# রামায়ণ ও মহাভারত

(সংক্ষেপিত)

ধর্মীয় শিক্ষা শিশু স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# রামায়ণ ও মহাভারত

(ধর্মীয় শিক্ষা শিশু স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য)

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# রামায়ণ ও মহাভারত (সংক্ষেপিত)

স্বত্ব : গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সম্পাদনায় : মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
শীর্ষক প্রকল্পের কারিকুলাম কমিটি
ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ
ড. কৃষ্ণেন্দু কুমার পাল
মোঃ রফিকুল ইসলাম
নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস
মোঃ মনির হোসেন মজুমদার
অসীম চৌধুরী
মোছাঃ নার্গিস আক্তার
মোঃ নুরুজ্জামান
প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
কাকলী রানী মজুমদার

পরিবেশনায় : মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প,
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

প্রথম প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
তৃতীয় প্রকাশকাল : আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

মুদ্রণ : **ফরাজী প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স**
১০১, মাতুয়াইল দক্ষিন পাড়া, মোঘলনগর, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬২।

মুদ্রণ সংখ্যা : ৩১,০৫০ কপি

# লেখক পরিচিতি

## উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

জন্ম ঃ ১৮৬৩ মৃত্যু ঃ ১৯১৫

বর্তমান বাংলাদেশের মৈমনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার মসুয়া গ্রামে এক খ্যাতনামা জমিদার বংশে ১৮৬৩ সালের ১২ই মে, জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতার নাম কালীনাথ রায়। কালীনাথের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠপুত্র সারদারঞ্জন ও মধ্যম পুত্র কামদারঞ্জন। এই কামদারঞ্জনই বাল্যকালে নিজের কাকা হরিকিশোর ও যশস্বী কর্তৃক দত্তকপুত্র রূপে গৃহীত হয়ে উপেন্দ্রকিশোর নামে পরিচিত হন। বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় এঁর পুত্র। শিল্পী ও চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় এঁর প্রপৌত্র। ১৮৮০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ ও পরে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে পড়াশুনা করেন এবং ১৮৮৪ সালে বি.এ. পাশ করেন। ১৮৮৩ সালে 'সখা' পত্রিকাতে এঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। শিশুদের জন্য বিখ্যাত 'সন্দেশ' মাসিক পত্রিকা ইনিই প্রকাশ করেন। ছেলেবেলায় সাধারণ পাঠ ভিন্ন চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত বিদ্যা প্রভৃতি সুকুমার কলাতেও এঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ছেলেদের রামায়ণ' 'ছেলেদের মহাভারত', ও 'টুনটুনির বই' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিজের রচিত গ্রন্থগুলিতে ইনি নিজেই ছবি আঁকতেন। ১৯১৫ সালে ২০ ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

# রামায়ণ

# আদিকাণ্ড

নেকদিন আগে আমাদের এই ভারতবর্ষে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। সরযূ নদীর ধারে, অযোধ্যা নগরে তিনি রাজ্য করিতেন।

সেকালের অযোধ্যা নগর আটচল্লিশ ক্রোশ লম্বা, আর বার ক্রোশ চওড়া ছিল। তাহার চারিদিকে প্রকাণ্ড দেওয়ালের উপরে লোহার কাঁটা দেওয়া ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল সাজানো থাকিত। সে অস্ত্রের নাম শতঘ্নী, কেন না তাহা ছুঁড়িয়া মারিলে একেবারে এক শত লোক মারা পড়ে।

তখনকার অযোধ্যা দেখিতে খুব সুন্দরও ছিল। ছায়ায় ঢাকা পরিষ্কৃত পথ, ফুলে ভরা সুন্দর বাগান, আর দামী পাথরের সাততলা আটতলা জমকালো বাড়িতে নগরটি ঝলমল করিত।

এই সুন্দর অযোধ্যা নগরে শাদা পাথরের বিশাল রাজপুরীতে শাদা ছাতার নীচে বসিয়া মহারাজ দশরথ তাঁহার রাজ্যের কাজ দেখিতেন। ধৃষ্টি, বিজয়, অকোপ, জয়ন্ত, সুমন্ত্র, সুরাষ্ট্র, ধর্মপাল আর রাষ্ট্রবর্ধন নামে তাঁহার আটজন মন্ত্রী এমন বিদ্বান বুদ্ধিমান আর ধার্মিক ছিলেন যে, তাঁহারা দেশে একটিও অন্যায় কাজ হইতে দিতেন না। সে দেশে চোর ডাকাত ছিল না। ভাল ছাড়া মন্দ কাজ কেহ করিত না। ভাল খাইয়া, ভাল পরিয়া, ভাল বাড়িতে থাকিয়া সকলেরই সুখে দিন যাইত। রাজা দশরথ তাহাদিগকে এত স্নেহ করিতেন যে আর কোন রাজা তেমন করিতে পারিতেন না। দশরথকেও তাহারা তেমনি করিয়া ভালবাসিত।

হায়! এমন রাজা দশরথ, তাঁহার একটিও ছেলে ছিল না। ছেলে নাই বলিয়া তিনি ভারি দুঃখ করিতেন। একদিন তিনি মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, 'দেখ, আমি যজ্ঞ করিব। হয়ত

তাহাতে খুশি হইয়া দেবতারা আমাকে পুত্র দিবেন।'

এ কথা শুনিয়া সকলে বলিল, 'মহারাজ, আপনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নিয়া আসুন। তিনি যজ্ঞ করিলে নিশ্চয়ই আপনার পুত্র হইবে।' এই মুনির হরিণের মত শিং ছিল, তাই লোকে তাঁহাকে ঋষ্যশৃঙ্গ বলিত। এমন ভাল মুনি কমই দেখা গিয়াছে।

মন্ত্রীদিগের কথা শুনিয়া দশরথ বলিলেন, 'বড় ভাল কথা। ঋষ্যশৃঙ্গ যে আমার জামাই হন, কারণ তিনি আমার বন্ধু লোমপাদ রাজার মেয়ে শান্তাকে বিবাহ করিয়াছেন। আমি নিজেই তাঁহাকে আনিতে যাইব।'

লোমপাদ রাজার বাড়ি অঙ্গদেশে। দশরথ সেই অঙ্গদেশে গিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে লইয়া আসিলেন। তারপর যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

আগে হইল অশ্বমেধ যজ্ঞ। ঘোড়ার মাংস দিয়া এই যজ্ঞ করিতে হয়। প্রথমে একটা ঘোড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ঘোড়ার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অনেক লোকজনও চলিল, যাহাতে কেহ তাহাকে আটকাইতে না পারে। তাহারা ক্রমাগত এক বৎসর ঘোড়াটাকে নানা দেশ ঘুরাইয়া শেষে তাহাকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিল।

তত দিনে শত-শত কারিকর, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, মুটে, মজুর মিলিয়া সরযূর উত্তর ধারে যজ্ঞের জন্য চমৎকার জায়গা তৈয়ার করিয়াছে। সেখানে কত মুনি, কত ব্রাহ্মণ, কত রাজা আর অন্য লোকজন কত আসিয়াছে, তাহার লেখাজোখা নাই। মিথিলার রাজা জনক, অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ, মগধের রাজা, পূর্বদেশের রাজা, সিন্ধুদেশের রাজা, সৌবীরের রাজা, সৌরাষ্ট্রের রাজা, আর কত বলিব। পৃথিবীর যত রাজার সঙ্গে দশরথের বন্ধুতা ছিল, সকলেই উপস্থিত।

ঘোড়া ফিরিয়া আসিলেই অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। যজ্ঞের কয়দিন সকলে কী আনন্দ করিয়া যে নিমন্ত্রণ খাইল, তাহা কী বলিব! যত চাহিয়াছে, ততই খাইতে পাইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ভোজনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'মহারাজের জয় হউক!' ছেলেদের পেট ভরিয়া গেল, তবুও তাহারা বলিল, 'আরও খাইব।'

অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন, 'এরপর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলে মহারাজের ছেলে হইবে।'

তখনই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হইল। সেই যজ্ঞের আগুনের ভিতর হইতে একজন পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। তাঁহার শরীর পাহাড়ের মত উঁচু, রঙ কালো, চোখ লাল, দাড়ি গোঁফ সিংহের কেশরের মত, পরণে লাল কাপড়। তাঁহার হাতে রুপার ঢাকা দেওয়া সোনার থালা, তাহাতে চমৎকার পায়স। সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ দশরথকে বলিলেন, 'মহারাজ, ব্রহ্মা নিজে এই পায়স রাঁধিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা রানীদিগকে খাইতে দাও, নিশ্চয় তোমার পুত্র হইবে।' এই বলিয়া তিনি কোথায় যে মিলাইয়া গেলেন, কেহ দেখিতে পাইল না।

দশরথের কী আনন্দ! এই পায়স রানীদিগকে খাইতে দিলেই তাঁহার পুত্র হইবে! প্রধানা রানী তিন জন—বড় কৌশল্যা, মেজ কৈকেয়ী, ছোট সুমিত্রা। দশরথ কী করিয়া তিন জনকে পায়স বাঁটিয়া দিলেন, বলিতেছি। প্রথমেই সেই পায়সের অর্ধেকটা লইয়া

খানিক সুমিত্রার জন্য আর বাকি কৌশল্যার জন্য রাখিলেন, তারপর অন্য অর্ধেকেরও খানিকটা সুমিত্রার জন্য, আর বাকিটা কৈকেয়ীর জন্য রাখা হইল। বেশ সহজ হিসাব।

তিন রানীতে মিলিয়া মনের সুখে এই পায়স খাইলেন। তাহার কিছুদিন পরেই তাঁহাদের দেবতার মত চারিটি ছেলে হইল—কৌশল্যার একটি, কৈকেয়ীর একটি, আর সুমিত্রার দুইটি।

দশরথের পুত্র হইয়াছে শুনিয়া যে সকলেই আনন্দিত হইল, তাহাতে আর সন্দেহ কী? ব্রাহ্মণ আর গরীব দুঃখীদের তো খুবই আনন্দ হইবার কথা, কারণ তাহারা অনেক টাকা-কড়ি পাইল।

ছেলে চারিটি এগারো দিনের হইলে পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনি তাঁহাদের নাম রাখিলেন। সকলের বড় ছেলেটি কৌশল্যার, তাঁহার নাম হইল রাম। তাহার পরেরটি কৈকেয়ীর, তাঁহার নাম হইল ভরত। আর দুটি সুমিত্রার, তাঁহাদের নাম হইল লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন।

ছেলে চারটি যেমন সুন্দর, তেমনি বুদ্ধিমান, আর তেমনি তাঁহাদের মিষ্ট স্বভাব। ভাল ছেলের যতরকম গুণ থাকিতে হয়, তাহার কিছুই তাঁহাদের কম ছিল না। অল্পদিনের ভিতরেই তাঁহারা যার-পর-নাই বিদ্বান আর বীর হইয়া উঠিলেন। লেখায়, পড়ায়, যুদ্ধে, শিকারে কোন কাজেই তাঁহাদের মতন আর কেহ ছিল না।

ভাইকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহা রাম, লক্ষ্মণ, ভরত আর শত্রুঘ্নকে দেখিলে বুঝিতে পারিতে। তাহার মধ্যে আবার রামকে লক্ষ্মণ আর ভরতকে শত্রুঘ্ন আরও বেশি করিয়া ভালবাসিতেন। ইহাদিগকে দেখিলে সকলেই সুখী হইত। রাজা দশরথ যে কতখানি আনন্দিত হইতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

একদিন রাজা দশরথ পুরোহিত আর মন্ত্রীদিগকে লইয়া ছেলেদের বিবাহের পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময় বিশ্বামিত্র মুনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। মুনিদের ভিতরে বিশ্বামিত্রের মান বড়ই বেশি। তাঁহার মত তপস্যা খুব কম লোকেই করিয়াছে, তেমন ক্ষমতাও খুব কম লোকেরই আছে। তাহাতে আবার লোকটি বিলক্ষণ একটু রাগী। এরূপ লোককে যেমন করিয়া আদর যত্ন করিতে হয়, দশরথ তাহার কিছুই বাকি রাখিলেন না। তারপর তিনি বলিলেন, 'মুনিঠাকুর, আপনি যে আসিয়াছেন, ইহা আমার বড়ই সৌভাগ্য ; আর ইহাতে আমি খুবই সুখী হইলাম। এখন আপনি কী চাহেন বলুন, আমি তাহাই দিতেছি।'

দশরথ ভাবিয়াছিলেন, মুনি টাকা-কড়ি চাহিবেন। কিন্তু মুনি যাহা চাহিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'মহারাজ, আমি যেজন্য আসিয়াছি তাহা শুন। আমি একটা যজ্ঞ করিয়াছিলাম, ইহার মধ্যে মারীচ আর সুবাহু নামে দুই রাক্ষস আসিয়া তাহাতে মাংস ঢালিয়া সব নষ্ট করিয়া দিয়াছে। শুনিয়াছি রাবণ নামে একটা ভয়ানক দুষ্ট রাক্ষস আছে, ইহারা তাহারই লোক। তুমি যদি দশ দিনের জন্য তোমার রামকে আমার সঙ্গে দাও, তবে সে রাক্ষস দুটাকে মারিয়া দিতে পারে। রাম ছাড়া আর কেহই এ কাজ করিতে পারিবে না। রাম এখন বড় হইয়াছে, আর বীরও যেমন-তেমন হয় নাই। রাক্ষসের সাধ্য কী যে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করে! তোমার কোন ভয় নাই। রামকে

দিয়া আমার এ কাজটি করাইয়া দাও, ইহাতে ভাল হইবে।'

মুনির কথা শুনিয়াই তো দশরথ কাঁপিতে কাঁপিতে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। খানিক পরে একটু সুস্থ হইয়া তিনি বলিলেন, 'মুনিঠাকুর, আপনার পায়ে পড়ি, আমি রামকে দিতে পারিব না! আমার রাম কি এ-সকল ভয়ানক রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে? না-হয় নিজেই অনেক লোকজন লইয়া আপনার যজ্ঞে পাহারা দিব। রামকে ছাড়িয়া দিন!' ইহাতে বিশ্বামিত্র এমনই রাগিয়া গেলেন যে, তাঁহার রাগ দেখিয়া দেবতারা পর্যন্ত অস্থির।

যে সর্বনেশে মুনি, ইঁহার আরও বেশি রাগ হইলে কি আর রক্ষা ছিল। কাজেই তখন বশিষ্ঠ মুনি রাজাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, শীঘ্র রামকে আনিয়া দিন, ইহাতে রামের ভাল হইবে। বিশ্বামিত্র যেমন তেমন মুনি নহেন, ইহার সঙ্গে যাইতে রামের কোনও ভয় নাই। তাহার ভালর জন্যই বিশ্বামিত্র তাহাকে লইতে আসিয়াছেন।' বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া দশরথের আর ভয় রহিল না। তিনি তখনই রাম আর লক্ষ্মণকে আনিয়া দিলেন।

যুদ্ধের পোশাক পরিয়া,তীর ধনুক খড়্গ লইয়া, বিশ্বামিত্রের পিছু-পিছু দুই ভাইকে যাইতে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। রাজা আর রানীরা তাঁহাদের মাথায় চুমা খাইয়া তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন; আর সকলেই বলিল, 'তোমাদের ভাল হউক!'

খানিক দূরে গিয়া বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন, 'বাছা রাম, ঐ সরযূর জলে মুখ ধুইয়া আইস। আমি তোমাকে "বলা" আর "অতি-বলা" নামক মন্ত্র দিব। এ মন্ত্র জানিলে তোমার পরিশ্রম বা অসুখ হইবে না, কেহ তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, আর যুদ্ধে সকলেই তোমার কাছে হারিয়া যাইবে।' রাম নদীতে মুখ ধুইয়া মুনির নিকট মন্ত্র লইলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, যেন তাঁহার শরীরের তেজ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

রাত্রি হইলে তিন জনে সরযূর ধারে ঘাসের উপর ঘুমাইয়া রহিলেন। সকালবেলা উঠিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন। সেদিনকার রাত্রি কাটিল অঙ্গদেশে মুনিদের আশ্রমে। এইখানে আসিয়া সরযূ নদী গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। পরদিন মুনিরা একখানি সুন্দর নৌকা আনিয়া তাঁহাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন।

ওপারে ভয়ানক বন। সেই বনে তাড়কা নামে একটা রাক্ষসী থাকে। তাহার গায়ে হাজার হাতির জোর। আগে এখানে সুন্দর দেশ ছিল, তাহাতে কতই লোকজন বাস করিত। এই তাড়কা আর তাহার পুত্র মারীচ সেই সকল লোকজনকে খাইয়া দেশটি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এখন সেখানে ভয়ানক বন, সে বনে মানুষ গেলেই তাড়কা তাহাকে ধরিয়া খায়।

বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন, 'বাছা, রাক্ষসীটাকে মারিতে হইবে।' রাম বলিলেন, 'আচ্ছা।' এই বলিয়া তিনি ধনুকের গুণ ধরিয়া খুব জোরে টঙ্কার দিলেন। ধনুকের গুণ জোরে টানিয়া হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে 'টং' করিয়া একটা শব্দ হয়, তাহাকেই বলে 'টঙ্কার'। রাম ধনুকে এমনি টঙ্কার দিলেন যে, তাহা শুনিয়া বনের জন্তুরা মনে করিল বুঝি সর্বনাশ উপস্থিত।

সে শব্দে তাড়কাও প্রথমে চমকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরেই সে হাত তুলিয়া,

হাঁ করিয়া, ঘোরতর গর্জন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। তখন ধূলায় চারিদিক অন্ধকার করিয়া সে রাম-লক্ষ্মণের উপরে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল।

কিন্তু রামের বাণের কাছে সে পাথর কিছুই নয়। তিনি পাথর তো আটকাইলেনই, তাহার উপর আবার রাক্ষসীর লম্বা হাতদুটোও কাটিয়া ফেলিলেন। তবুও কিন্তু সে ছুটিয়া আসিতে ছাড়ে না। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ তাহার নাক আর কান কাটিয়া দিলেন। তখন সে হঠাৎ কোথায় যে মিলাইয়া গেল, কিছুই বুঝা গেল না। হাত নাই তবুও বড় বড় পাথর ছুড়িয়া মারে, কিন্তু কোথায় আছে দেখা যাইতেছে না।

তখন রাম কেবল তাহার শব্দ শুনিয়াই সেই শব্দের দিকে তীর ছুঁড়িতে লাগিলেন। এমন ভয়ানক তীর ছুঁড়িতে লাগিলেন যে, রাক্ষসী তাহার জীবনে আর কখনও এত তীর খায় নাই। লুকাইয়া থাকিবার জো কী! তীরের জ্বালায় অস্থির হইয়া শেষটা তাহাকে দেখা দিতেই হইল। আর রামও অমনি এক বাণে একেবারে তাহার বুক ফুটা করিয়া দিলেন। তখন ভয়ানক চিৎকার করিয়া তাড়কা মরিয়া গেল।

দেবতারা আকাশ হইতে রামের যুদ্ধ দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। আর বিশ্বামিত্রের তো কথাই নাই। তিনি রামকে কি বলিয়া আশীর্বাদ করিবেন, আর কী দিয়া সুখী করিবেন, তাহাই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। সে রাত্রি তাঁহাদের সেই বনেই কাটিল। সকালে উঠিয়া বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন, 'বাছা, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাই তোমাকে কতকগুলি আশ্চর্য অস্ত্র দিব। এ-সকল অস্ত্র থাকিলে কেহই তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে না।'

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র পূর্বমুখে বসিয়া মনে মনে অস্ত্রদিগকে ডাকিতে লাগিলেন, আর অমনি নানারূপ আশ্চর্য এবং ভয়ঙ্কর অস্ত্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ইন্দ্রচক্র, ব্রহ্মশির, ঐষিক, ব্রহ্মাস্ত্র, ধর্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ, শুষ্ক অশনি, আর্দ্র অশনি, পৈনাক, নারায়ণ, শিখর, বায়ব্য, হয়শির, ক্রৌঞ্চ, কঙ্কাল, মুষল, কপাল, কিঙ্কিণী, নন্দন, মোহন, প্রস্বাপন, প্রশমন, বর্ষণ, শোষণ, সন্তাপন, বিলাপন, মাদন, মানব, তামস, সৌমন, সংবর্ত—আর কত নাম করিব! এ-সকল ছাড়া, আরও অনেকগুলি অস্ত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা, শূল, বজ্র ইত্যাদি বিশ্বামিত্রের ডাকে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা জোড়হাত করিয়া রামকে বলিল, 'রাম, আমরা এখন তোমার হইয়াছি; তুমি যাহাই বলিবে তাহাই করিব।' রাম একে-একে তাহাদের সকলের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, 'এখন যাও, আমি যখন ডাকিব, তখন আসিবে।' অস্ত্রেরা 'আচ্ছা তাহাই হইবে' বলিয়া যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেইখানে চলিয়া গেল।

ইহার পর তাঁহারা একটা খুব সুন্দর স্থানে আসিলেন। সে স্থানটি দেখিয়া রাম বলিলেন, 'কী সুন্দর জায়গা! গুরুদেব, এখানে কে থাকেন?' বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'এই স্থানের নাম সিদ্ধাশ্রম। এখানে আগে কশ্যপ মুনি থাকিতেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী অদিতি দেবীর সহিত এক হাজার বৎসর এইখানে থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু নিজে তাঁহাদের পুত্র হইয়া জন্মেন। সেই ছেলের নাম বামন। তিনি অনেক

আশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন। এখন আমি এই স্থানে থাকিয়া তপস্যা করি। এইখানে দুষ্ট রাক্ষসেরা যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসে। সেই দুষ্টদিগকে তুমি মারিবে।'

এই কথা বলিতে না বলিতেই তাঁহারা আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর ঠিক হইল যে, পরদিন যজ্ঞ আরম্ভ হইবে।

যজ্ঞের দিন ভোরে উঠিয়া রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, 'মুনিঠাকুর, রাক্ষসেরা কখন আসিবে ঠিক করিয়া বলিয়া দিন।' বিশ্বামিত্র তখন চক্ষু বুজিয়া বসিয়া ছিলেন, রাম লক্ষ্মণের কথায় কোন উত্তর দিলেন না। অন্য মুনিরা বলিলেন, 'রাজপুত্র, উনি মৌনে বসিয়া আছেন। উঁহাকে ছয় রাত্রি ঐরূপ চুপ করিয়া থাকিতে হইবে, কথা বলিতে পারিবেন না। এই ছয় রাত্রি তোমরা খুব সাবধান হইয়া তপোবন পাহারা দাও।' রাম লক্ষ্মণ তখনই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পাহারা দিতে আরম্ভ করিলেন। দিন নাই, রাত নাই, চোখে ঘুম নাই, খালি কখন রাক্ষস আসে সেদিকেই তাঁহাদের মন।

এইরূপে পাঁচ দিন চলিয়া গেল। ছয় দিনের দিন তাঁহারা আরও বেশি করিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। এমন সময় দপ্ করিয়া যজ্ঞের বেদী জ্বলিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ভয়ানক শব্দ, আর যজ্ঞের জায়গায় রক্ত বৃষ্টি। তখন রাম উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, মারীচ আর সুবাহুর সঙ্গে বড় বড় বিকটাকার রাক্ষসেরা দল বাঁধিয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিয়াছে।

তাহা দেখিয়া রাম মারীচের বুকে মানবাস্ত্র নামক বাণ ছুঁড়িয়া মারিলেন। বাণের চোটে সে বেচারা অজ্ঞান হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে একশত যোজন দূরে সমুদ্রে গিয়া পড়িল। তারপর রাম আগ্নেয়াস্ত্র ছুঁড়িলে তাহার ঘা খাইয়া সুবাহু সেইখানেই পড়িয়া মরিল। বাকি রাক্ষসগুলিকে মারিতে খালি বায়ব্য অস্ত্র ছাড়া আর কিছুর দরকার লাগে নাই। তখন মুনিগণের যে কি আনন্দ হইল, তাহা কি বলিব!

অনেক পরিশ্রমের পর সে রাত্রিতে লতা-পাতার বিছানায় রাম লক্ষ্মণ বড়ই সুখে ঘুমাইলেন। পরদিন সকালে মুনিরা বলিলেন, 'চল বাবা, মিথিলায় যাই। সেখানকার রাজা জনক যজ্ঞ করিবেন, তাহা দেখিতে হইবে। আর সেখানে একখানা ভয়ঙ্কর ধনুক আছে, তাহাতে এত জোর যে, দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস, মানুষ কেহই তাহাতে গুণ দিতে পারে নাই। সেই ধনুকখানাও দেখিতে হইবে।' এই বলিয়া মুনিরা মিথিলায় যাইবার জন্য জিনিসপত্র বাঁধিয়া লইলেন। জিনিস নিতান্ত কম ছিল না, একশতখানা গাড়ি তাহাতেই বোঝাই হইয়া গেল।

সবুজ শস্যের ক্ষেতের মধ্য দিয়া তাঁহাদের চলিবার পথ। সে পথে যাইতে রাম লক্ষ্মণের বড়ই ভাল লাগিতেছিল। সেদিনকার রাত্রিতে তাঁহারা শোণ নদের ধারে আসিয়া রহিলেন। তাহার পরের রাত্রি গঙ্গার ধারে, তাহার পরের রাত্রি বিশালা নগরে কাটিল। চারি দিনের দিন সকালবেলায় তাঁহারা দূর হইতে মিথিলার সুন্দর রাজপুরী দেখিতে পাইলেন। ঐ স্থানের নিকটেই একটি অতি সুন্দর আর খুব পুরাতন আশ্রম ছিল। তাহা দেখিয়া রাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গুরুদেব, এটি কাহার তপোবন? এখানে কেন লোকজন নাই?'

বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'বাছা, এটি গৌতম মুনির আশ্রম। গৌতমের স্ত্রী অহল্যা একবার একটা নিতান্ত অপরাধের কাজ করাতে গৌতম তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন, "তুই এইখানে ছাইয়ের উপর পড়িয়া থাক্। তোকে কেহ দেখিতে পাইবে না। বাতাস ভিন্ন তুই আর কিছু খাইতে পাইবি না। এইরূপে তোর অনেক বৎসর কাটিবে। তারপর যখন দশরথের পুত্র রাম এইখানে আসিবেন, তখন তাঁহার পূজা করিস। তাহা হইলে আবার তুই ভাল হইবি, আর আমিও ফিরিয়া আসিব।" এই বলিয়া গৌতম কৈলাস পর্বতে চলিয়া গেলেন। রাম, তুমি একবার এই আশ্রমের ভিতরে আইস। তাহা হইলে অহল্যা আবার ভাল হইতে পারেন।'

গৌতমের আশ্রমে গিয়া তাঁহারা অহল্যা দেবীকে দেখিতে পাইলেন। এতদিন ধরিয়া তিনি কেবলই তপস্যা করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার শরীরে এমন আশ্চর্য তেজ হইয়াছে যে, দেবতারাও তাঁহার দিকে তাকাইতে পারেন না। এতদিন গৌতমের শাপে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। এখন রাম আসিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে দেখিল। অহল্যাকে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণ তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় করিয়া লইলেন। অহল্যাও গৌতমের কথা মনে করিয়া রামকে পূজা করিলেন। এদিকে গৌতম মুনি হিমালয়ে থাকিয়া তপস্যার দ্বারা সকল কথাই জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং তিনিও তখন সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। এইরূপে অহল্যার দুঃখের শেষ হইল। তারপর গৌতম আর অহল্যা দুইজনে মিলিয়া মনের সুখে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন।

গৌতমের আশ্রম হইতে মিথিলা বেশি দূরে নয়। সেখানে গিয়া সকলে দেখিলেন যে, জনক রাজা অতি চমৎকার যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। কত মুনি, কত লোকজন, কত গাড়ি ঘোড়া সেখানে আসিয়াছে, তাহা গণিয়া উঠা ভার। বিশ্বামিত্র তাঁহাদের থাকিবার জন্য সেই ভিড়ের এক কোণে একটি নিরিবিলি জায়গা খুঁজিয়া লইলেন। ততক্ষণে রাজা জনকও খবর পাইয়া বিশ্বামিত্রকে আদর করিবার জন্য সেখানে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার পুরোহিত শতানন্দ মুনি।

বিশ্বামিত্রকে নানারূপ সম্মানে তুষ্ট করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মুনিঠাকুর, আপনার সঙ্গের এই ছেলে দুটি কী সুন্দর! আহা, যেন দুটি দেবতার ছেলে! এ দুটি কোন্ রাজার পুত্র? আর কি জন্য এত কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছেন?' বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'মহারাজ, ইঁহারা অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। সিদ্ধাশ্রমে রাক্ষসদিগকে মারিয়া, তারপর গৌতমের আশ্রমে অহল্যার কষ্ট দূর করিয়া এখানে আসিয়াছেন। এখন ইঁহাদের সেই শিবের ধনুক দেখিবার ইচ্ছা।'

জনকের পুরোহিত শতানন্দ মুনি গৌতমের বড় ছেলে। তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার মাতা আবার ভাল হইয়াছেন, তখন তাঁহার মনে কী সুখই হইল। তিনি রামকে কতই স্নেহ দেখাইলেন আর বিশ্বামিত্রের কত প্রশংসা করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিশ্বামিত্রই রামকে আনিয়া তাঁহার মায়ের দুঃখ দূর করিয়াছেন।

পরদিন সকালবেলায় বিশ্বামিত্র জনককে বলিলেন, 'মহারাজ, সেই ধনুকখানি রাম

লক্ষ্মণ একবার দেখিতে চাহেন।'

জনক বলিলেন, 'ধনুকের কথা বলি শুনুন। এই ধনুক আগে ছিল শিবের। শিব একবার দেবতাদের উপর চটিয়া গিয়া এই ধনুক হাতে তাঁহাদিগকে তাড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবতারা অনেক মিনতি করাতে খুশি হইয়া ধনুকখানা তাঁহাদিগকেই দিলেন। দেবতারা আবার রাজা দেবরাতের নিকট তাহা রাখেন। এই দেবরাত আমার পূর্বপুরুষ।

ইহার পর একদিন আমি লাঙল দিয়া যজ্ঞের স্থান চষিতেছিলাম। এমন সময় আমার লাঙলের মুখের কাছে পৃথিবী হইতে একটি পরমা সুন্দরী কন্যা উঠিল। সেই মেয়েটি এতদিনে আমার ঘরে থাকিয়া এখন বড় হইয়াছে। লাঙলের মুখে উঠিয়াছিল বলিয়া আমি তাহার নাম রাখিয়াছি সীতা*। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, এই শিবের ধনুকে যে গুণ দিতে পারিবে তাহাকেই এই মেয়ে দিব।

'তারপর কত রাজা আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা ধনুকে গুণ দিবে কি, তাহা তুলিতেই পারে না। তখন তাহারা ভয়ানক চটিয়া গিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। আমি অনেক কষ্টে, দেবতাদের সাহায্য লইয়া শেষে শত্রুদিগকে তাড়াই। এখন সেই ধনুক আমি রাম লক্ষ্মণকে দেখাইব। রাম যদি তাহাতে গুণ দিতে পারেন, তবে তিনি সীতাকে পাইবেন।'

তখন জনকের হুকুমে ধনুকখানা বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আনা হইল। আট চাকার গাড়ির উপরে, লোহার সিন্ধুকের মধ্যে ধনুকখানি রহিয়াছে। তাহা টানিয়া আনিতে পাঁচ হাজার জোয়ান কাহিল! রাম সেই ধনুক দেখিয়া কহিলেন, 'এটাতে গুণ দিতে হইবে নাকি?' বিশ্বামিত্র আর জনক বলিলেন, 'হাঁ।'

এত বড় ধনুক তুলিতে রামের একটু কষ্ট হইলেও তাঁহার নিন্দার কথা ছিল না। কিন্তু কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং সে কাজটা তাঁহার খুব সহজই বোধ হইল। যেই ধনুক তোলা, অমনি তাহাতে গুণ চড়ানো। তারপর গুণ ধরিয়া এক টান দিতেই, ধনুক ভাঙিয়া একেবারে দুইখান! এমনি সহজে রাম সেই ধনুক ভাঙিলেন।

কিন্তু রাম তাহা সহজে ভাঙিলেন বলিয়া তো ধনুকখানি সহজ ধনুক ছিল না! আর সে ধনুক ভাঙার ব্যাপারখানাও যেমন তেমন ব্যাপার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ, তাহার শব্দে বিশ্বামিত্র, জনক আর রাম লক্ষ্মণ ছাড়া সকল লোক চিৎপাত হইয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। তখন জনক বলিলেন, 'রামের গায়ে আশ্চর্য জোর! এমন আর কাহারও নাই। আমি ইহার সঙ্গেই সীতার বিবাহ দিব।'

তখনই পত্র লইয়া দূতেরা দশরথকে আনিতে অযোধ্যায় চলিল। দশরথও তাহাদের মুখে সকল কথা শুনিয়া আর বিলম্ব করিলেন না। পরদিনই বশিষ্ঠ আর অন্য-অন্য পুরোহিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া তিনি মিথিলা যাত্রা করিলেন। ধন-রত্ন, গাড়ি-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত, কত সঙ্গে লইলেন, তাহার লেখাজোখা নাই। মিথিলায় পৌঁছিতে তাঁহাদের চারিদিন লাগিল।

---

* লাঙলের মুখের আঁচড়ে মাটিতে যে দাগ পড়ে, তাহার নাম 'সীতা'।

রাজায় রাজায় দেখা হইলে একটা খুবই ধুমধাম হইয়া থাকে। সে আর কত বর্ণনা করিব? কিন্তু আসল কাজের কথাটা, রামের বিবাহের কথা। সে বিষয়ের পরামর্শ কিরূপ হইয়াছিল, বলিতেছি।

জনক রাজার আর একটি মেয়ে ছিল, তাহার নাম উর্মিলা। তাহা ছাড়া জনকের ভাই রাজা কুশধ্বজের দুটি মেয়ে ছিল, তাহাদের নাম মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এই চারিটি ভাইয়ের সঙ্গে সীতা, উর্মিলা, মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি এই চারিটি বোনের বিবাহ হইলে বেশ ভাল হয়, না? সুতরাং স্থির হইল যে, রামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত উর্মিলার, ভরতের সহিত মাণ্ডবীর, আর শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্তির বিবাহ হইবে।

সুন্দর সময়ে অগ্নি-সাক্ষী করিয়া মহা ধুমধামে শুভকার্য শেষ হইলে সেদিন মিথিলায় কী আনন্দই হইয়াছিল! যেদিকে তাকাও কেবলই আলো, আর ধূপ-ধুনা, আর মুনিঠাকুর, আর শঙ্খ-ঘণ্টা, আর ঢাক-ঢোল ; আর হাতি ঘোড়া, আর মিঠাই সন্দেশ, আর ভিখারী বৈষ্ণব, আর হাসি তামাশা, ছুটাছুটি, ভোজন, ভোজন, কোলাহল, কোলাহল, কোলাহল।

পরদিন সকালে বিশ্বামিত্র হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। দশরথও অযোধ্যায় যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। জনক প্রত্যেক মেয়েকে কী দিয়াছিলেন শুনিবে? প্রত্যেক মেয়েকে তিনি এক-এক লক্ষ গরু দিয়াছিলেন। আর হাতি, ঘোড়া, সিপাহি, রূপা; মণি, মুক্তা, রেশমী কাপড়, কম্বল ইত্যাদি কত যে দিয়াছিলেন, আমি তাহার হিসাব দিতে পারিব না। ইহার উপর আবার এক-এক শত করিয়া সখী, এক-এক শত দাসী, আর এক-এক শত চাকর। এইরূপ আদর যত্ন করিয়া জনক সকলকে বিদায় করিলেন। দশরথও মনের সুখে অযোধ্যায় চলিলেন।

এমন সময় দেখ কী সর্বনাশ উপস্থিত! পাখিরা চ্যাঁচাইতেছে, জন্তুরা ছুটিয়া পলাইতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে, ঝড় বহিতেছে, গাছ ভাঙিয়া পড়িতেছে, সূর্য ঢাকিয়া গিয়াছে, চারিদিক অন্ধকার। সকলে ভয়ে অস্থির, না জানি এর পর কী বিপদ হইবে!

বিপদ যে কি, তাহা জানিতেও বিলম্ব হইল না ; কারণ তখনই পরশুরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে মানুষ পথ দিয়া চলিবার সময় এমন কাণ্ড হয়, তিনি যে কেমন ভয়ঙ্কর লোক, তাহা বুঝিতেই পার। তাঁহার শরীরটা যেন একটা পাহাড়, চোখদুটো যেন আগুনের গোলা! হাতে একখানি ধনুক আছে, তাহা সেই জনক রাজার ধনুকের চেয়ে নিতান্ত কম নহে। আর একখানা কুড়াল যে আছে, তাহার কথা কি বলিব! কুড়াল কাঁধে ফিরেন বলিয়া তাঁহার 'পরশু' অর্থাৎ 'কুড়ুলে' রাম নাম হইয়াছে (পরশু অর্থে কুড়াল)। এই কুড়াল দিয়া তিনি একবার নয়, দুবার নয়, ক্রমাগত একুশবার ক্ষত্রিয়দিগকে কাটিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়াছেন। তাহাদের অপরাধ এই যে, কার্তবীর্যার্জুন নামক তাহাদের একজন তাঁহার বাপ জমদগ্নি মুনিকে মারিয়া ফেলে।

এতদিনে তাঁহার রাগটা একটু কমিয়া গিয়াছে। এখন আর ক্ষত্রিয় দেখিলেই তাহাকেই ধরিয়া মারেন না। কিন্তু রামের উপর তিনি বড়ই চটিয়া গিয়াছেন। তিনি আসিয়া রামকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়াই বলিলেন, 'তুমি নাকি বড় বীর হইয়াছ? শিবের ধনুক ভাঙিয়াছ?

বটে! আচ্ছা, আমি এই আর একখানি ধনুক আনিয়াছি। এখানিতে একবার তীর চড়াইয়া টান দেখি! যদি পার, তবে তোমার সহিত যুদ্ধ করিব।'

ইহা শুনিয়া দশরথের বড় ভয় হইল। তিনি মনে করিলেন, না জানি এই সর্বনেশে মানুষ রামের কী ভয়ানক অনিষ্টই করিবেন! তাই তিনি রামকে ছাড়িয়া দিবার জন্য পরশুরামকে অনেক মিনতি করিলেন। কিন্তু পরশুরাম কি তাহা শোনেন! তিনি রামকে বলিলেন, 'বিশ্বকর্মা দু-খানি বড় ধনুক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার একখানি তুমি ভাঙিয়াছ, আর একখানি এই আমার হাতে আছে। এখানি সেখানার চেয়ে কম নয়। এখন বলিতেছি, আমার এই ধনুকখানিতে তীর চড়াও, দেখি কেমন ক্ষত্রিয়!'

ক্ষত্রিয়কে 'দেখি তুমি কেমন ক্ষত্রিয়' বলিলে বড়ই অপমানের কথা হয়। সে তাহা কিছুতেই সহিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই তখন রাম বলিলেন, 'আচ্ছা তবে দেখুন'। এই বলিয়া তিনি ধনুকখানি লইয়া তাহাতে গুণ দিলেন। তারপর একটি বাণ তাহাতে চড়াইয়া বলিলেন, 'মুনিঠাকুর, আপনি ব্রাহ্মণ, আমার গুরুলোক ; তাই এই বাণ আমি আপনার উপর ছুঁড়িতে ইচ্ছা করি না ; কেন না, তাহা হইলে আপনি মরিয়া যাইবেন। তবে আপনি তপস্যা করিয়া যে সকল জায়গা পাইয়াছেন, আমি ইচ্ছা করিলে তাহা নষ্ট করিয়া দিতে পারি, না হয় আপনার আকাশে চলাফেরার পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারি। এখন বলুন, ইহার কোন্‌টা করিব?'

এতক্ষণে পরশুরামের সে রাগ নাই। তিনি খুবই জব্দ হইয়া গিয়াছেন। তাই তিনি নরম হইয়া বলিলেন, 'রাম, আমার তপস্যায় পাওয়া স্থানগুলিই না হয় নষ্ট করিয়া দাও, কিন্তু আমার পথ আটকাইও না। তোমার ভাল হউক। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি যে-সে লোক নহ।' সুতরাং রাম তীর ছুঁড়িয়া পরশুরামের তপস্যায় পাওয়া জায়গাগুলি নষ্ট করিয়া দিলেন, তাঁহার পথ আটকাইলেন না। তখন পরশুরাম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, আর আর সকলে অযোধ্যায় চলিয়া আসিল।

তারপর রানীরা কত আদর করিয়া বউ লইলেন, সে আর বেশি করিয়া কি বলিব? সে সময় পূজা অর্চনা, গান বাজনা, আমোদ আহ্লাদ অবশ্যই হইয়াছিল। রানীরা বউদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বসন ভূষণ কত কী দিয়াছিলেন, সে খবর কে রাখে!

আমি কেবল ইহাই জানি যে, ইহার কিছুদিন পরে ভরত আর শত্রুঘ্ন মামার বাড়ি বেড়াইতে গেলেন।

# অযোধ্যা কাণ্ড

রাজা দশরথের বয়স প্রায় ষাট হাজার বৎসর হইয়াছে। এত বয়স হইলে কতখানি বুড়া হয় বুঝিতেই পার। কাজেই তিনি এখন আর রাজ্যের কাজের জন্য আগের মতন পরিশ্রম করিতে পারেন না। আর রামও এতদিনে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জোরে, সাহসে,—যত রকম গুণ হইতে পারে, সকল গুণেই—সকলের বড় হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা দেখিয়া দশরথ একদিন মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, 'আমি এখন বুড়া হইয়াছি, আর কত দিনই বা বাঁচিব। তাই আমি মনে করিতেছি যে রামকে যুবরাজ করিয়া দেই।' এই বলিয়া তিনি মন্ত্রী পাঠাইয়া দেশ বিদেশে সংবাদ দিলেন, 'আমি একটা মস্ত সভা করিব।'

খবর পাইয়া পৃথিবীর যত ভাল ভাল রাজা আর বড় লোক সকলে দশরথের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সভায় দশরথ বলিলেন, 'দেখ, এতদিন আমি যতদূর পারিয়াছি রাজ্যের কাজ করিয়াছি। এখন আমার অনেক বয়স হইয়াছে, চুল পাকিয়া গিয়াছে, গায়ের জোর কমিয়া গিয়াছে। এই বুড়া বয়সে আমি রাজ্যের জন্য এত পরিশ্রম করিতে পারি না। আমার রাম এখন বড় হইয়াছেন, আর তাঁহার গুণের কথা তোমরা সকলেই জান। এজন্য আমি এখন তাঁহার হাতে রাজ্যের ভার দিতে চাহিতেছি। তাহাতে তোমরা কী বল?'

এ কথায় সকলে বলিল, 'মহারাজ, রামের গুণের কথা কী বলিব! পৃথিবীতে এমন আর নাই! দেশের লোক রামকে যে কত ভালবাসে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আপনি রামকে যুবরাজ করিয়া দিন, দেখিয়া আমাদের চক্ষু জুড়াক।'

তখন দশরথ বলিলেন, 'সুন্দর চৈত্র মাস আসিতেছে; বনে ফুল ফুটিয়াছে। আপনারা শীঘ্র আয়োজন করুন। এই সুন্দর সময়ে রামকে যুবরাজ করিতে হইবে।' এই কথা শুনিয়া সভার লোক এতই আনন্দিত হইল যে, তাহাদের কোলাহলে সভাঘর ফাটে আর কি!

দশরথের কথায় মন্ত্রী সুমন্ত্র তখনি রামকে লইয়া আসিলেন। দশরথ পরম আদরের সহিত তাঁহাকে কাছে বসাইয়া বলিলেন, 'বাবা, তোমার যেমন গুণ, সকলে তোমাকে তেমনি ভালবাসে। এখন তুমি যুবরাজ হও, তাহা দেখিয়া সকলে সুখী হউক।' রামের

যাহারা বন্ধু, তাহারা শুনিবামাত্র ছুটিয়া গিয়া কৌশল্যাকে খবর দিল। সে সংবাদে কৌশল্যা কিরূপ খুশি হইয়াছিলেন, আর তাহাদিগকে কত পুরস্কার দিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতেই পার।

স্থির হইল যে, পরদিনই রামকে যুবরাজ করা হইবে। সে সংবাদে অযোধ্যায় হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। অযোধ্যার লোকেরা মনের আনন্দে আর ঘরের ভিতরে না থাকিতে পারিয়া পথে আসিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। গাড়ি ঘোড়া লইয়া আর চলিবার জো রহিল না। সকলের মুখে খালি রামের কথা। কেহ বলিতেছে 'বাঃ, মহারাজ কী ভাল কাজই করিলেন।' কেহ বলিতেছে, 'মহারাজ চিরজীবী হউন।'

রানী কৈকেয়ীর একটা দাসী ছিল। তাহার নাম ছিল মন্থরা ; কিন্তু তাহার পিঠে একটা মস্ত কুঁজ ছিল বলিয়া সকলে তাহাকে কুঁজী বলিয়া ডাকিত। যেমন কদাকার চেহারা, তেমনি তাহার কুটিল মন ছিল। উহার ঐ মস্ত কুঁজটার ভিতরে বুঝি খালি হিংসা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কৈকেয়ী ঐ দাসীটিকে বাপের বাড়ি হইতে আনিয়াছিলেন, কাজেই তাহাকে বড় আদর করিতেন।

সকালবেলা লোকের কলরব শুনিয়া কুঁজী ছাতে উঠিয়া দেখিতে গেল, কিসের গোলমাল। সেখানে গিয়া দেখিল যে, রাস্তায় চন্দনের জল আর পদ্মের পাপড়ি ছড়ানো হইয়াছে, নিশান উড়িতেছে, আর চারিদিকে কেবল গান বাজনা আর কোলাহল শুনা যায়। ইহাতে কুঁজীর মনে বড়ই ভাবনা উপস্থিত হইল। উহার কাছেই একটি ঝি রেশমী কাপড় পরিয়া হাসিমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। কুঁজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ গা, রামের মা কৌশল্যা কিসের জন্য লোককে এত টাকা দিতেছে? ও যে কৃপণ, তবু ও এমন করিয়া টাকা দিতেছে, ব্যাপারখানা কী?' ঝি বলিল, 'কাল যে রাম যুবরাজ হইবেন!'

এই কথা শুনিয়া আর কি কুঁজী হিংসায় স্থির থাকিতে পারে? সে হিংসায় যে তার কুঁজ তখন ফাটিয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য! ফাটিলে ভালই ছিল। কৈকেয়ী তখন শুইয়া ছিলেন। কুঁজী সেখানে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তাড়া—কি তাড়া! 'বড় যে শুইয়া আছ? দেখিতেছ না যে তোমার সর্বনাশ হইয়া গেল? শীঘ্র উঠ!'

কুঁজীর রাগ দেখিয়া কৈকেয়ী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'কী হইয়াছে, মন্থরা? আমার কোন বিপদ হইয়াছে কি? তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন?' মন্থরা দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিল, 'তোমার যাহাতে সর্বনাশ হয়, তাহাই হইয়াছে। কাল মহারাজ রামকে যুবরাজ করিবেন।'

এ কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর এত আনন্দ হইল যে তিনি তখনই একখানা দামী গহনা কুঁজীকে পুরস্কার দিয়া ফেলিলেন। কুঁজী তাহা দূরে ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'কী বোকা! এমন বিপদে পড়িয়াও আবার আমোদ করিতেছে! রাম রাজা হইলে ভরতের সর্বনাশ হইবে না বুঝি? আর তুমিও বুঝি তখন কৌশল্যা রানীর দাসী হইয়া থাকিবে না?'

কৈকেয়ী বলিলেন, 'মন্থরা, রাম বড়ই ধার্মিক। আর তিনি যখন বড় ছেলে, তখন তাঁহারই তো রাজ্য পাওয়া উচিত। রাম আমাকে যেমন যত্ন করেন, ভরতও তেমন করে না। আমি ভরতকে যেমন ভালবাসি, রামকেও তেমনি ভালবাসি। রাম রাজা হইলে দেখিবে, তিনি ভাইদিগকে কত সুখে রাখিবেন।'

কুঁজী লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'হায় হায়, এ কেমন মেয়ে গো! আমি তোমার ভালোর জন্য এত করি, আর তুমি আমার কথায় কানই দাও না! রাম রাজা হইলে নিশ্চয় ভরতকে তাড়াইয়া দিবে, না হয় মারিয়া ফেলিবে। আর সেই রামের যে মা, কৌশল্যা রানী, তাহাকে তো এতদিন তুমি অগ্রাহ্যই করিয়াছ। সে কি তখন তাহার শোধ লইতে ছাড়িবে? তাই বলি, এইবেলা যাহাতে ভরত রাজ্য পায় আর রাম বনে চলিয়া যায়, তাহার উপায় দেখ।'

হায় হায়, কুঁজী হতভাগী কেন পৃথিবীতে জন্মিয়াছিল! কৈকেয়ীর মন তো আগে মন্দ ছিল না! দুষ্ট কুঁজীই তো তাঁহার ভিতর হিংসা ঢুকাইয়া দিল। কুঁজী যখন 'ভরতকে রাম মারিয়া ফেলিবে' বলিয়া ভয় দেখাইল, তখন কৈকেয়ী বলিলেন, 'মন্থরা, আজই আমি রামকে বনে পাঠাইয়া ভরতকে রাজা করিব। এখন এই কাজটি কেমন করিয়া হইতে পারে বল।'

কুঁজী বলিল, 'সেকি! তুমি কি সব ভুলিয়া গিয়াছ? সেই যে দণ্ডকবনের ভিতরে বৈজয়ন্ত নগরে সম্বর অসুর ছিল, দেবতাদের সঙ্গে তাহার ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আমাদের রাজা দেবতাদের সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, তোমাকে সঙ্গে নিয়াছিলেন। রাজা ভয়ানক অস্ত্রের ঘা খাইয়া যুদ্ধের জায়গাতেই অজ্ঞান হইয়া গেলেন, তখন তুমিই তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া আসিয়া বাঁচাইলে। তাহাতে তিনি তোমাকে দুইটি বর দিতে চাহিলেন। তুমি বলিলে, "যখন ইচ্ছা হয় লইব"। এ-সকল কথা তো তোমার মুখেই শুনিয়াছি। এখন কেন সেই বর চাহিয়া লও না? এক বরে রামকে বনে পাঠাও, আর এক বরে ভরতকে রাজা কর। তাহা হইলেই আপদ চুকিয়া যাইবে। এক কাজ কর। তুমি ময়লা কাপড় পরিয়া, মুখ ভার করিয়া, মেঝেতেই পড়িয়া থাক। রাজা আসিলে কথাটিও কহিবে না, খালি রাগ করিবে আর কাঁদিবে। রাজা তোমাকে যে ভালবাসেন! তোমার রাগ দেখিলে নিশ্চয় তিনি ভয় পাইবেন, আর যাহা চাও তাহাই দিয়া তোমাকে খুশি করিবেন। কিন্তু খবরদার! আগে রাজার মুখ দিয়া এই কথাটি বাহির করিয়া লইবে যে, তুমি যাহা চাও তাহাই তিনি দিবেন। এইরকম করিয়া তাঁহাকে কথায় আটকাইয়া তারপর বর দুইটি চাহিবে। তাহা হইলে আর তাঁহার "না" বলিবার জো থাকিবে না।'

এইরূপ করিয়া কুঁজী কৈকেয়ীর মন একেবারে খারাপ করিয়া দিল। তখন তাঁহার মুখে কুঁজীর প্রশংসা আর ধরে না! এরপর ময়লা কাপড় পরিয়া, গহনা ভাঙিয়া, রাগের ভরে মেঝেতে শুইতে আর কতক্ষণ লাগে!

এদিকে রাজা দশরথ রামের সংবাদ লইয়া কৈকেয়ীর মহলে আসিয়া দেখেন—কৈকেয়ীর মুখে কথা নাই, গায়ে অলঙ্কার নাই, তিনি মেঝেতে পড়িয়া কেবলই কাঁদিতেছেন। কী সর্বনাশ! কৈকেয়ীর কী হইয়াছে? কে তাঁহার এমন দশা করিল? বেচারা বুড়া রাজা ব্যস্ত হইয়া এইরূপ কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে, কৈকেয়ীর কী হইয়াছে! রাজা কত মিষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কৈকেয়ী, তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে? না কেহ তোমাকে কিছু বলিয়াছে? না তুমি কাহারও উপকার করিয়াছ?' কৈকেয়ী কোন কথারই উত্তর দিলেন না।

শেষে রাজা বলিলেন, 'তোমার কি কিছু চাই? বল সেটা কোন্ জিনিস, এখনই তাহা দিতেছি।' তখন কৈকেয়ী বলিলেন, 'আগে প্রতিজ্ঞা কর দিবে, তবে বলিব।' রাজা বলিলেন, 'এই পৃথিবীতে রামের মতন আমি কাহাকেও ভালবাসি না। সেই রামের নাম লইয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব।'

এ কথা শুনিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, 'দেবতারা শুনুন, রাজা কী প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। মহারাজ, সেই দেবাসুর যুদ্ধের কথা মনে কর। সেই যে তুমি ভয়ানক ঘা খাইয়াছিলে, আর আমি তোমাকে বাঁচাইয়াছিলাম। তখন আমাকে যে দুটি বর দিতে চাহিয়াছিলে, আর আমি বলিয়াছিলাম দরকার হইলে লইব, আজ সেই দুই বর আমাকে দিতে হইবে। এখন তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি না দাও, তবে আমি নিশ্চয় মরিয়া যাইব।'

নিষ্ঠুর কৈকেয়ী বুঝিয়াছিলেন যে রাজা একবার 'দিব' বলিলে আর প্রাণ গেলেও 'দিব না' বলিতে পারিবেন না। তাই এখন সময় বুঝিয়া বলিলেন, 'রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য সন্ন্যাসী সাজাইয়া দণ্ডক বনে পাঠাইতে হইবে, আর ভরতকে রাজা করিতে হইবে।'

হায়, কী নিষ্ঠুর কথা! সেই ভয়ানক কথা শুনিয়াই দশরথ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। খানিক পরে একটু জ্ঞান হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু তখনই কৈকেয়ীর কথা মনে হওয়াতে আবার অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে আবার দশরথের জ্ঞান হইল। তখন তিনি ভয়ানক রাগের সহিত কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ওরে নিষ্ঠুর দুষ্ট কৈকেয়ী, রাম তোর কি করিয়াছে? রাম এমন করিয়া তোর সেবা করে, আর তুই কি না তাহার সর্বনাশ করিতে বসিয়াছিস? কোন্ দোষে আমি রামকে তাড়াইব? হায় হায়, রাম গেলে আমি বাঁচিব কেমন করিয়া!'

এইরূপে কৈকেয়ীকে বিস্তর গালি দিয়া, তারপর দশরথ অতিশয় কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, 'কৈকেয়ী, তোমার পায়ে পড়ি, এমন কথা মুখে আনিও না! রাম তোমার যেমন সেবা করে, ভরতও তো তেমন করে না। আর বড় ছেলেই যে রাজা হয়, তাহাও তো তুমি জান। আমার রামের কত গুণ! এমন রামকে তোমার জন্য এরূপ নিষ্ঠুর কথা আমি কী করিয়া বলিব?'

শেষে তিনি আবার বিনয় করিয়া বলিলেন, 'কৈকেয়ী, আমি বুড়া হইয়াছি, আর বেশিদিন বাঁচিব না। আমাকে দয়া কর! আমার আর যাহা আছে সকলই দিতেছি; তোমার পায়ে পড়ি, রামকে ছাড়িবার কথা আমাকে বলিও না!'

দশরথ এইরূপে কত দুঃখ কত মিনতি করিলেন, কতবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর কৈকেয়ীর কিছুতেই দয়া হইল না। তিনি বলিলেন, 'মহারাজ একবার বর দিয়া আবার এমন করিয়া কাঁদিতেছ? তুমি তো খুব ধার্মিক দেখিতেছি! লোকে শুনিলে বলিবে কী? তুমি যাহাই বল, ও-বর আমি কিছুতেই ছাড়িব না। রামকে যদি তুমি রাজা কর, তবে তখনই আমি বিষ খাইয়া মরিব।'

আহা, বুড়া বেচারার কী কষ্ট! এমন দুঃখ আর কেহ কি কখন পাইয়াছে? রাজা কখনও কাঁদেন, কখনও কৈকেয়ীকে গালি দেন। কখনও বলেন, 'হায়, কৌশল্যা কী বলিবেন?'

কখনও বলেন, 'হায়, সীতার কী দশা হইবে?' কখনও আবার অজ্ঞান হইয়া যান। জ্ঞান হইলে আবার কখনও কৈকেয়ীকে বকেন, কখনও রামের জন্য দুঃখ করেন। একবার কৈকেয়ীর পা ধরিতে গেলেন, কিন্তু ততক্ষণ তাঁহার জ্ঞান রহিল না।

এইরূপ করিয়া সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। কৈকেয়ীর দয়া হওয়া দূরে থাকুক, তিনি আরও বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ, সত্য কথা বল বলিয়া যে বড় অহঙ্কার করিয়া থাক, এখন আমাকে বর দিবার বেলা তাহা কোথায় গেল?' রাত ভোর হইয়া গেল, তখনও সেই একই কথা, 'মহারাজ, প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এখন বর না দিয়া যাইবে কোথায়? শীঘ্র রামকে বনে পাঠাও, আর আমার ভরতকে রাজা কর!'

শেষে দশরথ বুঝিতে পারিলেন যে, আর রামকে বনে না দিয়া উপায় নাই। তখন তিনি বলিলেন, 'আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন আর কী বলিব? তোর যাহা ইচ্ছা কর। আমি কেবল একটিবার রামকে দেখিতে চাই।'

ততক্ষণে সূর্য উঠিয়াছে। সেদিনকার কাজ আরম্ভ করিবার সময় হইয়াছে। রামকে যুবরাজ করিবার সকল আয়োজন প্রস্তুত। পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনি মন্ত্রী সুমন্ত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'সুমন্ত্র, সব প্রস্তুত, সকলেই আসিয়াছেন, সময়ও হইয়াছে; শীঘ্র মহারাজকে সংবাদ দাও।' সুমন্ত্র সংবাদ দিতে গেলেন। এদিকে যে সর্বনাশ হইয়াছে, তিনি তাহার কিছুই জানেন না। তিনি অন্যান্য দিনের মত গিয়া রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ, সব প্রস্তুত। এখন মহারাজের অনুমতি হইলেই রামকে যুবরাজ করা যায়।'

সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া রাজার দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তখন সুমন্ত্র চমকিয়া গিয়া দেখিলেন যে, রাজার চোখ লাল, আর তাঁহাকে বড়ই কাতর দেখা যাইতেছে। তিনি ইহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মনের দুঃখে কেবল জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজার কথা কহিবার শক্তি নাই। তাহা দেখিয়া মিথ্যাবাদী কৈকেয়ী নিজেই কহিলেন, 'দেখ সুমন্ত্র, রাজার মনে কিনা বড়ই আনন্দ হইয়াছে, তাই রাত্রে তাঁহার ঘুম হয় নাই। এখন তিনি একটু ঘুমাইবেন। তুমি রামকে এইখানে লইয়া আইস।' এ কথায় সুমন্ত্র রামকে আনিতে গেলেন।

রাম তাঁহার নিজের বাড়িতে সীতার কাছে বসিয়া আছেন, এমন সময় সুমন্ত্র সেখানে গিয়া বলিলেন, 'যুবরাজ, মহারাজ আর রানী কৈকেয়ী আপনাকে দেখিতে চাহেন; শীঘ্র সেখানে চলুন।' রাম তখনই তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসিলেন। আসিবার সময় পথের লোকেরা তাঁহার কতই প্রশংসা করিতে লাগিল, কতই আশীর্বাদ করিল।

রাজা দশরথ ভয়ানক দুঃখে অবশ হইয়া আছেন, কৈকেয়ী কাছে বসিয়া। এমন সময় রাম আসিয়া তাঁহাদের দু-জনকে প্রণাম করিলেন। দশরথ কেবল একটিবার তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'রাম!' আর কথা বাহির হইল না; খালি চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রামের মনে কী পর্যন্ত দুঃখ আর চিন্তা হইল, সহজেই বুঝিতে পার। তিনি কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, আমি কি না জানিয়া কোন দোষ করিয়াছি?' বাবা কেন কথা কহিতেছেন না? তাঁহাকে কেন এমন কাতর দেখিতেছি? কোনও মন্দ সংবাদ আসিয়াছে কি? আপনি তো বাবাকে কিছু বলেন নাই?'

কৈকেয়ী বলিলেন, 'তোমার বাবার রাগও হয় নাই, কোন বিপদও হয় নাই। রাজার একটা কাজ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তোমার ভয়ে তাহা বলিতে পারিতেছেন না। রাজা যখন কাজটা করিবেন বলিয়াছেন, তখন তুমি কিন্তু তাহাকে কোনরূপ বাধা দিও না ; তাহা হইলে যে পাপ হইবে!' রাম বলিলেন, 'মা, এমন কথা কেন বলিতেছেন? বাবা যে কাজ করিবেন বলিয়াছেন, আমি কখনই তাহাকে বাধা দিব না। বাবার কথা কি অমান্য করিতে পারি?'

তাহা শুনিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, 'কথাটি বাপু আর কিছুই নয়। তোমার বাবা আগে আমাকে দুটি বর দিবেন বলিয়াছিলেন, সেই বর আমি আজ চাহিয়াছি। একটা বর এই যে, তুমি মাথায় জটা লইয়া গাছের ছাল পরিয়া চৌদ্দ বৎসরের জন্য দণ্ডক বনে যাইবে। আর একটা বর চাহিয়াছি যে, এই যে সব আয়োজন হইয়াছে, তাহা দিয়া ভরতই রাজা হইবে। তুমি রাজ্যের লোভ ছাড়িয়া দাও। মহারাজের কষ্ট হইতেছে বলিয়া মুখে এ সকল কথা বলিতে পারিতেছেন না, তাই আমি বলিলাম। পিতার কথা তোমার রাখা উচিত।'

এ কথা শুনিয়া দশরথ দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু রাম একটুও দুঃখিত না হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা মা, তাহাই করিব। এমন কী কাজ আছে, বাবা বলিলে যাহা না করিতে পারি? আজই ভরতকে আনিতে দূত পাঠাইয়া দিন। আমিও আজই বনে চলিয়া যাইতেছি। কিন্তু বাবা কেন নিজে আমাকে এ কথা বলিলেন না?'

কৈকেয়ী বলিলেন, 'বেশ বেশ, ভরতকে আনিতে আজই ঘোড়ায় চড়িয়া লোক যাইবে। আর তুমিও দেখিতেছি বনে যাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছ। শীঘ্র যাও! মহারাজের বড় লজ্জা হইয়াছে, তাই কথা বলিতেছেন না। কিন্তু তুমি যতক্ষণ চলিয়া না যাইতেছ, ততক্ষণ তাঁহার স্নানাহার নাই।'

এই কথা শুনিয়া দশরথ 'হায় হায়' করিতে করিতে আবার অজ্ঞান হইয়া গেলেন। বনে যাইবার কথায় রামের কোন কষ্টই হয় নাই, কিন্তু পিতার দুঃখে তিনি অস্থির হইলেন; 'হায়, পিতার একটু সেবাও করিতে পারিলাম না, কারণ এখনই বনে যাইতে হইবে।' কাজেই কোন রকমে রাজাকে একটু তুলিয়া বসাইয়া তাঁহাকে সেখান হইতে চলিয়া আসিতে হইল।

কৈকেয়ীর ব্যবহারে লক্ষ্মণ রাগে অস্থির হইয়া উঠিলেন, কিন্তু রামের কিছুমাত্র দুঃখের ভাব দেখা গেল না। তিনি লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে কৌশল্যার বাড়িতে চলিলেন। সেখানে মেয়েরা সুন্দর সাজ পোশাক পরিয়া তাঁহারই জন্য আমোদ আহ্লাদ করিতেছিল। তাহা দেখিয়াও তাঁহার দুঃখ হইল না। তাঁহার মনে কেবল এই ভাবিয়া দুঃখ হইল যে, তিনি গেলে হয়ত তাঁহার পিতা মাতা মরিয়া যাইবেন।

রামের বনবাসের কথা ততক্ষণে অনেকেই শুনিয়াছে, আর সকলেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাজার নিন্দা করিতেছে। কিন্তু মা কৌশল্যা তখনও ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। রাম যুবরাজ হইবেন, তাহাই তিনি জানেন, আর তাঁহার জন্য মনের সুখে দেবতার পূজা করিতেছেন। এমন সময় রাম সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কৌশল্যা

আনন্দে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, 'বাবা, আজ তুমি যুবরাজ হইবে। আশীর্বাদ করি, অনেক দিন সুখে বাঁচিয়া থাক। ধর্মে তোমার মতি হউক, আর সকলে তোমাকে ভালবাসুক।'

রাম বলিলেন, 'মা, তোমার বড় দুঃখের সময় আসিয়াছে। তুমি তো জান না, মা, আমি এখনই দণ্ডকবনে যাইব। মহারাজ ভরতকে রাজ্য দিবেন, আমাকে তপস্বীর বেশ ধরিয়া চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে যাইতে হইবে।'

আমরা অনেক সময়ে লোকের কষ্ট বুঝিতে পারি। কিন্তু হায়, আমাদের এমন কী সাধ্য আছে যে, মা কৌশল্যার প্রাণের কষ্ট বুঝিতে পারিব? তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন, সকলে সেবা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিল। জ্ঞান হইলে পর তিনি বলিলেন, 'বাছা রাম, তুমি যদি না হইতে, তবে আমার এত কষ্ট হইত না। এখন তোমাকে হারাইয়া আমি কী করিয়া বাঁচিব? হায় হায়, আমার বুকটা কি লোহার, যে এত দুঃখেও ফাটিয়া গেল না? আমার কি মরণ নাই? আহা, যমের ঘরে বুঝি আমার মত দুঃখিনীর জন্য একটু জায়গা হইবে না! বাছা, তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেইখানে যাইব। আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া চল।'

কৌশল্যার দুঃখ দেখিয়া লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'মা, দাদা কিসের জন্য বনে যাইবেন? মহারাজ এখন বুড়া হইয়াছেন, তাঁহার কি মাথার ঠিক আছে? তাহা না হইলে কেন স্ত্রীর কথায় ভুলিয়া এমন লোককে বনে পাঠাইতেছেন? এমন রাজার কথা না শুনিলে কী হয়?'

তারপর তিনি রামকে বলিলেন, 'দাদা, একবার হুকুম দাও তো দেখি, কে তোমাকে রাজ্য না দেয়! না হয় অযোধ্যার সব লোককে মারিব। বাবাকেও মারিব! আমার প্রাণ থাকিতে কাহার সাধ্য, দাদাকে ঠকাইয়া ভরতকে রাজ্য দেয়!'

আবার তিনি কৌশল্যাকে বলিলেন, 'মা, আমি কি ভয় করি? তুমি আর দাদা দেখ, আমি কী করিতে পারি! বুড়া রাজাকে আমি এখনই মারিব!'

ইহা শুনিয়া কৌশল্যা বলিলেন, 'শোন তো বাবা, লক্ষ্মণ কী বলিতেছে! বাবা, তুমি বনে যাইও না! তাহা হইলে আমি কখনই বাঁচিব না। মাকে মারিলে তোমার পাপ হইবে।'

কৌশল্যার কষ্ট দেখিয়া রামের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'মা, কাঁদিও না। বাবার কথা আমি কী করিয়া অমান্য করিব? ভাই লক্ষ্মণ, তুমি আমাকে কত ভালবাস, তাহা কি আমি জানি না? তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝিতেছি। কিন্তু যাহাতে ধর্ম হয়, তাহাই আমাদের করা উচিত। কাজেই বাবা যখন বলিয়াছেন, তখন আমায় বনে যাইতেই হইবে।'

তারপর হাত জোড় করিয়া রাম কৌশল্যাকে বলিলেন, 'মা, তুমি বাধা দিও না। চৌদ্দ বৎসর দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যাইবে। তারপর আবার তোমার কাছে আসিব।' কৌশল্যা বলিলেন, 'বাবা, কেবল রাজাই কি তোমার গুরু? আমি কি কেহ নই? আমাকে এত কষ্ট দিয়া তুমি কেমন করিয়া যাইবে?'

রাম বলিলেন, 'বাবা ধর্ম ঠিক রাখিবার জন্যই আমাকে বনে পাঠাইতেছেন। আমাদের

কি উচিত তাঁহার কথা অমান্য করা? মা, আমাকে বনে যাইবার অনুমতি দাও ; আর আশীর্বাদ কর, যেন চৌদ্দ বৎসর পরে আবার আসিয়া তোমার পায়ের ধূলা লইতে পারি। তোমার পায়ে ধরি মা, আমাকে বাধা দিও না!'

এইরূপ করিয়া রাম কৌশল্যাকে কত বুঝাইলেন ; লক্ষ্মণকে কত বুঝাইলেন ; কিন্তু কৌশল্যা তবুও বলিলেন, 'বাবা, আমি এ দেশ ছাড়িয়া তোমার সঙ্গেই যাইব।'

রাম বলিলেন, 'দেখ মা, কৈকেয়ী ছল করিয়া বাবাকে কী ভয়ানক দুঃখে ফেলিয়াছেন! আমি তো বনে চলিলাম, তারপর তুমিও যদি আমার সঙ্গে যাও, তবে কি বাবা বাঁচিবেন? মা, এমন কথা মনে ভাবিও না। যতদিন বাবা বাঁচিয়া আছেন, ততদিন তাঁহার সেবা কর। চৌদ্দ বৎসর পরে নিশ্চয় আমি আবার আসিব।'

এইরূপে রাম অনেক বুঝাইলে পর কৌশল্যা বলিলেন, 'বাবা, কিছুতেই শুনিলে না? তুমি বনে যাইবেই? হায়, আমার কপালে বুঝি কেবল দুঃখই লেখা ছিল! তবে এস বাবা! আশীর্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক। হায়, আমার ভাগ্যে কি এমন দিন হইবে যে, তুমি আসিয়া আবার আমাকে মা বলিয়া ডাকিবে?'

এই বলিয়া তিনি ভক্তিভরে দেবতার পূজা করিতে লাগিলেন, যাহাতে রামের কোন অমঙ্গল না হয়। পূজা শেষ হইলে তাঁহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার মুখখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; চক্ষু আর ফিরিতে চাহে না। শেষে রাম তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া সীতার নিকট বিদায় লইতে চলিলেন।

সীতাও বিপদের কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই ; কিন্তু রামের মুখ দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে একটা বিপদ হইয়াছে। রাম যখন বনে যাইবার কথা বলিলেন, তখন সীতা রাজ্য গেল বলিয়া কোন দুঃখ করিলেন না। তিনি কেবল বলিলেন, 'আমি তোমার সঙ্গে যাইব।' রাম অনেক নিষেধ করিলেন। বনে যত ক্লেশ যত ভয় আছে, তাহাদের কথা বলিয়া অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু সীতা তাহা শুনিবেন কেন? তিনি রামের গলা জড়াইয়া ধরিয়া এমন ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন যে, রাম কিছুতেই তাঁহাকে রাখিয়া যাইতে পারিলেন না। কাজেই তখন আর কী করেন! তিনি বলিলেন, 'তবে চল ; আমি যেমন করিয়া থাকিব, তুমিও তেমনি করিয়া থাকিবে। আমাদের যাহা কিছু আছে তাহা ব্রাহ্মণদিগকে, চাকর-বাকরকে, আর গরিব দুঃখীকে বিলাইয়া চল আমরা শীঘ্র বনে যাই।'

লক্ষ্মণ রামের আগেই সেখানে আসিয়াছিলেন। রাম সীতার কথাবার্তা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'দাদা, যদি যাইবেই, তবে আমি ধনুক বাণ লইয়া তোমার আগে আগে যাইব। আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।' রাম বলিলেন, 'সে কী ভাই, তুমি যদি যাও, তবে মা কৌশল্যা আর মা সুমিত্রাকে কে দেখিবে?' লক্ষ্মণ বলিলেন, 'মা কৌশল্যার জন্য কোন চিন্তা নাই। আর তিনি এত লোককে খাইতে দিতেছেন, তিনি কি মা সুমিত্রাকে দুটি ভাত দিতে পারিবেন না? দাদা, আমাকে সঙ্গে লও। আমি রোজ তোমাদের ফলমূল আনিয়া দিব।'

সুতরাং লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইতে হইল। লক্ষ্মণ দেখিতে দেখিতে সকলের নিকট বিদায় লইয়া অস্ত্রশস্ত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত। তারপর যাহাকে যাহা দিতে হইবে, রামের কথামত

সকলকে তাহা দিতে লাগিলেন। চাকরেরা যাহা পাইল, তাহাতে তাহাদের চিরকাল সুখে কাটিবে। তাহা ছাড়া আবার রাম তাহাদিগকে বলিলেন, 'যতদিন আমরা ফিরিয়া না আসি, ততদিন আমাদের বাড়িতেই থাক।'

সে দেশে ত্রিজট নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঠাকুরটি বুড়া যতদূর হইতে হয়, আবার গরিব তাহার চেয়েও বেশি। সেই ব্রাহ্মণ রামের দানের কথা শুনিয়া কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়া উপস্থিত। রাম তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া কহিলেন, 'ঠাকুর, আপনি এই লাঠিটা যত দূর ফেলিতে পারিবেন, ততদূর পর্যন্ত আমার যত গরু আছে সব আপনার।'

সেই বুড়া বামুনের গায়ে কী জোরটাই ছিল! তখন তিনি কসিয়া কোমর বাঁধিয়া, 'হেঁই—হো' শব্দে লাঠিগাছটাকে একেবারে সরযূ পার করিয়া দিলেন, ততদূর অবধি গণিয়া দেখা গেল, এক লক্ষ গরু। রাম ইহাতে যার-পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া সেই লক্ষ গরু তো তাঁহাকে দিলেনই, তাহা ছাড়া আরও অনেক ধন দিলেন।

এইরূপে সমস্ত ধন দান করিয়া রাম লক্ষ্মণ আর সীতা দশরথের সহিত দেখা করিবার জন্য পথ দিয়া হাঁটিয়া চলিলেন। তাহা দেখিয়া সকলে বলিতে লাগিল, 'হায় হায়, যে রাম কখনও একা পথ চলেন নাই, যে সীতা কখনও ঘরের বাহির হন নাই, আজ কিনা তাঁহারা এমনিভাবে পথ হাঁটিয়া চলিয়াছেন। দশরথকে নিশ্চয়ই ভূতে পাইয়াছে, নহিলে এরূপ হইবে কেন? এ দেশে আমরা আর থাকিব না! চল আমরা রামের সঙ্গে বনে চলিয়া যাই, কৈকেয়ী তাঁহার ছেলেকে লইয়া এইখানে পড়িয়া থাকুক!'

রামকে বিদায় দিতে দশরথের কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল, তাহা আর আমি লিখিয়া কত জানাইব? কৈকেয়ীর ছল বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বর দিয়া বসিয়াছেন, কাজেই এখন আর নিজে কী করিয়া 'না' বলেন! কিন্তু রাম তাঁহার কথায় বনে যান, ইহা তাঁহার একেবারেই ইচ্ছা নহে। তাই তিনি রামকে বলিলেন, 'বাছা রে, তুমি আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া নিজে অযোধ্যার রাজা হও।' রাম বলিলেন, 'বাবা, আপনি আরও হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া সুখে রাজ্য করুন। আমি রাজ্য চাহি না। আমি বনে গিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রাখিব, তারপর আবার আপনার পায়ের ধূলা লইতে আসিব'।

আর একটি দিন রামকে রাখিতে পারিলেও হয়ত দশরথের মনে কতকটা আরাম হইত। কিন্তু আর একটি দিনও তাঁহাকে রাখিবার উপায় নাই, কারণ সেদিনই তাঁহার যাইবার কথা।

শেষে দশরথ সুমন্ত্রকে বলিলেন, 'রামের সঙ্গে অনেক সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র আর গাড়ি ঘোড়া দাও। শহরের লোকেরা তাঁহার সঙ্গে যাউক। লোকজন, টাকাকড়ি কিছুতেই যেন তাঁহার কষ্ট না হয়।'

ইহা শুনিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, 'মহারাজ, সবই যদি রামের সঙ্গে পাঠাইবেন, তবে আমার ভরতের রাজা হইয়াই বা কী লাভ?'

রাম বলিলেন, 'বাবা, এ সকল কিছুই চাহি না। আমার একখানা খন্তা, একটি পেঁটরা, আর খানকতক ছেঁড়া ন্যাকড়া হইলেই চলিবে।' এই কথা বলিতে বলিতেই কৈকেয়ী তিন টুকরা ন্যাকড়া লইয়া উপস্থিত। রাম, লক্ষ্মণ ভাল কাপড় ছাড়িয়া ন্যাকড়া পরিলেন।

কিন্তু হায়, সীতা তো জানেন না কেমন করিয়া ন্যাকড়া পরিতে হয়। তিনি শুধু তাহা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুতরাং রামকেই নিজ হাতে সেই ন্যাকড়াখানা তাঁহার রেশমী শাড়ির উপরে জড়াইয়া দিতে হইল। তাহা দেখিয়া কাহার সাধ্য, চোখের জল থামাইয়া রাখে!

তখন বশিষ্ঠ সীতাকে ন্যাকড়া পরাইতে বারণ করিয়া কৈকেয়ীকে অনেক বকিলেন। দশরথও বলিলেন, 'সীতাকে ন্যাকড়া পরাইতে হইবে, এমন বর তো আমি কখনও দিই নাই! সীতা সকল রকম ধনরত্ন লইয়া যাউক।'

সকলের শেষে রাম হাত জোড় করিয়া দশরথকে বলিলেন, 'মহারাজ, আমার দুঃখিনী মাকে দেখিবেন।'

এদিকে যাইবার সময় উপস্থিত। সুমন্ত্র রথ সাজাইয়া প্রস্তুত। সুতরাং তিনজনে সকলকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। রানী সুমিত্রা তখন লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, 'বাবা, তুমি রামের সহিত যাও। সকল সময় তাঁহার কাছে থাকিও। রাম ছাড়া তোমার আর কেহ নাই। রামকে মনে করিও যেন রাজা দশরথ, সীতাকে মনে করিও যেন আমি, আর বনকে মনে করিও যেন অযোধ্যা। যাও বাছা, মনের সুখে চলিয়া যাও।'

তারপর আগে সীতাকে সুন্দর কাপড় পরাইয়া রথে তুলিয়া দেওয়া হইল। পরে রাম লক্ষ্মণ অস্ত্রশস্ত্র, পেঁটরা, আর সীতার চৌদ্দ বৎসরের মতন কাপড় লইয়া তাঁহার সঙ্গে উঠিয়া বসিলেন। রথ চলিতে দেখিয়া সকলে পাগলের মত হইয়া তাহার সঙ্গে ছুটিল। যখন রথের সঙ্গে আর ছুটিতে পারে না, তখন তাহারা অতি কাতরভাবে সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিল, 'ও সুমন্ত্র, একটু আস্তে যাও! আমরা যে আর পারি না!'

রাম অনেক সহ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু এতটা কী সহ্য যায়? নিজে দশরথ, এমনকি রানীরা অবধি ছুটিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের কান্নায় বুঝি পাথরও গলিয়া যায়, মানুষ তো মানুষ! রাম অস্থির হইয়া সুমন্ত্রকে ক্রমাগত বলিতেছেন, 'জোরে চালাও!' কিন্তু সুমন্ত্র জোরে চালাইবেন কি? এদিকে যে রাজা নিজে বলিতেছেন, 'রথ থামাও! মা কৌশল্যা হা রাম! হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া এলোচুলে পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিতেছেন।

যাহা হউক, সুমন্ত্র যখন দেখিলেন যে রাম আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি রথ খুব জোরেই চালাইয়া দিলেন। কাজেই তখন আর রথের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে না পারিয়া প্রায় সকলকেই ফিরিতে হইল।

দশরথকেও অনেক কষ্টে ফিরানো হইল। কিন্তু যতক্ষণ রথের ধূলা দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণে তাঁহাকে ঘরে আনা গেল না। রথের দিকে চাহিয়া তিনি সেইখানে মাটিতে বসিয়া রহিলেন, আর দাঁড়াইবার শক্তি নাই। রথ চোখের আড়ালে চলিয়া গেলে, আর বসিয়াও থাকিতে পারিলেন না।

একটু সুস্থ হইলে পর দশরথ কৌশল্যার হাতখানি ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে চলিলেন—কৈকেয়ীর ঘরে নহে, কৌশল্যার ঘরে। কৈকেয়ী রাজাকে নিতে আসিলেন; কিন্তু রাজা বলিলেন, 'তুই আমাকে ছুঁইস না!'

কৌশল্যার ঘরে আসিয়া দশরথ সেই যে বিছানায় শুইলেন, তাহাই তাঁহার শেষ

শয়ন। কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন চলিয়া গেল। রাত্রিতে অনেক কষ্টে কৌশল্যাকে বলিলেন, 'আমি যে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না! আমার গায়ে হাত দাও!' কৌশল্যা রাজার কাছে আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া সুমিত্রা বলিলেন, 'দিদি, এত দুঃখ কেন করিতেছ? রাম কেমন বীর, তাহা কি জান না? লক্ষ্মণও তাহার সঙ্গে গিয়াছে, তাহাদের কিসের ভয়? আবার তাহারা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিবে!' সুমিত্রার কথা শুনিয়া কৌশল্যা অনেক শান্ত হইলেন।

দশরথকে যখন ফিরাইয়া আনা হইল, তখনও অযোধ্যার অনেক লোক রথের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছিল। তাহারা কিছুতেই ফিরিতে চাহিল না। তাহাদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের গায়ে জোর নাই, মাথা কাঁপে, তবুও তাঁহারা যাইবেনই। তাঁহাদের কষ্ট দেখিয়া রাম লক্ষ্মণ আর সীতা রথ হইতে নামিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, 'বাছা রাম, আমরা যাইব।'

এইরূপে তাঁহারা তমসা নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ততক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছে। কাজেই সেখানেই রাত্রিতে থাকিবার আয়োজন হইল।

ভোরে উঠিয়া রাম দেখিলেন যে, অযোধ্যার লোকেরা তখনও ঘুমাইতেছে। তখন তিনি চুপি চুপি সুমন্ত্রকে উঠাইয়া বলিলেন, 'চল, এইবেলা আমরা চলিয়া যাই।' সুমন্ত্র রথ সাজাইয়া আনিলেন, কিন্তু রাম লক্ষ্মণ ও সীতা তাহাতে চড়িয়া আর বেশি দূর গেলেন না। খানিক পরেই তাঁহারা রথ হইতে নামিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন, 'তুমি রথখানিকে উত্তর দিক হইতে ঘুরাইয়া আন।' শুধু রথ হালকা বলিয়া পথে কিনা তাহার দাগ পড়িবে না, তাই রাম শুধু রথখানিকে ঘুরাইয়া আনিতে দিলেন। তিনি জানিতেন যে, ঐরূপ করিলে আর অযোধ্যার লোকেরা রথের চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। তাই তাঁহারা পথ ছাড়িয়া বনের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন, আর সুমন্ত্র শুধু রথখানিকে কিছু দূরে ঘুরাইয়া আনিয়া, অন্য এক স্থান হইতে আবার তাঁহাদের তিনজনকে তুলিয়া লইলেন।

এদিকে তমসা নদীর ধারে সেই লোকগুলি জাগিয়া দেখিল যে, রাম নাই। তখন তাহারা এই বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইল, 'হায় হায়, কেন ঘুমাইলাম? আমাদের ভাগ্যে কি এই ছিল? রাম কি শেষে এইরূপ করিয়া আমাদিগকে ফেলিয়া গেলেন?' কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারা রথের চিহ্ন দেখিয়া খানিক দূরে গেল। কিন্তু তাহার পরে রথ কোন্ দিকে গিয়াছে আর কিছু বুঝিতে পারিল না। কাজেই তখন নিতান্ত দুঃখের সহিত তাহাদিগকে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতে হইল।

সমস্তদিন রথ চালাইয়া, রাম বিকালে শৃঙ্গবের নগরের নিকট গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটি সুন্দরী ইঙ্গুদী গাছ দেখিয়া বলিলেন, 'এই গাছতলায় আজ আমরা থাকিব।'

এই স্থানের রাজার নাম গুহ। তিনি রামের বন্ধু। রাম আসিয়াছেন শুনিবামাত্রই গুহ তাড়াতাড়ি অনেক লোকজন আর ভাল ভাল খাবার জিনিস লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামের থাকিবার জন্য সুন্দর বিছানা, ঘোড়ার জন্য ঘাস, কিছুই আনিতে

তিনি বাকি রাখেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা যে, রামকে তাঁহাদের রাজা করিয়া সেইখানেই রাখেন।

রাম আদরের সহিত তাঁহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া বলিলেন, 'ভাই, তোমার ভালবাসাতেই আমার যার-পর-নাই সুখ হইয়াছে। কিন্তু তোমার জিনিস আমি কি করিয়া লইব? আমায় যে তপস্বীর মতন ফল মূল খাইয়া থাকিতে হইবে। আমাদের কিছুই দরকার নাই, কেবল ঘোড়াগুলিকে দুটি ঘাস দিতে বল।' কাজেই গুহ রামকে আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। রাম সীতা জল মাত্র খাইয়া গাছতলায় শুইয়া রহিলেন।

রাত্রিতে রাম ঘুমাইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ জাগিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া গুহ মনের দুঃখে বলিলেন, 'রাজপুত্র, আমরাই জাগিয়া বন্ধুকে পাহারা দিব, আপনি ঘুমান।' লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদার এই দুঃখের সময় আমি কেমন করিয়া ঘুমাইব? ইহার পর বাবা আর বেশি দিন বাঁচিবেন না। তখন মা কৌশল্যা আর সুমিত্রাও নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবেন।' লক্ষ্মণের আর গুহের ঘুম হইল না, সমস্ত রাত্রি তাহাদের কাঁদিয়াই কাটিল।

পরদিন সকালে সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া আর গুহের নিকট বিদায় লইয়া রাম লক্ষ্মণ আর সীতা নৌকায় গঙ্গা পার হইলেন। বুড়া সুমন্ত্রের কি আর অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে পা চলে? রামের সঙ্গে যাইবার জন্য তিনি কতই না মিনতি করিয়াছিলেন! কিন্তু রাম বলিলেন, 'তুমি যদি অযোধ্যায় ফিরিয়া না যাও, তবে কৈকেয়ী মনে করিবেন যে আমি বুঝি বনে যাই নাই। তাহা হইলে বাবাকে তিনি বড়ই কষ্ট দিবেন। তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও।' সুতরাং সুমন্ত্র আর রামের সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। তিনি একদৃষ্টে রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন আর রামকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

গঙ্গা পার হইবার পূর্বেই রাম লক্ষ্মণ বটের আঠায় জটা পাকাইয়া তপস্বী সাজিয়াছিলেন। গঙ্গানদীর পরপারে বৎসদেশ। সেখানে হরিণ মারিয়া তাহারা বর্ম পরিয়া ধনুর্বাণ হাতে বনের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এক রাত্রি তাঁহাদের সেই বনের ভিতরেই কাটিল। তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহারা প্রয়াগে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের নিকট গঙ্গার সহিত যমুনা আসিয়া মিলিয়াছে।

রাম লক্ষ্মণ ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিলে পর তিনি তাঁহাদিগকে অনেক আদর যত্ন করিলেন। ভরদ্বাজ রামকে তাঁহার আশ্রমেই রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সে স্থানের খুব কাছেই লোকজনের বাড়ি ছিল বলিয়া রামের সেখানে থাকিতে তত ভাল লাগিল না। তিনি ভরদ্বাজকে বলিলেন, 'দয়া করিয়া আমাদিগকে একটি নির্জন ভাল জায়গা দেখাইয়া দিন।' ভরদ্বাজ বলিলেন, 'তবে তুমি এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট পর্বতে গিয়া বাস কর। চিত্রকূট খুব সুন্দর আর নির্জন স্থান। সেখানে ফল ফুল, নদী ঝরণা, পাখি, হরিণ অনেক আছে। সে স্থানটি তোমাদের বেশ ভাল লাগিবে।'

তাহার পরদিনই তাঁহারা ভরদ্বাজকে প্রণাম করিয়া চিত্রকূট যাত্রা করিলেন। পথে যমুনা নদী পার হইতে হয়। নদীর ধারে শুকনা কাঠের অভাব নাই। খসখসের দড়িতে সেই কাঠ বাঁধিয়া পার হইবার জন্য ভেলা প্রস্তুত হইল। ভেলার উপর আবার জামের আর

বেতের ডাল দিয়া একটা গদি করিতেও বাকি রহিল না—সীতার বসিবার জন্য একটু মোলায়েম জায়গা তো চাই। এই কারিকুরিটি অবশ্য লক্ষ্মণের ; সীতার সুবিধা করিতে সর্বদাই ব্যস্ত। এই ভেলায় জিনিসপত্র-সুদ্ধ তাঁহারা নদী পার হইলেন।

তারপর আগে লক্ষ্মণ, মাঝখানে সীতা, পিছনে রাম—এইরূপ করিয়া তাঁহারা পথ চলিতে লাগিলেন। পথের দুই ধারে সুন্দর ফুল ফুটিয়া আছে ; সীতা তাহা পূর্বে কখনও দেখেন নাই। তিনি তাঁহার মিষ্টি কথায় রামকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এটি কী ফুল?' অমনি লক্ষ্মণ তাহা তুলিয়া আনিয়া দেন।

এইরূপে এক দিন পথ চলিয়া তাঁহারা চিত্রকূট পর্বতের কাছে আসিলেন। সে স্থানটি অতি চমৎকার। তাহার কাছে মন্দাকিনী নামে অতি সুন্দর একটি নদী। সেই নদীর ধারে তাঁহারা কাঠ আর লতাপাতা দিয়া সুন্দর একখানা ঘর বাঁধিলেন। মণিমাণিক্যের কাজ করা মার্বেল পাথরের বাড়িতে থাকা যাঁহাদের অভ্যাস, এখন তাঁহাদের থাকিবার জায়গা হইল একটি কুঁড়ে। সেই কুঁড়ে ঘরখানিতে তাঁহাদের বেশ সুখেই দিন কাটিতে লাগিল।

সুমন্ত্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে দেখিয়া দশরথের দুঃখ আরও বাড়িয়া গেল। প্রথমে তিনি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন। জ্ঞান হইলে পর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুমন্ত্র, তুমি চলিয়া আসার সময় তাহারা কী বলিল?' সুমন্ত্র বলিলেন, 'রাম আপনাদের সকলকে প্রণাম জানাইয়াছেন ; আর বলিয়াছেন, "মাকে বলিও, তিনি যেন সর্বদা বাবার সেবা করেন। ভরতকে বলিও, তিনি যেন রাজা হইয়া বাবাকে অমান্য না করেন।" লক্ষ্মণ রাগের সহিত বলিলেন, "সুমন্ত্র, বাবা যখন দাদাকে বনে পাঠাইয়াছেন, তখন আর তাঁহার উপরে আমার একটুও ভক্তি নাই।" সীতা কিছুই বলেন নাই, তিনি কেবল হেঁটমুখে চোখের জল ফেলিয়াছেন, আর এক-এক বার রামের মুখের দিকে আর রথের দিকে তাকাইয়াছেন।'

ইহার পর রাজা দশরথ ক্রমেই অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি আর অধিকক্ষণ বাঁচিবেন না। যখন তাঁহার বয়স অল্প ছিল, তখন তিনি একবার অন্ধকার রাত্রিতে হাতি মনে করিয়া একটি অন্ধ মুনির ছেলেকে তীর দিয়া মারিয়া ফেলেন। তাহাতে সেই অন্ধ মুনি দুঃখে মরিয়া যান, আর মরিবার পূর্বে দশরথকে এই বলিয়া শাপ দেন, 'তোমারও এইরূপে পুত্রের শোকে প্রাণ যাইবে।'

মৃত্যুর সময় সেই কথা মনে করিয়া দশরথ দুঃখ করিতে লাগিলেন। তারপর ক্রমে তাঁহার শরীর অবশ হইয়া আসিল। শেষে 'হা রাম! হা কৌশল্যা! হা সুমিত্রা! হা রে দুষ্ট কৈকেয়ী!' এই বলিতে বলিতে রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁর প্রাণ বাহির হইয়া গেল। রামকে বনে পাঠাইয়া ছয়দিন মাত্র দশরথ বাঁচিয়াছিলেন।

রামের জন্য ক্রমাগত কয়েকদিন দুঃখ করিয়া করিয়া সকলে একেবারে অবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। দশরথের মৃত্যুর সময় কেহই টের পান নাই। পরদিন দশরথকে জাগাইতে গিয়া সকলে দেখিলেন যে তিনি মরিয়া গিয়াছেন। তখন আবার কান্না আরম্ভ হইল।

এইরূপে দুঃখের উপর আবার দুঃখ আসিয়া সকলকে যে কিরূপ অস্থির করিয়াছিল, তাহা কী বলিব! এদিকে ভরত শত্রুঘ্নও বাড়ি নাই। তাঁহারা না আসিলে দশরথকে

পোড়ানোও যাইতেছে না। সুতরাং তাড়াতাড়ি ভরত শত্রুঘ্নকে আনিতে লোক গেল। আর যতদিন তাঁহারা না আসেন, ততদিনের জন্য দশরথকে তৈলের কড়ার ভিতরে রাখিয়া সকলে তাঁহাদের পথ চাহিয়া রহিলেন।

ভরত মামার বাড়িতে সুখেই ছিলেন। এ সকল বিপদের কথা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। ইহার মধ্যে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, রাজা দশরথ অত্যন্ত ময়লা হইয়া গিয়াছেন, আর একটা পাহাড় হইতে পড়িয়া যাইতেছেন। পাহাড়ের নিচে তৈল ছিল, তিনি সেই তৈলে ডুবিয়া গেলেন। তারপর গাধার গাড়িতে চড়িয়া তিনি দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিলেন।

এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া ভরতের মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল। তাই তিনি আর পরদিন বন্ধুগণের সহিত ভাল করিয়া আমোদ করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে অযোধ্যা হইতে লোক আসিয়া বলিল, 'রাজকুমার, আপনি শীঘ্র চলুন। সেখানে এমন কিছু হইয়াছে যে, আপনার দেরি হইলে ক্ষতি হইতে পারে।'

এইসকল শুনিয়া ভরত তাড়াতাড়ি অযোধ্যায় চলিয়া আসিলেন। অযোধ্যায় আসিয়া দেখেন যে, তাহার আর আগের মত চেহারা নাই, রাস্তায় লোকজন চলিতেছে না, দোকান পাট বন্ধ, আর সকলেরই মুখ অতিশয় মলিন। দশরথের ঘরে গিয়া দেখিলেন তিনি সেখানে নাই, সুতরাং সেখান হইতে কৈকেয়ীর ঘরে গেলেন।

কৈকেয়ী হাসিভরা মুখে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাল আছ তো? পথে কোন কষ্ট হয় নাই?' ভরত বলিলেন, 'আসিতে একটু পরিশ্রম হইয়াছে। কিন্তু মা, এত তাড়াতাড়ি কেন আমাকে ডাকিয়া আনিলে? বাবা কোথায়?' কৈকেয়ী বলিলেন, 'বাছা, তোমার বাবা মরিয়া গিয়াছেন।'

এ কথা শুনিয়া ভরত 'হায় হায়' করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তাঁহার জ্ঞান হইলে পর কৈকেয়ী বলিলেন, 'বাছা, তোমার বুদ্ধি হইয়াছে, তুমি কেন এত অস্থির হইতেছ?' ভরত বলিলেন, 'হায়! বাবা আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় গেলেন! মা, বাবার কী অসুখ হইয়াছিল? মরিবার সময় তিনি কী বলিয়া গিয়াছেন?'

কৈকেয়ী বলিলেন, 'বাছা, মরিবার সময় তোমার বাবা বলিয়াছেন, "হা রাম! হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!" আর বলিয়াছেন যে, যাহারা রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতে দেখিবে, তাহারাই সুখী।'

এ কথা শুনিয়া ভরত বলিলেন, 'মা, দাদা তবে এখন কোথায়?' কৈকেয়ী বলিলেন, তোমার দাদা সীতা আর লক্ষ্মণকে লইয়া বনে গিয়াছেন।' ভরত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দাদা কী জন্য বনে গিয়াছেন? তিনি এমন কী অন্যায় করিয়াছেন যে তাঁহাকে বনে পাঠানো হইল?'

কৈকেয়ী বলিলেন, 'তিনি কোন অন্যায় কাজ করেন নাই। আমিই রাজাকে বলিয়া তাঁহাকে বনে পাঠাইয়াছি। রাজা আমাকে দুটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। আমি এই দুই বর লইয়াছি যে, রাম বনে যাইবে, আর তুমি রাজা হইবে। এখন এ সব তোমার হইল, তুমি রাজা হইয়া সুখে থাক।'

ভরতকে সুখী করিবার জন্যই কৈকেয়ী এমন পাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভরত যে রামকে কতদূর ভালবাসিতেন, তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার কাজে সুখী হওয়া দূরে থাকুক, ভরত দুঃখে আর রাগে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এতই রাগ হইল যে, কৈকেয়ী তাঁহার মা না হইলে হয়ত তিনি তাঁহাকে মারিয়াই ফেলিতেন।

ভরত বলিলেন, 'দাদা যদি তোমাকে এত মান্য না করিতেন, তাহা হইলে আমি তোমাকে এখনই তাড়াইয়া দিতাম! তুমি রাজার মেয়ে, আর তোমার এই কাজ! যাহা হউক, তুমি যাহা করিয়াছ তাহা আমি কখনই হইতে দিব না। আমি এখনই দাদাকে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছি। তোমার মত দুষ্ট স্ত্রীলোক আর এই পৃথিবীতে নাই! তুমি কেন আগুনে পুড়িয়া, না হয় গলায় দড়ি দিয়া মর না? না হয় বনেই চলিয়া যাও না?'

তারপর ভরত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমি কখনও রাজ্য চাহি না। দাদার রাজ্য আমি কেন লইব? আমি মামার বাড়ি গিয়াছিলাম, ইহার মধ্যে মা এত কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন, আমি ইহার কিছুই জানি না।' এই বলিয়া তিনি শত্রুঘ্নকে লইয়া কৌশল্যার সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন।

কৌশল্যাও ভরতের গলা শুনিতে পাইয়া তাঁহার নিকটেই আসিতেছিলেন। পথে দুইজনের দেখা হইল। ভরতকে দেখিয়া কৌশল্যা বলিলেন, 'বাবা, এখন তুমি তো রাজ্য পাইয়াছ, তুমি সুখে থাক। আর এই দুঃখিনীকে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও।' এই কথায় ভরত কৌশল্যার পা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তখন কৌশল্যাও তাঁহাকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ভরতের কোন দোষ নাই।

দশরথ তখনও সেই কড়ার মধ্যে তৈলের ভিতরে আছেন। তাঁহাকে পোড়াইতে আর বিলম্ব করা যায় না। সুতরাং পরদিন বশিষ্ঠ অনেক কষ্টে ভরতকে একটু শান্ত করিয়া সেই কাজের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে দশরথকে পোড়ানো আর তাঁহার শ্রাদ্ধাদি সকলই হইয়া গেল।

ইহার পর একদিন ভরত আর শত্রুঘ্ন কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময় কুঁজী ভারি সাজ-গোজ করিয়া সখীদিগের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। গহনা পরিয়া, চন্দন মাখিয়া, তাহার মুখে হাসি আর ধরে না! বোধহয় মনে ভাবিয়াছিল যে খুব বড়রকমের একটা কিছু পুরস্কার পাইবে। পুরস্কারটি কী হইল, বলি শুন।

যেই কুঁজী সেখানে আসিল, অমনি ভরত তাহাকে ধরিয়া শত্রুঘ্নের হাতে দিয়া বলিলেন, 'এই হতভাগীই সকল অনিষ্টের গোড়া! এখন ইহাকে যাহা করিতে হয় কর।' শত্রুঘ্নও পাপিষ্ঠাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া বেশ ভালমতই তাহাকে পুরস্কার দিতে আরম্ভ করিলেন। সখীরা তো ভয়ে দে-ছুট। তখন ভরত বলিলেন, 'ভাই, ওটাকে মারিয়া ফেলিও না। স্ত্রীলোককে মারিয়াছ শুনিলে দাদা রাগ করিবেন।' সুতরাং শত্রুঘ্ন কুঁজীকে ছাড়িয়া দিলেন, কুঁজীও পলাইয়া বাঁচিল।

এইরূপ করিয়া দশরথের মৃত্যুর পর তের দিন গেল। তখন একজন রাজা না হইলে কাজই চলিতেছে না। সুতরাং সকলেরই ইচ্ছা, এখন ভরত রাজা হন। কিন্তু ভরত

বলিলেন, 'চল, দাদাকে লইয়া আসি। দাদাই রাজা হইবেন, আর আমি চৌদ্দ বৎসর বনে গিয়া থাকিব।' তখন সকলে মিলিয়া মহা আনন্দে ভরত শত্রুঘ্নের সঙ্গে রামকে ফিরাইয়া আনিতে চলিল। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া, মন্ত্রী, পুরোহিত, চাকর-বাকর, সিপাহী, সৈন্য, সকলেই চলিল। অযোধ্যার লোক কেহই পড়িয়া থাকিল না। রথে চড়িয়া, হাতি চড়িয়া, ঘোড়া গাধা উটে চড়িয়া, না হয় হাঁটিয়া, যে যেমন করিয়া পারিয়াছে সেইরূপ করিয়াই চলিয়াছে। এক লক্ষ ঘোড়সোয়ার, নয় হাজার হাতি, ষাট হাজার রথ, তাহা ছাড়া সিপাহী সান্ত্রী, আর লোকজন যে কত, তাহার ঠিকানা নাই। এমনি করিয়া তাহারা রামকে আনিতে চলিল।

তাহারা যখন গুহের দেশে আসিল, তখন গুহ এত সৈন্য আর লোকজন দেখিয়া প্রথমে একটু ভয় পাইলেন। তাই তিনি তাঁহার নিজের লোকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভরত কি রামের অনিষ্ট করিতে আসিয়াছেন? আমি থাকিতে তিনি তাহা পারিবেন না! চল, আমরা তাঁহার পথ আটকাই। আর যদি তাঁহার মনে কোন মন্দ ভাব না থাকে, তবে তাঁহার কোন ভয় নাই।'

এই কথা বলিয়া তিনি ভরতের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। ভরতের কাছে যখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে ভরত রামকে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছেন, তখন তাঁহার মনে খুবই সুখ হইল।

গুহকে দেখিয়া সকলে রাম লক্ষ্মণ আর সীতার সংবাদ শুনিবার জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। বনে যাইবার সময় গুহের দেশে আসিয়া তাঁহারা কোথায় ছিলেন, কী খাইয়াছিলেন, কী কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, কোন কথাই না শুনিয়া তাহারা ছাড়িল না। রাম সীতা কুশ বিছাইয়া ইঙ্গুদী গাছতলায় ঘুমাইয়াছিলেন, সেই ইঙ্গুদী গাছতলার সেই কুশ তখনও রহিয়াছে। গুহ সকলকে তাহাও দেখাইলেন।

পরদিন গুহের লোকেরা পাঁচশত নৌকা আনিয়া ভরতকে গঙ্গা পার করিয়া দিল। গুহ নিজে ভরতের সঙ্গে চলিলেন। গঙ্গা পার হইয়া ভরদ্বাজের আশ্রমে পৌঁছিতে তাঁহাদের অধিক দিন লাগিল না। ভরত রামকে আনিতে যাইতেছেন শুনিয়া ভরদ্বাজ মুনি যে কতদূর সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা আর কী বলিব। ভরতকে তিনি বলিলেন, 'তোমার লোকজন-সুদ্ধ আমার এখানে নিমন্ত্রণ খাইয়া যাইতে হইবে।'

আর, কী আশ্চর্য নিমন্ত্রণই তিনি তাঁহাদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন! কেহ হয়ত বলিবে যে, মুনি এত টাকাকড়ি কোথায় পাইলেন যে ভরতের লোকদিগকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইলেন! কিন্তু কেবল টাকা হইলেই কি সব হইল? তপস্যার দ্বারা ভরদ্বাজ যাহা করিলেন, টাকায় তাহা হয় না। মুনির তপস্যার জোরে তাঁহার আশ্রমে কোরমা আর পায়সের দিঘি হইল, সরবতের নদী বহিল।

ভরতের লোকেরা যে সে নিমন্ত্রণ খাইয়া অবাক হইবে, তাহা আর আশ্চর্য কী? এরূপ নিমন্ত্রণ কি কেহ কোথাও খাইয়াছে? না এত আয়োজন কেহ ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে? নিজে দেবতারা আসিয়া ভরদ্বাজের আয়োজন করিয়াছিলেন ; আর গন্ধর্বেরা আসিয়া সেখানে গান গাহিয়াছিলেন।

এইরূপে ভরদ্বাজের আশ্রমে নিমন্ত্রণ খাইয়া সকলে চিত্রকূট রওয়ানা হইলেন। ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা যমুনা নদীর দক্ষিণ ধার দিয়া খানিক দূরে যাও। তারপর বাম দিকে যে দক্ষিণমুখো পথ গিয়াছে, সেই পথে গেলে রামের সন্ধান পাইবে।'

সেই পথে অনেক দূর চলিয়া, শেষে তাঁহাদের মনে হইল যে হয়ত রাম আর বেশি দূরে নাই। তখনই দুই-একজন লোক বনের ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, এক জায়গায় ধোঁয়া উঠিতেছে। তাহাতে নিশ্চয় বুঝা গেল যে, সেই বনেই রাম আছেন। তখন ভরত সঙ্গের লোকদিগকে সেখানে দাঁড়াইতে বলিয়া নিজেই তাঁহাদিগকে খুঁজিতে চলিলেন।

এদিকে ভরতের লোকজন অনেক দূরে থাকিতেই রাম লক্ষ্মণ তাহাদের কলরব শুনিতে পান, এবং উহা কিসের কলরব তাহা জানিবার জন্য লক্ষ্মণ একটা শালগাছে গিয়া উঠেন। সেখান হইতে চারিদিক দেখিয়া তিনি রামকে বলিলেন, 'দাদা, শীঘ্র আগুন নিভাইয়া ফেল, আর বর্ম পরিয়া তীর ধনুক লইয়া প্রস্তুত হও! ভরত আমাদিগকে মারিয়া ফেলিতে আসিয়াছে। আজ ভরতকে আর তাহার সকল সৈন্যকে মারিব, তবে ছাড়িব।'

এ কথায় রাম বলিলেন, 'ভাই, ভরত কি কখনও তোমার অনিষ্ট করিয়াছে। তবে কেন তাহাকে সন্দেহ করিতেছ?'

ইহাতে লক্ষ্মণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 'বোধহয় বাবা তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।' রাম বলিলেন, 'তাহা হইতে পারে। আমরা বনে থাকিয়া কষ্ট পাইতেছি, তাই বোধহয় বাবা আমাদিগকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। কিন্তু বাবার সঙ্গে তো সকল সময়েই প্রকাণ্ড সাদা ছাতা থাকে। সে ছাতা কই? তুমি শীঘ্র গাছ হইতে নামিয়া আইস।'

এদিকে ভরত খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমে রামের ঘরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। লতাপাতার ঘরখানি, তাহার ভিতরে রামের ধনুক দেখা যাইতেছে। আরও কাছে আসিলে দেখিলেন, রাম ঘরের ভিতর চামড়ার আসনে বসিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন ; পরনে গাছের ছাল, মাথায় জটা। তাহা দেখিয়া ভরতের মনে কী কষ্টই হইল! তিনি ছুটিয়া চলিলেন, কিন্তু পৌঁছিবার আগেই পড়িয়া গেলেন। মুখ দিয়া কেবল 'দাদা' এই কথাটি মাত্র বাহির হইয়াছিল, আর কথা সরিল না। ততক্ষণে শত্রুঘ্নও কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া রামের পায়ে পড়িলেন। তারপর চারি ভাই গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তাঁহারা একটু শান্ত হইলে পর রাম বলিলেন, 'ভরত, বাবা এখন কোথায়? তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া কেন আসিলে?' ভরত বলিলেন, 'দাদা, বাবা তোমার জন্য দুঃখ করিতে করিতে স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। এখন আমরা তোমাকে লইতে আসিয়াছি। তোমার পায়ে পড়ি দাদা, আমাদের সঙ্গে চল!' এই বলিয়া ভরত রামের পা জড়াইয়া ধরিলেন।

দশরথের মৃত্যুসংবাদে রাম কাঁদিতে কাঁদিতে ভরতকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'ভাই, বাবা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমারও করা উচিত, তোমারও করা উচিত, আমাকে যখন বনে পাঠাইয়াছেন, তখন আমি অযোধ্যায় কী করিয়া যাইব? আর তোমাকে যখন তিনি রাজা হইতে বলিয়া গিয়াছেন, তখন তুমিই বা কী করিয়া সে কথা অমান্য করিবে?'

তারপর দশরথের তর্পণ করিবার জন্য রাম মন্দাকিনী নদীর ধারে আসিলেন। তর্পণ শেষ হইলে আবার কান্না আরম্ভ হইল। সেই কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া ভরতের সঙ্গের লোকেরা আর দূরে বসিয়া থাকিতে পারিল না।

ততক্ষণে বেলা প্রায় শেষ হইয়াছিল। যাহা কিছু বেলা ছিল, তাহাও সকলের দেখাশুনা, প্রণাম, আশীর্বাদ ইত্যাদিতে কাটিয়া গেল। তারপর রাত্রি কেমন করিয়া কাটিল, তাহার কথা আর বেশি বলিয়া কী ফল? এত দুঃখ যাহাদের, তাহারা সে রাত্রি কেমন দুঃখে কাটাইয়াছিল, তাহা তোমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছ।

পরদিন রামকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা হইল। কিন্তু রাম কিছুতেই যাইতে চাহিলেন না। কেবল চেষ্টা করিলে কী হইবে? তাঁহাকে তো এ কথা বুঝাইয়া দেওয়া চাই যে, বনে যাওয়া উচিত নহে, অযোধ্যায় ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। নহিলে তিনি যাইবেন কেন? ভরত অনেক মিনতি করিয়াছিলেন বটে, বশিষ্ঠও নানারূপ মিষ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন। জাবালি নামক আর একজন পুরোহিত তাঁহার সহিত রীতিমত তর্কই জুড়িয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সকলকেই তাঁহার নিকট হার মানিতে হইল।

তখন ভরত বলিলেন, 'দাদা, যদি নিতান্তই না যাইবে, তবে তোমার পায়ের খড়ম দু-খানি আমাকে খুলিয়া দাও। এখন হইতে এই খড়মই আমাদের রাজা। আমরা ইহার চাকর। তোমার এই খড়ম লইয়া চৌদ্দ বৎসর তোমার মত গাছের ছাল পরিয়া, ফলমূল খাইয়া, অযোধ্যার বাহিরে তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। তাহার পরের বৎসরের প্রথম দিনে যদি তুমি ফিরিয়া না আইস, তবে আগুনে পুড়িয়া মরিব!'

রাম ভরতকে খড়ম দিয়া বলিলেন, 'চৌদ্দ বৎসর পরে অবশ্য ফিরিব। ভাই, আমার মাকে দেখিও।' এই বলিয়া রাম ভরতকে বিদায় দিলেন। তারপর ভরত সেই খড়মকে হাতির উপর চড়াইয়া অযোধ্যায় লইয়া আসিলেন। সেখানে রানীদিগকে রাখিয়া তিনি মন্ত্রী আর পুরোহিতদিগকে বলিলেন, 'দাদা যতদিন না আসেন, ততদিন আর অযোধ্যায় থাকিতে পারিব না। চলুন আমরা নন্দীগ্রামে যাই।'

নন্দীগ্রাম অযোধ্যার কাছেই। ভরত সেখানে গিয়া রামের খড়মকে সিংহাসনের উপর রাখিলেন। নিজে গাছের ছাল পরিয়া সেই খড়মের উপর ছাতা ধরিতেন, চামরের বাতাস করিতেন। রাজ্যের কোন কাজ আরম্ভ হইলে আগে খড়মের কাছে না বলিয়া কিছুই করিতেন না।

ভরত চলিয়া আসিলে পর রামের আর চিত্রকূটের কাছে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। তাই তিনি সীতা আর লক্ষ্মণকে লইয়া সেখান হইতে অত্রি মুনির আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

অত্রি আর তাঁহার স্ত্রী অনসূয়া দেবীর গুণের কথা কী বলিব! এমন ধার্মিক লোক অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহারা যে কত কাল যাবৎ তপস্যা করিতেছেন, তা কেহ জানে না। অনসূয়া দেবী যার-পর-নাই বুড়া হইয়াছেন, তেমন বুড়া মানুষ রাম দেখেন নাই। সীতাকে অনসূয়া দেবীর এতই ভাল লাগিল যে, তিনি তাঁহাকে বর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সীতা বলিলেন, 'মা, আপনি যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। ইহার পর আবার বর লইয়া কী হইবে?'

কিন্তু অনসূয়া কি তাহাতে ভোলেন? আর কিছু না হউক, একখানি পোশাক, কতকগুলি অলঙ্কার, একছড়া মালা, আর গায়ে মাখিবার খানিকটা অঙ্গরাগ তিনি সীতাকে না দিয়া ছাড়িলেনই না। এইসকল জিনিস যে খুব সুন্দর ছিল, সে বিষয়ে তো কিছু সন্দেহই নাই; তাহা ছাড়া ইহাদের একটি আশ্চর্য গুণ এই ছিল যে, ইহারা কোন কালেও ময়লা হইত না।

এইরূপ আদর যত্নে অত্রি মুনির আশ্রমে এক রাত্রি থাকিয়া পরদিন সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম অন্য একটি বনে চলিয়া গেলেন। সে বনের নাম দণ্ডক বন।

# অরণ্যকাণ্ড

দণ্ডক বনে অনেক মুনির আশ্রম ছিল। সেই সকল আশ্রমের মধ্যে এক রাত্রি থাকিয়া রাম সেখান হইতে আরও গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। বনবাসে আসিয়া অবধি এতদিনে তাঁহারা কোন রাক্ষস দেখিতে পান নাই। এইবার বেশ জমকালো রকমের একটা রাক্ষস তাঁহাদের সামনে পড়িল। বনের ভিতর সে দাঁড়াইয়া আছে, যেন একটা পাহাড়! চেহারার কথা আর কী বলিব! যেমন বিষম ভুঁড়ি, তেমনি বিদঘুটে হাঁ! তাহার উপর আবার গর্তপানা দুটো চোখ, গণ্ডারের চামড়ার মত চামড়া, আর পরনে রক্ত-চর্বি-মাখা বাঘছাল।

রাক্ষস মহাশয়ের তখন জলখাবার খাওয়া হইতেছিল। খাওয়ার আয়োজন বেশি নয়—গোটা তিনেক সিংহ, চারিটা বাঘ, দুটা গণ্ডার, দশটা হরিণ, আর একটা হাতির মাথা!

সে জলযোগে কাহারও কোন আপত্তি ছিল না, যদি হতভাগা সীতাকে লইয়া ছুট না দিত। সীতাকে লইয়া যাইতে দেখিয়া রাম 'হায় হায়!' করিয়া কাঁদিতে লাগলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদা, তুমি এত বড় বীর, তুমি কেন এমন করিয়া কাঁদিতেছ? এই দেখ, আমি রাক্ষস মারিয়া দিতেছি।'

তাহা শুনিয়া রাক্ষস বলিল, 'তোরা কে রে?' রাম বলিলেন, 'আমরা ক্ষত্রিয়। তুই কে?' রাক্ষস বলিল, 'আমার নাম বিরাধ; ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, অস্ত্র দিয়া কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না। তোরা শীঘ্র পালা।'

একথা শুনিয়া রাম বিরাধের গায়ে সাত বাণ মারিলেন। তখন সে সীতাকে ফেলিয়া, শূল হাতে বিকট শব্দে, হাঁ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে খাইতে আসিল। রাম লক্ষ্মণ যত বাণ মারেন, ব্রহ্মার বরে তাহাতে তাহার কিছুই হয় না; সে গা-ঝাড়া দিয়া সব ফেলিয়া দেয়। এমন সময় রামের দুই বাণে তাহার শূলটা কাটা গেল। তারপরে দুই জনে খড়্গ লইয়া যেই তাহাকে আক্রমণ করিয়াছেন, অমনি সে দুহাতে দুইজনকে কাঁধে ফেলিয়া দে ছুট।

তখন সীতা ভয়ানক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'ওগো রাক্ষস, তুমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমাকে খাও!' যাহা হউক, রাক্ষসের কাহাকেও খাইবার দরকার হইল না। কারণ, রাম লক্ষ্মণ তখনই তাহার দুই হাত ভাঙিয়া দিলেন, আর তাহাতে সে 'ভেউ ভেউ' করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

কিন্তু কী মুস্কিল! সে আপদ কিছুতেই মরিতে চায় না। দুইজনে তাহাকে কিল, লাথি, আছাড়, কত মারিলেন, মাটিতে ফেলিয়া থেতলা করিয়া দিলেন, খড়্গ দিয়া কাটিতে গেলেন, কিছুতেই তাহার মরণ নাই! তখন রাম বলিলেন, 'দেখ লক্ষ্মণ, এটা অস্ত্রে মরিবে না। চল এটাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলি।' এই কথা বলিয়া রাম সেই রাক্ষসের গলাটা পায়ে চাপিয়া ধরিলেন।

তখন রাক্ষস বলিতে লাগিল, 'বুঝিয়াছি, আপনারা রাম লক্ষ্মণ। আমি তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব ছিলাম, কুবেরের শাপে রাক্ষস হইয়াছি। কুবের আমাকে শাপ দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, দশরথের পুত্র রাম যুদ্ধ করিয়া আমাকে মারিলে, আমি আবার গন্ধর্ব হইয়া স্বর্গে যাইব।' এইরূপে নিজের পরিচয় দিয়া রাক্ষস বলিল, 'এখান হইতে দেড় যোজন দূরে শরভঙ্গ মুনি থাকেন। সেখানে গেলে আপনাদের ভাল হইবে।'

এরপর একটা গর্ত খুঁড়িয়া বিরাধকে পুঁতিলেই হয়। গর্ত খুঁড়িতে লক্ষ্মণের অধিক কষ্ট হইল না, কিন্তু পুঁতিবার সময় বিরাধ বড়ই চ্যাঁচাইয়াছিল।

তারপর তিনজনে শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গেলেন। রামকে দেখিতে শরভঙ্গের বড়ই ইচ্ছা। ইন্দ্র তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে আসেন, কিন্তু রামকে না দেখিয়া তিনি সেখানে যাইতে চাহেন নাই। রাম যে আসিবেন তাহা তিনি আগেই জানিতেন, আর শুধু তাঁহাকে দেখিবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

রামকে দেখা যখন হইয়া গেল, তখন আর এই পৃথিবীতে তাঁহার প্রয়োজন রহিল না। সুতরাং তিনি তখন রামের সম্মুখে নিজ হাতে আগুন জ্বালিয়া, তাহার ভিতরে গিয়া বসিলেন। তারপর দেখিতে দেখিতে তাঁহার সেই পুরাতন রোগা পাকা-চুল-দাড়ি-ওয়ালা শরীর পুড়িয়া গিয়া, তাহার বদলে অতি সুন্দর আর উজ্জ্বল একটি বালকের মত চেহারা হইল। তখন তিনি রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, এখান হইতে তোমরা সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে যাইও, তাহাতে তোমাদের উপকার হইবে।' এই বলিয়া তিনি ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন।

শরভঙ্গ মুনি স্বর্গে চলিয়া গেলে পর অন্য অনেক মুনি দেখিতে আসিলেন। তাঁহাদের নিকট রাম জানিতে পারিলেন যে, রাক্ষসেরা তাঁদের উপর বড়ই অত্যাচার করে। তাহা শুনিয়া রাম বলিলেন, 'আপনাদের ভয় নাই, আমি রাক্ষস দূর করিয়া দিব।'

তারপর রাম লক্ষ্মণ আর সীতা সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে গেলেন। সুতীক্ষ্ণের ইচ্ছা ছিল যে, রাম আর অন্য কোথাও না গিয়া তাঁহার আশ্রমেই থাকেন। কিন্তু দণ্ডক বনের অন্যান্য মুনিদের সহিত দেখা করিতে রামের নিতান্ত ইচ্ছা দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা তবে যাও, কিন্তু দেখা হইয়া গেলে আবার আমার এখানে আসিবে।' রাম লক্ষ্মণ তাহাতে সম্মত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর দশ বৎসর ধরিয়া রাম লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যের তপোবন সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা যে মুনির নিকটেই যান, তিনিই তাঁহাদিগকে কিছুদিন না রাখিয়া ছাড়েন না। কোথাও মাসেক, কোথাও চার-পাঁচমাস, কোথাও এক বৎসর, এইরূপ দশ বৎসর মুনিদের আশ্রমে আশ্রমে কাটাইয়া, শেষে তাঁহারা আবার সুতীক্ষ্ণের নিকটে

আসিয়া কিছুদিন রহিলেন।

সকল মুনির সহিতই দেখা হইল, কিন্তু অগস্ত্য মুনির সহিত দেখা এখনও হয় নাই। রাম ভাবিলেন যে, এখন একবার তাঁহার সহিত দেখা করিলে বড় ভাল হয়। তাই তাঁহারা সুতীক্ষ্ণের নিকট বিদায় লইয়া অগস্ত্যের আশ্রমে গেলেন।

মুনিদের মধ্যে অগস্ত্য একজন অতিশয় বড় লোক। তাঁহার এক একটা কাজ বড়ই আশ্চর্য। একবার তিনি চুমুক দিয়া সমুদ্রটাকে খাইয়া ফেলেন। ইল্বল আর বাতাপি নামক দুইটা দৈত্যকে তিনি যেমন করিয়া মারেন, তাহা অতি চমৎকার।

ইল্বল আর বাতাপি দুই ভাই ছিল। ইহাদের কাজ ছিল কেবল ব্রাহ্মণ মারিয়া খাওয়া। ইল্বল ব্রাহ্মণ সাজিয়া, সংস্কৃত কথা আওড়াইতে আওড়াইতে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইত। কোন ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেই বলিত, 'আমার বাড়িতে শ্রাদ্ধ, আপনার নিমন্ত্রণ।' শ্রাদ্ধের কথা একেবারেই মিথ্যা। আঁসলে ফাঁকি দিয়া ব্রাহ্মণ বেচারাকে নিজের বাড়িতে আনা চাই।

দুরাত্মা, সেই ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দিয়া আনিয়া ভেড়া খাইতে দিত। সে আবার যে-সে ভেড়াও নয়, তাহার ভাই বাতাপি সেই ভেড়া সাজিত। সেই ভেড়ার মাংস রাঁধিয়া সে ব্রাহ্মণকে খাইতে দিত, আর খাওয়া হইলে ডাকিত, 'বাতাপি, বাতাপি!' বাতাপি তখন ভেড়ার মত 'ভ্যা ভ্যা' করিতে করিতে বেচারা ব্রাহ্মণের পেট চিরিয়া বাহির হইত। এইরূপে তাহারা অনেক ব্রাহ্মণ মারিয়াছিল।

এই দুই দৈত্যকে শাস্তি দিবার জন্য অগস্ত্য মুনি একবার তাহাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে গেলেন। ইল্বল তাঁহাকেও সেইরকম করিয়া ভেড়া রাঁধিয়া খাওয়াইল। সে জানিত না যে, এই সর্বনেশে মুনি তাহার ভাইকে একেবারে হজম করিয়া ফেলিবেন। খাওয়া শেষে ইল্বল ডাকিল 'বাতাপি, বাতাপি!' অগস্ত্য বলিলেন, 'বাতাপি কোথা হইতে আসিবে? তাহাকে যে হজম করিয়া ফেলিয়াছি!' তাহা শুনিয়া ইল্বল অগস্ত্যকে মারিতে গেল, কিন্তু অগস্ত্য কেবল তাহার দিকে রাগের ভরে তাকাইয়াই তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

অগস্ত্য রামকে বিশ্বকর্মার তৈয়ারি একখানি ধনুক, ব্রহ্মদত্ত নামে একটা ভয়ঙ্কর বাণ, অক্ষয় তূণ নামক একটি তূণ, আর একখানি আশ্চর্য খড়্গ দিলেন। তূণটির এমন আশ্চর্য গুণ ছিল যে, তাহার ভিতরকার তীর কিছুতেই ফুরাইত না ; এইজন্য তাহার নাম অক্ষয় তূণ। রাম সেই জিনিসগুলি লইয়া অগস্ত্যকে বলিলেন, 'মুনিঠাকুর, আমাদিগকে একটি সুন্দর জায়গা দেখাইয়া দিন, আমরা সেখানে ঘর বাঁধিয়া থাকিব।' অগস্ত্য একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'এখান হইতে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটী নামে একটি অতি সুন্দর বন আছে। সেখানে সুন্দর ফলমূল, মিষ্ট জল, হরিণ, ময়ূর ইত্যাদি সকলই পাওয়া যায়। তোমরা সেইখানে গিয়া সুখে বাস কর। এ কথায় রাম অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া পঞ্চবটী যাত্রা করিলেন।

খানিক দূরে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, পথের ধারে বিশাল এক পাখি বসিয়া আছে। তাহাকে রাক্ষস ভাবিয়া রাম লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে হে?' সে বলিল, 'বাবা,

আমি তোমাদের পিতার বন্ধু। আমার নাম জটায়ু। আমার দাদার নাম সম্পাতি, আমার পিতার নাম অরুণ। গরুড় আমাদিগের জ্যেঠামহাশয়।'

পাখি আরও বলিল, 'তোমরা আমার সঙ্গে এইখানে থাক ; তাহা হইলে তোমরা যখন ফল আনিতে যাইবে, তখন আমি সীতাকে দেখিতে পারিব।' রাম লক্ষ্মণ তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার কথাবার্তা তাঁহাদের বড়ই মিষ্ট লাগিল।

সে স্থানটি বাস্তবিকই খুব সুন্দর। কাছেই গোদাবরী নদী। তাহাতে হাঁস সারস প্রভৃতি নানাবকমের পাখি খেলা করিতেছে। দুইধারে সুন্দর পাহাড়গুলি ফুলে ফলে বোঝাই হইয়া আছে। নদীতে হরিণ জল খাইতে আসে, আর বনের ভিতর ময়ূর ডাকে। ঘর বাঁধিয়া থাকিবার পক্ষে চমৎকার! এই সুন্দর স্থানে লক্ষ্মণ একটি সুন্দর ঘর বাঁধিলেন।

সেই ঘরটিতে তিনজনের বেশ সুখেই সময় কাটিতেছিল। কিন্তু সুখ কি চিরদিন থাকে? একদিন সূর্পণখা নামে একটা রাক্ষসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল, 'আমি রাবণ রাজার বোন। রামকে বিবাহ করিতে আসিয়াছি।' রাম তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইলেন না। তখন সে লক্ষ্মণকে বলিল, 'তুমি আমাকে বিবাহ কর।' লক্ষ্মণও রাজি হইলেন না। তাহাতে সে হতভাগী হাঁ করিয়া সীতাকে খাইতে গেল। এত বাড়াবাড়ি করিলে কে সহ্য করিতে পারে? কাজেই তখন লক্ষ্মণ খড়্গ দিয়া তাহার নাক আর কান কাটিয়া দিলেন। সেই রক্তমাখা নাক কান লইয়া রাক্ষসী হাত তুলিয়া চাঁচাইতে চাঁচাইতে বনের ভিতর ঢুকিয়া গেল।

কাছেই জনস্থান বলিয়া একটা জায়গা। সেখানে সূর্পণখার আর এক ভাই থাকে, তাহার নাম খর। সূর্পণখা কাটা নাক কান লইয়া, সেই খরের সম্মুখে গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। ভগ্নীর নাক কান কাটা দেখিয়া খর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'একি সর্বনাশ! হায় হায়! কিসে তোমার এইরূপ হইল? তুমি কেমন সুন্দর ছিলে। যমের মত তোমার ভয়ানক চেহারা, আর গর্তপানা চোখ ছিল। কোন্ দুষ্ট তোমার এমন দশা করিল, শীঘ্র বল। তাহাকে এখনি উচিত সাজা দিতেছি।'

সূর্পণখা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'দশরথ রাজার দুটা ছেলে আসিয়াছে, তাহাদের নাম রাম আর লক্ষ্মণ। তাহারাই আমার এই দশা করিয়াছে। আমার কোন দোষ নাই, দাদা। আজ আমাকে তাহাদের রক্ত আনিয়া খাইতে দিতে হইবে।'

এই কথা শুনিয়া খর তখনই চৌদ্দটা রাক্ষসকে হুকুম দিল, 'তোমরা এখনই সেই তিনটা মানুষকে মারিয়া নিয়া আইস, সূর্পণখা তাহাদের রক্ত খাইবেন।' সেই হুকুম পাওয়ামাত্রই চৌদ্দটা রাক্ষস অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ছুটিল। সূর্পণখা তাহাদের সঙ্গে গিয়া রাম লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিল।

এদিকে রামও সীতাকে লক্ষ্মণের নিকট রাখিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। চৌদ্দটা রাক্ষস বিষম রাগে তাঁহার উপর চৌদ্দটা শূল ছুঁড়িয়া মারিল। রাম চৌদ্দ বাণে সেই চৌদ্দটা শূলকে কাটিয়া, নারাচ অস্ত্রে একেবারে রাক্ষসদিগের বুক ফুটা করিয়া দিলেন। সে অস্ত্র তাহাদের পিঠ দিয়া বাহির হইয়া, মাটির ভিতরে অবধি ঢুকিয়া গেল। তাহা দেখিয়া সূর্পণখাও তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পলাইল।

সূর্পণখাকে আবার ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া খর বলিল, 'আবার কি হইয়াছে? তোমার সঙ্গে যাহারা গিয়াছিল, তাহারা কি সেই মানুষ তিনটাকে মারিতে পারে নাই?' সূর্পণখা বলিল, 'না, রামই তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছে। তুমি নিজে চল।' এই বলিয়া সে পেট চাপড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া, ঘোরতর শব্দে কাঁদিতে লাগিল।

তখন খর নিজেই তাহার ভাই দূষণকে লইয়া রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে চলিল। চৌদ্দ হাজার রাক্ষস শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, তোমর, গদা, শক্তি, কুড়াল, খড়্গ প্রভৃতি লইয়া গর্জন করিতে করিতে তাহাদের সঙ্গে চলিল। আকাশে দেবতারা ছুটিয়া দেখিতে আসিলেন, এবার কী ভয়ানক যুদ্ধ হয়!

এদিকে রামও সীতাকে লক্ষ্মণের সঙ্গে একটা পর্বতের গুহায় লুকাইয়া রাখিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছেন। রাক্ষসেরা গর্জন করিতে করিতে আসিয়া রামের উপর প্রাণপণে অস্ত্র ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু রাম এমনই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে তাহারা কিছুতেই টিকিতে পারিল না। রামের বাণে তাহাদের হাতি, ঘোড়া, লোকজন যত ছিল, সকলই একেবারে খণ্ড-খণ্ড হইয়া গেল।

তখন খরের ভাই দূষণ বড়ই রাগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। কিন্তু সে যে কেমন যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা আর বলিয়া কী হইবে। প্রথমেই তো রামের বাণে তাহার ঘোড়া গেল, সারথি গেল, ধনুক গেল। তখন সে লইল একটা পরিঘ। অমনি সেই পরিঘ-শুদ্ধ তাহার হাত দুটা কাটা গেল। তখন বেচারা মরিয়া গেল। তারপর আর তিনটা রাক্ষস আসিয়া ভালমতে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে না করিতেই মরিয়া গেল।

একলা রাম যুদ্ধ করিয়া চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে মারিলেন। অবশিষ্ট রহিল কেবল খর আর তাহার পুত্র ত্রিশিরা। ত্রিশিরা অতি অল্পক্ষণই যুদ্ধ করিয়াছিল ; শেষে রহিল শুধু খর।

খর ভয়ানক যুদ্ধ জানিত। সে প্রথমে খুব তেজের সহিত যুদ্ধ করিয়া রামের ধনুক আর বর্ম কাটিয়া ফেলিল। কিন্তু রাম তখনই সেই অগস্ত্য মুনির ধনুকখানি লইয়া, ক্রমে তাহার রথ, সারথি, ঘোড়া, ধনুক সব চুরমার করিয়া দিলেন। তখন খরের এক গদা মাত্র বাকি, তাহাও কাটিতে রামের অধিক সময় লাগিল না। গদা কাটা গেলে খরের হাতে আর একখানিও অস্ত্র রহিল না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার তেজ যে কিছুমাত্র কমিল, তাহা নহে। অস্ত্র ফুরাইলে সে শালগাছ লইয়া যুদ্ধ করিল। শালগাছ কাটা গেলে, শুধু হাতেই মারিতে আসিল। শেষে রাম তাহার বুকে এক বাণ মারিয়া তাহার প্রাণ বাহির করিয়া দিলেন।

জনস্থানের যত রাক্ষস প্রায় সকলকেই রাম মারিয়া শেষ করিলেন। বাকি রহিল খালি অকম্পন নামে একটা। অকম্পন পলাইয়া লঙ্কায় গিয়া রাবণকে বলিল, 'মহারাজ, জনস্থানে যত রাক্ষস ছিল, সকলই মরিয়া গিয়াছে। কেবল আমিই অনেক কষ্টে পলাইয়া আসিয়াছি।' তাহা শুনিয়া রাবণ আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'সে কী কথা, অকম্পন! তাহারা কী করিয়া মরিল?'

অকম্পন বলিল, 'মহারাজ, অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম তপোবলে

মারিয়াছে। রাম যে কত বড় বীর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে একাই জনস্থান নষ্ট করিয়াছে। তাহার সঙ্গে আবার তাহার এক ভাই আছে, সেটার নাম লক্ষ্মণ।'

এ কথা শুনিয়া রাবণের রাগের আর সীমা রহিল না। সে তখনই রাম লক্ষ্মণকে মারিবার জন্য জনস্থানে যাইতে চাহিল। কিন্তু অকম্পন তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, 'মহারাজ কি রামকে যেমন-তেমন বীর ভাবিয়াছেন? আপনার সমস্ত রাক্ষস লইয়া গেলেও তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পারিবেন না। তবে, তাহাকে মারিবার একটা উপায় আছে। রাম তাহার স্ত্রী সীতাকে আনিয়াছে। সীতা এতই সুন্দর যে, তেমন আর কেহ দেখে নাই। আপনি যদি রামকে ফাঁকি দিয়া এই সীতাকে ধরিয়া আনিতে পারেন, তবে সেই দুঃখে রাম আপনিই মরিয়া যাইবে।' তাহা শুনিয়া রাবণ বলিল, 'আমি আজই যাইতেছি।'

এই বলিয়া সে তাহার গাধায় টানা ঝকঝকে রথখানিতে চড়িয়া, তাড়কার পুত্র মারীচের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। মারীচ তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'মহারাজ যে এমন তাড়াতাড়ি করিয়া একলাটি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! ব্যাপারখানা কী?'

রাবণ বলিল, 'দশরথের ছেলে রাম জনস্থানের রাক্ষসদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছে। তাই আমি তাহার স্ত্রী সীতাকে ধরিয়া আনিতে যাইতেছি।' মারীচ বলিল, 'মহারাজ, এরূপ বুদ্ধি আপনাকে কে দিয়াছে? আপনি এইবেলা লঙ্কায় ফিরিয়া যাউন। রামের হাতে পড়িলে আপনার আর রক্ষা থাকিবে না।'

তাহা শুনিয়া রাবণ লঙ্কায় ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই দেখিল, সম্মুখে সূর্পণখা, তাহার নাক কান কাটা। জনস্থানে রাক্ষসেরা মারা গেলে পর হতভাগী চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে লঙ্কায় চলিয়া আসিয়াছে।

সূর্পণখার কথা শুনিয়া রাবণ আবার মারীচের কাছে ফিরিয়া গেল। এবারে আর সে তাহার কোন কথাই শুনিল না। সে বলিল, 'মারীচ, আমার এ কাজটি করিয়া না দিলেই নয়। তুমি রামের আশ্রমে গিয়া, সোনার হরিণ সাজিয়া সীতার সম্মুখে নাচিয়া বেড়াইবে। তোমাকে দেখিলে নিশ্চয় সীতা তোমাকে ধরিবার জন্য রাম লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া দিবে। রাম লক্ষ্মণ আশ্রমের বাহিরে চলিয়া গেলে আর সীতাকে ধরিয়া আনিতে কিসের ভয়!'

মারীচ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে জোড়হাতে বলিল, 'মহারাজ, এক সময় আমার গায় হাজার হাতির জোর ছিল। আমি মনের সুখে দণ্ডকবনের মুনিদিগকে ধরিয়া খাইতাম, আর তাহাদের যজ্ঞ নষ্ট করিয়া বেড়াইতাম। আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ নষ্ট করিতে গেলাম, আর এই রাম ধনুক লইয়া আমাকে আটকাইতে আসিল। তখন সে ছোট্ট ছেলেমানুষ ছিল। আমি মনে করিলাম, ঐটুকু মানুষ আমার কী করিবে! কিন্তু সেই ঐটুকু মানুষই এমন এক বাণ আমাকে মারিল যে, আমি তাহার চোটে অজ্ঞান হইয়া এক সমুদ্রের জলে আসিয়া পড়িলাম। এমন লোকের সঙ্গে কি ঝগড়া করিতে যাইতে হয়? তাহার তো কিছু করিতে পারিবেনই না, মাঝখান হইতে আপনার প্রাণটি যাইবে।'

ঔষধ তিক্ত হইলে যেমন তাহা খাইতে ভাল লাগে না, মারীচের কথাও রাবণের কাছে সেইরূপ ভাল লাগিল না। সে বলিল, 'এ কাজ তোমায় করিতেই হইবে। সোনার হরিণ,

তাহার গায়ে রূপার চক্র, এমনি সাজ ধরিয়া তুমি সীতার সামনে গিয়া খেলা করিতে থাক। এমন হরিণটি দেখিলেই সীতা ভুলিয়া যাইবে, আর তোমাকে ধরিবার জন্য রামকে না পাঠাইয়া থাকিতেই পারিবে না। রাম তোমার পিছনে পিছনে অনেক দূর আসিলে পর, তুমি রামের মতন গলায় চ্যাঁচাইবে, "হায় সীতা! হায় লক্ষ্মণ!" সে শব্দ শুনিলে, লক্ষ্মণ কি আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিবে? তাহাতে আশ্রম ছাড়িয়া রামের কাছে আসিতেই হইবে। তখন আর সীতাকে কে রাখে? মারীচ, এ কাজটি করিয়া দিলে আমার অর্ধেক রাজ্য তোমার। আর যদি না কর, তবে এখনি তোমার মরণ!'

কাজেই তখন আর বেচারা কী করে? রাবণের সেই রথে চড়িয়া তাহাকে আসিতে হইল। সীতা তখন সাজি হাতে করিয়া ফুল তুলিতেছিলেন। এমন সময় সেই দুষ্ট রাক্ষস সোনার হরিণ সাজিয়া তাঁহার সামনে আসিয়া খেলা করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সীতা রাম লক্ষ্মণকে ডাকিলেন।

সোনার হরিণ দেখিয়াই লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদা, হরিণ কি কখনও সোনার হয়? এটা নিশ্চয় সেই তাড়কার ছেলে মারীচের ফাঁকি! ঐ দুষ্ট অনেক সময় হরিণের সাজ ধরিয়া মুনিদিগকে মারিতে আসে।'

কিন্তু সীতা সেই হরিণ দেখিয়া এতই ভুলিয়া গেলেন যে, লক্ষ্মণের কথা তাঁহার কানেই গেল না। তিনি রামকে বলিলেন, 'কী সুন্দর হরিণ! ওটি আমাকে ধরিয়া দিতেই হইবে! জীবন্ত ধরিতে পারিলে আমরা উহাকে পুষিব, আর দেশে যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব! আর জীবন্ত ধরিতে না পারিলেও, উহার চামড়ায় সুন্দর আসন হইবে!'

লক্ষ্মণকে সাবধানে পাহারা দিতে বলিয়া রাম হরিণ ধরিতে চলিলেন। দুষ্ট রাক্ষস কতই ছল জানে! এক এক বার কাছে আসে, আবার বনের ভিতরে লুকায়, আবার খানিক দূর গিয়া গাছের আড়াল হইতে ডাক মারে। এইরূপ করিয়া সে তাঁহাকে অনেক দূর লইয়া গেল। রাম যতক্ষণ মনে করিয়াছিলেন যে তাহাকে ধরিতে পারিবেন, ততক্ষণ ক্রমাগত তাহার পিছু-পিছু ছুটিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন যে আশ্রম হইতে অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছেন, তবুও তাহাকে ধরিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি একটা তীর ছুঁড়িয়া মারিলেন।

সেই তীরের ঘায় রাক্ষসের হরিণের সাজ ঘুচিয়া গেল। এখন তাহার প্রাণ যায়-যায়। মরিবার সময় সে বিকট রাক্ষস হইয়া ঠিক রামেরই মতন স্বরে 'হায় সীতা! হায় লক্ষ্মণ!' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া রাম বুঝিতে পারিলেন যে সর্বনাশ হইয়াছে! এ শব্দ সীতার কানে গেলে কী আর রক্ষা থাকিবে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি ব্যস্ত হইয়া আশ্রমের দিকে ফিরিলেন।

এদিকে সীতা আশ্রম হইতে সেই দুষ্ট রাক্ষসের কান্না শুনিতে পাইয়া রামের জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'হায় হায়! না জানি কী সর্বনাশ হইল! লক্ষ্মণ, শীঘ্র যাও! নিশ্চয় তিনি রাক্ষসের হাতে পড়িয়াছেন!'

কিন্তু লক্ষ্মণকে রাম সীতার নিকট থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন, কাজেই তিনি সীতাকে

ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না। তখন সীতা লক্ষ্মণকে এই বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন, 'বুঝিয়াছি, তাঁহাকে রাক্ষসে মারিয়া ফেলে, ইহাই তুমি চাও। এমন ভাই তুমি!'

তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদাকে মারিতে পারে, ত্রিভুবনে এমন কেহ নাই। আপনি কেন আমাকে এইরূপ করিয়া বলিতেছেন? আপনাকে একলা ফেলিয়া যাওয়া কি আমার উচিত? আপনার কোন ভয় নাই। যে শব্দ শুনিয়াছেন, উহা রাক্ষসের ফাঁকি। রাক্ষসদিগের সঙ্গে আমাদের এখন শত্রুতা, সুতরাং তাহারা আমাদের অনিষ্ট করিবার জন্য কতই চেষ্টা করিবে। আপনি দুঃখ করিবেন না, স্থির হউন।'

কিন্তু সীতা আরও রাগিয়া বলিলেন, 'তবে রে নিষ্ঠুর দুষ্ট লক্ষ্মণ, রামের বিপদ হইলেই বুঝি তোর সুখ হয়? তোর মতন পাপী তো আর নাই! তোকে বুঝি ভরত পাঠাইয়াছে? না তুই নিজেই দুষ্টবুদ্ধি আঁটিয়া রামের সঙ্গে আসিয়াছিস?'

এ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণের মনে যে কী কষ্ট হইল, তাহা কী বলিব! তিনি বলিলেন, 'আপনাকে আমি মায়ের মতন ভক্তি করি। কিন্তু আপনি এমন শক্ত কথা আমাকে বলিতেছেন যে, আমার তাহা কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। যাহা হউক, এই আমি চলিলাম, বনের দেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন! সাবধান হইয়া ঘরে বসিয়া থাকুন, যেন দাদার সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া আবার আপনাকে দেখিতে পাই।' এই বলিয়া লক্ষ্মণ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বার বার ফিরিয়া তাকাইতে লাগিলেন, পাছে সীতার কোন অনিষ্ট হয়।

লক্ষ্মণ চলিয়া যাওয়া-মাত্রই সন্ন্যাসীর বেশে রাবণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে ছাতা লাঠি আর কমণ্ডুল, মাথায় টিকি, পায়ে জুতা, কপালে লম্বা ফোঁটা, মুখে ঘন-ঘন হরিনাম। দুষ্ট ক্রমে ঘরের দরজায় আসিয়া সীতার সহিত কথাবার্তা জুড়িয়া দিল। সীতা মনে করিলেন, বুঝি সে যথার্থই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী। কাজেই তিনি তাহাকে নমস্কার করিয়া, বসিবার জন্য কুশাসন আর পা ধুইবার জন্য জল আনিয়া দিলেন। তারপর তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর, ফলমূল আনিয়া দিই, দয়া করিয়া কিছু আহার করুন।'

রাবণ এইরূপে সীতার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া শেষে বলিল, 'আমি লঙ্কার রাজা রাবণ। তুমি বনে থাকিয়া, এই তপস্বীটার সঙ্গে মিছামিছি এ কষ্ট কেন করিতেছ? আমার সঙ্গে লঙ্কায় চল। সেখানে তুমি যার-পর-নাই সুখে থাকিবে।'

এই কথা শুনিয়া সীতা ভয়ানক রাগের সহিত বলিলেন, 'বটে রে দুষ্ট, তোর এত বড় কথা! এর উচিত সাজা তুই এখনি পাইবি।'

তখন রাবণ সন্ন্যাসীর সাজ ফেলিয়া তাহার নিজের চেহারায় দাঁড়াইল। সে যে কী বিকট মূর্তি, তাহা কী বলিব! দশটা মাথা, কুড়িটা হাত, কুড়িটা চোখ—দেখিলেই ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়। এইরূপ চেহারা করিয়া সে সীতাকে বলিল, 'তুমি বুঝি পাগল, তাই আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? রামের মায়া ছাড়িয়া দাও। সেটা হতভাগা, তাহাকে ভালবাসা কি তোমার উচিত?'

এই কথা বলিতে বলিতেই রাবণের রথ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাবণও

সীতার চুল ধরিয়া তাঁহাকে সেই রথে নিয়া তুলিতে আর বিলম্ব করিল না। সীতা রামের নাম ধরিয়া চিৎকার করিয়া কতই কাঁদিলেন, তাঁহার শরীরে যেটুকু জোর ছিল, তাহা লইয়াই প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইবার জন্য কতই চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই ভয়ানক রাক্ষসের সঙ্গে তিনি পারিবেন কেন? রথ তাঁহাকে লইয়া আকাশে উড়িয়া চলিল। সীতা পশুপক্ষীকে, বনদেবতাদিগকে, গোদাবরী নদীকে ডাকিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ওগো, তোমরা দয়া করিয়া রামকে সংবাদ দাও। তাঁহার সীতাকে দুষ্ট রাবণ চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে।'

সে সময়ে বুড়া জটায়ু পক্ষী গাছে বসিয়া ঘুমাইতেছিল। সীতার কান্নার শব্দে সে জাগিয়া দেখিল যে রাবণ তাঁহাকে লইয়া পলাইতেছে। তাহা দেখিয়া জটায়ু বলিল, 'বটে রে দুষ্ট রাক্ষস, আমি এখানে থাকিতেই তুই সীতাকে লইয়া পলাইবি? এখনই নখ দিয়া তোর মাথা ছিঁড়িয়া দিতেছি।'

তখন জটায়ু আর রাবণে বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাবণ জটায়ুকে ভয়ানক ভয়ানক বাণ মারে, আর জটায়ু নখের আঁচড়ে তাহার মাংস ছিঁড়িয়া নিতে ছাড়ে না। রাবণ জটায়ুর বুকে দশ বাণ মারিয়া মনে করিল, এইবার পাখি মরিবে। কিন্তু পাখি মরা দূরে থাকুক, বরং সে রাবণের ধনুকটা কাড়িয়া লইল, তাহার উপর আবার তাহাকে একটা প্রকাণ্ড লাথিও মারিল। তারপর রাবণ আবার নতুন ধনুক লইয়া আগের চেয়ে অনেক বেশি বাণ মারিল বটে, কিন্তু জটায়ু কি তাহাতে ডরায়? বাণ তো তাহার ডানার বাতাসেই উড়িয়া গেল। তারপর ধনুকখানি কাড়িয়া লইয়া তাহা মাড়াইয়া গুঁড়া করিতে কতক্ষণ লাগে।

এমনিতর ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া জটায়ু রাবণের রথ, ছাতা, সারথি, সহিস কিছুই আস্ত রাখিল না। কিন্তু সেই বুড়া বয়সে আর কত যুদ্ধ করিবে? সে শীঘ্রই কাহিল হইয়া পড়িল।

রাবণ দেখিল যে এইবেলা পলাইবার উত্তম সময়। সুতরাং সে হাতে একখানি খড়্গ আর বগলে সীতাকে লইয়া চুপি-চুপি চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া জটায়ু অমনি তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'দাঁড়া পাপী, যাইতেছিস কোথায়?' এই বলিয়া হাতির পিঠে যেমন মাহুত চড়ে, সেইরূপ জটায়ু গিয়া রাবণের পিঠে চড়িল। তারপর তাহাকে ঠোকরাইয়া, আঁচড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া এমনি নাকাল করিল যে নাকাল যাহাকে বলে!

কিন্তু রাবণ সহজে মরিবার লোক ছিল না। ব্রহ্মা তাহাকে বর দিয়াছিলেন যে, তাহার শরীরের কোন জায়গা ছিঁড়িয়া গেলে তাহা তখনই জোড়া লাগিবে। জটায়ু তাহার বাম দিকের দশটা হাত ছিঁড়িয়া ফেলিতে না ফেলিতেই দেখিল যে, তাহার আর দশটা হাত বাহির হইয়াছে। এরূপ লোকের সঙ্গে কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায়? কাজেই শেষটা জটায়ু আর পারিল না। তখন সেই দুষ্ট রাক্ষস খড়্গ দিয়া বেচারার পা আর ডানা দুখানি কাটিয়া ফেলিল। জটায়ুর তখন প্রাণ যায়-যায়। এরপর আর সীতাকে কে রক্ষা করিবে? কাজেই তখন রাবণ তাঁহাকে লইয়া শূন্যে চলিয়া গেল।

সীতার দুঃখের কথা আর কী বলিব! হায় হায়! তাঁহার সেই কান্না কেহই শুনিতে পাইল না। সেই শূন্যের উপর হইতে সীতা এমন একটি লোক দেখিতে পাইলেন না, যাহাকে ডাকিয়া বলিতে পারেন, 'আমাকে রক্ষা কর'। তিনি কেবল দেখিলেন যে, একটা পর্বতের উপর পাঁচটি বানর রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি তাঁহার সোনালী রঙের

চাদরখানি আর গায়ের গহনাগুলি ফেলিয়া দিলেন। মনে করিলেন, হয়ত তাহা দেখিতে পাইয়া তাহারা রামকে বলিবে। রাবণ ইহার টের পাইল না, কিন্তু বানরেরা তাহা চাহিয়া দেখিল।

এদিকে রাম সেই হরিণের-সাজ-ধরা রাক্ষসটাকে মারিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিতেছেন, তাঁহার মনে ভয়ের আর সীমা নাই। এমন সময় দেখিলেন, লক্ষ্মণ অতিশয় দুঃখিতভাবে সেই দিক দিয়া আসিতেছেন। লক্ষ্মণকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'সেকি লক্ষ্মণ, তুমি সীতাকে ফেলিয়া আসিয়াছ? না জানি কী সর্বনাশ হইয়াছে! সীতাকে হয়ত আর দেখিতে পাইব না!'

এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, সীতা নাই, খালি ঘর পড়িয়া রহিয়াছে। সীতা যে-সকল জায়গায় বেড়াইতেন, তাহার কোথাও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না।

হায় হায়! সীতা কোথায় গেলেন? তিনি কি কোথাও লুকাইয়া আছেন? না বনে ফুল তুলিতে গিয়াছেন? না নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন? কোথায় তিনি? গাছতলায়, নদীর ধারে, পাহাড়ের উপরে, কত জায়গায় রাম সীতাকে খুঁজিলেন, কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। গাছকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাখিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিণগুলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই সীতার সংবাদ বলিতে পারিল না।

তখন তিনি হাত পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'হায় রে লক্ষ্মণ, কে আমাদের সীতাকে লইয়া গেল? সীতা, তুমি বুঝি লুকাইয়া থাকিয়া তামাসা দেখিতেছ? শীঘ্র আইস, আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। তুমি চলিয়া গেলে যে আমি আর বাঁচিব না!'

লক্ষ্মণ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'দাদা, চল আরও ভাল করিয়া খুঁজি, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাকে পাইব।' কিন্তু রাম তবুও 'সীতা, সীতা!' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রামও কাঁদেন, লক্ষ্মণও কাঁদেন, আর চারিদিকে সীতাকে খোঁজেন।

এমন সময় তাঁহারা দেখিলেন, মাটিতে রাক্ষসের পায়ের দাগ রহিয়াছে, মাঝে মাঝে সীতারও পায়ের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা ভাঙা রথ আর একটা ধনুক বাণের টুকরাও সেখানে পড়িয়া আছে।

এ-সকল পায়ের চিহ্ন কাহার? এত বড় পা রাক্ষস ভিন্ন আর কাহার হইবে? নিশ্চয় সীতাকে রাক্ষসে লইয়া গিয়াছে, না হয় মারিয়া খাইয়াছে!

এইরূপ ভাবিয়া রাম বলিলেন, 'আমার সীতাকে রাক্ষসে লইয়া গেল, আর দেবতারা বারণ করিলেন না! আজ যদি আমার সীতাকে তাঁহারা না আনিয়া দেন, তবে আমি সকল সৃষ্টি নষ্ট করিব।' লক্ষ্মণ তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'দাদা, রাগ করিও না। চল এখন ভাবিয়া দেখি, এ কাজ কে করিয়াছে। সেই দুষ্টকে শাস্তি দিতেই হইবে।'

লক্ষ্মণের কথায় রাম একটু শান্ত হইলেন। তারপর তাঁহারা বনের ভিতর খুঁজিতে খুঁজিতে এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, জটায়ু রক্তমাখা শরীরে পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া রাম বলিলেন, 'এই দুষ্টই সীতাকে খাইয়াছে! এটা পাখি নয়, নিশ্চয় রাক্ষস! ঐ দেখ উহার বুকে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে!' এই বলিয়া রাম জটায়ুকে মারিতে গেলেন।

তখন জটায়ু বলিল, 'বাবা, রাবণই আমাকে মারিয়া রাখিয়াছে, তুমি আর আমাকে মারিও না। সীতাকে লইয়া যাইতে দেখিয়া আমি তাহার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলাম, কিন্তু দুষ্ট আমার পাখা কাটিয়া সীতাকে লইয়া গেল।'

এই কথা শুনিয়া রাম তীর ধনুক ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, জটায়ুকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জটায়ুর তখন মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, কথা কহিতেও কষ্ট হয়। তথাপি সে রামকে শান্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। প্রাণ যায় যায়, তবুও অনেক চেষ্টা করিল, যাহাতে তাঁহাকে সীতার খবর দিয়া যাইতে পারে। কিন্তু হায়! বেচারা কথা শেষ করিবার সময় পাইল না। সবে বলিয়াছিল, 'রাবণ বিশ্বশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভাই', ইহার মধ্যেই তাহার কথা আটকাইয়া গেল।

রাম তাহাকে ধরিয়া দেখেন, প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন রাজা দশরথের মতন কোনও একজন গুরুলোকের মৃত্যু হইল। আপনার লোক মরিলে যেমন করিয়া তাহাকে পোড়ায়, আর তাহার জন্য কাঁদে, জটায়ুকেও সেইরূপ করিয়া পোড়াইয়া রাম তাহার জন্য কাঁদিলেন। তারপর দুই ভাই বনে বনে, গুহায় গুহায়. সীতাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এমন সময় ভয়ানক শব্দে বন কাঁপিয়া উঠিল, রাম লক্ষ্মণ খড়্গ হাতে সেই শব্দের দিকে অনেক দূর গিয়া দেখিলেন, বিষম বিকটাকার একটা রাক্ষস বসিয়া আছে। সে-রকম রাক্ষসের নাম কবন্ধ। তাহার মাথা থাকে না। কী ভয়ঙ্কর জানোয়ার! যেন একটা হাত-পা-ওয়ালা কালো পর্বত! মাথা নাই, তাহার বদলে পেটটাই দাঁত খিঁচাইয়া হাঁ করিয়া আছে, আর তাহার ভিতর হইতে প্রকাণ্ড একটা জিহ্বা লক্‌লক্ করিয়া বাহির হইতেছে। চোখ একটি বৈ নাই, কিন্তু সেই একটা চোখ আগুনের মত উজ্জ্বল। এক একটা হাত প্রায় দুই ক্রোশ লম্বা! সেই লম্বা হাত দিয়া সে সিংহ, হরিণ, হাতি যাহা পাইতেছে তাহাই ধরিয়া মুখে দিতেছে।

রাম লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকেও সে ধরিয়া ফেলিল। লক্ষ্মণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, 'দাদা, এইবার বুঝি প্রাণটা যায়!' কিন্তু রাম তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, 'ভয় কী? ব্যস্ত হইতেছ কেন?'

তখন সেই রাক্ষসটা বলিল, 'তোমরা কে হে? এখানে কী করিতে আসিয়াছ? হাতে ধনুক, বাণ, খড়্গ দেখিতেছি। গায়ে জোর আছে বলিয়া বোধহয়। আর আমারও ক্ষুধা হইয়াছে। সুতরাং তোমাদিগকে খাইব।' কিন্তু সে তাহার প্রকাণ্ড মুখ অথবা পেট, যাহাই বল হাঁ করিয়া যেই রাম লক্ষ্মণকে খাইতে যাইবে, অমনি খড়্গ দিয়া তাঁহারা তাহার হাত দুইটা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন সে বেদনায় অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কে?' লক্ষ্মণ তাঁহাদের নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'তুমি কে? কবন্ধ হইলে কী করিয়া?'

রাম লক্ষ্মণের পরিচয় পাইয়া কবন্ধ বলিল, 'আমার বড়ই সৌভাগ্য যে আজ তোমাদিগকে দেখিতে পাইলাম, আর তোমরা আমার হাত কাটিলে। আমার নাম দনু। এক সময়ে আমি বড় সুন্দর ছিলাম, আর ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছিলাম যে অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিব। ইহার মধ্যে একদিন আমি রাক্ষসের সাজ ধরিয়া স্থূলশিরা নামক এক

মুনিকে ভয় দেখাইতে গেলাম। তাহাতে মুনি আমাকে শাপ দিলেন, 'তুই ঐরূপ হইয়াই থাক্"। শাপ দূর করিয়া দিবার জন্য আমি অনেক মিনতি করিলে, তিনি বলিলেন, "রাম যখন তোর হাত কাটিয়া তোকে পোড়াইবেন, তখন আবার তোর সুন্দর চেহারা হইবে।"

'এইরূপ করিয়া আমি রাক্ষস হইলাম। তারপর আবার একদিন আমি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলাম। তাহাতে ইন্দ্র তাঁহার বজ্র দিয়া আমাকে এমন শাস্তি দিলেন যে, আমার মাথা আর পা একেবারে পেটের ভিতর ঢুকিয়া গেল। কিন্তু তবুও আমি মরিলাম না। তখন আমি এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলাম, 'হায় হায়! ব্রহ্মার বরে যে আমাকে অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে! এখন আমি খাইব কী করিয়া?" ইহাতে ইন্দ্র দয়া করিয়া আমাকে এই লম্বা হাতদুটা দিলেন। ইহা দিয়াই আমি এতদিন জীবজন্তু ধরিয়া খাইতেছি। রাম, তুমি আমাকে পোড়াইয়া ফেল। তাহা হইলে আমার আবার সুন্দর শরীর হইবে।'

তারপর রাম লক্ষ্মণ প্রকাণ্ড চিতা জ্বালিয়া কবন্ধকে তাহাতে পোড়াইলেন। সেই চিতার ভিতর হইতে সুন্দর চেহারা লইয়া কবন্ধ উঠিয়া আসিল। আর ঠিক সেই সময়ে একখানা হাঁসের টানা রথও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই রথে চড়িয়া কবন্ধ রামকে বলিল, 'সুগ্রীব নামে এক বানর আছে। তাহার বড় ভাই বালী তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়াতে সে এখন আর চারিটি বানর সঙ্গে করিয়া পম্পা নদীর ধারে ঋষ্যমূক পর্বতে ভয়ে ভয়ে বাস করে। সুগ্রীব যেমন বীর, তেমনি বুদ্ধিমান। তুমি তাহার সহিত বন্ধুতা কর। সে সীতার সন্ধানও করিতে পারিবে, তাঁহাকে পাইবার উপায়ও করিয়া দিবে।'

এ কথায় কবন্ধের নিকট বিদায় লইয়া রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে খুঁজিবার জন্য পম্পা নদী ও ঋষ্যমূক পর্বতের দিকে যাত্রা করিলেন।

পম্পার ধারে শবরী নামে একজন অতিশয় বুড়া তপস্বিনী বাস করিতেন। তিনি কেবল রামকে দেখিবার জন্যই এতদিন বাঁচিয়া ছিলেন। রামের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিলেন, 'রাম, তোমাকে যখন দেখিতে পাইয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আমি স্বর্গে যাইতে পারিব। তোমার জন্য এই ফলমূল আনিয়া রাখিয়াছি, তুমি দয়া করিয়া তাহা লও।'

এইরূপে রামকে আদর করিয়া, তাঁহার সম্মুখেই তিনি নিজের শরীর আগুনে পোড়াইয়া ফেলিলেন। তারপর সেই আগুনের ভিতর হইতে অতি সুন্দর বেশে বাহির হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

# কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

পম্পা নদী পার হইলে ঋষ্যমূক পর্বত। সেই ঋষ্যমূক পর্বতের নিকটে বানরদিগের রাজা সুগ্রীব আর কয়েকটি বানর সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সে দেখিল যে, দুইজন মানুষ সেই দিকে আসিতেছে।

এই দুইজন অবশ্য রাম ও লক্ষ্মণ ছাড়া আর কেহ নহেন। কিন্তু সুগ্রীবের মনে সর্বদাই বালীর ভয় লাগিয়া ছিল। বালী তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, আবার কখন হয়ত তাহার লোক আসিয়া তাহাকে মারিবে। এইজন্য রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়াই সে ভাবিল, বুঝি তাঁহারাও বালীরই লোক। তাই সে সঙ্গের বানরদিগকে ডাকিয়া বলিল, 'সর্বনাশ হইয়াছে, এই দুইজন নিশ্চয়ই বালীর লোক।' এই কথা শুনিয়া অন্যান্য বানরদিগের মনেও ভারি ভয় হইল।

কিন্তু উহাদিগের মধ্যে হনুমান বলিয়া একজন ছিল, সে বলিল 'কিসের ভয়? বালী তো ঋষ্যমূক পর্বতে আসিতেই পারে না, আর ঐ লোকদুইটির সঙ্গেও তাহাকে দেখিতেছি না।' তাহা শুনিয়া সুগ্রীব বলিল, 'ও দুইজনকে দেখিয়া আমার বড়ই ভয় হইতেছে। উহারা বালীর লোক হইতেও তো পারে। হনুমান, তুমি একবার গিয়া জানিয়া আইস না, উহারা কিরূপ লোক, আর কেন এখানে আসিয়াছে।'

হনুমান তখন দাড়ি গোঁফ পরিয়া একটি ভিখারী সাজিল। তারপর রাম লক্ষ্মণের কাছে গিয়া মিষ্ট কথায় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, 'মহাশয়, আপনারা কে? কী জন্যই বা এখানে আসিয়াছেন? আপনাদিগকে দেখিলে যেমন-তেমন লোক বলিয়া বোধহয় না! এমন সুন্দর চেহারা, হাতে চমৎকার অস্ত্র, আর শরীরে বোধ হইতেছে যেন কতই জোর! এই ঋষ্যমূক পর্বতে বানরের রাজা সুগ্রীব থাকেন। তাঁহার ভ্রাতা বালী তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়াতে তিনি মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সুগ্রীব খুব বীর, আর বড়ই ধার্মিক। তিনি আপনাদের সহিত বন্ধুতা করিতে চাহেন, এবং সেইজন্যই আপনাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহার মন্ত্রী, আমার নাম হনুমান। আমি পবনের পুত্র, জাতিতে বানর।'

হনুমানের কথা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'আমি সুগ্রীবকে খুঁজিতেছি, এমন সময় তাহার মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটিকে অতিশয় বিদ্বান, বুদ্ধিমান আর বীর বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহার কথাগুলি কি মিষ্ট আর কেমন শুদ্ধ! এতক্ষণ কথা

কহিল, তবুও একটা পাড়াগেঁয়ে কথা উহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। লক্ষ্মণ, তুমি ইহার সঙ্গে কথাবার্তা বল।'

তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, 'আমরাও সুগ্রীবকে খুঁজিতেছি। আমরা অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। ইঁহার নাম রাম, আমার নাম লক্ষ্মণ। আমি ইঁহার ছোট ভাই। সৎমার ছলনায় ইনি আমাকে লইয়া বনে আসিয়াছেন। ইঁহার স্ত্রী সীতাদেবীও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ দুষ্ট রাক্ষস তাঁহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে, তাহার কিছুই জানি না। শুনিয়াছি তোমাদের রাজা সুগ্রীব খুব বুদ্ধিমান। হয়ত তিনি সেই রাক্ষসকে জানেন। তাই রাম তাঁহার সহিত বন্ধুতা করিতে আসিয়াছেন।'

হনুমান বলিল, 'সুগ্রীব অবশ্যই ইঁহার সহিত বন্ধুতা করিবেন, আর বানরদিগকে লইয়া সীতাকে খুঁজিবার সাহায্য করিবেন। বালীর ভয়ে তিনি বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, সুতরাং আপনাদের আসাতে তাঁহারও উপকার হইতে পারে।'

তারপর হনুমান রাম লক্ষ্মণকে পিঠে করিয়া সুগ্রীবের নিকট লইয়া গেল। সুগ্রীব রামের পরিচয় পাইয়া বলিল, 'রাম, তুমি পৃথিবীর মধ্যে সকলের বড়, আর আমি বানর। তুমি আমার সহিত বন্ধুতা করিতে আসিয়াছ, আমার কী সৌভাগ্য!'

তখনই হনুমান দুইখানি কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালিল। সেই আগুনের সম্মুখে সুগ্রীব রামের সহিত কোলাকুলি করিয়া বলিল, 'তুমি আমার বন্ধু হইলে। এখন হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা, আমারও তাহাই ইচ্ছা হইবে। যাহাতে তোমার সুখ হয়, তাহাতে আমারও সুখ হইবে ; আর যাহাতে তোমার দুঃখ হয়, তাহাতে আমারও দুঃখ হইবে।' এইরূপে রাম আর সুগ্রীবের বন্ধুতা হইয়া গেল। তারপর তাঁহারা গাছের পাতার বিছানায় বসিয়া নিজ-নিজ সুখ-দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন।

রাম বলিলেন, 'বন্ধু, আমি বালীকে মারিয়া তোমার ভয় দূর করিব।' সুগ্রীব বলিল, 'বন্ধু, তুমি সাহায্য করিলে আমি যে আবার রাজ্য পাইব, তাহাতে সন্দেহ কী? তোমার কষ্টও দূর করিয়া দিব। সীতা যেখানেই থাকুন, আমরা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবই করিব। কেহই তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না। সেদিন এইখান দিয়া রাবণ একটি মেয়েকে লইয়া যাইতেছিল। বোধহয় তিনিই সীতা। তিনি তোমার নাম ধরিয়া কাঁদিতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া গায়ের চাদর আর গহনা ফেলিয়া গেলেন। আমরা তাহা পর্বতের গুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছি, দেখিলে হয়ত চিনিতে পারিবে।'

এই বলিয়া সুগ্রীব সীতার সেই সকল অলঙ্কার আর কাপড় আনিয়া রামকে দেখাইল। সীতার গায়ের চাদর, তাঁহার দুইখানি নূপুর, তাঁহার কেয়ূর আর কুণ্ডল—এ-সকল দেখিয়া রাম চিনিতে পারিলেন। তখন তাঁহার দুঃখ যেন আরও বাড়িয়া গেল। সুগ্রীব তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিল, 'বন্ধু, দুঃখ করিও না। আমরা নিশ্চয় সীতাকে আনিয়া দিব।' এইরূপে দুই বন্ধুতে দুজনার দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন।

তারপর সুগ্রীব আর বালীর ঝগড়ার কথা উঠিল। একটা অসুর ছিল, তাহার নাম মায়াবী। সে দুন্দুভি নামক দানবের বড় ছেলে। একবার বালীর সঙ্গে মায়াবীর যুদ্ধ হয়। তখন বালীর তাড়া খাইয়া সে একটা প্রকাণ্ড গর্তের ভিতরে গিয়া ঢোকে। বালীও সুগ্রীবকে

সেই গর্তের মুখে রাখিয়া সেই অসুরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভিতরে ঢুকিল।

সুগ্রীব এক বৎসর সেই গর্তের মুখের কাছে বসিয়া রহিল, কিন্তু বালী ফিরিল না। শেষে গর্তের ভিতর হইতে গরম রক্ত বাহির হইতে লাগিল, অসুরদিগের ভয়ানক গর্জন শোনা গেল। তাহাতে সুগ্রীব মনে করিল, বুঝি বালী মারা গিয়াছে। তখন সে অসুরের ভয়ে গর্তের মুখে এক প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিল। সেখানকার লোকেরা বালী মরিয়াছে জানিয়া সুগ্রীবকে রাজা করিল।

ইহার পর বালী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সুগ্রীব রাজা হইয়াছে। তখন সে বলিল, 'আমি সুগ্রীবকে গর্তের মুখে রাখিয়া অসুর মারিতে গিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে হতভাগা আমার রাজ্য লইবার ফন্দি করিয়া আমাকে পাথর চাপা দিয়া আসিয়াছে!' এই বলিয়া সে সুগ্রীবকে অনেক কষ্ট দিয়া তাড়াইয়া দিল। তাহার কোন কথাই শুনিল না।

তাহার পর হইতে সুগ্রীব বালীর ভয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে আসিয়া বাস করিতেছে। মতঙ্গ মুনির শাপে বালী ঋষ্যমূক পর্বতে আসিতে পারে না। কাজেই সেখানে থাকিলে সুগ্রীবের ভয় অনেকটা কম থাকে।

রাম বালীকে মারিবেন শুনিয়া সুগ্রীব খুব সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু এ কাজ তিনি করিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে তাহার মনে সন্দেহ ছিল। বালী যেমন তেমন বীর ছিল না। সকালে উঠিয়া সে চার সাগরের জল দিয়া আহ্নিক করিত। পর্বতের চূড়া লইয়া গোলা খেলিত।

দুন্দুভি নামে মহিষের চেহারাওয়ালা একটা অসুর ছিল। সে এমন প্রকাণ্ড ছিল, আর তাহার গায়ে এতই জোর ছিল যে, কেহই তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহস পাইত না। দুন্দুভি সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেল। সমুদ্র হাতজোড় করিয়া বলিল, 'আমি পারিব না, হিমালয়ের কাছে যাও!' হিমালয়ের কাছে গেলে হিমালয় বলিল, 'আমি কি যুদ্ধ জানি? আমি অমনি হার মানিতেছি।' তখন দুন্দুভি বলিল, 'তবে আমি কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব শীঘ্র বল, নহিলে তোমাকে গুঁতাইয়া গুঁড়া করিব।' হিমালয় বলিল, কিষ্কিন্ধ্যায় বানরের রাজা বালী থাকেন। তাঁহার কাছে যাও। তিনি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবেন।'

দুন্দুভি তখনই কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া বালীর দরজার সম্মুখে ভয়ানক গর্জন করিতে লাগিল। গর্জন শুনিয়া বালী সেখানে আসিলে দুন্দুভি বলিল, 'তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব।' তখন বালী দুই হাতে তাহার দুইটা শিং ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপর তাহার লেজ ধরিয়া তাহাকে মাটিতে খালি আছাড়ের পর আছাড়—ঠিক যেমন করিয়া ধোপা কাপড় কাচে। এইরূপে সেটা মরিয়া গেলে পর সেই লেজ ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাকে একেবারে চার ক্রোশ দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

সেই সময় দুন্দুভির রক্ত মতঙ্গ মুনির আশ্রমে গিয়া পড়ে। তাহাতে সেই মুনি বালীকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, সে সেখানে গেলেই মাথা ফাটিয়া যাইবে। মাথা ফাটিবার ভয়ে বালী আর সেখানে আসে না। দুন্দুভির হাড়গুলি তখনও ঋষ্যমূক পর্বতে পড়িয়া ছিল। সুগ্রীব রামকে তাহা দেখাইল। বালীর গায়ে কি যেমন-তেমন জোর ছিল! সাতটা বড় বড় শালগাছ একসঙ্গে ধরিয়া বালী তাহাতে এমনি নাড়া দিতে পারিত যে, সেই নাড়াতেই

তাহাদের সমস্ত পাতা ঝরিয়া পড়িত।

কাজেই বালীকে সুগ্রীব এত ভয় করিত। আর সেইজন্যই রাম তাহাকে মারিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইল। তাহার ভয় দেখিয়া লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, কী করিলে তোমার বিশ্বাস হইবে যে দাদা বালীকে মারিতে পারিবেন?' সুগ্রীব বলিল, 'ঐ যে সাতটা তালগাছ দেখিতেছ, বালী তাহার এক একটাকে একেবারে এপিঠ ওপিঠ করিয়া ফুঁড়িয়া ফেলিতে পারে। রাম যদি ঐ দুন্দুভির হাড় দুইশত ধনু দূরে ফেলিতে পারেন, আর বাণ মারিয়া একটা তালগাছ ফুটা করিতে পারেন, তবে বুঝিব তিনি বালীকে মারিতে পারিবেন।'

এই কথা শুনিয়া রাম হাসিতে হাসিতে পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া দুন্দুভির সেই পাহাড়ের মত হাড়গুলিকে ঠেলিয়া দিলেন, আর সেগুলি একেবারে চল্লিশ ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িল। কিন্তু তাহাতেও সুগ্রীবের সন্দেহ গেল না। সে বলিল, 'এখন কিনা হাড়গুলি শুকাইয়া হাল্কা হইয়া গিয়াছে, এখন তো এত দূরে ফেলিতে পারিবেই। বালী আস্ত মহিষটাকে ফেলিয়াছিলেন, সেটা তখন মাংস আর চর্বিতে ইহার চেয়ে কত ভারী ছিল! আচ্ছা, একটা তালগাছ ফুটা কর দেখি!'

তাহা শুনিয়া রাম একটা বাণ মারিলেন। সে বাণ একেবারে সেই সাতটা তালগাছকে ফুঁড়িয়া পাহাড়টাকে সুদ্ধ ফুঁড়িয়া পাতালে ঢুকিয়া গেল। পাতালে গিয়াও কিন্তু সে থামিল না, থামিল আসিয়া রামের তূণে। তখন সুগ্রীব তাড়াতাড়ি রামের পায়ের ধুলা লইতে পারিলে বাঁচে। সে বুঝিতে পারিল যে, ভাল করিয়া রামের এক বাণ খাইলে বালী নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে।

তবে আর কিসের ভয়! এখন কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া বালীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইতে পারিলেই কাজ হইবে। সুতরাং সকলে মিলিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আসিল।

সেখানে আসিয়া সুগ্রীব কোমরে কাপড় জড়াইয়া, আকাশ ফাটাইয়া চিৎকার করিতে লাগিল, 'কোথায় গেলে দাদা? আইস দেখি, একবার যুদ্ধ করি!' তাহা শুনিয়া রাগে বালীর রক্ত গরম হইয়া উঠিল। আর কি সে বসিয়া থাকিতে পারে! তখনই দাঁত কড়মড় করিতে করিতে ঝড়ের মতন আসিয়া উপস্থিত। তখন দুজনে কী ভয়ানক যুদ্ধ হইল, তাহা কী বলিব! কিল আর চড়ের চোটে দুজনের মুখ দিয়াই রক্ত উঠিতে লাগিল।

এদিকে রাম বড়ই ভাবনায় পড়িয়াছেন। বালী আর সুগ্রীব দেখিতে একই রকম। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের সময় বালীকে বাণ মারিবেন। কিন্তু এখন কোন্‌টা যে বালী, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিতেছেন না। বাণ মারিলে তাহাতে বালী না মরিয়া যদি সুগ্রীব মরিয়া যায়, তবে তো সর্বনাশ!

কাজেই তখন আর বাণ মারা হইল না। সে-যাত্রা সুগ্রীবকে কেবল্ অনেকগুলি কিল চড় খাইয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঋষ্যমূক পর্বতে পলাইয়া আসিতে হইল। সেখানে আসিয়া সে রামকে বলিল, 'বন্ধু, এই বুঝি তোমার কাজ! তোমার কথায় আমি বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া এতগুলি মার খাইলাম, আর তুমি চুপ করিয়া তামাশা দেখিলে!'

তখন রাম তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, 'বন্ধু, রাগ করিও না। আমি যে কেন বাণ মারি

নাই, তাহা শোন। তুমি আর বালী দেখিতে ঠিক একই রকম। কাজেই তোমাদের কোন্‌টি কে, আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। বালীকে মারিতে গিয়া যদি তোমাকে মারিয়া ফেলিতাম, তাহা হইলে লোকে আমাকে কী বলিত? তুমি আবার যুদ্ধ করিতে যাও, আর এমন একটা কোন চিহ্ন লইয়া যাও, যাহাতে আমি তোমাকে চিনিতে পারি। তাহা হইলে দেখিবে, এক বাণেই আমি বালীকে মারিয়া ফেলিব।'

এই কথা বলিয়া তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'লক্ষ্মণ, তুমি ফুল-শুদ্ধ ঐ নাগপুষ্পী লতাটি আনিয়া সুগ্রীবের গলায় বাঁধিয়া দাও।' লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন।

এবারে সুগ্রীবের মনে খুবই সাহস। সুতরাং সে আগের চেয়ে অনেক বেশি করিয়া চ্যাঁচাইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া বালীও বাহির হইয়া আসিতে আর বিলম্ব করিল না। রাগ দু-জনেরই সমান। দু-জনেই বলে, 'ঘুষি মারিয়া তোর মাথা গুঁড়া করিয়া দিব!' আর যুদ্ধও যেমন-তেমন হইল না! কিল, চড়, লাথি, গুঁতা, আঁচড়, কামড়, কোনটারই ত্রুটি নাই। তারপর আবার গাছ পাথর লইয়াও যুদ্ধ হইল। কিন্তু বালীর গায় জোর বেশি থাকাতে, শেষে সুগ্রীব কাবু হইয়া পড়িতে লাগিল।

এমন সময় রামের বাণ ভয়ানক শব্দে বালীর বুকে আসিয়া বিঁধিল। বাণের ঘায় বালীকে মাটিতে পড়িতে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণ তাহার নিকট ছুটিয়া আসিলেন। তখন বালী রামকে অনেক গালি দিল।

রাম বলিলেন, 'তুমি দুষ্ট লোক, তোমাকে মারাতে আমার কোন অন্যায় হয় নাই। আমার বন্ধুর নিকট আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে তোমাকে মারিব, কাজেই তোমাকে মারিয়াছি।'

বালীকে মারিয়া বন্ধুর উপকার করিয়াছেন, কাজেই ইহাতে রামের মনে কষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু শেষে যখন বালীর স্ত্রী তারা আর তাহার পুত্র অঙ্গদ সেখানে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন সুগ্রীবও চক্ষের জল রাখিতে পারিল না।

মরিবার সময় বালীর ভাল বুদ্ধি হইয়াছিল। তখন সে সুগ্রীবকে ডাকিয়া বলিল, 'ভাই, বুদ্ধির দোষে অন্যায় করিয়াছি, ক্ষমা কর। আমার অঙ্গদকে তোমার নিকট রাখিয়া গেলাম। তাহাকে তুমি তোমার পুত্রের মত দেখিও।' এই বলিয়া সে নিজের গলার সোনার হার সুগ্রীবের গলায় পরাইয়া দিল। সেই সোনার হার বালীকে ইন্দ্র দিয়াছিলেন। তাহার গুণ অতি আশ্চর্য।

বালীর মৃত্যুর পর রাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা আর অঙ্গদকে যুবরাজ করিলেন। তারপর সীতাকে খুঁজিবার আয়োজন হইতে লাগিল। সুগ্রীব হনুমানকে ডাকিয়া বলিল, 'হনুমান, শীঘ্র বানরদিগকে সংবাদ দাও। যে সকল বানর খুব শীঘ্র চলিতে পারে, তাহারা দশ দিনের ভিতরে পৃথিবীর সকল বানরকে ডাকিয়া উপস্থিত করুক। মহেন্দ্র পর্বতে, হিমালয়ে, বিন্ধ্যাচলে, কৈলাসে আর মন্দার পর্বতে যে সকল বানর আছে; সমুদ্রের পারে, উদয় পর্বতে আর অস্ত পর্বতে, অঞ্জন পর্বতে আর পদ্মাচলে কালো কালো হাতির মতন যে সকল বানর আছে; পর্বতের গুহার ভিতরে, সুমেরুর পাশে যে সকল বানর আছে; আর মহারুণ পর্বতে যে সকল ভয়ঙ্কর বানর আছে, আমাদের দূতেরা তাহাদের সকলকেই

এখানে ডাকিয়া আনুক।'

তখনই চারিদিকে দূতসকল ছুটিয়া চলিল, আর দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর সকল বানর আসিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইতে লাগিল।

অঞ্জন পর্বত হইতে আসিল তিন কোটি বানর ; কৈলাস হইতে আসিল এক হাজার কোটি ; অস্তাচল হইতে দশ কোটি ; হিমালয়ের বানর ফল খায়, কিন্তু সিংহের মত জোরালো—সেই বানর এক হাজার খর্ব, গর্জন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিন্ধ্য পর্বতের কালো বানর এক হাজার কোটি আসিল; ক্ষীরোদ সমুদ্রের পারে যে সকল বানর নারিকেল খাইয়া থাকে, তাহারাও আসিল।

পৃথিবীর বানর আর আসিতে কেহ বাকি নাই। তাহা ছাড়া কিষ্কিন্ধ্যায় কত কোটি বানর আছে, তাহার হিসাব কে করিবে? বানরের পায়ের ধূলায় আকাশ অন্ধকার, সূর্য দেখা যায় না। কিষ্কিন্ধ্যাতে আর স্থান নাই। কত বানর আসিয়াছে, আর কত আসিতেছে। তাহাদের কেহ লাফায়, কেহ গর্জন করে, কেহ কেহ কুস্তি আরম্ভ করিয়াছে।

তারপর সুগ্রীব সীতাকে খুঁজিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইল। পূর্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে, উত্তরে কোনখানেই লোক পাঠাইতে বাকি রহিল না। সুগ্রীব তাহাদিগকে বলিল, 'এক মাসের মধ্যে তোমাদের ফিরিয়া আসা চাই ; না আসিলে প্রাণদণ্ড হইবে।'

এই-সকল বানরের মধ্যে হনুমানও ছিল। সুগ্রীব তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'হনুমান, তুমি জলে, শূন্যে স্বর্গে সকল স্থানেই যাইতে পার, আর সকল স্থানের খবরই জান। তোমার মতন বীর কে আছে? যাহাতে খুব ভাল করিয়া সীতার খোঁজ হয়, তুমি সেইরূপ করিবে।' হনুমানকে দেখিয়া রামও বুঝিয়াছিলেন যে, সে নিশ্চয়ই সীতার সংবাদ আনিতে পারিবে। তাই তিনি তাহার হাতে তাঁহার নিজের নাম লেখা একটি আংটি দিয়া বলিলেন, 'এই আংটি দেখিলেই সীতা তোমাকে আমার লোক বলিয়া জানিতে পারিবেন।' হনুমান জোড় হাতে আংটিটি লইয়া রামকে প্রণাম করিল।

তারপর বানরেরা সীতার খোঁজ করিবার জন্য গর্জন করিতে করিতে চারিদিকে ছুটিয়া চলিল। তাহাদের কেহ বলে, 'আমি রাবণকে মারিয়া সীতাকে আনিব।' কেহ বলে, 'আরে না! তোমরা থাক, আমিই সব করিব।' কেহ বলে, 'আমি পাহাড় গুঁড়া করিব।' কেহ বলে, আমি এক যোজন লাফাইব।' কেহ বলে, 'আমি দশ যোজন লাফাইব।' কেহ বলে, 'আমি দশ হাজার যোজন লাফাইব।'

এইরূপ করিয়া বানরেরা সীতাকে খুঁজিতে বাহির হইল। ক্ষুধা হইলে তাহারা ফল খায়; রাত্রিতে গাছেই ঘুমায়। এক মাস পর্যন্ত এমনি করিয়া খুঁজিয়া, তাহারা পৃথিবীর কোন স্থান দেখিতে বাকি রাখিল না। কত দেশে, কত বনে, কত পাহাড়ে যে তাহারা গিয়াছিল, তাহার শেষ নাই।

সমুদ্রে যে-সকল দ্বীপ আর পাহাড় আছে, সেখানে ভয়ঙ্কর কালো কালো জন্তু থাকে। তাহাদের কান পর্দার মত হইয়া ঠোঁট অবধি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের একটা বৈ পা নাই, কিন্তু তবুও তাহারা বাতাসের মত ছোটে—সেইখানে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

যেখানে পিঙ্গলবর্ণ কিরাতেরা থাকে—তাহারা কাঁচা মাছ খায়—সেইখানে তাহারা

সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

বাঘমুখো মানুষের দেশে, জব দ্বীপে, স্বর্ণ দ্বীপে, রৌপ্য দ্বীপে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

ভয়ঙ্কর ইক্ষু সমুদ্রের ধারে বিকটাকার রাক্ষসেরা থাকে, তাহারা জন্তুর ছায়া ধরিয়া টানিয়া টানিয়া তাহাকে খায়। সেইখানে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

তারপর লাল সমুদ্র। সেখানে রাক্ষসেরা পাহাড়ের চূড়া ধরিয়া বাদুড়ের মত ঝুলিতে থাকে। সূর্যের তেজে তাহাদের মাথা গরম হইয়া গেলে তাহারা সমুদ্রের জলে পড়িয়া যায়। সেখান হইতে ঠাণ্ডা হইয়া আবার পাহাড়ে উঠিয়া ঝুলিতে থাকে। সেই লাল সমুদ্রে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

তারপর ক্ষীরোদ সমুদ্র। তারপর জলোদ সমুদ্র। সেখানে অতি বিশাল একটা ঘোড়ার মুখ হইতে ক্রমাগত আগুন বাহির হইতেছে, আর তাহা দেখিয়া সমুদ্রের জন্তুসকল ভয়ে চিৎকার করিতেছে। সেই জলোদ সমুদ্রে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

যেখানে সূর্য উদয় হয়, সেই সোনার পর্বতে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল। তাহার পরে কেবলই অন্ধকার ; সেখানে কেহই যাইতে পারে না।

বৃষভ পর্বত দেখিতে ষাঁড়ের মতন, তাহাতে গন্ধর্বেরা থাকে। সেখানে নানারকম চন্দন গাছ আছে, কিন্তু তাহার কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে বড়ই বিপদ হয়। সেখানেও তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

চন্দনগিরি নামক পর্বতে একরকম পক্ষী থাকে, তাহার নাম সিংহ পক্ষী। তাহারা হাতি আর তিমিমাছ ধরিয়া খায়। সেই পক্ষীর বাসায় তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

সুমেরু পর্বত পার হইলে অস্তাচল ; সেখানে সূর্য অস্ত যান। ততদূর পর্যন্ত তাহারা সীতাকে খুঁজিতে গিয়াছিল। তাহার পর কেবল অন্ধকার ; সেখানে কেহই যাইতে পারে না।

উত্তরকুরু দেশের নদীতে সোনার পদ্ম ফোটে, আর তাহার তীরে মুক্তা ছড়ানো থাকে। সেই দেশে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

তাহার পরে উত্তর সমুদ্র। তাহার মাঝখানে সোমগিরি নামক সোনার পর্বত আছে। সূর্য না উঠিলেও, সোমগিরির আলোকেই পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সোমগিরি বড় ভয়ানক পর্বত ; সেখানে বানরেরা যাইতে পারে নাই।

এইরূপ করিয়া তাহারা সীতাকে খুঁজিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইল না। এক মাস পরে আর সকলেই কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিল ; কেবল হনুমান আর তাহার সঙ্গে যাহারা গিয়াছিল, তাহারা এখনও ফিরে নাই।

হনুমান, অঙ্গদ, তার, আর জাম্ববান অনেক বানর লইয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল। তাহারা অনেক খুঁজিয়াও সীতাকে দেখিতে পাইল না। প্রথমে ভয়ানক একটা বনের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা কাহিল। তারপর সেখান হইতে যে জায়গায় আসিল, তাহা আরও ভয়ঙ্কর। সে পোড়া দেশে গাছপালা নাই, জীবজন্তু জন্মাইতে পায় না, নদীসকল শুকাইয়া গিয়াছে, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পাইবার জো নাই। কবে কণ্ডু বলিয়া এক মুনি ছিলেন,

এই হতভাগ্য দেশে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হয়। সেই পুত্রের শোকে কণ্ব মুনি দেশটাকে শাপ দিয়া তাহার এই দশা করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, সেখানেও তাহারা সীতার কোন সন্ধান পাইল না।

সেখান হইতে তাহারা আর একটা বনে গিয়া ঢুকিবামাত্রই একটা বিকটাকার অসুর তাহাদিগকে তাড়িয়া মারিতে আসিল। অঙ্গদ মনে করিল, বুঝি এটাই রাবণ। এই মনে করিয়া সে তাহাকে এমন এক চড় মারিল যে, সে চড় খাইয়া আর তাহার উঠিয়া যাইতে হইল না। এক চড়েই অসুরের বাছা মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিয়া অস্থির।

কিন্তু এত খুঁজিয়াও সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না। এদিকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাহাদের প্রাণ যায়, আর চলিবার শক্তি নাই। এমন সময়ে তাহারা একটা প্রকাণ্ড গর্তের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গর্তের নাম ঋক্ষ বিল। তাহার ভিতর হইতে হাঁস, সারস প্রভৃতি পক্ষী উড়িয়া বাহির হইতেছিল। সে-সকল পক্ষীর শরীরে জল দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে, নিশ্চয়ই এই গর্তের ভিতরে জল আছে।

এই মনে করিয়া তাহারা সেই গর্তের ভিতর ঢুকিল। গর্তের মুখের কাছে খানিক দূর পর্যন্ত ভয়ানক অন্ধকার, কিন্তু সেই অন্ধকারের পরেই একটি অতি সুন্দর এবং আশ্চর্য স্থান। সেখানকার সকলই সোনার। গাছপালাও সোনার, জলের মাছও সোনার, পদ্মফুলও সোনার। কেবল পদ্মের কাছে যে মৌমাছি উড়িতেছে, তাহা মানিকের।

সেই স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা একটি তপস্বিনী দেখিতে পাইল। তাঁহার শরীরে এত তেজ যে, দেখিলে মনে হয় যেন আগুন জ্বলিতেছে। তাহারা তপস্বিনীকে প্রণাম করিয়া জোড়হাতে বলিল, 'মা, আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এখানে আসিয়াছি। এ আশ্চর্য দেশ কাহার, আর এ সকল জিনিস কী করিয়া সোনার হইল, তাহা জানিতে আমাদের বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।'

তপস্বিনী বলিলেন, 'বাছা, এ স্থান ময় নামক দানবের তৈয়ারি। তোমরা এখানে কেন আসিয়াছ? ইহা যে অতি ভয়ঙ্কর স্থান!' এই বলিয়া তিনি নানারকম মিষ্ট ফল আর ঠাণ্ডা জল আনিয়া বানরদিগকে খাইতে দিলেন। বানরেরা তাহা খাইয়া তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিল।

এদিকে আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত। সেই গর্তের ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের এক মাস চলিয়া গেল, তবুও তাহারা বাহিরে আসিবার পথ পায় না। তাহা দেখিয়া সেই তপস্বিনী তাহাদিগকে বলিলেন, 'বাছাসকল, এ গর্তের ভিতর একবার আসিলে কেহই জীবন্ত বাহিরে যাইতে পারে না। যাহা হউক, তোমাদের কোনও ভয় নাই। তোমরা খানিক চোখ বুজিয়া থাক, আমি তোমাদিগকে বাহিরে লইয়া যাইতেছি।' এই কথা শুনিয়া বানরেরা সেখানে চোখ বুজিয়া রহিল, তারপর চাহিয়া দেখিল যে, তাহারা বাহিরে বিন্ধ্য পর্বতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নিকটে সমুদ্র, তাহার গর্জন শোনা যাইতেছে।

গর্তের বাহিরে আসিয়া কিন্তু তাহাদের একটুও আনন্দ হইল না ; বরং নানা চিন্তায় তাহাদের মন অস্থির হইয়া উঠিল। তাহাদের তখন বার-বার এই কথা মনে হইতে লাগিল, 'এখন দেশে গিয়া কী বলিব? এক মাস তো চলিয়া গেল। কিন্তু হায়, সীতার কোন সংবাদই

পাওয়া গেল না! এখন কোন্ মুখে দেশে ফিরিব? সুগ্রীব আগেই বলিয়াছেন যে এক মাসের ভিতর না ফিরিলে তিনি মারিয়া ফেলিবেন। কাজেই আর কিসের ভরসায় বা দেশে ফিরিব? তাহার চেয়ে এইখানে না খাইয়া মরা অনেক ভাল।'

সুতরাং তাহারা স্থির করিল যে, তাহারা আর দেশে না গিয়া সেইখানেই না খাইয়া মরিবে। এইরূপে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তাহারা খাওয়া দাওয়া ছাড়িয়া দিয়া দক্ষিণ মুখে সমুদ্রের ধারে বসিয়া রহিল। তখন তাহাদের কান্না ছাড়া আর কোন কাজ রহিল না। তাই তাহারা রামের কথা, সীতার কথা, জটায়ু পাখির কথা আর নিজেদের দুঃখের কথা বলিয়া কেবলই কাঁদিতে লাগিল।

সেই বিন্ধ্য পর্বতের উপরে জটায়ুর দাদা সম্পাতি পাখি থাকিত। সে বানরদিগকে দেখিয়া বলিল, 'অনেক দিন পরে আমার জন্য এতগুলি খাবার জিনিস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমার বড়ই ভাগ্য! এই-সকল বানরের এক-একটা মরিবে আর আমি খাইব।

এই কথা শুনিয়া অঙ্গদ হনুমানকে বলিল, 'ঐ দেখ যম নিজেই পাখি সাজিয়া আমাদিগকে লইতে আসিয়াছে। আমাদের প্রাণ গেল, তবুও রামের কাজ হইল না! জটায়ু যুদ্ধ করিয়া সীতার জন্য প্রাণ দিয়াছিল, জটায়ুই সুখী!'

জটায়ুর নাম শুনিয়া সম্পাতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'হায়! কে তোমরা আমার প্রাণের ভাই জটায়ুর মৃত্যুর কথা বলিতেছ? জটায়ু কেমন করিয়া মরিল? আমার পাখা পুড়িয়া গিয়াছে, আমি উড়িতে পারি না। তোমরা আমাকে ধরিয়া নামাও।'

সম্পাতির কথায় প্রথমে বানরদের বড় ভয় হইল, পাছে পাখিটাকে পাহাড় হইতে নামাইলে সে তাহাদিগকে ঠোকরাইয়া খাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু শেষে তাহারা ভাবিল, 'আমরা যখন মরিতে বসিয়াছি, তখন ঐ পাখিটা আমাদিগকে খাইলে আমরা যাহা চাই তাহাই তো হইবে, আর বেশি কী!' তখন অঙ্গদ সম্পাতিকে পাহাড় হইতে নামাইয়া আনিল। তারপর নিজেদের পরিচয় দিয়া রামের বনবাসের কথা, সীতাকে লইয়া যাইবার কথা, জটায়ুর মৃত্যুর কথা, সুগ্রীবের আর রামের বন্ধুতার কথা, বালীর মৃত্যুর কথা, সীতাকে খুঁজিবার কথা, এক-এক করিয়া সকলই তাহাকে বলিল।

অঙ্গদের কথা শুনিয়া সম্পাতি বলিল, 'তোমরা যে জটায়ুর কথা বলিতেছ, সে আমার ভাই। তাহাকে যে মারিয়াছে, তাহার শাস্তি দিই এমন শক্তি আমার আর এখন নাই। ছেলেবেলায় আমরা দুই ভাই মিলিয়া ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় সূর্যের নিকট দিয়া আসিতে গিয়া তাহার তেজে জটায়ু অজ্ঞান হইয়া গেল। তাহাকে ঢাকিতে গিয়া আমিও পাখা পুড়িয়া এখানে পড়িলাম। সেই অবধি আমি এখানে পড়িয়া আছি, জটায়ুর কী হইয়াছে আমি জানি না।'

ইহা শুনিয়া অঙ্গদ বলিল, 'রাবণ কোথায় থাকে তুমি জান কি?' সম্পাতি বলিল, 'একদিন রাবণকে আমি একটি মেয়েকে লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। সেই মেয়েটি 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া কাঁদিতেছিলেন। বোধহয় তিনিই সীতা। সামনের এই সমুদ্র একশত যোজন চওড়া। তারপর লঙ্কাদ্বীপ, সেই লঙ্কায় রাবণের বাড়ি। তোমরা এই সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় যাও। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, তোমরা সেখান হইতে ভালোয় ভালোয়

ফিরিয়া আসিতে পারিবে। রাবণ সীতাকে লইয়া যাইবার সময় আমার পুত্র সুপার্শ্ব তাহার পথ আটকাইয়াছিল, কিন্তু রাবণ মিনতি করাতে ছাড়িয়া দিল। আমার পাখা নাই, আমি আর কী করিতে পারি? আমি কেবল মুখের কথা বলিয়াই রামের উপকার করিব। তোমরা আর বিলম্ব করিও না। যাহা করিলে রামের কাজ হইতে পারে তাহা কর।'

এই কথা বলিয়া সম্পাতি আবার বলিল, 'সীতাকে যে রাবণ লইয়া যাইবে, এ কথা নিশাকর নামে এক মুনি আমাকে অনেকদিন আগেই বলিয়াছিলেন। আট হাজার বৎসর আগে এখানে নিশাকর মুনির আশ্রম ছিল। ছেলেবেলায় আমি আর জটায়ু তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতাম। তিনি আমাদিগকে বড়ই স্নেহ করিতেন। আমার যখন পাখা পুড়িয়া গেল, তখন তিনি বলিলেন, 'তুমি দুঃখ করিও না ; তোমার আবার পাখা হইবে। তুমি এখান হইতে কোথাও যাইও না। আমি তপস্যা করিয়া জানিয়াছি যে, রাজা দশরথের পুত্র রামের স্ত্রী সীতাকে রাবণ চুরি করিয়া লইয়া যাইবে। সেই সীতাকে খুঁজিবার জন্য রামের দূতেরা এখানে আসিলে, তুমি তাহাদিগকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিও। তাহা হইলেই তোমার আবার পাখা হইবে।' সেই অবধি আমি তোমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিয়া এইখানে বসিয়া আছি। আমার অনেক দুঃখ, কিন্তু রামের এই কাজটি করিবার জন্য আমি সকল দুঃখ ভুলিয়া আছি। সুপার্শ্ব সীতার সাহায্য করে নাই বলিয়া আমি তাহাকে বকিয়াছিলাম।'

কী আশ্চর্য! এই কথা বলিতে বলিতে সম্পাতির সুন্দর লাল রঙের পাখা হইল। তখন সে বানরদিগকে ডাকিয়া বলিল, 'দেখ দেখ! মুনির বরে আমার আবার পাখা হইয়াছে, আর গায়ে যেন সেই আমার প্রথম বয়সের মতন জোর বোধ হইতেছে! তোমরা চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই সীতার সন্ধান পাইবে।' এই বলিয়া সম্পাতি আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়া চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া বানরদিগের মনে যে আনন্দ ও আশা হইল, তাহা আর কী বলিব! তখন তাহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, সীতার খবর পাওয়া যাইবে।

কিন্তু কী করিয়া সীতার খবর পাওয়া যাইবে? একশত যোজন সমুদ্র ডিঙাইতে পারিলে তবে তো লঙ্কা! আর সেই লঙ্কায় গেলে তবে তো সীতার সন্ধান হয়। বানরেরা সমুদ্রের ধারে আসিয়া অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। এত বড় সমুদ্র পার হইয়া সীতার সংবাদ আনা বড়ই কঠিন দেখা যাইতেছে। এ কাজ কে করিবে?

তখন অঙ্গদ বলিল, 'তোমরা তো সকলেই খুব বীর। বল দেখি ভাই, কে কত দূর লাফাইতে পার?'

অঙ্গদের কথা শুনিয়া তারা বলিল, 'আমি দশ যোজন লাফাইতে পারি।' গবাক্ষ বলিল, 'আমি কুড়ি যোজন পারি।' শরভ বলিল, 'আমি ত্রিশ যোজন পারি।' ঋষভ বলিল, 'আমি চল্লিশ যোজন পারি।' গন্ধমাদন বলিল, 'আমি পঞ্চাশ যোজন পারি।' মৈন্দ বলিল, 'আমি ষাট যোজন পারি।' দ্বিবিদ বলিল, 'সত্তর যোজন পারি।' সুষেণ বলিল, 'আশি যোজন পারি।' জাম্ববান বলিল, 'নব্বই যোজন পারি।' সকলের কথা শুনিয়া অঙ্গদ বলিল, 'আমি একশত যোজন সমুদ্র ডিঙাইতে পারি। কিন্তু ফিরিয়া আসিতে পারিব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে।'

তখন জাম্ববান বলিল, 'রাজপুত্র, তুমি ইচ্ছা করিলে এক হাজার যোজন পার হইতে পার, কিন্তু তাহা করিতে যাইবে কেন? তুমি হুকুম দিবে, আমরা কাজ করিব। যে এ কাজের যোগ্য লোক, আমি তাহাকে ঠিক করিয়া দিতেছি।'

এই বলিয়া সে হনুমানকে বলিল, 'বাপু হনুমান, তুমি যে এত বড় বীর হইয়া এমন চুপ করিয়া এক পাশে বসিয়া আছ, তাহার কারণ কী? তুমি তো যেমন-তেমন লোক নহ।'

বাস্তবিকই হনুমান যেমন-তেমন লোক ছিল না। যখন হনুমানের জন্ম হয়, তখন সূর্য উঠিতেছিল। লাল সূর্য দেখিয়া সে মনে করিল, বুঝি তাহা কোনরূপ ফল। তাই সে লাফাইয়া তাহা ধরিতে গেল। সূর্যের তেজে তাহার কিছুই হয় নাই, কিন্তু ইন্দ্র তাহাকে দেখিয়া বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। বজ্র খাইয়াও সে মরিল না, কেবল পর্বতের উপরে পড়িয়া তাহার বাঁ পাশের হনু অর্থাৎ দাড়ি ভাঙিয়া গেল। সেইজন্য তাহার নাম হইল হনুমান।

হনুমান পবন দেবতার পুত্র। ইন্দ্র হনুমানকে বজ্র মারাতে পবন রাগ করিয়া সমস্ত বাতাস বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহাতে সংসারে লোক নিঃশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। তখন দেবতারা দেখিলেন, বড় বিপদ! কাজেই তাঁহারা পবনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য হনুমানকে বর দিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, 'কোনও অস্ত্রে হনুমানের মৃত্যু হইবে না।' ইন্দ্র বলিলেন, 'তাহার নিজের ইচ্ছা ভিন্ন কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইবে না।'

বড় হইয়া হনুমান অসাধারণ বীর হইয়াছে। সে যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাইতে পারে, কিছুতেই তাহাকে আটকায় না। সেই হনুমানকে ডাকিয়া এখন জাম্ববান বলিল, 'বাছা, তুমি এ কাজটি করিলে আমাদের প্রাণ বাঁচে।'

তখন হনুমান বলিল, 'ঐ যে মহেন্দ্র পর্বত দেখা যাইতেছে, উহা খুব উঁচু আর মজবুত। ঐ স্থান হইতে লাফাইবার সুবিধা হইবে।' এই কথা বলিয়া সে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়া উঠিল।

মহেন্দ্র পর্বত দেখিতে খুব সুন্দর, আর বড়ও কম নহে। তাহাতে বড় বড় বন আছে, ঝর-ঝর শব্দে কত ঝরনা বহিতেছে, পাখিরা গাছে বসিয়া মনের সুখে গান গাহিতেছে। আর বাঘ, সিংহ, হাতি প্রভৃতি জানোয়ারেরা দলে দলে বনের ভিতর চরিয়া বেড়াইতেছে। হনুমানের সঙ্গে সঙ্গে বানরের দল পর্বতে উঠিয়া ইহাদের সুখ ভাঙিয়া দিল। তখন তাহারা কে কোথায় পলাইবে, তাহা ভাবিয়াই ব্যস্ত। পাখিরা উড়িতে লাগিল, সাপগুলি গর্তের ভিতর গিয়া লুকাইল, অনেকে পর্বত ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

# সুন্দরকাণ্ড

মহেন্দ্র পর্বতে উঠিয়া হনুমান একটি ছোট মাঠের উপর দাঁড়াইল। তারপর জোড়হাতে দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া সে লাফ দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে সময়ে তাহার শরীর এত বড় হইয়াছিল যে, তাহার ভার মহেন্দ্র পর্বতের সহ্য হইল না। সেই পর্বতের ভিতর হইতে তখন এমনি করিয়া জল বাহির হইয়াছিল যে, ভিজা গামছাকে নিংড়াইলে তাহার চেয়ে বেশি করিয়া জল বাহির হয় না। সেখানকার জীবজন্তুরা মনে করিল, বুঝি পৃথিবীর শেষ উপস্থিত। মুনিরা পর্বত ছাড়িয়া দূরে গিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন।

তারপর হনুমান দুই হাতে মাটিতে ভর দিয়া, লেজ মোটা করিয়া, শরীর কোঁচকাইয়া, পা গুটাইয়া এমনই ভয়ানক লাফ দিল যে, তাহার কথা মনে করিলেও যার-পর-নাই আশ্চর্য বোধহয়। সেই লাফের চোটে পর্বতের গাছপালা অবধি তাহার পিছু-পিছু ছুটিয়া চলিল। সমুদ্রের জল গিয়া আকাশে উঠিল। তখন হনুমানকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন একটা পর্বত আকাশের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিতেছে! সেজন্য দেবতারা তাহার কতই প্রশংসা করিলেন।

এদিকে সমুদ্র মৈনাক পর্বতকে ডাকিয়া বলিল, 'মৈনাক, তুমি শীঘ্র জলের ভিতর হইতে মাথা জাগাইয়া দাও। হনুমানের বোধহয় পরিশ্রম হইয়াছে। সে তোমার চূড়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিবে।' মৈনাক পর্বত সমুদ্রের জলের নীচে থাকে। সমুদ্রের কথায় সে তখনই জল হইতে উঠিয়া হনুমানের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু হনুমানের বিশ্রামের কিছুমাত্র দরকার নাই, তাহার উপরে আবার তাহার বড় তাড়াতাড়ি। কাজেই সে মৈনাককে বুকের ধাক্কায় সরাইয়া দিল।

তখন মৈনাক বলল, 'হনুমান, তুমি একটু আমার চূড়ায় দাঁড়াইয়া বিশ্রাম কর। আমার চূড়ায় মিষ্ট ফল আছে, তুমি তাহা আহার কর। সত্য যুগে যখন সকল পর্বতেরই পাখা ছিল, তখন তাহারা যেখানে ইচ্ছা চলিয়া বেড়াইত ; আর তাহাদের চাপে অনেক জীবজন্তু মারা যাইত। এইজন্য ইন্দ্র বজ্র দিয়া সকল পর্বতের পাখা কাটিয়া দেন। কিন্তু তোমার পিতা পবনদেব দয়া করিয়া আমাকে সমুদ্রের জলে উড়াইয়া ফেলাতে, ইন্দ্র আমার পাখা কাটিতে পারেন নাই। হনুমান, তোমার পিতা আমার এই উপকার করিয়াছিলেন। তুমি কি আমার চূড়ায় একটু বিশ্রাম করিয়া আমাকে সুখী করিবে না?'

হনুমান বলিল, 'মৈনাক, তোমার কথা শুনিয়াই আমার মনে যার-পর-নাই সুখ হইয়াছে। কিন্তু ভাই, আমি ব্যস্ত আছি, এখন বসিতে পারিব না। আমাকে মাপ কর।'

এই বলিয়া মৈনাককে ছুঁইয়া হনুমান আবার ছুটিয়া চলিল।

দেবতারা দেখিলেন যে, হনুমান বড়ই ভয়ানক কাজ করিতে চলিয়াছে। এ কাজ সে করিয়া আসিতে পারিবে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তাঁহাদের বড়ই ইচ্ছা হইল। তাই তাঁহারা নাগদিগের মাতা সুরসাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'সুরসা ঠাকরুন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটিবার হনুর পথটা আগলাইয়া দাঁড়ান তো! দেখি সে কেমন বীর!'

দেবতাদের কথায় সুরসা ভয়ঙ্কর রাক্ষসীর বেশে হাঁ করিয়া হনুমানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হনুমান তাহা দেখিয়া নিজের শরীরটাকে দশ যোজন বড় করিয়া ফেলিল। সে মনে করিয়াছিল যে, এত বড় হইলে আর রাক্ষসী তাহাকে গিলিতে পারিবে না। কিন্তু রাক্ষসী তখনই তাহার দশ যোজনের জায়গায় বিশ যোজন হাঁ করিয়া বসিল।

কী বিপদ! হনুমান যতই বড় হয়, রাক্ষসী অমনি তাহার চেয়েও বড় হাঁ করে! দশ যোজন, বিশ যোজন, ত্রিশ যোজন, চল্লিশ যোজন, পঞ্চাশ যোজন, ষাট যোজন, আশি যোজন—হনুমান যতই বড় হইতেছে, রাক্ষসী তাহার চেয়েও বড় হাঁ করিতেছে! হনুমান যখন নব্বুই যোজন হইল, রাক্ষসীর হাঁ তখন একশত যোজন। কাজেই শেষে হনুমান মনে করিল, 'আর বড় হইয়া কী হইবে? অন্য উপায় দেখা যাউক।'

তখন সে হঠাৎ বুড়া আঙুলটির মতন ছোট হইয়া রাক্ষসীর পেটের ভিতর ঢুকিয়া, আবার তখনই বাহির হইয়া আসিল। হনুমান খুবই তাড়াতাড়ি ছোট হইল, রাক্ষসীর মস্ত হাঁ-টাকে গুটাইয়া লইতে বোধহয় তাহার চেয়ে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। কাজেই হনুমানকে গিলা আর তাহার হয় নাই। তারপর হয়ত আবার বুড়া আঙুলের মতন ছোট হনুমানটি কোন্ খান দিয়া ফসকিয়া গিয়াছে, রাক্ষসী তাহা টের পায় নাই। যেমন করিয়াই হউক, নাগের মা ঠাকরুনকে হনুমান বড়ই ফাঁকিটা দিয়াছিল।

সুরসাকে ফাঁকি দিয়া বেশি দূর যাইতে না যাইতেই হনুমান আর একটা রাক্ষসীর হাতে পড়িল। এটার নাম সিংহিকা। হনুমান শূন্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার মধ্যে সিংহিকা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার ছায়া ধরিয়া বসিল। হনুমান হঠাৎ দেখিল যে, সে আর চলিতে পারিতেছে না, আর সমুদ্রের ভিতর হইতে একটা ভয়ানক রাক্ষসীও উঠিয়া আসিতেছে। সে জানিত যে, একরকম ভয়ঙ্কর রাক্ষস আছে, তাহারা জন্তুর ছায়া ধরিয়া তাহাকে আটকাইয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং সে বুঝিতে পারিল যে, এটা সেইরকম রাক্ষসী।

তখন হনুমান তাহার শরীর বড় করিতে লাগিল। রাক্ষসীও অমনি ঘোরতর গর্জনের সহিত একেবারে আকাশ পাতাল জোড়া ভয়ঙ্কর এক হাঁ করিয়া হনুকে গিলে আর কি! তাহা দেখিয়া হনুমান খুব ছোট হইয়া রাক্ষসীর পেটের ভিতর ঢুকিল। সুতরাং রাক্ষসী যে হনুকে খাইতে চাহিয়াছিল, সে কাজ তাহার হইয়াছিল বলিতে হইবে। তবে দুঃখের বিষয়, হজমটা তেমন ভাল করিয়া হয় নাই। কারণ, হনু তাহার পেটের ভিতর গিয়াই তাহার নাড়ি ভুঁড়ি সব ছিঁড়িয়া প্রাণ বাহির করিয়া দিল। কাজেই হনুকে হজম করিবার অবসর আর বেচারির রহিল না।

এতক্ষণে হনুমান লঙ্কার খুব কাছে আসিয়াছে। দূর হইতে সমুদ্রের তীরে সুন্দর গাছপালা দেখা যায়। তখন হনুমান ভাবিল, 'এই প্রকাণ্ড শরীর লইয়া লঙ্কায় গেলে রাক্ষসেরা কি মনে করিবে?' সুতরাং নামিবার পূর্বে সে তাহার শরীরটাকে খুব ছোট করিয়া লইল।

সমুদ্র পার হইয়া হনুমান যেখানে নামিল, সেটা পর্বত। এই পর্বতের নাম লম্ব পর্বত, ইহাকে ত্রিকূট পর্বতও বলে। এখান হইতে লঙ্কাপুরী বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নিজে বিশ্বকর্মা লঙ্কা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। উহা স্বর্গের মত সুন্দর, আবার তেমনি মজবুত। লম্ব পর্বতের উপরেই শহর, তাহার চারিদিকে সোনার দেওয়াল। বড় বড় সিংহ-দরজা আছে, তাহাও সোনার। শহরের চারিধারে রাক্ষসেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পাহারা দিতেছে।

দূর হইতে কিছুকাল লঙ্কার শোভা দেখিয়া তারপর হনুমান ধীরে ধীরে তাহার উত্তর দরজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তখনও বেলা ছিল বলিয়া পুরীর ভিতর ঢুকিল না। এত আলোর মধ্যে লঙ্কায় ঢুকিতে গেলে রাক্ষসেরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার কাজই মাটি করিয়া দিবে। তাই বাকি বেলাটুকু সে চুপি-চুপি বাহিরেই কাটাইল। তারপর যখন নগরে ঢুকিতে গেল, তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে। তখন যে সে শহরে ঢুকিল, তাহাও একটি বিড়ালছানার মত ছোট হইয়া।

লঙ্কার বাড়ি-ঘর যেমন বড় বড়, তেমনি সুন্দর। দরজা জানালা সোনার, রোয়াক পান্নার, সিঁড়িগুলি মানিকের। হনুমান এ-সকলের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে, এমন সময় একটা বিকট রাক্ষসী কোথা হইতে আসিয়া তাহার পথ আটকাইয়া বলিল, 'কে রে তুই বানর? এখানে কি করিতে আসিয়াছিস? সত্য বল্, নহিলে তোকে মারিয়া ফেলিব!

হনুমান বলিল, 'বলিতেছি। আগে বল তুমি কে, আর কেনই বা এত রাগ করিতেছ।' রাক্ষসী বলিল, 'আমি এই স্থানের দেবতা, আমারই নাম লঙ্কা। এ স্থানের লোকেরা আমারই পূজা করে, আমি এখানে পাহারা দিই। আজ আমার হাতে তোর মরণ দেখিতেছি!'

হনুমান তাহাতে কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া বলিল, 'এই সুন্দর নগরটি একবার দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে!'

রাক্ষসী কহিল, 'আমাকে হারাইতে না পারিলে তুই নগর দেখিতে পাইবি না।'

হনুমান আবার মিনতি করিয়া বলিল, 'ঠাকরুণ, আমি দেখিয়াই চলিয়া যাইব!'

এ কথায় রাক্ষসী রাগিয়া হনুমানকে এক চড় মারিল। কাজেই তখন হনুমানেরও রাগ হইবে না কেন? তবে রাক্ষসী স্ত্রীলোক বলিয়া, তাহাকে বেশি মারিতে হনুমানের ইচ্ছা হইল না। সে কেবল বাঁ হাতে আস্তে তাহাকে একটি কিল মারিল, তাহাতেই বেচারী মাটিতে পড়িয়া মুখ সিঁটকাইয়া একেবারে অজ্ঞান! জ্ঞান হইলে সে বলিল, 'রক্ষা কর বাবা, আর না! ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন আমি বানরের কাছে হারিব, তখন রাক্ষসদের বড় বিপদ হইবে। এখন সে বিপদের সময় উপস্থিত দেখিতেছি। রাক্ষসদিগের

আর রক্ষা নাই! এখন তুমি পুরীর ভিতর গিয়া যাহা ইচ্ছা কর।'

তখন হনুমান প্রাচীর ডিঙাইয়া লঙ্কার ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে ঘরে ঘরে তিল তিল করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোথাও সীতার দেখা পাইল না।

সে-সকল ঘরের কোথাও লোকজন গোলমাল করিতেছে, কোথাও পড়াশুনার শব্দ হইতেছে, কোথাও গুপ্তচরেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বসিয়া আছে। কোথাও সকলে মিলিয়া আমোদ করিতেছে। তাহাদের বাজনার শব্দ এমনি মিষ্ট যে, তাহাতে আপনা হইতে ঘুম আসিতে চায়। হনুমান এইরূপ কত স্থান দেখিল, কিন্তু কোথাও সীতাকে দেখিতে পাইল না।

এক জায়গায় রাবণের পুষ্পক রথ রহিয়াছে। বিশ্বকর্মা তাহা ব্রহ্মার জন্য মণি-মুক্তা দিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা সেই রথ কুবেরকে দেন। কুবেরের নিকট হইতে রাবণ তাহা কাড়িয়া আনে। হনুমান সেই রথের উপর উঠিয়া দেখিল।

রাবণের বাড়িতে সকলে খাওয়া দাওয়া সারিয়া ঘুমাইয়াছে। সেখানে কত আশ্চর্য জিনিসই হনুমানের চোখে পড়িল! সোনার জানালা, মানিকের সিঁড়ি, হাতির দাঁতের মূর্তি, স্ফটিকের থা.—সকলই আশ্চর্য! ইহার মধ্যে আবার সকলের চেয়ে আশ্চর্য রাবণের শুইবার স্থা.টি। স্ফটিকের বেদী, তাহার উপরে নীলকান্ত মণির খাট, তাহাতে সোনালী কাজ-করা হাতির দাঁতের খুঁটি। কলের পুতুলসকল পাখা হাতে লইয়া সেই খাটে বাতাস করিতেছে।

রানী মন্দোদরীকে দেখিয়া একবার হনুমান মনে করিল, 'এই বুঝি সীতা।' কিন্তু আবার ভাবিল, 'সীতা এমন সুখে ঘুমাইতেছেন, তাহা কখনই হইতে পারে না। ইনি নিশ্চয়ই অন্য কেহ হইবেন।'

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে রাবণের খাবার ঘরে গেল। কত জন খাইতে খাইতে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সোনার থালা ঘটিতে, মণির কাজ করা স্ফটিকের বাটিতে কতরকম খাবার জিনিস রহিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মাংসের ব্যঞ্জনই বা কতরকমের—হরিণের মাংস, শুয়োরের মাংস, মহিষের মাংস, গণ্ডারের মাংস, ভেড়া, ছাগল, মোরগ আর ময়ূরের মাংস, কিছুরই অভাব নাই। তাহা ছাড়া মাছ তো আছেই। হনুমান সকলই দেখিল।

সেখানে অনেক মেয়ে রহিয়াছেন। কেহ দেবতার কন্যা, কেহ নাগের কন্যা। দেখিতে সকলেই সুন্দর। আবার বিকট চেহারা এবং ভয়ঙ্কর দাঁতওয়ালা রাক্ষসের মেয়েও অনেক আছে। কিন্তু সীতা কোথাও নাই।

হনুমান অনেক করিয়া খুঁজিল। ঘরের পর বাগান, বাগানের পর ঘর, কিছুই সে বাকি রাখিল না। কিন্তু দেখিল, সীতা কোথাও নাই। তখন মনের দুঃখে সে বলিল, 'হায় হায়! এত করিয়াও সীতাকে দেখিতে পাইলাম না! হয়ত রাবণ তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে, না হয় তিনি নিজেই মরিয়া গিয়াছেন। আমার এত পরিশ্রম সকলই বৃথা হইল। এখন আমি কোন্ মুখে ফিরিয়া যাইব? তাহার চেয়ে আমার মরিয়া যাওয়া ভাল!' তারপর আবার সে মনে করিল, 'না, মরিব কেন? এখনও ত সকল স্থান দেখা হয় নাই। আরো

ভাল করিয়া খুঁজি।'

এই বলিয়া সে আবার প্রাণপণে খুঁজিতে খুঁজিতে একটি অশোক বন দেখিতে পাইল। সেই বনে যাইবামাত্র তাহার মনে হইল, 'এইখানে বোধহয় সীতাকে দেখিতে পাইব। হয়ত এইদিক দিয়া তিনি আসিবেন।' এই মনে করিয়া সে একটি শিংশপা অর্থাৎ শিশু গাছের পাতার আড়ালে লুকাইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল।

এমন সময় একটি মেয়ে সেইদিক দিয়া আসিলেন। না খাইয়া তাঁহার শরীর ভয়ানক রোগা আর ময়লা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও তিনি দেখিতে আশ্চর্যরূপ সুন্দর। রাক্ষসীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে আর তিনি ক্রমাগত নিঃশ্বাস আর চোখের জল ফেলিয়া, কেবল যেন কাহার কথা ভাবিতেছেন। চুল বাঁধেন নাই, একখানি মাত্র হলদে রঙের ময়লা কাপড় পরিয়া আছেন। হনুমান তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল যে ইনিই সীতা। কারণ, তাহারা ঋষ্যমূক পর্বতে থাকিয়া যে মেয়েটিকে দেখিতে পাইয়াছিল, ইনি তাঁহারই মতন দেখিতে।

ততক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তখন আর সীতার সহিত কথা বলিবার সুবিধা হইল না। তাই হনুমান আবার রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে সীতা বসিয়া বসিয়া কেবল কাঁদিতেছেন। ভয়ঙ্কর রাক্ষসীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহাদের কোনটা লম্বা, কোনটা কুঁজো, কোনটা কানা। কোনটার কান হাতির কানের মত চ্যাটালো ; কাহারও কান আবার ঘোড়ার কানের মত সুচালো। কোনটার গলা হাড়গিলার গলার মতন লম্বা। কোনটার গায় এত লোম যে দেখিলে মনে হয় যেন কম্বল পরিয়াছে। কোনটার মুখ শুয়োরের মুখের মতন, কোনটার মুখ বাঘের মুখের মতন, কোনটার মুখ শেয়ালের মুখের মতন। কোনটার হাতির পায়ের মতন পা। এক-একটার আবার হাতির শুঁড়ের মতন শুঁড়ও আছে। কোনটার জিহ্বা লক-লক করিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে।

চারিধারে এই-সকল রাক্ষসী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের মাঝখানে সীতা সেই শিংশপা গাছের তলায় বসিয়া কেবলই কাঁদিতেছেন।

তারপর যখন অনেক রাত্রি হইল, তখন রাবণ সেখানে আসিল। সে আসিয়া সীতাকে খুশি করিবার জন্য কতই মিষ্ট কথা কহিল, আবার কত লোভও দেখাইল। কিন্তু সীতা তাহার কোন কথাই শুনিলেন না। তিনি তাহাকে বলিলেন, 'ওরে দুষ্ট, পাপ করাই বুঝি তোমার কাজ? তুমি যেমন লোক, রাম লক্ষ্মণ আসিয়া তোমাকে তেমনি সাজা দিবেন! যদি তুমি ভাল চাহ, এখনই আমাকে ফিরাইয়া দিয়া রামকে সন্তুষ্ট কর ; নতুবা তোমার আর রক্ষা নাই। তুমি তো মরিবেই, তোমার লঙ্কায় আর একটি লোকও বাঁচিয়া থাকিবে না।'

এই কথায় রাবণ ভয়ানক রাগিয়া বলিল, 'আমি আর দুই মাস দেখিব। তাহার পর যদি তুমি আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা না বল, তবে তোমাকে কাটিয়া রাঁধিয়া খাইব!' সীতা বলিলেন, 'আমার এমন ক্ষমতা আছে যে আমি তোমাকে এখনই ভস্ম করিতে পারি। কেবল রাম আমাকে অনুমতি দেন নাই বলিয়া চুপ করিয়া আছি। তুমি কুবেরের ভাই, আর নিজে এমন বীর। তুমি কেন রামকে ফাঁকি দিয়া আমাকে লইয়া আসিলে?'

রাবণ দেখিল যে, সীতা কিছুতেই তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইতেছেন না। তখন সে

রাক্ষসীদিগকে আরো বেশি করিয়া সীতাকে বুঝাইতে বলিয়া চলিয়া গেল।

রাবণ গেলে পরে রাক্ষসীরা আসিয়া সীতাকে বকিতে লাগিল। একজন বলিল, 'তোমার মতন এত বোকা ত দেখি নাই! এমন রাজা রাবণ, তাহাকে তুমি ভালবাসিতে চাহ না!' আর-একজন বলিল, 'আমার কথা শোন, তোমার জেদ ছাড়িয়া দাও। তাহা হইলে তুমি সকলের রানী হইবে।' বিকটা বলিল, 'তুই অভাগী রাবণকে কেন ভালবাসিবি না?' দুর্মুখী বলিল, 'আমাদের কথা রাখ্, নহিলে তোকে মারিয়া ফেলিব!'

কিন্তু সীতা ইহাদের কোন কথাতেই কান দিলেন না। তাহা দেখিয়া রাক্ষসীরা নিজ-নিজ ঠোঁট চাটিতে চাটিতে কুড়াল লইয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। নিম্নোদরী বলিল, 'তোকে খাইব!' চন্দ্রোদরী বলিল, 'এটাকে মারিয়া ইহার যকৃত, প্লীহা ও বুক সব চিবাইয়া খাইব।'

এইরূপ করিয়া রাক্ষসীরা সীতাকে মারিয়া খাইবার পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া সীতা বলিলেন, 'তোমরা আমাকে মারিয়া খাইয়া ফেল। আমার বাঁচিয়া কি কাজ?' রাক্ষসীরা বলিল, 'আর দুই মাস থাক্, তারপর তোর মাংস ছিঁড়িয়া খাইব।'

এমন সময়ে ত্রিজটা নামে এক বুড়ী রাক্ষসী সেখানে আসিয়া বলিল, 'তোমরা সীতাকে কষ্ট দিও না। আজ আমি বড় ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি। বোধহয় রাবণ মরিয়া যাইবে আর লঙ্কাও ছারখার হইবে। তোমরা সীতাকে বকিয়াছ, এখন ইঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহ। তাহা হইলে হয়ত তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।'

সীতা বলিলেন, 'ত্রিজটা, তোমার কথা সত্য হইলে আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিব।' এই কথা বলিয়া তিনি আবার কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর সেই শিংশপা গাছের নিকটে আসিয়া, এক হাতে গাছের ডাল ধরিয়া আর এক হাতে মাথার বেণী লইয়া বলিলেন, 'এই বেণী গলায় বাঁধিয়া মরিব।'

হনুমান শিংশপা গাছে বসিয়া সবই দেখিয়াছে, আর মনে মনে ভাবিতেছে, কি করিয়া সীতাকে একটু শান্ত করিবে। চারিদিকে রাক্ষসীর দল, সীতার কাছে গেলে তাহারা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। কিন্তু যদি শীঘ্র তাঁহার সহিত কথা বলা না হয়, তবে হয়ত তিনি তাহার পূর্বেই মরিয়া যাইবেন! আবার, কথা কহিতে গেলে, যদি রাবণ মনে করিয়া তিনি চিৎকার করিয়া উঠেন, তবে সকল দিকই মাটি হয়। কাজেই এমন করিয়া কথা কহিতে হইবে, যাহাতে তিনি ভয় না পান।

এই ভাবিয়া সে সীতার আর একটু কাছে আসিয়া, আস্তে আস্তে মিষ্ট কথায় বলিতে লাগিল, 'মহারাজ দশরথের পুত্র রামচন্দ্র বনে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন লক্ষ্মণ ঠাকুর আর মা সীতা। দুষ্ট রাবণ রামকে ফাঁকি দিয়া সীতাকে লইয়া আসিল। রাম তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া সুগ্রীবের সহিত বন্ধুতা করিলেন। তারপর সন্ধান করিবার জন্য সুগ্রীব আমাদিগকে পাঠাইলেন। কত দেশে, কত বনে আমরা সীতা মাকে খুঁজিয়াছি। শেষে সম্পাতি পাখির কথায় সাগর পার হইয়া, এখানে আসিয়া বুঝি মায়ের দেখা পাইলাম!' এই বলিয়া হনুমান চুপ করিল।

হনুমানের কথায় সীতা আশ্চর্য হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

দেখিলেন, একটি নিতান্ত ছোট বানর গাছের ডালে বসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছে। তাহার গায়ের রঙ অশোক ফুলের মত লাল, চোখ সোনালী, পরনে সাদা কাপড়। ইহা দেখিয়া প্রথমে সীতার বড় ভয় হইল। কিন্তু শেষে অনেক ভাবিয়া তিনি বলিলেন, 'হে দেবতা বৃহস্পতি, হে ব্রহ্মা, হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, দোহাই আপনাদের! এই বানর যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য হউক!'

তখন হনুমান গাছ হইতে নামিয়া সীতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'আপনি কে মা? কেনই বা এই বনে থাকিয়া এত দুঃখ করিতেছেন? আপনি যদি রামের সীতা হন, তবে আমার কথার উত্তর দিন।' এই কথা শুনিয়া সীতা বলিলেন, 'আমি রাজা দশরথের পুত্রবধূ। আমার পিতার নাম জনক, স্বামী রামচন্দ্র। বিমাতার কথায় রাম বনে আসিয়াছিলেন। আমি আর লক্ষ্মণ তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলাম। সেখান হইতে দুষ্ট রাবণ আমাকে ধরিয়া লঙ্কায় আনিয়াছে। দুই মাস পরে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।'

হনুমান সীতার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিবার জন্য একটু একটু করিয়া কাছে আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে আবার সীতা ভয় পাইয়া বলিলেন, 'হায়! ইহার সহিত কেন কথা কহিলাম? এ হয়ত সেই দুষ্ট রাবণই বানর সাজিয়া আসিয়াছে!'

তাহা শুনিয়া হনুমান জোড়হাতে তাঁহাকে অনেক বুঝাইল। রামের সহিত কেমন করিয়া তাহার পরিচয় হইয়াছে, রাবণ সীতাকে লইয়া আসিবার পর রাম কি করিয়া দিন কাটাইতেছেন, তাহারাই বা কেমন করিয়া সীতাকে খুঁজিয়াছে, এ-সকল কথার কিছুই সে তাঁহাকে বলিতে বাকি রাখিল না। সকলের শেষে, রামের সেই আংটিটি তাঁহার হাতে দিল।

আংটি দেখিয়া সীতার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন আনন্দে তাঁহার সেই সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তারপর তিনি মন খুলিয়া হনুমানকে রামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ কেমন আছেন? তাঁহারা কেন আসিয়া রাবণকে মারিয়া ফেলিতেছেন না? সীতাকে না দেখিয়া রামের শরীর বেশি রোগা হইয়া যায় নাই ত? এইরূপ কত প্রশ্নই তিনি করিলেন। রামের কথা যত জিজ্ঞাসা করেন, ততই তাঁহার আরো জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে।

হনুমান যার-পর-নাই মিষ্ট কথায় তাঁহার কথার উত্তর দিয়া তারপর বলিল, 'মা, আসুন, আপনাকে পিঠে করিয়া রামের কাছে লইয়া যাই।'

তাহা শুনিয়া সীতা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এতটুকু বানরটি হইয়া তুমি কি করিয়া আমাকে লইয়া যাইবে?' হনুমান বলিল, 'ইচ্ছা করিলেই, মা, আমি ঢের বড় হইতে পারি।'

এই বলিয়া সে দেখিতে দেখিতে পর্বতের মত বড় হইয়া বলিল, 'মা, আপনার আশীর্বাদে রাবণ আর তাহার লোকজন ঘরবাড়ি-সুদ্ধ এই লঙ্কাটাকে আমি মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে পারি। আপনার কিছু ভয় নাই। আমার পিঠে উঠিয়া বসুন।'

সীতা বলিলেন, 'তুমি যে পারিবে তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু সমুদ্রের উপর দিয়া যাইবার সময় আমি নিশ্চয়ই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইব, কাজেই আমার যাওয়া ঠিক নহে। তুমি

শীঘ্র তাঁহাদিগকে এখানে লইয়া আইস।'

হনুমান বলিল, 'মা, আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আচ্ছা, তবে আমাকে এমন একটা কিছু জিনিস দিন, যাহা দেখিয়া রামের বিশ্বাস হইবে যে আমি যথার্থই আপনাকে দেখিয়া গিয়াছি।' একথায় সীতা তাঁহার মাথার মণি খুলিয়া হনুমানের হাতে দিলেন। হনুমান সেই মণি লইয়া, সীতাকে প্রণাম করিয়া তাহার নিকট বিদায় লইল। যাইবার সময় তাঁহাকে অনেক সাহস দিয়া বলিল, 'মা আপনার কোন চিন্তা নাই। শীঘ্রই আপনার কষ্ট দূর হইবে।'

সীতার নিকট বিদায় লইয়া হনুমান ভাবিতে লাগিল, 'সীতার সন্ধান ত পাইয়াছি। এখন রাক্ষসেরা কেমন যুদ্ধ জানে, তাহার কিছু খবর লইয়া যাইতে পারিলে মন্দ হয় না। আমি যদি এই সুন্দর অশোক বনটিকে নষ্ট করিয়া ফেলি, তাহা হইলে রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবে। তখন আমিও তাহাদের বিদ্যা বুঝিতে পারিব।'

এই বলিয়া হনুমান বিষম হুপ-হাপ্, দুপ্-দাপ্, চড়্-চড়্, মড়্-মড়্ শব্দে অশোক বন ভাঙিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে সে সেই বনের এমন দুর্দশা করিল যে, আগুন দিয়া পোড়াইলেও তাহার চেয়ে বেশি হয় না। এইরূপে সমস্ত বাগানটিকে ছারখার করিয়া সে একটি সিংহ-দরজার উপরে বসিয়া দেখিতে লাগিল, রাক্ষসেরা এখন কি করে।

এদিকে রাক্ষসেরা বন ভাঙার শব্দে সেখানে আসিয়া দেখিল যে, হনুমান তাহার কাজ শেষ করিয়া সিংহ দরজায় চড়িয়া গর্জন করিতেছে। তখন তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে গিয়া রাবণকে বলিল, 'মহারাজ, একটা ভয়ঙ্কর বানর আসিয়া অশোক বন লণ্ডভণ্ড করিয়াছে! বোধহয় সে রামের লোক। সে সীতার সহিত কথা কহিয়াছে আর তিনি যেখানে আছেন, সে জায়গাটুকু ভাঙে নাই।'

একথা শুনিয়া রাবণ রাগে তাহার কুড়ি চোখ লাল আর কুড়ি পাটি দাঁত কড়্মড়্ করিয়া তখনই হুকুম দিল, 'শীঘ্র ওটাকে বাঁধিয়া লইয়া আইস।' হুকুম পাওয়ামাত্রই বড় বড় রাক্ষসেরা মুষল, মুদ্গর হাতে মহা তেজের সহিত হনুমানকে বাঁধিয়া আনিতে চলিল। তাহাদিগকে দেখিয়া হনুমান সেই সিংহ দরজার বিশাল ঘড়কাটা হাতে লইয়া বলিল, 'জয়, রামচন্দ্রের জয়!'

তারপর আর কয়েক মুহূর্তের বেশি বিলম্ব হইল না। ইহারই মধ্যে সে রাক্ষসগুলির মাথা গুঁড়া করিয়া, আবার সেই সিংহ-দরজায় উঠিয়া ভাল মানুষের মত বসিয়াছে—যেন সে কিছুই জানে না।

খানিক পরে তাহার মনে হইল যে, ঐ যে পাহাড়ের মতন বড় বাড়িটা দেখা যাইতেছে, সেটাকে ভাঙিতে পারিলে ত বেশ হয়। যেমন কথা তেমন কাজ। অমনি সেই বাড়িটাকে চুরমার করিয়া হনু আবার সিংহ দরজায় উঠিয়া বসিয়া আছে।

ততক্ষণে অসংখ্য পাহারাওয়ালা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হনুমানও আর কিছু না পাইয়া, সেই ভাঙা বাড়ির একটা সোনার থাম লইয়াই সে-সকল পাহারাওয়ালাকে পিষিয়া দিল। এদিকে রাবণ জাম্বুমালীকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহার বুক পরিঘের ঘায় ভাঙিতে হনুমানের অধিক সময় লাগিল না। তারপর মন্ত্রীর ছেলেরা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। তাহাদিগকেও হনুমান কয়েকটি কিল চড়েই শেষ

করিয়া আবার সেই সিংহ-দরজায় উঠিয়া বসিয়া রহিল।

এইরূপে হনুমান লঙ্কায় যে কি ভয়ানক কাণ্ড বাধাইল, তাহা কি বলিব। বড় বড় বীরেরা যুদ্ধ করিতে আসে আর হনু তাহাদিগকে গুঁড়া করিয়া দেয়। ঘোড়া দিয়া ঘোড়া মারে, হাতি মারে, রাক্ষস দিয়া রাক্ষস মারে।

দুর্ধর, প্রঘস, বিরূপাক্ষ, ভাসকর্ণ আর যূপাক্ষ, ইহাদের এক-একজন অসাধারণ যোদ্ধা। হনুমান দুর্ধরের রথের উপর খালি লাফাইয়া পড়িয়াই রথ আর ঘোড়া-সুদ্ধ তাহাকে থেঁৎলা করিয়া দিল। তারপর শালগাছ দিয়া বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষকে শেষ করা, পর্বতের চূড়া দিয়া প্রঘস ও ভাসকর্ণকে পেষা, আর এটাতে ওঠাতে ঠোকাঠুকি করিয়া সঙ্গের রাক্ষসগুলির মাথা ফাটান, এ-সকল ত হনুর পক্ষে কেবল খেলা। সে-কাজ সে চক্ষের পলকে সারিয়া আবার সেই সিংহ-দরজায় উঠিয়া বসিল।

ইহার পর রাবণের পুত্র অক্ষ আট ঘোড়ার রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে আসিল। সে খুবই যুদ্ধ করিতে পারিত আর প্রথমে অনেক বাণ মারিয়া হনুমানকে একটু ব্যস্ত করিয়াই তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহা অধিক সময়ের জন্য নহে। তাহার পরেই হনুমান এক চড়ে তাহার রথের আটটা ঘোড়াকে আর আট কিল মারিয়া রথখানিকে গুঁড়া করিয়া দিল। তখন অক্ষ রথ হইতে না নামিয়া আর যায় কোথায়? আর হনুও তখন তাহার পা ধরিয়া তাহাকে মাটির উপর এমনি এক আছাড় দিল যে, তাহাতেই বেচারা একেবারে চুরমার। তারপর হনুমান আবার সেই সিংহ দরজায় উঠিয়া বসিয়া রহিল।

অক্ষের মৃত্যুর কথা শুনিয়া রাবণ তাহার বড় ছেলে ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। ইন্দ্রজিতের মতন যোদ্ধা লঙ্কায় আর কেহ ছিল না। কিন্তু সে আসিয়াও প্রথমে হনুমানের কিছু করিতে পারে নাই। আর, কি করিয়াই বা পারিবে? বাণ আসিবার আগেই হনুমান সরিয়া বসিয়া থাকে, কাজেই তাহা আর তাহার গায়ে লাগিতে পারে না। তাহা দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ রাগের ভরে একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িয়া দিল। ব্রহ্মা তাহাকে সেই অস্ত্র দিয়াছিলেন। সে অস্ত্রকে কেহ আটকাইতে পারে না, কাজেই হনুমানও তাহা আটকাইতে পারিল না। আবার হনুমানকে ব্রহ্মা বর দিয়াছিলেন যে, কোন অস্ত্রেই তাহার মৃত্যু হইবে না। সুতরাং ব্রহ্মাস্ত্রও তাহাকে মারিতে না পারিয়া খালি বাঁধিয়া ফেলিল।

ব্রহ্মাস্ত্রে বাঁধা পড়িয়া হনুমান ভাবিল, 'বেশ হইয়াছে! এখন এরা আমাকে রাবণের কাছে লইয়া যাইবে আর আমিও তাহার সহিত দুটা কথাবার্তা কহিতে পারিব।'

হনুমান বাঁধা পড়িয়াছে দেখিয়া রাক্ষসেরা আনন্দে নাচিতে লাগিল। তাহাদের উৎসাহ দেখে কে! তাহারা মোটা মোটা শনের দড়ি আনিয়া তাহাকে ত শক্ত করিয়া বাঁধিলই, তাহা ছাড়া তাহাদের যতদূর সাধ্য গালি দিতে আর ভ্যাঙচাইতেও ছাড়িল না। হনুমান কিছুই করে না, খালি চ্যাঁচাইতেছে।

এদিকে কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্রের বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে। কারণ, সে বাঁধন এমনি রকমের যে তাহার উপর আবার দড়ি দিয়া বাঁধিতে গেলে, তাহা আপনি খুলিয়া যায়। যাহা হউক, বাঁধন যে খুলিয়া গিয়াছে, এ কথা হনুমান রাক্ষসদিগকে জানিতে দিল না। ইন্দ্রজিৎ টের পাইল বটে, কিন্তু অন্য রাক্ষসেরা তাহার কিছুই বুঝিল না। তাহারা মনে করিল, 'বাঃ,

খুব মজবুত করিয়া বাঁধিয়াছি!' তারপর বিস্তর টানাটানি আর 'হেঁইয়ো!' হেঁইয়ো!' করিয়া তাহারা হনুমানকে মারিতে মারিতে রাবণের সভায় লইয়া চলিল।

সেখানে রাক্ষসেরা তাহাকে দেখিয়া কি আশ্চর্যই হইল। কেহ বলিল, 'আরে, এ বানর কে? এটা এখানে কি করিতে আসিল?' কেহ বলিল, 'এটাকে শীঘ্র মারিয়া ফেল। কেহ বলিল, 'পোড়াইয়া ফেল!' কেহ বলিল, 'খাইয়া ফেল!' এই বলিয়া তাহারা হনুমানকে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

হনুমান কিছু বলে না। সে কেবল ক্রমাগত রাবণকে আর তাহার সভার ঘরখানি চাহিয়া দেখিতেছে। মণি-মাণিক্যের কাজ করা স্ফটিকের সিংহাসনে রাবণ বসিয়া আছে। তাহার দশ মাথায় দশটি ঝকঝকে সোনার মুকুট। শরীরটি কুচকুচে কালো, তাহাতে রক্তচন্দন মাখানো, তাহার উপর সোনার হার। এক-একটা মুখ যেন এক-একটা জ্বালা! তাহাতে আবার দাঁতগুলি ধারালো, আর ঠোঁটগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। হনুমান তাহাকে দেখিয়াই মনে মনে ভাবিল যে, এ ব্যক্তি যেমন-তেমন বীর নহে!

এদিকে রাক্ষসেরা হনুমানকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছে—'তুই কোথা হইতে আসিয়াছিস?' 'এখানে আসিলি কি করিতে?' 'বন ভাঙিলি কেন?' 'কে তোকে পাঠাইয়াছে?' 'ঠিক করিয়া বল, তাহা হইলে এখনই তোকে ছাড়িয়া দিব, মিথ্যা কহিলে মারিয়া ফেলিব!'

তাহা শুনিয়া হনুমান রাবণকে বলিল, 'রাজা রাবণ, আমি বানর। তোমাকে দেখিতে লঙ্কায় আসিয়াছিলাম। সহজে তোমার দেখা না পাইয়া বন ভাঙিয়াছি! তাহাতে রাক্ষসেরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিল, কাজেই আমিও তাহাদিগকে মারিয়াছি। আমি রামের দূত, পবনের পুত্র, আমার নাম হনুমান। তোমার ধনজন এত আছে, তোমার কি এমন অন্যায় কাজ করা উচিত? তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি, আমার কথা শোন, সীতাকে রাখিও না ; তাহা হইলে তোমার প্রাণ যাইবে। কি বলিব, রাম আমাকে অনুমতি দেন নাই, নহিলে আমি এখনই তোমার লঙ্কা গুঁড়া করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিতাম।'

তখন রাবণ তাহার লাল লাল কুড়িটা চোখ ঘুরাইয়া বলিল, 'কোথারে জল্লাদসকল, কাট্ ত এটাকে!' কিন্তু বিভীষণ তাহাকে বারণ করিল।

বিভীষণ রাবণের ছোট ভাই, আর অতিশয় বুদ্ধিমান লোক। সে বলিল, 'মহারাজ, করেন কি? দূতকে কখনও মারিতে আছে? তাহাতে যে ভয়ানক পাপ! দূতকে চাবুক মারা যায়, তাহার মাথা মুড়াইয়া দেওয়া যায়, শরীরের কোন স্থান খোঁড়া করিয়াও দেওয়া যায় ; কিন্তু তাহাকে মারা কখনই হইতে পারে না। আর, এটাকে মারিয়া ফেলিলে খবর লইয়া কে যাইবে? তাহা হইলে রাম লক্ষ্মণই বা কি করিয়া এখানে আসিবে, আর রাক্ষসেরাই বা কি করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া, নিজেদের বাহাদুরি দেখাইবে!'

বিভীষণের কথা শুনিয়া রাবণ বলিল, 'বিভীষণ, ঠিক বলিয়াছ। ইহাকে মারিয়া কাজ নাই। এই দুষ্টের লেজ পোড়াইয়া দাও, তাহা হইলে দেশে গিয়া আর মুখ দেখাইতে পারিবে না!'

তখন রাক্ষসেরা বোঝা বোঝা নেকড়া আনিয়া হনুমানের লেজে জড়াইতে লাগিল।

যত জড়ায়, হনুমানের লেজ ততই বড় হয়, আর বেশি নেকড়া লাগে। লঙ্কার নেকড়া ফুরাইয়া যাইবার গতিক আর কি। নেকড়া জড়ান হইলে, তাহাতে তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিল।

সেই লেজের আগুন দিয়া হনুমান যে কি কাণ্ড করিবে, তাহা আগে জানিলে কখনই তাহারা এমন করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইত না। হনুমান প্রথমেই ত সেই জ্বলন্ত লেজটি ঘুরাইয়া রাক্ষসদিগকে মারিতে আরম্ভ করিল। যত মারে রাক্ষসেরাও ততই বেশি করিয়া তাহাকে বাঁধে, আর তাহাকে দেখিয়া ছেলে, বুড়ো, আর স্ত্রীলোকেরা হাততালি দিয়া হাসে। এইরূপ করিয়া রাক্ষসেরা লঙ্কার গলি গলি হনুমানকে লইয়া তামাশা দেখাইতে লাগিল। অবশ্য, এ খবর সীতার কাছে পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তাহা শুনিয়া সীতা মনে মনে বলিলেন, 'হে দেবতা অগ্নি, আমি যদি কোন পুণ্য কাজ করিয়া থাকি, তবে তুমি হনুমানকে পোড়াইও না!'

এদিকে হনুমান ভাবিতেছে, 'কি আশ্চর্য! আমার লেজে এত আগুন, তবু তাহাতে জ্বালা নাই কেন? আগুন যেন আমার কাছে হিমের মতন লাগিতেছে! বুঝিয়াছি, আমার পিতা পবন, আর রাম, আর সীতা, ইঁহাদের দয়াতেই এইরূপ হইয়াছে।'

তখন সে মুহূর্তের মধ্যে তাহার শরীরটাকে খুব ছোট করিয়া ফেলিল। তাহাতে বাঁধনের দড়িগুলি আপনা হইতেই খুলিয়া পড়ায়, রাক্ষসেরা আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

তারপর একটা প্রকাণ্ড দরজার হুড়কা লইয়া রাক্ষসগুলির মাথা ভাঙিতে আর কতক্ষণ লাগে।

বাঁধন ঝাড়িয়া ফেলিয়া হনুমান ভাবিল, 'এখন কি করি? সমুদ্র ডিঙাইয়া, বন ভাঙিয়া, রাক্ষস অনেক মারিয়াছি। এখন এই লেজের আগুন দিয়া এই সকল ঘর দুয়ার পোড়াইতে পারিলেই কাজ শেষ হয়।'

যেই এই কথা মনে করা, অমনি এক লাফে একেবারে ঘরের চালে গিয়া উঠা। তারপর ঘর হইতে ঘরে, সেখান হইতে বাগানে, বাগান হইতে আবার ঘরের ছাদে, এইরূপ করিয়া হনুমান লঙ্কায় আগুন লাগাইয়া ফিরিতে লাগিল। আগে প্রহস্তের বাড়ি, তারপর মহাপার্শ্বের বাড়ি, তারপর বজ্রদংষ্ট্র, ইন্দ্রজিৎ, জাম্বুমালী, মকরাক্ষ, নরান্তক, কুম্ভ, নিকুম্ভ এইরূপ করিয়া একেবারে রাজার বাড়ি পর্যন্ত কিছুই বাকি রহিল না। আগুন যতই জ্বলিয়া উঠিল, বাতাসও ততই ছুটিয়া চলিল, আর হনুমানও ততই মনের সুখে গর্জন করিতে লাগিল।

সেদিন লঙ্কায় কি সর্বনাশই উপস্থিত হইয়াছিল! যেদিকে চাহিয়া দেখা যায়, সেইদিকেই আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার, রাক্ষসেরা যে পথ দেখিয়া পলাইবে, তাহারও জো নাই। চারিদিকে কেবল বাতাসের শোঁ-শোঁ, পোড়া কাঠ ফাটার পট-পট, বাড়ি ঘর পড়ার মড়-মড়, আর রাক্ষসদিগের হায় হায়! বেচারারা পাগলের মতন ছুটাছুটি করিতেছে আর বলিতেছে, 'হায় হায়! সর্বনাশ হইল!'—'বাবা গো! এটা কি আসিল!' ছেলে বুড়া স্ত্রী পুরুষ কত রাক্ষস যে পড়িয়া

মরিল, তাহার লেখাজোখা নাই!

হনুমান তাহার লেজের আগুন সমুদ্রের জল দিয়া সহজেই নিবাইয়াছিল। কিন্তু লঙ্কার সে সর্বনেশে আগুন কেহই নিবাইতে পারিল না। সেদিন আগুনের তামাশা দেখিয়া হনুমানের মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল।

কিন্তু তাহার আনন্দ অধিকক্ষণ রহিল না। এতক্ষণ সে লঙ্কা পোড়াইতে ব্যস্ত ছিল, তাই সীতার কথা তাহার মনে হয় নাই। তাঁহার কথা মনে হইবামাত্রই সে ভয়ে আর দুঃখে অস্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল, 'হায় হায়! কি করিলাম? সীতাকে-সুদ্ধ পোড়াইয়া মারিলাম। এখন আমি রামের কাছে গিয়া কি বলিব?' যাহা হউক, তখনই আবার তাহার এ কথাও মনে হইল যে, সীতা পুড়িয়া মরিবেন ইহা কি সম্ভব? যেন আকাশ হইতে কেহ বলিতেছে, 'কি আশ্চর্য! লঙ্কা পুড়িয়া ছারখার হইল, কিন্তু সীতার কিছুই হয় নাই!'

এ কথা শুনিয়া হনুমানের যে কি আনন্দ হইল তাহা কি বলিব! সে অমনি দুই লাফে গিয়া সীতার নিকট উপস্থিত। তারপর তাঁহাকে অনেক সাহস দিয়া আর তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া, সে সেখান হইতে বিদায় হইল।

লঙ্কার কাছেই অরিষ্ট পর্বত। হনুমান সীতার নিকট বিদায় লইয়া সেই পর্বতে গিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যে, সেখান হইতে লাফ দিলে সমুদ্র পার হওয়ার সুবিধা হইবে।

এদিকে হনুমানের সঙ্গের বানরেরা সমুদ্রের ধারে অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা কেবল ভাবিতেছে, কখন হনুমান ফিরিয়া আসিবে। এমন সময় দূর হইতে তাহার গর্জন এবং শোঁ-শোঁ শব্দ শুনিতে পাইল। তাহা শুনিয়া জাম্ববান বলিল, 'নিশ্চয় হনুমান সীতার সন্ধান পাইয়াছে, নহিলে এত চ্যাঁচাইবে কেন?'

জাম্ববানের কথায় বানরেরা আনন্দে লাফালাফি করিতে লাগিল। তাহাদের কেহ গাছে চড়ে, কেহ লেজ নাড়ে, কেহ কাপড় উড়ায়, আবার কেহ মাথা তুলিয়া খালি হনুমানের পথের দিকে চাহিয়া আছে। এমন সময় হনুমান ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসিয়া টিপ্ করিয়া সেইখানে পড়িল।

তাহাকে দেখিয়া বানরেরা আর কি তাহাদের আনন্দ সামলাইয়া রাখিতে পারে! তাহারা সকলেই অস্থির হইয়া উঠিল। কি করিয়া তাহাকে আদর আর সম্মান দেখাইবে, তাহাই যেন তাহারা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কেহ তাহার বসিবার জন্য গাছের ডাল বিছাইয়া দেয়, কেহ ফল মূল আনিয়া দেয়, কেহ কেহ কিচিমিচি করে। অনেকে কেবল হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হনুমান আগে জাম্ববান অঙ্গদ প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিয়া, তারপর সীতার এবং লঙ্কার খবর সকলকে শুনাইল।

এতদিনে বানরদিগের মনে আবার সুখ আসিয়াছে। তাহাদের কাজ হইয়াছে, এখন সংবাদ লইয়া দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত। ফিরিবার পূর্বে একবার তাহারা মনে করিয়াছিল সীতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে; কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিল যে রামের অনুমতি ভিন্ন তাহা করা উচিত নহে। সুতরাং তাহারা তাড়াতাড়ি কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া চলিল। তিন দিন আগে তাহাদের মনে যেমন ভয় আর দুঃখ ছিল, এখন তেমনি উৎসাহ আর আনন্দ।

তাহারা যখন কিষ্কিন্ধ্যার কাছে সুগ্রীবের মধুবনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের উৎসাহ আর থামাইয়া রাখিতে পারিল না। অঙ্গদ বলিল, 'তোমরা পেট ভরিয়া মধু খাও।' তাহা শুনিয়া বানরেরাও আর তিলমাত্র বিলম্ব করিল না। পেট ভরিয়া মধু আর ফল ত তাহারা খাইলই, তাহার উপর আবার গাছপালা ভাঙিয়া বনের দুর্দশার একশেষ করিল। তাহাদের না আছে মৌমাছির ভয়, না আছে পাহারাওয়ালার চিন্তা।

সুগ্রীবের মামা দধিমুখ সেই বনের প্রহরী ছিল। সে তাহাদিগকে কত বারণ করিল, কত ধমকাইল, দুই-একজনকে মারিলও। কিন্তু বানরেরা কি তাহাতে থামে? বরং তাহারা উল্টিয়া দধিমুখেরই নানারকম দুর্দশা করিল। তাহাকে আঁচড়াইয়া, কামড়াইয়া, কিলাইয়া, লেজ ধরিয়া টানিয়া বেচারার আর কিছু রাখিল না।

তখন দধিমুখ আর তাহার লোকেরা বানরদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। কিন্তু যুদ্ধ করিয়া তাহারা পারিবে কেন? লাভের মধ্যে অঙ্গদের হাতে মার খাইয়া দধিমুখের হাড় ভাঙিবার গতিক হইল।

তখন বেচারা কাঁদিকে কাঁদিতে সুগ্রীবের নিকট গিয়া নালিশ করিল। সুগ্রীব তাহার কথা শুনিয়া বলিল, 'মামা, তোমার কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। নিশ্চয় উহারা সীতার সন্ধান পাইয়াছে। তাহা না হইলে কি এমন পাগলামি করিতে পারে? মামা, তুমি দুঃখ করিও না ; শীঘ্র গিয়া উহাদিগকে পাঠাইয়া দাও।'

দধিমুখও তাহা শুনিয়া ভাবিল, 'বা! তাই ত, উহারা নিশ্চয় সীতার খবর আনিয়াছে।' তখন কোথায় বা গেল তাহার বেদনা, কোথায় বা গেল তাহার কান্না। সে সকল দুঃখ ভুলিয়া অমনি হনুমান প্রভৃতিকে আনিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তাহারা আসিলে রাম লক্ষ্মণ আর সুগ্রীব সকল কথাই শুনিতে পাইলেন। হনুমান রামকে সীতার সংবাদ বলিয়া সেই মণি তাঁহার হাতে দিল। রাম মণি হাতে লইয়া, বারবার তাহা দেখিতে লাগলেন। তারপর তাহা বুকে চাপিয়া ধরিলেন আর তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

# লঙ্কাকাণ্ড

তার পর সকলে উৎসাহে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া লঙ্কায় চলিল। সকলের আগে চলিল নল। সে পথ পরীক্ষায় বড়ই পণ্ডিত। কোন্ পথ ভাল, কোথায় পরিষ্কার জল, কোথায় মিষ্ট ফল, নলের সব মুখস্থ আছে। নল যে পথে যাইতেছে, সেই পথ ধরিয়া অন্যেরা তাহার পিছু পিছু চলিয়াছে। হনুমান রামকে আর অঙ্গদ লক্ষ্মণকে পিঠে করিয়া লইয়াছে। অন্য বানরেরা গাছের ফল খাইয়া, ফুলের শোভা দেখিয়া, মনের সুখে দল বাঁধিয়া চলিয়াছে। এইরূপে তাহারা সেই মহেন্দ্র পর্বতের কাছে সমুদ্রের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে রাবণ রাক্ষসদের সহিত বসিয়া পরামর্শ করিতেছে। সে বলিল, 'বল দেখি এখন উপায় কি! বড়ই যে মুস্কিল দেখিতেছি! লঙ্কায় আসিয়া প্রবেশ করা ত যেমন-তেমন সহজ কাজ নহে! সেই কাজ সামান্য একটা বানরে করিয়া দিয়া গেল, আমার ঘর বাড়ি ভাঙিল, এতগুলি রাক্ষসও মারিল! বল দেখি এখন কি করা যায়।' রাক্ষসেরা বলিল, 'সে কি মহারাজ! আমাদের এত সৈন্য, এত অস্ত্র আর আপনি এমন বীর! পৃথিবী, আকাশ, পাতাল সকলই আপনি জয় করিয়াছেন। বানর আর মানুষকে আপনার কিসের ভয়? আপনার নিজেরও যুদ্ধ করিতে হইবে না ; একা ইন্দ্রজিৎই মানুষ আর বানর মারিয়া শেষ করিবেন।'

প্রহস্ত বলিল, 'আমি তাহাদিগকে মারিব।'

বজ্রদংষ্ট্র বলিল, 'আমি একটা বুদ্ধি করিয়াছি। জোয়ান জোয়ান রাক্ষসেরা ভরতের সৈন্য সাজিয়া উহাদের কাছে যাইবে। উহারা কিছুতে বুঝিতে পারিবে না। আর ইহার মধ্যে আমাদের লোকেরা এক সময় তাহাদিগকে বাগে পাইয়া মারিয়া শেষ করিবে।'

রাক্ষসেরা সকলেই এইরূপ বলিতেছে, তাহা দেখিয়া বিভীষণ বলিল, 'মহারাজ, যাহার জোর নাই, সে কি সাহস করিয়া লঙ্কায় যুদ্ধ করিতে আসে? রামের সীতা রামকে ফিরাইয়া দিন, নহিলে বড়ই বিপদ হইবে। আপনি রামের এত অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতেই ত রাম যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এ কাজ আপনার উচিত হয় নাই।'

বিভীষণের কথা শুনিয়া রাবণ রাগের ভরে সভা হইতে চলিয়া গেল।

পরদিন আবার মস্ত সভা। সেদিনও খোসামুদে রাক্ষসেরা বলিল, 'মহারাজ, কোন ভয় নাই, যুদ্ধ করুন।' আর কেবল বিভীষণ বলিল, 'শীঘ্র সীতাকে ফিরাইয়া দিন।' সেজন্য

রাবণ রাগের ভরে তাহাকে যত ইচ্ছা গালি দিয়া শেষে বলিল, 'হতভাগা, আর কেহ যদি এই কথা বলিত, তাহা হইলে এখনই তাহাকে কাটিয়া ফেলিতাম।'

তখন বিভীষণ বলিল, 'মহারাজ, আপনি আমার গুরুজন। আপনাকে বুঝাইতে পারি, আমার এমন সাধ্য কি? আমার অন্যায় হইয়া থাকিলে ক্ষমা করিবেন। ভাল কথা বলিতে গেলাম, তাহাতে আপনার এত রাগ হইল। এখন আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, আমি চলিলাম।' এই বলিয়া বিভীষণ আর চারিজন রাক্ষস সঙ্গে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রাবণের সভা ছাড়িয়া বিভীষণ আর সেই চারিজন রাক্ষস সমুদ্র পার হইয়া রামের নিকটে চলিয়া আসিল। সেখানে সুগ্রীব আর অন্য অন্য বানরদিগকে দেখিয়া বিভীষণ বলিল, 'আমি রাবণের ভাই, আমার নাম বিভীষণ। আমি সীতাকে ফিরাইয়া দিবার কথা বলাতে, রাবণ আমাকে গালি দিয়াছেন। তাই আমি রামের কাছে থাকিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।'

এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব তাড়াতাড়ি রামের কাছে গিয়া সংবাদ দিল। বিভীষণকে সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। হনুমান ছাড়া বানরদিগের অন্য কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে নাই। তাই তাহারা সকলে বিভীষণকে জায়গা দিতে রামকে বারবার নিষেধ করিল। খালি হনুমান বলিল, 'উহার মুখ দেখিয়া ত উহাকে দুষ্ট লোক বলিয়া আমার বোধ হয় না। ও যথার্থই আমাদের সহিত বন্ধুতা করিতে আসিয়াছে। উহাকে জায়গা দেওয়া উচিত।'

সকলের কথা শুনিয়া রাম বলিলেন, 'যে আশ্রয় চায়, তাহাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত। সে যদি দুষ্টও হয়, তথাপি তাহার এমন ক্ষমতা নাই যে আমার অনিষ্ট করে। তোমরা শীঘ্র তাহাকে ডাকিয়া আন।'

তখন বিভীষণ আসিয়া রামকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'রাবণ আমায় অপমান করিয়াছেন, তাই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। এখন আপনার ইচ্ছা হয় আমাকে রাখুন, না হয় মারিয়া ফেলুন।'

রাম মিষ্ট কথায় তাহার ভয় দূর করিয়া বলিলেন, 'বিভীষণ, আমি রাবণকে মারিয়া তোমাকে রাজা করিব।' বিভীষণও বলিল, 'আমি প্রাণ দিয়া আপনার সাহায্য করিব।'

তখন রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'চল, আমরা এখানেই বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করি।' রাজা হইবার সময় স্নান করিতে হয়, সেই স্নানকে অভিষেক বলে। রামের কথায় লক্ষ্মণ তখনই সমুদ্রের জলে বিভীষণকে অভিষেক করিয়া তাহাকে লঙ্কার রাজা করিলেন।

তারপর সুগ্রীব আর হনুমান বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, সমুদ্র পার হইব কি করিয়া?' বিভীষণ বলিল, 'রাম যদি সমুদ্রের পূজা করেন, তবে অবশ্য সমুদ্র পার হওয়া যাইবে।'

এ কথা শুনিয়া বানরেরা তখনই পূজার জোগাড় করিয়া, সমুদ্রের ধারে কুশাসন বিছাইয়া দিল। রাম তাহাতে শুইয়া রহিলেন। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, চারি দিন রাম সেইখানে পড়িয়া আছেন, তবুও সমুদ্র তাঁহার সংবাদ লয় না। তাহা দেখিয়া রাম বলিলেন, 'এত করিয়া পূজা করিলাম, আর তুমি গ্রাহ্যই করিলে না! তোমার এতই

অহঙ্কার! আচ্ছা দাঁড়াও, তোমাকে শুদ্ধিয়া ফেলিতে কতক্ষণ লাগে।'

এই বলিয়া রাম ধনুক লইয়া তাহাতে ব্রহ্মাস্ত্র জুড়িলেন। সে অস্ত্রের তেজে চন্দ্র সূর্য অবধি কাঁপিতে লাগিল। আর সাগরও প্রাণের ভয়ে অমনি হাত জোড় করিয়া উপস্থিত হইল। তারপর সে রামের নিকট অনেক মিনতি করিয়া বলিল, 'এই নল বিশ্বকর্মার পুত্র। নল আমার উপর সেতু বাঁধিয়া দিলেই সকলে পার হইতে পারিবে। সেতু যাহাতে না ভাঙে, সেজন্য আমি এখন হইতে খুব স্থির হইয়া থাকিব।'

তখনই বানরেরা গাছ আর পাথর আনিয়া সমুদ্রের ধারে ফেলিতে লাগিল। নল কি আশ্চর্য কারিকর! সেই গাছ পাথর দিয়া একশত যোজন লম্বা সুন্দর সেতু প্রস্তুত করিতে ছয় দিনের বেশি লাগিল না। সেই সেতুর উপর দিয়া সকলে পার হইয়া লঙ্কায় আসিল।

রাম লঙ্কায় আসিয়াছেন শুনিয়া রাবণ শুক আর সারণ নামক তাহার দুইজন মন্ত্রীকে চুপি চুপি তাঁহার সৈন্য দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। শুক সারণ বানর সাজিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সে ফাঁকিতে বিভীষণ ভুলিল না। সে তখনই তাহাদিগকে ধরিয়া রামের কাছে লইয়া গেল।

শুক সারণ ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে, এ-যাত্রা আর তাহাদের রক্ষা নাই ; কেন না, শত্রুর লোক ঐরূপ চুরি করিয়া খবর লইতে আসিলে, তাহাকে মারিয়া ফেলাই দস্তুর। তাহারা রামের পায়ে পড়িয়া বলিল, 'আমরা রাবণের হুকুমে আপনার সৈন্য গণিতে আসিয়াছিলাম।'

তাহা শুনিয়া রাম হাসিয়া বলিল, 'তোমাদের কিছু ভয় নাই। যদি সৈন্য দেখা হইয়া থাকে, তবে নিশ্চিন্তে ঘরে চলিয়া যাও। আর যদি দেখা না হইয়া থাকে, তবে ভাল করিয়া দেখিয়া যাও।'

এ কথা শুনিয়া শুক সারণ রামকে কত আশীর্বাদ করিল! তারপর তাহারা গিয়া রাবণকে বলিল, 'মহারাজ, যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই। ইহারা বড় ভয়ানক বীর! সীতাকে ফিরাইয়া দিন।'

রাবণ বলিল, 'তোমরা যে ভারি ভয় পাইয়াছ! বল দেখি, এই পৃথিবীতে এমন কে আছে যে আমাকে যুদ্ধ করিয়া হারাইতে পারে?' এই বলিয়া সে ছাদে উঠিয়া দেখিতে গেল, রামের সৈন্য কিরূপ।

সাদা সাদা মেঘ আসিয়া যেমন করিয়া আকাশ ঢাকে, তেমনি করিয়া বানরেতে লঙ্কার চারিদিক ছাইয়া গিয়াছে। এই-সকল সৈন্য দেখিয়া সারণ রাবণকে কহিল, 'মহারাজ, ঐ দেখুন নীল বীর, দশ হাজার যোদ্ধা সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছে। ঐ দেখুন বালীর পুত্র অঙ্গদ, উহার সঙ্গে অনেক কোটি সৈন্য। ঐ নল, যে ঐ সেতু বাঁধিয়াছে। ঐ শ্বেত, ঐ কুমুদ, ঐ চণ্ড, ঐ সংরম্ভ, ঐ শরভ, ঐ বিনত, ঐ পনস, ঐ ক্রথন, ঐ গবয়, ঐ হয়। ঐ জাম্ববান, দেখুন তাহার সহিত কত ভাল্লুক আসিয়াছে, ঐ রম্ভ, ঐ সন্নাদন, ঐ প্রমাথী, ঐ গবাক্ষ, ঐ কেশরী, ঐ শতাবলী!'

'মহারাজ, ঐ যে শাল গাছের মতন বড় বড় বানর দাঁড়াইয়া আছে, উহারা সুগ্রীবের লোক। উহাদের বাড়ি কিষ্কিন্ধ্যায় ; উহারা সকলেই বড় বড় বীর। উহাদের মধ্যে ঐ

দুইজনার নাম মৈন্দ আর দ্বিবিদ। আর হনুমানকে বোধহয় চিনিতে পারিয়াছেন ; ঐ যে বসিয়া আছে। হনুমানের কাছে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি রাম। তাঁহার কথা আর কি বলিব! যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমনি দয়ালু, তেমনি বিদ্বান, তেমনি ধার্মিক, আর তেমনি বীর। উঁহার পাশে ঐ লক্ষ্মণ বসিয়া—সোনার মত রঙ, কোঁকড়ান কালো চুল, চওড়া বুক। দেখিতে যেমন, গুণেও তেমনি। উঁহার মতন বীর কোথাও নাই। লক্ষ্মণের পাশে ঐ দেখুন বিভীষণ বসিয়া আছেন। শুনিয়াছি, রাম নাকি তাঁহাকে লঙ্কার রাজা করিয়াছেন। ঐ সুগ্রীব, যাঁহার গলায় সোনার হার আর শরীর পাহাড়ের মতন বড়।'

'মহারাজ, এক শত লক্ষে এক কোটি হয়। লক্ষ কোটিতে এক শঙ্কু, লক্ষ শঙ্কুতে এক মহাশঙ্কু, লক্ষ মহাশঙ্কুতে এক বৃন্দ, লক্ষ বৃন্দে এক মহাবৃন্দ, লক্ষ মহাবৃন্দে এক পদ্ম, লক্ষ পদ্মে এক মহাপদ্ম, লক্ষ মহাপদ্মে এক খর্ব, লক্ষ খর্বে এক সমুদ্র, লক্ষ সমুদ্রে এক মহৌঘ। রামের সঙ্গে এইরূপ হিসাবে একহাজার কোটি, একশত শঙ্কু, একহাজার মহাশঙ্কু, একশত বৃন্দ, একহাজার মহাবৃন্দ, একশত পদ্ম, একহাজার মহাপদ্ম, একশত খর্ব, একশত সমুদ্র আর একহাজার মহৌঘ সৈন্য আসিয়াছে।'

এ-সকল দেখিয়া শুনিয়া রাবণের মনে খুবই ভয় হইল। কিন্তু সে তাহা শুক সারণকে জানিতে দিল না। বাহিরে সে যার-পর-নাই রাগ দেখাইয়া, শুক সারণকে বকিয়া সেখান হইতে তাড়াইয়া দিল।

এরপর একদিন কি হইল শুন। লঙ্কায় বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে একটা জাদুকর রাক্ষস ছিল। রাবণ তাহাকে দিয়া ঠিক রামের মাথার মতন একটা মাথা, আর তাঁহার ধনুর্বাণের মতন ধনুর্বাণ প্রস্তুত করাইল। তারপর অশোক বনে গিয়া সেই মাথা আর ধনুক সীতাকে দেখাইয়া বলিল, 'এই দেখ, তোমার রামকে আমরা মারিয়া ফেলিয়াছি। রাত্রিতে যখন তাহারা ঘুমাইতেছিল, তখন আমার সৈন্যেরা গিয়া তাহার মাথা কাটিয়াছে, আর বিভীষণকে ধরিয়া আনিয়াছে। লক্ষ্মণ পলাইয়াছে, সুগ্রীবের ঘাড় ভাঙিয়াছে, হনুমান জাম্ববান প্রভৃতি আর সকলে মরিয়া গিয়াছে। এখন আর রামের কথা ভাবিয়া কি করিবে?'

রাবণের কথা শুনিয়া আর সেই মাথা দেখিয়া সীতা ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় একটা দারোয়ান আসিয়া রাবণকে ডাকিয়া লইয়া গেল। রাবণ যাইতে না যাইতেই সেই জাদুর তৈয়ারি মুণ্ড আর ধনুক কোথায় যে মিলাইল, কিছু বুঝা গেল না।

বিভীষণের স্ত্রী সরমাকে রাবণ সর্বদা সীতার কাছে থাকিতে বলিয়াছিল। সরমা সীতাকে অত্যন্ত ভালবাসিত, আর সর্বদা তাঁহার কাছে কাছে থাকিত। রাবণ চলিয়া গেলে পরেও সীতা মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছেন দেখিয়া সরমা বলিল, 'সীতা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? রাবণের কথা সকলই মিথ্যা। যুদ্ধও হয় নাই, রামেরও কিছু হয় নাই। আমি নিজে তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি। রাক্ষসেরা বড়ই ভয় পাইয়াছে। রাম নিশ্চয় তাহাদিগকে মারিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন।' সরমা আর সীতা এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময় বানরদিগের গর্জন শুনা যাইতে লাগিল। সেই গর্জন শুনিয়া রাক্ষসেরা মনে করিল, বুঝি সর্বনাশ উপস্থিত।

রামের সৈন্য যেখানে ছিল, তাহার কাছেই সুবেল পর্বত। সেই পর্বতের উপর উঠিয়া

বানরেরা যুদ্ধের আগের রাত্রি কাটাইল। সুবেল পর্বতের উপর হইতে লঙ্কার সকলই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই পরদিন সকালে উঠিয়া সকলে সেখান হইতে লঙ্কার শোভা দেখিতে লাগিল। সেই লঙ্কার উত্তর দরজার কাছে রাবণ নিজে দাঁড়াইয়া। তাঁহার দুই পাশে চামর দুলিতেছে, মাথার উপরে সাদা ছাতা, গলায় গজমতির মালা।

রাবণকে দেখিয়া সুগ্রীবের আর সহ্য হইল না। সে তখনই এক লাফে সেই পর্বতের উপর হইতে একেবারে লঙ্কার দরজার উপর গিয়া পড়িল। আর-এক লাফে একেবারে রাবণের ঘাড়ে। ঘাড়ে পড়িয়াই হাসিতে হাসিতে তাহার মুকুটটি কাড়িয়া লইয়া মাটিতে এক আছাড়। তারপর মল্লযুদ্ধ। রাবণ সুগ্রীবকে ধরিয়া মাটিতে আছড়াইল, সুগ্রীবও রাবণকে আছড়াইল। কিল, চড়, লাথি দুইজনে দুইজনকে যে কত মারিল, তাহার লেখাজোখা নাই। এইরূপ রাবণকে অপমান আর নাকাল করিয়া, সুগ্রীব এক লাফে আবার সুবেল পর্বতে চলিয়া আসিল। লজ্জায় তখন রাবণের মুখে আর কথাটি নাই!

তারপর রামের সৈন্য পর্বত হইতে নামিয়া লঙ্কার দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। লঙ্কার কোন দরজা দিয়াই তাহারা রাক্ষসদিগের বাহির হইবার পথ রাখিল না। উত্তর দরজায় রাবণ ছিল, রাম লক্ষ্মণ নিজে গিয়া সেই দরজা আটকাইলেন। মৈন্দ, দ্বিবিদ আর নীল পূর্ব দরজা আটকাইল। ঋষভ, গবাক্ষ, গয় আর গবয়কে লইয়া দক্ষিণ দরজায় রহিল। পশ্চিম দরজায় গাছ পাথর লইয়া নিজে হনুমান। উত্তর দরজা আর পশ্চিম দরজার মাঝখানে সুগ্রীব। এইরূপে সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। এখন রাবণ বাহিরে আসিলেই হয়।

তখন রাম অঙ্গদকে রাবণের সভায় পাঠাইয়া দিলেন। রাবণ পাত্র মিত্র লইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় অঙ্গদ সেখানে গিয়া উপস্থিত। সেখানে গিয়া সে রাবণকে বলিল, 'আমি শ্রীরামের দূত, আমার নাম অঙ্গদ। আমার পিতার নাম বালী। তাঁহার কথা বোধহয় তোমার এখনও মনে আছে। রাম বলিলেন তুমি শীঘ্র বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ কর। তিনি তোমাকে বধ করিয়া বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিবেন।'

এখানে একটা হাসির কথা বলি। অঙ্গদ যে রাবণকে তাহার পিতার নাম বলিয়া 'তাহার কথা বোধহয় তোমার এখনও মনে আছে' বলিল, তাহার কারণ কি জান? রাবণ একবার বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া বড়ই নাকাল হইয়াছিল। রাবণ সকলকে যুদ্ধে হারাইয়া ত্রিভুবন ঘুরিয়া বেড়াইত, আর কেহ তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহস করিত না। যুদ্ধ করিবার আর লোক না পাইয়া শেষে সে একদিন বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেল। বালী তখন সমুদ্রের ধারে চোখ বুজিয়া সন্ধ্যা করিতেছিল। রাবণ মনে করিল, 'এই বেলা উহাকে জড়াইয়া ধরিয়া জব্দ করি। চোখ বুজিয়া আছে, দেখিতে পাইবে না।' এই বলিয়া ত সে পিছন দিক হইতে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু প্রাণপণে টানাটানি করিয়াও তাহাকে নাড়িতে পারিল না। ততক্ষণে বালী সন্ধ্যা সারিয়া, রাবণ মহাশয়কে পাখিটির মত খপ্ করিয়া বগলে পুরিয়া বসিয়াছে। বালী পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারি সমুদ্রের ধারে বসিয়া চারিবার সন্ধ্যা করিত। সবে তখন তাহার একবার সন্ধ্যা শেষ হইয়াছিল ; সুতরাং সে রাবণকে বগলে করিয়াই আরও তিনবার সন্ধ্যা করিল। এদিকে

সেই বগলের চাপে, গরমে, ঘামে আর গন্ধে বেচারা চ্যাপ্টা হইয়া, সিদ্ধ হইয়া, দম আটকাইয়া, পেট ঢাক হইয়া নাকালের একশেষ। মরে নাই কেবল ব্রহ্মার বরে। তাই অঙ্গদ এখন বলিল, 'বোধহয় মনে আছে।'

তাহা শুনিয়া রাবণ বলল, 'এই মুর্খকে এখনই টুকরা টুকরা করিয়া কাট্ ত রে।' এই কথা বলিতে বলিতেই চারিটা রাক্ষস আসিয়া অঙ্গদকে ধরিয়া ফেলিল। অঙ্গদও সেই চারিটা রাক্ষসকে বগলে লইয়া এক লাফে একেবারে ছাদের উপরে। সেখান হইতে রাক্ষসগুলিকে আছড়াইয়া ফেলিয়া আর ছাদখানিকে গুঁড়া করিয়া, আর এক লাফে সে রামের কাছে আসিয়া হাজির।

ইহার পর দুই দলে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কত রাক্ষস আর কত বানর যে মরিতে লাগিল, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। চারিদিকে মার মার, কাট কাট, ধুপ ধাপ, ঘড় ঘড়, ঝন ঝন, ঠকাঠক, ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল, রাত্রিতেও তাহার শেষ নাই। যুদ্ধের স্থানে মরা রাক্ষস আর বানরের পাহাড় হইয়া গেল, রক্তের নদী বহিয়া চলিল, তবুও যুদ্ধের বিরাম নাই।

এক স্থানে পাঁচটা সেনাপতি অসংখ্য রাক্ষস লইয়া বড়ই গর্জন করিতে করিতে রামের সহিত যুদ্ধ জুড়িয়াছে। আবার দেখিতে দেখিতে রামের বাণ খাইয়া পাঁচজনেই পলাইবার পথ পাইতেছে না।

আর এক স্থানে অঙ্গদ আর ইন্দ্রজিতে যুদ্ধ। অঙ্গদ লাথি মারিয়া, ইন্দ্রজিতের সারথি আর ঘোড়া চ্যাপ্টা করিয়া দিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ দেখিল, সামনে থাকিয়া যুদ্ধ করিলে বড়ই বিপদ। কাজেই তখন সে মেঘের আড়ালে লুকাইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এইরূপ যুদ্ধ করিবার বর সে শিবের নিকট পায়। যখন সে মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করিত, তখন কেহই তাহাকে দেখিতে পাইত না। কাজেই তখন তাহাকে কেহই মারিতে পারিত না; কিন্তু সে নিজে অন্য সকলকে বাণ মারিয়া অস্থির করিত।

মেঘের আড়ালে থাকিয়া দুষ্ট ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষ্মণের গায় নাগপাশ বাণ মারিল। সে বাণ ছুঁড়িবামাত্রই বড় বড় সাপ আসিয়া তাঁহাদিগকে জড়াইয়া ফেলিল। ইন্দ্রজিতকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহারা তাহা আটকাইতে পারিলেন না।

এইরূপে সে রাম লক্ষ্মণকে সাপের বাঁধনে বাঁধিয়া তাঁহাদের উপর এমনি নিষ্ঠুর বাণ মারিতে লাগিল যে তাঁহাদের শরীরে একটুও স্থান রহিল না, যেখানে বাণ বিঁধে নাই। সেই ভয়ানক বাণের যন্ত্রণায় তাঁহারা অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ হাসিতে হাসিতে গিয়া রাবণকে বলিল, 'বাবা, রাম লক্ষ্মণকে মারিয়া আসিয়াছি।'

এদিকে সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ, হনুমান, জাম্ববান প্রভৃতি সকলে রাম লক্ষ্মণকে ঘিরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বানরদিগের মধ্যে সুষেণ ভাল ঔষধ জানিত। সে বলিল, 'ক্ষীরোদ সাগরের তীরে বিশল্যকরণী আর সঞ্জীবনী নামক ঔষধ আছে। চন্দ্র আর দ্রোণ নামক পর্বতের উপরে সেই ঔষধ পাওয়া যায়। শীঘ্র তাহা লইয়া আইস।'

এমন সময় ভয়ানক ঝড় উঠিয়া গাছপালা ভাঙিতে লাগিল, অজগরেরা তাড়াতাড়ি গর্তের ভিতরে লুকাইতে চলিল, সমুদ্রের জন্তু আর আকাশের পক্ষীসকল ভয়ে অস্থির

হইয়া উঠিল। গোলমাল শুনিয়া সকলে চাহিয়া দেখিল, গরুড় আসিতেছে। তাহারই পাখার বাতাসে এরূপ কাণ্ড উপস্থিত। গরুড়কে দেখিয়াই ইন্দ্রজিতের সাপেরা ভাবিল, 'সর্বনাশ! আমাদের যম আসিয়াছে!' তখন তাহারা রাম লক্ষ্মণকে ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে। গরুড়কে সাপেরা বড়ই ভয় করে, কারণ সে সাপ দেখিলেই ধরিয়া খায়।

গরুড় রাম লক্ষ্মণের গায় হাত বুলাইয়া দিবামাত্রই, তাঁহাদের শরীরের সকল জ্বালা চলিয়া গেল, এমন-কি, বাণের দাগ পর্যন্ত রহিল না। তখন দুই ভাই আবার সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহাদের বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহাদের জোর আর সাহস দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

গরুড়কে দেখিয়া রাম বলিলেন, 'পাখি, তুমি কে? বড়ই ভয়ানক বিপদ হইতে তুমি আমাদিগকে বাঁচাইলে!' গরুড় বলিল, 'আমার নাম গরুড়, ইন্দ্রজিৎ তোমাদিগকে বাঁধিয়াছে শুনিয়া তাড়াতাড়ি এখানে আসিয়াছি। তোমাদিগকে আমি বড়ই ভালবাসি। এখন যাই, এই যুদ্ধে তোমরা নিশ্চয় জিতিবে।' এই কথা বলিয়া গরুড় চলিয়া গেল। রাম লক্ষ্মণকে সুস্থ দেখিয়া, বানরদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সে আনন্দে তাহারা কোলাহল করিয়া লঙ্কা কাঁপাইয়া তুলিল।

বানরের কোলাহল শুনিয়া রাবণ বলিল, 'রাম লক্ষ্মণ ত মরিয়া গিয়াছে, তবে আবার বানরদিগের কিসের কোলাহল? দেখ ত বিষয়টা কি!' রাক্ষসেরা দেখিয়া আসিয়া বলিল, 'মহারাজ, ইন্দ্রজিৎ যাহা করিয়াছিলেন, সব মাটি। রাম লক্ষ্মণ নাগপাশের বাঁধন ছাড়াইয়া আবার উঠিয়া বসিয়াছে।' রাবণ তাহা শুনিয়া বলিল, 'বল কি? তবেই ত সর্বনাশ!' এই বলিয়া সে রাম লক্ষ্মণকে মারিবার জন্য তাড়াতাড়ি ধূম্রাক্ষকে পাঠাইয়া দিল।

গাধার মুখ সিংহের আর বাঘের মতন হইলে সে জানোয়ার দেখিতে কেমন বিকট হয়? সেইরূপ গাধায় ধূম্রাক্ষের রথ টানিত। সেই রথে চড়িয়া ধূম্রাক্ষ যুদ্ধ করিতে চলিল। সঙ্গে বর্ম-আঁটা সিপাহী সৈন্য, হাতি, ঘোড়া, মুষল, মুদ্গর, পরিঘ, পট্টিশ, ভিন্দিপালের আর শেষ নাই। রাক্ষসদের যেমন গর্জন, তেমনি রাগ। যেন এক-একটা ভূত আর কি। পশ্চিম দরজায় হনুমানের পাহারা ; রাক্ষসেরা দাঁত কড়মড় করিতে করিতে মার মার শব্দে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রথমে হনুমানের দলের ছোট ছোট বানরদিগের সহিত রাক্ষসদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষসদিগের অস্ত্র ধনুক বাণ, শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর প্রভৃতি। বানরদিগের অস্ত্র গাছ আর পাথর। যুদ্ধের সময় বানর আগে নিজের নামটি বলে, তারপর 'জয়রাম' শব্দে গাছ পাথর উঠাইয়া ধাঁই করিয়া রাক্ষসের মাথা ফাটায়। কেহ বা কিল চড় মারিয়া তাহাদের ছাতি ভাঙিয়া দেয়, নখে আঁচড়াইয়া নাক, কান ছিঁড়িয়া আনে। এইরূপে মার খাইয়া রাক্ষসেরা কিছুতেই বানরদিগের সামনে টিকিতে পারিল না।

তাহা দেখিয়া ধূম্রাক্ষ এমনি তেজের সহিত বানরদিগকে তাড়া করিল যে, তাহারা পলাইবার পথ পায় না। যাহা হউক, হনুমানের সামনে এত বাহাদুরি আর কতক্ষণ থাকে? হনুমান তাহাকে এমনি এক পর্বতের চূড়া ছুঁড়িয়া মারিল যে, তাহাতে তাহার রথখানি

একেবারে চুরমার হইয়া গেল। ইহার আগেই সে গদা হাতে করিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, তাই রক্ষা ; নহিলে তাহাকেও রথের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইত। ততক্ষণে হনুমান গাছ দিয়া অন্যান্য রাক্ষসগুলিকে শেষ করিয়া দিয়াছে। কেবল গদা হাতে ধূম্রাক্ষই বাকি। সেটা বড়ই ভয়ঙ্কর গদা ; তাহার গায় বড় বড় কাঁটা! কিন্তু ভয়ঙ্কর হইলেও, তাহা দিয়া সে হনুমানের কিছু করিতে পারিল না। বরং হনুমানই পর্বতের চূড়া দিয়া তাহার মাথা গুঁড়া করিয়া দিল। ধূম্রাক্ষের পরে যে যুদ্ধ করিতে আসিল, তাহার নাম বজ্রদংষ্ট্র। বজ্রদংষ্ট্র অনেক যুদ্ধ করিয়া, শেষে অঙ্গদের হাতে মারা গেল।

বড় বড় রাক্ষসেরা যুদ্ধ করিতে আসে আর বানরেরা তাহাদিগকে মারিয়া শেষ করে। এইরূপে অকম্পন যুদ্ধে আসিয়া হনুমানের হাতে, নরান্তক দ্বিবিদের হাতে, কুম্ভহনু জাম্ববানের হাতে আর প্রহস্ত নীলের হাতে প্রাণ দিল। রাক্ষস মারিয়া বানরদিগের আনন্দের সীমা নাই। আর যুদ্ধে যাহারা জয়লাভ করিল, তাহাদের প্রশংসার শেষ নাই।

এদিকে লঙ্কায় আবার যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিল, আর দেখিতে দেখিতে আবার অসংখ্য রাক্ষস যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল। এত রাক্ষস দেখিয়া রাম বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজা বিভীষণ, এত সৈন্য এত অস্ত্র লইয়া কে আসিল?'

বিভীষণ বলিল, 'ঐ যাহার রথের নিশানে সিংহের চেহারা দেখিতেছেন, সে ইন্দ্রজিৎ। আর ঐ যাহার খুব লম্বা চওড়া শরীর, তাহার নাম অতিকায়। সেও রাবণের পুত্র। ঐ যে হাতির গলায় ঘণ্টার শব্দ হইতেছে, তাহার উপরে মহোদর। ঐ যে লাল রঙের যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়িয়া আছে, তাহার নাম পিশাচ। শূল হাতে ষাঁড়ের উপর চড়িয়া যে আসিতেছে, উহার নাম ত্রিশিরা। যাহার নিশানে সাপের ছবি, সে কুম্ভ। আর যাহার হাতে পরিঘ রহিয়াছে, সে নিকুম্ভ। ঐ যাঁহার মাথায় মুকুট আর উপরে সাদা ছাতা, তিনি নিজে রাবণ।'

রাম বলিলেন, 'রাবণ আসিয়াছে? ভালই হইয়াছে! আজ সীতাকে চুরি করিয়া আনিবার শাস্তিটা উহাকে দিতে হইবে।'

রাবণকে দেখিয়া সুগ্রীব একটা পর্বতের চূড়া ছুঁড়িয়া মারিল। রাবণ সেই পর্বত কাটিয়া সুগ্রীবকে এমনই এক বাণ মারিল যে তাহাতে সে চিৎকার করিয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া জ্যোতিমুখ, গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ আর নল ছুটিয়া যুদ্ধ করিতে আসিল। কিন্তু তাহাদের সাধ্য কি যে রাবণের সম্মুখে টিকিয়া থাকে! বাণের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বানরেরা একেবারে রামের কাছে গিয়া উপস্থিত। তখন রাম নিজেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এমন সময় লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদা, আমি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিব।'

এদিকে হনুমান ছুটিয়া গিয়া রাবণকে বলিল, 'আজ এই এক কিলে তোর প্রাণ বাহির করিয়া দিব!'

রাবণ বলিল, 'মার্ দেখি তোর কত জোর!' এই বলিয়া সে আগেই হনুমানের বুকে এক চড় মারিল। হনুমানের খুব লাগিল বটে, কিন্তু সে সামলাইয়া উঠিয়া রাবণের বুকে এক চড় মারিয়া তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া দিল। আবার রাবণ একটু সুস্থ হইয়া হনুমানের বুকে এমন এক কিল মারিল যে হনুমান সহজে তাহার চোট সামলাইয়া উঠিতে পারিল না।

ততক্ষণে রাবণ হনুমানকে ছাড়িয়া নীলের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। রাবণ বাণ মারে আর নীল গাছ পাথর মারে। ইহার মধ্যে নীল হঠাৎ খুব ছোট্টটি হইয়া কখন গিয়া রাবণের রথের নিশানে উঠিয়াছে। সেখান হইতে রাবণের মুকুটে, সেখান হইতে তাহার ধনুকের আগায়। এমনি করিয়া সে তাহাকে কি যে ব্যস্ত করিয়া তুলিল, তাহা বলিবার নহে। তাহা দেখিয়া বানরেরা যত হাসে, রাবণের রাগ ততই বাড়িয়া যায়। শেষে সে অগ্নিবাণে নীলকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া, লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

লক্ষ্মণ আর রাবণের অনেকক্ষণ খুব যুদ্ধ হইল। রাবণ বাণ মারে, লক্ষ্মণ তাহা কাটেন। আবার লক্ষ্মণ বাণ মারেন, রাবণ তাহা কাটে। একবার ব্রহ্মার দেওয়া একটা বাণ মারিয়া রাবণ লক্ষ্মণকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। কিন্তু লক্ষ্মণ তখনই আবার সুস্থ হইয়া রাবণের ধনুক কাটিয়া, তারপর তিন বাণে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ছাড়িলেন।

তারপর রাবণের আবার জ্ঞান হইলে সে একটা শক্তি হাতে লইল। এই শক্তিও ব্রহ্মা তাহাকে দিয়াছিলেন। ইহা অতি ভয়ানক অস্ত্র! লক্ষ্মণ বাণ মারিয়া তাহা কাটিলেন, তবুও সেটা আসিয়া তাঁহার বুকে বিঁধিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। তখন রাবণ তাড়াতাড়ি লক্ষ্মণকে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার সাধ্য কি যে তাঁহাকে নাড়ে! ততক্ষণে হনুমান আসিয়া তাহার বুকে অমনি এক কিল মারিল যে, তেমন কিল আর সে কখনও খায় নাই। কিলের চোটে রাবণ রক্ত বমি করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া গেল।

এদিকে হনুমান লক্ষ্মণকে কোলে করিয়া রামের নিকট লইয়া আসিয়াছে। সেখানে তাঁহার বুক হইতে শক্তি খসিয়া পড়িবামাত্রই তিনি সুস্থ শরীরে উঠিয়া বসিলেন। ততক্ষণে রাবণও আবার উঠিয়া ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করাতে, রাম নিজেই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলেন। তাহা দেখিয়া হনুমান বলিল, 'আমার পিঠে চড়িয়া যুদ্ধ করুন।'

হনুমানের উপর রাবণের আগে হইতেই বিষম রাগ। কাজেই এবার তাহাকে বাগে পাইয়া সে খুব করিয়া বাণ মারিতে ছাড়িল না। কিন্তু খালি হনুমানকে বাণ মারিলে কি হইবে? রামকে আটকাইতে পারিলে তবে ত হয়! তাহার রথ ঘোড়া সারথি সকলই কাটিয়া শেষ করিয়াছেন, এখন তাহার নিজের প্রাণটি লইয়া টানাটানি। ইহারই মধ্যে তাহার মুকুট গিয়াছে, আর সে নিজে এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার আর ধনুক ধরিবারও ক্ষমতা নাই। তাহা দেখিয়া রাম বলিলেন, 'তোমার বড়ই পরিশ্রম হইয়াছে দেখিতেছি। আচ্ছা, আজ তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর, তারপর অন্য সময়ে দেখা যাইবে।' তখন রাবণ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া লঙ্কার ভিতর চলিয়া গেল।

এখন রাবণ করে কি? সিংহাসনে বসিয়া সে চিন্তা করিতেছে, চারিদিকে রাক্ষসেরা দাঁড়াইয়া। তাহাদের দিকে চাহিয়া রাবণ বলিল, 'এত করিয়া শেষটা কিনা আমাকে মানুষের কাছে হারিতে হইল। পূর্বে যখন তপস্যা করিতে গেলাম, তখন ব্রহ্মা বর দিতে আসিলেন। আমি বলিলাম, "দেবতা অসুর যক্ষ রাক্ষস ইহাদের কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না; এই বর আমাকে দিন।" ব্রহ্মা আমাকে সেই বরই দিলেন। মানুষের কথা তখন আমি ভাবি নাই, কাজেই বর লইবার সময় তাহার কথা বলি নাই। সেইজন্যই ত

এই বিপদ! আমি কি জানি যে মানুষ এমন ভয়ানক হইতে পারে! তোমরা শীঘ্র গিয়া কুম্ভকর্ণকে জাগাও, সে যদি রাম লক্ষ্মণকে মারিতে পারে।'

কুম্ভকর্ণ রাবণের ভাই। রাবণেরা তিন ভাই ছিল। রাবণ বড়, তারপর কুম্ভকর্ণ, তারপর বিভীষণ। ইহারা বিশ্রবা মুনির পুত্র। ইহাদের মাতার নাম কৈকসী। বিশ্রবার আর এক পুত্রের নাম কুবের। রাবণ আর কুম্ভকর্ণ জন্মিবার পূর্বেই বিশ্রবা কৈকসীকে বলিয়াছিলেন, 'এ দুটো ভয়ঙ্কর রাক্ষস হইবে।' কিন্তু বিভীষণের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'এটি ধার্মিক হইবে।' আসলেও তাহারা তেমনি হইল। রাবণের আর কুম্ভকর্ণের জ্বালায় লোক স্থির থাকিতে পারিত না। রাবণের চেয়ে কুম্ভকর্ণটা বেশি দুষ্ট ছিল। মুনিদিগকে পাইলেই সে দুষ্ট ধরিয়া খাইত।

একদিন কৈকসী কুবেরকে দেখাইয়া রাবণকে বলিলেন, 'দেখ্ দেখি, ও কেমন ভাল। তুই বাছা এমনি হইলি কেন?' রাবণ বলিল, 'দেখ না মা, আমি ওর চেয়ে বেশি হইব!' এই বলিয়া সে কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণকে লইয়া তপস্যা আরম্ভ করিল।

সে কি যেমন-তেমন তপস্যা! দশ হাজার বৎসর চলিয়া গেল, তবুও তাহাদের তপস্যা ফুরাইল না। দশ হাজার বৎসর তপস্যার পর ব্রহ্মা আসিয়া রাবণকে বলিলেন, 'রাবণ, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর লহ।'

রাবণ বলিল, 'এই বর দিন যে আমার মৃত্যু হইবে না।'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'এই বর দিতে পারিব না, অন্য বর চাহ।'

রাবণ বলিল, 'তবে এই বর দিন যে, সর্প যক্ষ দৈত্য রাক্ষস আর দেবতা—ইহাদের কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না। ইহা ছাড়া মানুষ আর অন্য-অন্য যে-সকল জন্তু আছে, তাহাদের ভয় আমার নাই।' ব্রহ্মা কহিলেন, 'আচ্ছা, তাহাই হউক। আর ইহা ছাড়া এই বরও দিতেছি যে, তোমার যখন যেরূপ ইচ্ছা হইবে, তুমি সেইরূপ চেহারা করিতে পারিবে।'

তারপর ব্রহ্মা বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি বর চাহ?'

বিভীষণ বলিল, 'আমাকে দয়া করিয়া এই বর দিন যে, আমার যেন সকল সময়েই ঈশ্বরেতে আর ধর্মেতে মতি থাকে।'

তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হইবে। আর তাহা ছাড়া, তুমি অমর হইবে।' এই বলিয়া তিনি কুম্ভকর্ণকে বর দিতে চাহিলেন।

এমন সময় দেবতারা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, 'দোহাই ঠাকুর, এই হতভাগাকে বর দিবেন না! ইহার জ্বালায় আমরা অস্থির হইয়াছি! এই দুষ্ট ইহারই মধ্যে সাতটা অপ্সরা, ইন্দ্রের দশ জন চাকর আর তাহা ছাড়া বিস্তর মুনি ঋষি খাইয়া ফেলিয়াছে। বর না পাইতেই এমন, বর পাইলে কি আর কাহাকেও রাখিবে?'

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মা, তুমি গিয়া উহার বুদ্ধি নাশ করিয়া দাও।'

ব্রহ্মার কথায় সরস্বতী তখনই কুম্ভকর্ণের মনের ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন আর তাহাতেই তাহার মাথায় এমনি গোল লাগিয়া গেল যে, সে আর বুঝিয়া সুঝিয়া ব্রহ্মার সহিত কথা

কহিতে পারিল না।

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কুম্ভকর্ণ, কি বর চাহ?'

কুম্ভকর্ণ বলিল, 'আমি দিনরাত খালি ঘুমাইতে চাহি।'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'বেশ কথা, তাহাই হউক।'

কুম্ভকর্ণের কথা অগস্ত্য মুনি এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার কথা বিভীষণ যাহা বলিয়াছে, তাহা অন্য রূপ। বিভীষণ বলে যে, কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত দুষ্ট ছিল বলিয়া ব্রহ্মা নিজেই তাহাকে শাপ দিয়াছিলেন, 'তুই ছয় মাস ঘুমাইবি আর একদিন জাগিয়া থাকিবি।'

যাহা হউক, সে-অবধি কুম্ভকর্ণ কেবলই ঘুমায়। সেই কুম্ভকর্ণকে এখন রাক্ষসেরা জাগাইতে চলিল।

একটা পর্বতের গুহার ভিতরে কুম্ভকর্ণের শুইবার ঘর। ঘরখানি অতি সুন্দর। তাহার মেঝে সোনার আর দেয়ালের কারিকুরি অতি আশ্চর্য। গুহাটি এক যোজন চওড়া আর তাহার দরজাও তেমনি বড়। বড় দরজা না হইলে কুম্ভকর্ণ ঘরে ঢুকিবে কি করিয়া? তাহার শরীর এতই বড় যে, বিছানায় শুইয়া থাকিলেও তাহাকে একটা পর্বতের মতন দেখা যায়। তাহার নাকের নিঃশ্বাসে ঝড় বহে। সেই ঝড়ের চোটে রাক্ষসেরা ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া যায়।

প্রথমে অনেক শুয়োর, হরিণ, মহিষ প্রভৃতি জন্তু আর কলসী কলসী রক্ত আনিয়া কুম্ভকর্ণের কাছে পাহাড়ের মতন করিয়া রাখা হইল। ঘুম হইতে উঠিয়া তাহার বিষম ক্ষুধা হইবে। তখন আর কিছু না পাইলে যাহারা জাগাইতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে ধরিয়াই হয়ত মুখে দিবে। কাজেই আহার যোগাড়টি সকলের আগে আর বেশ ভালরকম হওয়া চাই।

তারপর তাহার গায় চন্দন লেপিয়া আর ঘরে ধূপ জ্বালাইয়া রাক্ষসেরা নানারকম শব্দ করিতে লাগিল। বড় বড় শঙ্খ, যাহার একটার আওয়াজ শুনিলে প্রাণ চমকিয়া যায়, তাহার কয়েক শত আনিয়া তাহারা একসঙ্গে বাজাইল। আবার কয়েক শত রাক্ষস মিলিয়া প্রাণপণে চিৎকার করিল। না জানি তখন ব্যাপারখানা কিরকম হইয়াছিল। রাক্ষসের চিৎকার ত সহজ চিৎকার নহে, তাহার কাছে শঙ্খ কোথায় লাগে! সেই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আবার বাহু চাপড়াইবার ঘোরতর চটাপট শব্দ!

এই সকল বিকট শব্দ তাহারা সকলে মিলিয়া একসঙ্গে করিয়াছিল। সে কি যেমন-তেমন কোলাহল! আকাশের পাখি তাহা শুনিলে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। এমনিতর শব্দ করিয়া তাহারা প্রাণপণে কুম্ভকর্ণের গায় নাড়া দিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম তাহাতে ভাঙিল না।

তারপর দশ হাজার রাক্ষস মিলিয়া তাহাকে প্রাণপণে কিল, গদার বাড়ি আর পাথরের গুঁতা মারিয়াও জাগাইতে পারিল না। বরং তাহাতে তাহার আরাম বোধ হওয়ায় সে এমনই নাক ডাকাইতে লাগিল যে, তাহার নিঃশ্বাসের সামনে টিকিয়া থাকাই ভার!

তখন সকলে একসঙ্গে গর্জন করিয়া শঙ্খ, ভেরী ও ঢাকের বাদ্য আর মুগুরের গুঁতা হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহার উপর আবার অনেক হাতি, ঘোড়া আর উট আনিয়া তাহাকে

মাড়াইল। তাহাতেও যখন তাহার ঘুম ভাঙিল না, তখন তাহার চুল ছিঁড়িয়া, কান কামড়াইয়া আর কানের ভিতর জল ঢালিয়া তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিল। শতঘ্নী আনিয়া তাহাকে মারিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণ কিছুতেই জাগিল না।

শেষে তাহারা একেবারে এক হাজার হাতি দিয়া তাহাকে মাড়াইতে আরম্ভ করিল। এইবার কুম্ভকর্ণের বোধ হইল, যেন কেহ অতিশয় আদরে তাহার গা টিপিয়া দিতেছে। তখন সে চক্ষু মেলিয়া বসিয়া হাই তুলিল।

সে হাই তোলা দেখিয়া কি আর কাহারও সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে ভরসা হয়? রাক্ষসেরা তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে সেই শুয়োর ও মহিষের ঢিপি দেখাইয়া দিয়াই, অমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া দূরে চলিয়া গেল। কুম্ভকর্ণও মাংসের পর্বত আর রক্তের কলসীসকল সামনে পাইয়া তাহা শেষ করিয়া দিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না।

রাক্ষসেরা এতক্ষণ ভয়ে-ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। যখন তাহারা দেখিল যে কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা কমিয়াছে, তখন তাহার কাছে আসিয়া নমস্কার করিল। তখনও কুম্ভকর্ণের চোখে ঘুম রহিয়াছে। সে খানিক রাক্ষসদিগের দিকে ঢুলু-ঢুলু চোখে বোকার মতন তাকাইয়া রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে জাগাইলে কেন! কোন বিপদ হইয়াছে নাকি?'

সেখানে মন্ত্রী যূপাক্ষ ছিল। সে হাত জোড় করিয়া বলিল, 'মানুষ আর বানর আসিয়া লঙ্কা ছারখার করিয়াছে!' তাহা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ বলিল, 'তবে আমি আগে সেই মানুষ আর বানরগুলিকে খাইয়া, তারপর দাদার সঙ্গে দেখা করিব।' রাক্ষসেরা কহিল, 'আগে রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া তারপর যুদ্ধ করিতে গেলেই ভাল হয়।' তখন কুম্ভকর্ণ রাবণের সঙ্গে দেখা করিতে চলিল।

যাইবার সময় তাহার সেই বিশাল শরীর আর বিকট চেহারা দেখিয়া বানরেরা যে কি ভয় পাইয়াছিল, তাহা কি বলিব! তাহাদের কেহ রামের কাছে গিয়া আশ্রয় লইল, কেহ ভয়ে মাটিতে শুইয়া পড়িল। অন্যেরা দুই লাফে কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিক নাই। তখন রাম বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওটা আবার কি হে? এরূপ জন্তু ত আর কখনও দেখি নাই! এটা রাক্ষস, না দৈত্য?'

বিভীষণ বলিল, 'ইনি বিশ্রবা মুনির পুত্র, নাম কুম্ভকর্ণ। ইনি জন্মিয়াই এত জন্তু ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করেন যে ইঁহার ভয়ে সকলে ইন্দ্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। ইন্দ্র তখন কুম্ভকর্ণকে বজ্র দিয়া মারিলেন। কুম্ভকর্ণও ঐরাবতের দাঁত ছিঁড়িয়া লইয়া, তাহার ঘায় ইন্দ্রকে অজ্ঞান করিয়া দিলেন।'

'কুম্ভকর্ণের অত্যাচার দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি কেবল ঘুমাইবে।" ইহাতে পৃথিবীর লোক খুবই আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু রাবণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, "প্রভু, কুম্ভকর্ণ আপনার নাতির পুত্র। তাহাকে কি এমন করিয়া শাস্তি দিতে হয়? ইহার জাগিবার উপায় করিয়া দিন।" তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "আচ্ছা, ও ছয় মাস ঘুমাইবে, তারপর একদিন জাগিয়া থাকিবে।" রাবণ আজ বড়ই ভয় পাইয়া সেই কুম্ভকর্ণকে জাগাইয়াছেন।'

এই কথা শুনিয়া রাম বানরদিগকে বলিলেন, 'তোমরা সাবধান হইয়া যুদ্ধের জন্য

প্রস্তুত থাক।' বানরেরা বড় বড় পর্বতের চূড়া হাতে করিয়া লঙ্কার দরজা আটকাইয়া রহিল।

এদিকে কুম্ভকর্ণ রাবণের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ, আমাকে কেন জাগাইয়াছেন? কি করিতে হইবে?'

রাবণ বলিল, 'ভাই, তুমি খালি ঘুমাও, কোন খবর ত রাখ না! ইহার মধ্যে দশরথের পুত্র রাম বানর লইয়া আসিয়া লঙ্কা ছারখার করিয়া দিল। বড় বড় বীরেরা তাহাদের হাতে মারা গিয়াছে। লঙ্কায় কি আর যোদ্ধা আছে! তাই তোমাকে জাগাইয়াছি। তুমি যদি ইহাদিগকে মারিতে পার, তবেই রক্ষা।'

তারপর সকল কথা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ বলিল, 'না বুঝিয়া শুনিয়া কাজ করিয়াছেন, তাহাতেই ত এত বিপদ! লোকে এত করিয়া আপনাকে বুঝাইল, আপনি তাহা শুনিলেনই না। বিভীষণ যাহা বলিয়াছিল, সেরূপ করিলে কি এমন হইত?' তাহাতে রাবণ রাগিয়া বলিল, 'তোমার এত কথায় কাজ কি? যাহা বলিতেছি, তাহাই কর। জান না, আমি তোমার দাদা? বড় যে উপদেশ দিতে আসিয়াছ!'

তাহা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ কহিল, 'আমি যাহা ভাল মনে করিয়াছি, তাহাই বলিয়াছি। দাদা হইলে কি আর তাহাকে ভাল কথা বলিতে নাই? যাহা হউক, আমি থাকিতে আপনার কিসের ভয়? এখনই আমি এগুলিকে মারিয়া দিতেছি।'

তখন রাবণ যার-পর-নাই খুশি হইয়া বলিল, 'ভাই, তোমার মত বীর আর কে আছে? তাই ত ইহাদিগকে মারিবার জন্য তোমাকে জাগাইয়াছি। শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও! শীঘ্র গিয়া রাম লক্ষ্মণ আর তাহাদের সৈন্যদিগকে খাইয়া আইস।'

তারপর রাবণ নিজ হস্তে কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধের পোশাক পরাইয়া দিল। তাহার সঙ্গে কত সৈন্য দিল, তাহার সংখ্যা নাই। যখন কুম্ভকর্ণ গর্জন করিয়া শূল হাতে লঙ্কা হইতে বাহির হইল, তখন বানরেরা ত তাহাকে দেখিয়া 'বাবা গো' বলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দে ছুট! একবার দেখিয়া আর তাহারা দুইবার দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না।

অঙ্গদ কি সহজে তাহাদিগকে বকিয়া ফিরাইতে পারে! একবার অনেক কষ্টে তাহারা ফিরিয়াছিল, কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর জন্তুর সামনে টিকিয়া থাকা ত সহজ কাজ নহে! যম পাহাড় সাজিয়া যুদ্ধ করিতে আসিলে তাহাকেও দুই চারিটা পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে পারে, এমন সাহস হয়ত তাহাদের ছিল। কিন্তু এ আপদ যে যমের চেয়েও ভয়ঙ্কর! কারণ, এ হতভাগা বানর দেখিলেই মিঠাই মণ্ডার মতন তুলিয়া মুখে দেয়! যম ত তাহা করে না। যাহা হউক, এরূপ ভয় খালি ছোট মর্কটগুলাই পাইল, বড় বানরেরা নহে।

বড়দের মধ্যে দ্বিবিদ পাহাড় ছুঁড়িয়া অনেক রাক্ষস মারিল। হনুমানও পর্বতের চূড়া আর গাছ লইয়া কুম্ভকর্ণের সহিত কম যুদ্ধ করে নাই। কিন্তু কুম্ভকর্ণের শূলের কাছে তাহার গাছ পাথর কিছুই করিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া হনুমান রাগের ভরে একটা প্রকাণ্ড পর্বতের চূড়া দিয়া ঠুকিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া দিল। কুম্ভকর্ণও আবার একটু সুস্থ হইয়া, হনুমানের বুকে এমন এক শক্তির ঘা মারিল যে হনুমান বেদনায় চেঁচাইয়া অস্থির।

ইহার পর ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ, আর গন্ধমাদন এই পাঁচজন মিলিয়া কুম্ভকর্ণকে

মারিতে গেল। কিন্তু তাহারা কুম্ভকর্ণের কি করিবে! তাহারা প্রাণপণ করিয়া আঁচড়, কামড়, লাথি, কিল, গাছ, পাথর যত মারে, কুম্ভকর্ণের তাহাতে বেশ আরামই বোধ হয়—যেন কেহ তাহার ঘামাচি মারিয়া দিতেছে। তারপর কুম্ভকর্ণ যখন তাহাদিগকে বগলে ফেলিয়া চাপিতে আর ঠুকিতে আরম্ভ করিল, তখন বেচারাদের দুর্দশার শেষ রহিল না।

হাজার হাজার বানর কুম্ভকর্ণকে একসঙ্গে আক্রমণ করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিল না। কুম্ভকর্ণ তাহাদিগকে ধরিয়া অমনি মুখে দেয়। অনেক বানর আবার তাহার মুখের ভিতর ঢুকিয়া নাকের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়াও আসে।

তারপর অঙ্গদ অনেক যুদ্ধ করিল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। একবার সে বুকে চড় মারিয়া কুম্ভকর্ণকে অজ্ঞান করিয়াছিল বটে, কিন্তু কুম্ভকর্ণও তখনই আবার লাফাইয়া উঠিয়া, এক কিলে অঙ্গদকে অজ্ঞান করিয়া দিল।

অঙ্গদকে অজ্ঞান দেখিয়া সুগ্রীব পাহাড় হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে পাহাড় যে কুম্ভকর্ণের গায় লাগিয়া গুঁড়া হইয়া গেল, তাহা বোধহয় বলিবার আগেই বুঝিয়াছ। তারপর শূল দিয়া সে সুগ্রীবকে এমনি এক ঘা মারিবার যোগাড় করিয়াছিল যে হনুমান তাড়াতাড়ি শূলটা ভাঙিয়া না ফেলিলে, হয়ত তখনই সুগ্রীবের বুক ফুটা হইয়া যাইত। শূল ভাঙার পরেও কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে সহজে ছাড়িল না। সে তাহাকে পর্বতের চূড়ার ঘায় অজ্ঞান করিয়া, রাক্ষসদিগকে দেখাইবার জন্য লঙ্কার ভিতরে লইয়া গেল।

লঙ্কার ভিতরে গিয়াই সুগ্রীবের জ্ঞান হইয়াছে। তখন সে মনে করিল যে, এইবেলা কুম্ভকর্ণকে জব্দ করিবার একটা উপায় করা চাই। যেই এই কথা মনে করা, আর অমনি দুই হাতে রাক্ষসের দুটি কান, দাঁতে তাহার নাকটি, আর দুই পায়ে তাহার দুই পাশের চামড়া একেবারে শিকড়-সুদ্ধ ছিঁড়িয়া তোলা। সে সময়ে কুম্ভকর্ণ কিরূপ চমকিয়া গিয়াছিল আর কেমন মুখ সিঁটকাইয়া ফেলিয়াছিল, আর কি ভয়ানক চ্যাঁচাইয়াছিল, আর সুগ্রীবকেই বা কতখানি ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি আছড়াইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা আর বলিবার দরকার নাই। আর সেই গোলমালে যে সুগ্রীবই দুই লাফে সেখান হইতে চলিয়া আসিল, তাহাও সহজেই বুঝিতে পার।

কুম্ভকর্ণের চেহারা একেই ত অতিশয় ভয়ানক, তাহার উপরে আবার এখন নাক কান নাই ; সুতরাং তাহা আরও ভয়ানক হইবার কথা। আবার বেদনায় সে এতই রাগিয়া গিয়াছে যে, এখন আর রাক্ষস বানর বুঝিতে পারে না। রাক্ষসকেও ধরিয়া মুখে দেয়, বানরকেও ধরিয়া মুখে দেয়। কাজেই এবারে যে বানরেরা তাহাকে দেখিয়া আরও ভয় পাইল, ইহা আশ্চর্য নহে। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণকে বলিল, 'লক্ষ্মণ, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি যে সাহস করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু আমি এখন রামকে মারিতে আসিয়াছি, তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।' এই বলিয়া সে রামের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

রামের বাণে তাহার হাতের গদা মাটিতে পড়িয়া যাইতে অধিক সময় লাগিল না। তখন আর তাহার অন্য অস্ত্র নাই। কাজেই সে পর্বতের চূড়া লইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ

করিল। এদিকে বড় বড় বানরেরা দল বাঁধিয়া তাহার ঘাড়ে গিয়া উঠিয়াছে। সে যুদ্ধ করিবে, না বানরগুলিকেই ঝাড়িয়া ফেলিবে, বুঝিতে পারিতেছে না।

কিন্তু রামের বাণ খাইয়াও কুম্ভকর্ণ সহজে কাহিল হইল না। যে বাণে বালী মরিয়াছিল, তাহাও সে সহিয়া রহিল। ইহার মধ্যে কখন সে একটা লোহার মুদ্গর তুলিয়া লইয়াছে। সেই মুদ্গর ঘুরাইয়া সে রামের বাণও ফিরাইয়া দিতেছে, আবার বানরদিগকেও মারিতেছে। তাহা দেখিয়া রাম বায়ুবাণে সেই মুদ্গরসুদ্ধ তাহার হাতটি কাটিয়া ফেলিলেন। তখন কুম্ভকর্ণ বেদনায় চিৎকার করিতে করিতে, আর-এক হাতে একটা তালগাছ লইয়া রামকে মারিতে চলিল। রাম ইন্দ্রঅস্ত্রে সে হাতটাও কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তবুও সে ছুটিয়া আসিতে ছাড়িল না।

তারপর রাম অর্ধচন্দ্র বাণ মারিয়া তাহার পা দুইটা কাটিলেন। তবুও সে গড়াইতে গড়াইতে হাঁ করিয়া রামকে গিলিতে চলিয়াছে। তখন রাম অনেকগুলি বাণ মারিয়া তাহার মুখের হাঁ বন্ধ করিয়া দিলেন, তারপর ইন্দ্রঅস্ত্রে মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। কুম্ভকর্ণের মৃত্যু দেখিয়া রাক্ষসেরা ভয়ে চিৎকার করিতে লাগিল, আর দেবতা, গন্ধর্ব, মুনি, ঋষিরা যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া কোলাহলে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিলেন।

রাবণ যখন শুনিল যে কুম্ভকর্ণের মৃত্যু হইয়াছে, তখন তাহার আর দুঃখের শেষ রহিল না। প্রথমে সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। জ্ঞান হইলে পর অনেক কাঁদিয়া শেষে বলিল, 'হায়, আমি না বুঝিয়া ভাই বিভীষণকে অপমান করিয়াছিলাম, তাহার শাস্তি এখন পাইতেছি! আমার সব গেল।' এই বলিয়া সে আবার অজ্ঞান হইয়া গেল।

রাবণের দুঃখ দেখিয়া তাহার পুত্র ত্রিশিরা বলিল, 'মহারাজ আপনি এত দুঃখ করিতেছেন কেন? আমি রাম লক্ষ্মণকে মারিয়া দিতেছি।' তাহা শুনিয়া দেবান্তক, নরান্তক ও অতিকায় নামক রাবণের আর তিন পুত্র এবং মহোদর ও মহাপার্শ্ব নামে ইহাদের দুই খুড়া বলিল যে, তাহারাও যুদ্ধ করিতে যাইবে।

ইহারা আসিয়া প্রথমে ছোট ছোট বানরদিগকে বড়ই অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরেই অঙ্গদ, হনুমান, নীল আর ঋষভ আসিয়া অতিকায় ছাড়া ইহাদের আর সকলকেই মারিয়া ফেলিল।

অতিকায় তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট একটা রথ, অনেকগুলি অস্ত্র আর এমন একটা বর্ম পাইয়াছিল যে, তাহাতে কিছুই বিঁধিতে পারিত না। সেই বর্মের নাম অক্ষয় কবচ। এই-সকলের জোরে অতিকায় লক্ষ্মণের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল। লক্ষ্মণ তাহাকে অনেক বাণ মারিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন বাণই সেই বর্ম ভেদ করিতে পারিল না। এমন সময় পবন আসিয়া লক্ষ্মণের কানে কানে বলিলেন, 'ব্রহ্মাস্ত্র মার, অন্য অস্ত্রে এ রাক্ষস মরিবে না। ইহার গায়ে অক্ষয় কবচ আছে।' এ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়িলেন। সে অস্ত্র আটকাইবার জন্য অতিকায় কত চেষ্টাই করিল, কত শক্তি, কত গদা, কত শূল ছুড়িয়া মারিল, কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র কি তাহাতে থামে! দেখিতে দেখিতে অতিকায়ের মাথা তাহাতে কাটিয়া দুইখণ্ড হইয়া গেল।

ইহার পর আবার ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ করিতে আসিল। ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে থাকিয়া

যুদ্ধ করে। চোরের মত আড়াল হইতে সে সকলকে বাণ মারিল, অন্যেরা তাহার কিছুই করিতে পারিল না। তাহার বাণ খাইয়া সকল বানর অজ্ঞান হইয়া গেল। রাম লক্ষ্মণ পর্যন্ত অনেকক্ষণ বাণ সহ্য করিয়া, শেষে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। ইহাতে রাক্ষসেরা যে খুবই খুশি হইল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহারা নাচিতে নাচিতে লঙ্কায় গিয়া কহিল, 'এবারে উহাদিগকে মারিয়া আসিয়াছি!'

এদিকে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান সকলেই অজ্ঞান, কেবল বিভীষণ আর

হনুমান অজ্ঞান হয় নাই। তাহারা দুইজনে মশাল লইয়া সকলকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই অন্ধকার রাত্রিতে কোটি কোটি বানর যুদ্ধের জায়গায় পড়িয়া আছে, ইহাদের ভিতর হইতে কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করা কি সহজ কাজ!

অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা এক জায়গায় জাম্ববানকে দেখিতে পাইল। বিভীষণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'জাম্ববান, তুমি কি বাঁচিয়া আছ?' তাহা শুনিয়া জাম্ববান অনেক কষ্টে উত্তর করিল, 'চক্ষে তীর লাগিয়াছে, চাহিতে পারি না। আপনার গলার শব্দে বোধ

হইতেছে, আপনি বিভীষণ। হনুমান বাঁচিয়া আছে ত?'

বিভীষণ বলিল, 'তুমি রাম লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে না, অন্য কাহারও কথা জিজ্ঞাসা করিলে না, আগেই হনুমানের কথা কেন?'

জাম্ববান বলিল, 'হনুমান যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে কোন ভয় নাই ; আর যদি সে মরিয়া গিয়া থাকে, তবে আর উপায় নাই।'

তখন হনুমান জাম্ববানকে প্রণাম করিল। হনুমানকে চিনিতে পারিয়া জাম্ববান বলিল, 'বাছা, তুমি ছাড়া এ সময়ে আমাদের আর কেহ নাই। তুমি চেষ্টা করিলে সকলকে বাঁচাইতে পার। হিমালয়ের পরে ঋষভ আর কৈলাস পর্বত। সেই দুই পর্বতের মাঝখানে ঔষধের পর্বত। সেখানে বিশল্যকরণী, মৃত্যুসঞ্জীবনী, সুবর্ণকরণী আর সন্ধানী, এই চারি রকমের ঔষধ আছে ; শীঘ্র গিয়া তাহা লইয়া আইস।'

হনুমান তখনই ঔষধ আনিতে চলিয়া গেল। হিমালয় পর্বত পার হইলে কৈলাস পর্বত, তাহার কাছে ঔষধের পর্বত। এতদূর যাইতে হনুমানের কিছুই বিলম্ব হইল না। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিল যে, ঔষুধ খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই কঠিন। ঔষধের গাছ ঝক্-ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহা সে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু কাছে আসিতেই তাহারা যে কোথায় লুকাইয়াছে কিছুই বুঝিবার জো নাই।

তখন হনুমান রাগিয়া বলিল, 'আচ্ছা দাঁড়াও! আমি পাহাড়সুদ্ধই লইয়া যাইতেছি!' এই বলিয়া গাছ, পাথর, হাতি, গণ্ডার সবসুদ্ধ সেই প্রকাণ্ড পাহাড় ধরিয়া সে এমনই বিষম টান দিল যে সেই টানে একেবারে পাহাড়ের গোড়া অবধি চড়্-চড়্ শব্দে উঠিয়া আসিল। তারপর সেটাকে মাথায় করিয়া ফিরিয়া আসা ত এক মুহূর্তের কাজ।

ঔষধ আনিয়া তাহা আর কাহাকেও খাওয়াইবার দরকার হইল না। সে এমনি আশ্চর্য ঔষধ যে, তাহার গন্ধ পাইয়াই সকলে উঠিয়া বসিল—যেন তাহারা সবে ঘুম হইতে জাগিয়াছে। রাম লক্ষ্মণ উঠিলেন, বানরেরা সকলেই উঠিল। উঠিল না খালি রাক্ষসগুলি। পাছে অনেক রাক্ষস মরিয়াছে দেখিলে বানরদের সাহস বাড়িয়া যায়, এজন্য রাক্ষস মরিলেই অন্য রাক্ষসেরা তাহাকে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিত। কাজেই ঔষধের গন্ধ তাহাদের নাকে পৌঁছিতে পারিল না আর তাহারাও বাঁচিল না।

সকলে বাঁচিয়া উঠিল, কাজেই ঔষধের কাজ ফুরাইয়া গেল। তখন হনুমান আবার যেখানকার পাহাড়টি, সেইখানে তাহাকে রাখিয়া আসিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় দলে দলে বানর মশাল হাতে লইয়া লঙ্কায় গিয়া ঢুকিল। হনুমান সেবার লঙ্কার সকল স্থান পোড়াইতে পারে নাই, কিন্তু এবার আর কিছু বাকি রহিল না। রাক্ষসেরা বানরদিগের বাধা দিবে কি, তাহারা নিজেরাই তখন পলাইতে ব্যস্ত। তাহাদের সে সময়কার চিৎকার একশত যোজন দূর হইতে শোনা গিয়াছিল।

একদিকে লঙ্কা ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, আর একদিকে সেই রাত্রিতেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এবারে রাক্ষসদিগের সেনাপতি কুম্ভ, নিকুম্ভ, যুগাক্ষ, শোণিতাক্ষ আর প্রজঙ্ঘ।

সে রাত্রিতে রাক্ষস আর বানরেরা ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু বানরদিগের সঙ্গে

রাক্ষসেরা আঁটিতে পারিল না। অঙ্গদ, দ্বিবিদ আর মৈন্দ, যুগাক্ষ, প্রজঙ্ঘ আর শোণিতাক্ষের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল।

কুম্ভ দেখিল যে, বানরেরা রাক্ষসদিগকে মারিয়া শেষ করিতেছে। তখন সে ধনুর্বাণ লইয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সে সময়ে আর তাহার সামনে কেহ টিকিয়া থাকিতে পারিল না। মৈন্দ, দ্বিবিদ, অঙ্গদ সকলেই তাহার বাণে অজ্ঞান হইয়া গেল। তাহার বাণে চারিদিক এমনি করিয়া ছাইয়া গিয়াছিল যে, জাম্ববান আর সুষেণ আসিয়া বাণের জন্য

কিছুই দেখিতে পাইল না। তারপর সুগ্রীব আসিয়া অনেক গাছ, পাথর ছুঁড়িয়া মারিল, কিন্তু তাহাতেও প্রথমে কুম্ভের কিছুই হইল না। তখন সুগ্রীব তাহার ধনুক কাড়িয়া লইল।

ধনুক গেলে কাজেই তখন কুস্তি। কুম্ভ আসিয়া সুগ্রীবকে জড়াইয়া ধরিল। সুগ্রীবও তাহার সহিত খুব একচোট কুস্তি করিয়া শেষে তাহাকে একেবারে সমুদ্রের জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু কুম্ভ তাহাতে হটিবার লোক নহে। সে সেইখান হইতে ভিজা কাপড়ে উঠিয়া আসিয়া সুগ্রীবের বুকে এক কিল মারিয়াছে। সুগ্রীবেরও কাজেই তখন সেই কিলের

শোধ দেওয়া দরকার হইল। আর সেই শোধ দিতে গিয়া, সুগ্রীবের কিলে কুম্ভের প্রাণও বাহির হইয়া গেল। কাজেই তাহার আর যুদ্ধ করিতে হইল না।

এদিকে ভাইয়ের মৃত্যুতে নিকুম্ভ রাগে জ্বলিয়া একেবারে আগুন। তাহার হাতে একটা ভয়ানক পরিঘ। সেই পরিঘের ভয়ে কেহই তাহার নিকটে ঘেঁষিতে পারিতেছে না। সেই পরিঘ লইয়া সে হনুমানকে মারিতে আসিল। কিন্তু হনুমান কি পরিঘকে ভয় করিবার লোক? পরিঘকে হনুমান ভয় করা দূরে থাকুক, বরং সেটাই তাহার বুকে ঠেকিয়া গুঁড়া হইয়া গেল, আর তাহার এক কিলের চোটে নিকুম্ভের বর্ম ছিঁড়িয়া একেবারে খান-খান হইল।

এই সময়ে নিকুম্ভ কোন ফাঁকে তাড়াতাড়ি হনুমানকে ধরিয়া লইয়া এক ছুট দিয়াছিল। কিন্তু হনুমান তাহাতে ঠকিবে কেন? সে প্রচণ্ড এক কিল মারিয়া তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া গেল। তাহার পরেই দেখা গেল যে, সে ঘোরতর গর্জনে নিকুম্ভকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে চড়িয়া বসিয়াছে। তখন নিকুম্ভের চিৎকার দেখে কে। যাহা হউক, তাহাকে অধিক চ্যাঁচাইতে হইল না ; কারণ তাহার পরক্ষণেই হনুমান তাহার মাথাটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ইহার পর যে যুদ্ধ করিতে আসিল, সে সেই খরের পুত্র। তাহার নাম মকরাক্ষ। তাহার যুদ্ধের কথা আর কি শুনিবে? রাম তাহাকে হাসিতে হাসিতে যে-সকল বাণ মারিলেন, তাহাতেই সে বেচারার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

তখন রাবণ আর কাহাকে পাঠাইবে? ইন্দ্রজিৎ ভিন্ন আর লোক নাই। কাজেই ইন্দ্রজিৎ আবার যুদ্ধ করিতে আসিল। তাহার যুদ্ধ কিরূপ, তাহা ত জানাই আছে। সেই চোরা-যুদ্ধ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে সে খুবই কষ্ট দিল।

তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদা, ব্রহ্মাস্ত্র মারিয়া কেন একেবারে সকল রাক্ষস শেষ করিয়া দাও না?' রাম বলিলেন, 'যে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে তাহাকেই মারা যায় ; যাহারা যুদ্ধ করিতেছে না, তাহাদিগকে কি মারা উচিত? আচ্ছা, আজ ইন্দ্রজিতের রক্ষা নাই। আজ যদি সে মাটির নীচে গিয়াও লুকায়, তথাপি তাহাকে মারিবই।' এ কথা শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ তখনই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

খানিক পরে দেখা গেল যে একটি স্ত্রীলোককে রথে লইয়া ইন্দ্রজিৎ আবার আসিয়াছে। স্ত্রীলোকটি দেখিতে ঠিক সীতার মতন, কিন্তু আসলে তাহা রাক্ষসদের গড়া মায়া, অর্থাৎ জাদুর পুতুল ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই মায়া সীতার চুল ধরিয়া ইন্দ্রজিৎ তাহাকে খড়্গ দিয়া কাটিতে যাইতেছে, আর মায়া সীতা 'হা রাম!' বলিয়া চিৎকার করিতেছে। তাহা দেখিয়া হনুমান আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল, 'দুষ্ট, সীতাকে যদি মারিস, তবে তোকে এখনই যমের বাড়ি পাঠাইব!' কিন্তু হনুমান এ কথা বলিয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইবার পূর্বেই, ইন্দ্রজিৎ সে পুতুলটার মাথা কাটিয়া তাহাকে বলিল, এই দেখ্ তোদের সীতাকে কাটিয়া ফেলিয়াছি!'

তখন হনুমান রাগে দুঃখে অস্থির হইয়া রাক্ষসদের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু খানিক যুদ্ধ করিয়াই সে ভাবিল, 'সীতা যখন মরিয়া গিয়াছেন, তখন আর কিসের

জন্য যুদ্ধ করিব? আগে রামকে গিয়া এই সংবাদ দিই। তারপর তিনি যাহা বলেন, তাহাই করা যাইবে।'

ইন্দ্রজিৎ সীতাকে কাটিয়া ফেলিয়াছে, এ কথা শুনিয়া রাম দুঃখে নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িলেন। এমন-কি, সে সময়ে তাঁহাকে শান্ত করাই সম্ভব হইত না, যদি বিভীষণ সেখানে না আসিত।

বিভীষণ সকল কথা শুনিয়া রামকে বলিল, 'সীতাকে কাটিয়াছে, ইহা কখনই হইতে পারে না। যাহা কাটিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই মায়া সীতা। তোমরা যথার্থ সীতা মনে করিয়া কাঁদিতে বসিয়াছ, আর ততক্ষণে সেই দুষ্ট নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করিতে গিয়াছে। যজ্ঞ শেষ করিতে পারিলে আর কেহই তাহাকে যুদ্ধের সময় দেখিতে পাইবে না ; কাজেই সকলে তাহার নিকটে হারিয়া যাইবে। যজ্ঞ শেষ না হইলে তাহার নিজেকেই মরিতে হইবে। পাছে বানরেরা যজ্ঞে বাধা দেয়, তাই সে এরূপ করিয়া তোমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। এই যজ্ঞ শেষ না হইতেই উহাকে মারিতে হইবে। লক্ষ্মণ, আমার সঙ্গে চল। তুমি ভিন্ন আর কেহ এ কাজ করিতে পারিবে না।' এই বলিয়া লক্ষ্মণকে লইয়া বিভীষণ যজ্ঞ আটকাইতে চলিল।

কিন্তু যজ্ঞ আটকাইতে গেলেই ত আর অমনি তাহা আটকাইয়া ফেলা যায় না। রাক্ষসেরা তাহা সহজে করিতে দিবে কেন? কাজেই সেখানে রাক্ষসদের সহিত লক্ষ্মণের ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যাহা হউক, ইন্দ্রজিতের আর যজ্ঞ করা হইল না। রাক্ষস আর বানরের গর্জনে লঙ্কা কাঁপিতেছে, এই গোলমালের ভিতরে কি আর যজ্ঞ হয়! আর, এখনই গিয়া লক্ষ্মণকে না আটকাইলে ত তিনি মুহূর্তের মধ্যেই সকলকে মারিয়া শেষ করিবেন। কাজেই তখন ইন্দ্রজিৎ ছুটিয়া না আসিয়া আর যায় কোথায়। আর সেইজন্যই যজ্ঞ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিতে হইল। প্রাণ বাঁচিলে তবে ত যজ্ঞ হইবে।

এদিকে হনুমান প্রকাণ্ড গাছ লইয়া রাক্ষসদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। রাক্ষসেরাও তাহাকে নানাবিধ অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিতে ছাড়িতেছে না। এমন সময় ইন্দ্রজিৎ আসিয়া হনুমানকে তাড়া করিল। তাহা দেখিয়া বিভীষণ লক্ষ্মণকে বলিল, 'ঐ ইন্দ্রজিৎ আসিতেছে, এই বেলা দুষ্টকে বধ কর।'

তখন লক্ষ্মণ আর ইন্দ্রজিতে কি যুদ্ধই না হইল। ইন্দ্রজিৎ রথের উপরে, আর লক্ষ্মণ হনুমানের পিঠের উপরে। দুইজনেই প্রায় সমান বীর, সুতরাং অনেকক্ষণ পর্যন্ত সমানভাবেই যুদ্ধ চলিল,কাহারও হার জিত নাই। অস্ত্রের ঘায় দুইজনের শরীর দিয়াই দর দর করিয়া রক্ত পড়িতেছে। অদ্ভুত-অদ্ভুত অস্ত্রসকল দুইজনেই ছুঁড়িতেছেন, আবার দুইজনেই কাটিতেছেন।

ইহার মধ্যে একবার ইন্দ্রজিতের রথের ঘোড়া আর সারথি কাটা যায়। আবার বাণের অন্ধকারের ভিতরে কখন ছুটিয়া গিয়া, সে আবার নতুন রথে চড়িয়া আসে। তারপর ক্রমাগত দুইবার তাহাকে ধনুক বদলাইতে হইয়াছে। খানিক পরে আবার লক্ষ্মণের ভল্লঅস্ত্রে ইন্দ্রজিতের নতুন রথের সারথি মারা গেল, আর বিভীষণ গদার ঘায় তাহার চারিটা ঘোড়া চুরমার করিয়া দিল। তখন ইন্দ্রজিৎ রথ হইতে নামিয়া যে-ই বিভীষণকে

একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিয়াছে, অমনি লক্ষ্মণ তাহা খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে আরও অনেক যুদ্ধের পর শেষে লক্ষ্মণ তাঁহার ধনুকে ইন্দ্রঅস্ত্র জুড়িলেন। ইন্দ্র যাহা দিয়া দৈত্যদিগকে মারিয়াছিলেন, এ সেই অস্ত্র। তাহার চেহারা দেখিয়াই রাক্ষসদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। আর লক্ষ্মণ তাহা ছুঁড়িবামাত্রই ইন্দ্রজিতের মাথা কাটিয়া একেবারে দুইখান হইল।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে কেবল যে বানরেরাই আনন্দে 'জয় লক্ষ্মণ!' বলিয়া লেজ নাড়িল, তাহা নহে। স্বর্গ হইতে যেমন করিয়া ফুল পড়িল আর দুন্দুভির শব্দ শুনা গেল, তাহাতে নিশ্চয় বুঝা গেল যে দেবতারাও ইহাতে কম খুশি হন নাই। দুঃখ হইল খালি রাক্ষসদেরই। তাহা ছাড়া আর কে না সুখী হইল?

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর কথা শুনিয়া রাবণ প্রথমে অনেক কাঁদিল। তারপর রাগে অস্থির হইয়া বলিল, 'ইন্দ্রজিৎ মায়া-সীতা কাটিয়াছিল, আমি সত্যসত্যই সীতাকে কাটিব।' মন্ত্রীরা বারণ না করিলে, সেদিন সে সীতাকে কাটিয়াই ফেলিত। মন্ত্রীদের কথায় অনেক কষ্টে রাগ থামাইয়া সে বলিল, 'রাক্ষসগণ, আজ তোমরা গিয়া কেবল রামকে ঘিরিয়া মার। তোমাদের হাতে আজ যদি বাঁচিতেও পারে, তবুও ইহাতে সে দুর্বল হইয়া যাইবে। তাহা হইলে কাল আমি তাহাকে গিয়া মারিব।'

সেই রাক্ষসেরা যখন রামকে মারিতে গেল, তখন রাম এমনই যুদ্ধ করিলেন যে তেমন যুদ্ধ কেহ কখনও দেখে নাই। তিনি কোথায় আছেন তাহাই কেহ বুঝিতে পারিল না, এত তাড়াতাড়ি তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিন ঘণ্টার ভিতরে আঠার হাজার হাতি, দুই লক্ষ সৈন্য, দশ হাজার রথ, আর সওয়ারসুদ্ধ চৌদ্দহাজার ঘোড়া তাঁহার বাণে খণ্ড-খণ্ড হইল। তখন আর-আর সকল রাক্ষস ভয়েই পালাইয়া গেল।

এখন আর কে যুদ্ধ করিতে যাইবে? রাবণ ছাড়া লঙ্কায় আর বড় বীর কেহ নাই। কাজেই সে অবশিষ্ট রাক্ষসদিগকে লইয়া নিজেই যুদ্ধ করিতে আসিল। রাক্ষসেরা যত যুদ্ধ জানে, এবারে তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি করিল না। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! রাবণের সঙ্গে ছোটখাট বীর যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা অল্প সময়ের ভিতরেই মরিয়া গেল।

কিন্তু রাবণ নিজে নিজে এমনি ঘোরতর যুদ্ধ করিল যে বানরেরা তাহার সামনে দাঁড়াইতে পারিল না। যুদ্ধ যাহা হইল, তাহার বেশির ভাগ রাম আর লক্ষ্মণের সঙ্গে। লক্ষ্মণ রাবণের ধনুক কাটিলেন আর সারথিকেও মারিলেন। ঘোড়াগুলির জন্য তাঁহার কিছু করিতে হইল না, কারণ বিভীষণ আগেই তাহাদের কর্ম শেষ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার জন্য রাবণ বিভীষণকে শক্তি ছুঁড়িয়া মারে, কিন্তু লক্ষ্মণ তাহা কাটিয়া ফেলাতে বিভীষণের তাহাতে কিছু হয় নাই।

তখন রাবণ আর একটা শক্তি লইল। সেটা এত ভয়ানক যে, তাহার ভিতর হইতে ঝক্-ঝক্ করিয়া আলো বাহির হইতেছে। লক্ষ্মণ দেখিলেন, বিভীষণের এবার বড়ই বিপদ। কাজেই তিনি তাহাকে বাঁচাইবার জন্য রাবণকে খুব বেশি করিয়া বাণ মারিতে লাগিলেন।

তখন রাবণ কহিল, 'বটে! বিভীষণকে বাঁচাইতে চাহিস? আচ্ছা, তবে তোকেই ইহা

দিয়া মারিব!' এই বলিয়া সে সেই শক্তি লক্ষ্মণের দিকেই ছুঁড়িয়া মারিল। সে অস্ত্র গর্জন করিতে করিতে আসিয়া বুকে বিঁধিবামাত্র লক্ষ্মণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার বুক হইতে তাহা বাহির করিবার জন্য বানরেরা তখনই ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু রাবণ বাণ মারিয়া তাহাদিগকে তাহার কাছে আসিতে দিল না। তাহা দেখিয়া রাম নিজেই আসিয়া দুই হাতে সেই শক্তি টানিয়া তুলিলেন। রাবণ তাহার যতদূর সাধ্য তাঁহাকে বাণ মারিল, তিনি তাহা গ্রাহ্যও করিলেন না।

লক্ষ্মণের দুঃখে রামের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সে দুঃখের দিকে তখন মন না দিয়া তিনি বলিলেন, 'লক্ষ্মণ এখন এইভাবেই থাকুক। আগে আমি এই দুষ্টকে শাস্তি দিতেছি।' এই বলিয়া তিনি রাবণকে বাণে বাণে-এমনই জব্দ করিয়া তুলিলেন যে, তাহার তখন লঙ্কায় পলাইয়া যাওয়া ভিন্ন আর বাঁচিবার উপায় রহিল না।

রাবণ পলাইয়া গেলে পর রাম লক্ষ্মণকে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন সুষেণ তাঁহাকে বলিল, 'আপনি শান্ত হউন। লক্ষ্মণ মরেন নাই। এখনও তাঁহার বুকের কাছে ধুক্-ধুক্ করিতেছে আর চক্ষু উজ্জ্বল রহিয়াছে।' এইরূপে রামকে শান্ত করিয়া সুষেণ তখনই হনুমানেকে দিয়া ঔষধ আনাইল। সে ঔষধের গন্ধে লক্ষ্মণ আবার ভাল হইয়া উঠিলেন।

এদিকে রাবণ আবার আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। রামের সহিত তাহার ভয়ানক যুদ্ধ চলিয়াছে, এমন সময় দেখা গেল যে মণি মুক্তার কাজ করা একখানি উজ্জ্বল রথ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতেছে। সেই রথের ঘোড়া ছয়টি সবুজ রঙের। তাহাদের শরীরে সোনার অলঙ্কার আর গলায় মুক্তার মালা। সেই রথের সারথি মাতলি হাত জোড় করিয়া রামকে বলিল, 'ইন্দ্র আপনার জন্য এই রথ, ধনুক, কবচ আর অস্ত্র পাঠাইয়াছেন। এই রথে চড়িয়া আপনি রাবণকে বধ করুন।' তাহা শুনিয়া রাম সেই রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সে যুদ্ধ যে কি ভয়ানক হইয়াছিল, তাহা কি বলিব! রাবণ একবার ইন্দ্রের রথের নিশান আর ঘোড়া কাটিয়া বাণে বাণে রামকে অস্থির করিয়া তুলিল। আবার তারপরেই রামের তেজ দেখিয়া তাহার মনে হইল, বুঝি এইবারেই তাহার প্রাণ যায়। সে সময়ে দেবতা, অসুর প্রভৃতি সকলে রাম রাবণের যুদ্ধ দেখিবার জন্য আকাশে উপস্থিত। অসুরেরা বলে, 'রাবণের জয় হউক।' দেবতারা বলে, 'রামের জয় হউক!'

এদিকে রাবণ আগুনের মত তেজাল তিনমুখো একটা শূল ছুঁড়িয়া রামকে বলিল, এইবার তুই মরিবি!' কিন্তু রাম আর এক শূলে সেই শূল কাটিয়া, তারপর হাজার হাজার বাণে তাহাকে এমনি নাকাল করিয়া ফেলিলেন যে, সে আর ধনুকখানিও ধরিয়া থাকিতে পারে না। তখন রাম দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, আর তাহার সারথি রথ ফিরাইয়া লঙ্কায় পলাইয়া গেল।

লঙ্কায় আসিয়া একটু সুস্থ হওয়ামাত্রই রাবণ সারথিকে গালি দিতে আরম্ভ করিল, ওরে নির্বোধ, তুই কি ভাবিয়াছিস, আমার গায়ে জোর নাই? না কি আমার সাহস কম? দেখ্ ত হতভাগা, কি করিলি? রথ লইয়া পলাইয়া আসিলি, এখন লোকে আমাকে বলিবে কি?'

সারথি বলিল, 'মহারাজ, আপনার পরিশ্রম হইয়াছে আর ঘোড়াগুলিও বড় কাহিল। তাই একটু বিশ্রামের জন্য এইখানে আসিয়াছি। এখন যেমন অনুমতি করেন, তাহাই করি।' এ কথায় রাবণ খুশি হইয়া সারথিকে হাতের বালা পুরস্কার দিয়া বলিল, 'শীঘ্র যুদ্ধের জায়গায় চল্। শত্রুকে না মারিয়া আমি ঘরে ফিরিব না।' কাজেই সারথি আবার যুদ্ধের জায়গায় রথ ফিরাইয়া আনিল।

এবারে যে যুদ্ধ হইল, তাহাই শেষ যুদ্ধ। কিন্তু রাবণ সহজে মরে নাই। মাথা কাটিলেও যে মরিতে চাহে না, তাহাকে মারা সহজ কি করিয়া হইবে? এক-একবার রাবণের মাথা কাটা যায়, আবার তখনই তাহার জায়গায় আর-একটা মাথা উঠে। এইরূপ করিয়া রাম একশত বার তাহার মাথা কাটিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহার মৃত্যু হইল না।

তখন মাতলি রামকে বলিল, 'আপনি ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ুন, নিশ্চয় রাবণ মরিবে।' এই অস্ত্র

রাম অগস্ত্য মুনির কাছে পাইয়াছিলেন। ইহার সমান অস্ত্র আর জগতে নাই।

সে অস্ত্র ধনুকে জুড়িবার সময় পৃথিবী অবধি কাঁপিতে লাগিল, জীবজন্তুরা ত ভয় পাইতেই পারে। সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছুঁড়িবামাত্রই তাহা রাবণের বুকে ভেদ করিয়া মাটির ভিতরে ঢুকিয়া গেল। এবার রাবণের মৃত্যু আটকায় কাহার সাধ্য। মাথা কাটা গেলেও তাহার মাথা জোড়া লাগিয়াছিল, কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্রের ঘা খাইয়া আর তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল না। যে রাবণের তেজে দেবতারা পর্যন্ত অস্থির, সেই রাবণকে মুহূর্তের মধ্যে বধ করিয়া রামের অস্ত্র তাঁহার তূণে ফিরিয়া আসিল।

রাবণের মৃত্যুতে সকলে কিরূপ সুখী হইল, বানরেরা কিরূপ লাফালাফি করিল আর লেজ নাড়িল, দেবতারাই বা কেমন করিয়া দুন্দুভি বাজাইলেন আর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, সে-সকল আর বেশি করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তখন যে একটা আনন্দের ঘটা হইয়াছিল, তাহা সহজেই মনে করিয়া লইতে পারি।

অবশ্য রাক্ষসেরা রাবণের জন্য অনেক দুঃখ করিয়াছিল। যে বিভীষণ তাহার নিকট অপমান পাইয়া এত রাগের ভরে চলিয়া আসিয়াছিল, সে বিভীষণও কি কাঁদে নাই? বিভীষণই সকলের আগে কাঁদিয়াছিল। হাজার হউক, ভাই ত! রাগ যতই থাকুক, রাবণের মৃত্যুতে তাহা ভুলিয়া গিয়া সে কাঁদিয়া অস্থির হইল। রাম তাহাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

আহা! লঙ্কার রানীরা তখন কি কাতর হইয়াই কাঁদিয়াছিল! সে কান্না শুনিলে বুঝি পাথরও গলিয়া যায়। তাহাদের ত আর কোন দোষ ছিল না, কাজেই তাহাদের দুঃখে কাহার না দুঃখ হইবে? তাহাদিগকে শান্ত করিবার ক্ষমতা কাহারও হইল না। শেষে তাহারা নিজেরাই একে অন্যকে বুঝাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রাম বিভীষণকে বলিলেন, 'ইহাদের দুঃখ আমি আর সহিতে পারিতেছি না। শীঘ্র রাবণকে পোড়াইবার আয়োজন কর।'

তখন সকলে মিলিয়া রাবণকে রেশমী পোশাকে সাজাইয়া, সোনার পাল্কিতে করিয়া, শ্মশানে লইয়া গেল। সেখানে চন্দনকাঠের চিতায় অনেক জাঁকজমকের সহিত তাহাকে পোড়ানো হইল। তারপর রাম বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিলেন।

এখন আবার সীতার কথা বলিবার সময় হইয়াছে। দুঃখিনী সীতা এখনও সেই ময়লা কাপড়খানি পরিয়া, বিনা স্নানে, এলো চুলে, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে অশোক বনে দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার দুঃখের সময় কখন ফুরাইয়াছে, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। এমন সময় হনুমান আসিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহাকে রাবণের মৃত্যুসংবাদ দিল।

সুখ বা দুঃখ বেশি হইলে লোকে ব্যস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সেই সুখ বা দুঃখ যদি নিতান্তই বেশি রকমের হয়, তবে প্রায়ই ব্যস্ত হইবার অবসর থাকে না। তখন লোকে কেমন হতবুদ্ধির মত হইয়া যায়। হনুমানের কথা শুনিয়া সীতাও অনেকক্ষণ সেইরূপ হইয়া রহিলেন। তারপর একটু সুস্থ হইয়া হনুমানকে বলিলেন, 'বাছা, যে সংবাদ তুমি দিলে, আমি দীন দুঃখিনী তাহার উপযুক্ত পুরস্কার কি দিব?'

কিন্তু হনুমান পুরস্কারের ধার ধারে না। সীতা যে সুখী হইয়াছেন ইহাই তাহার পক্ষে

ঢের, সে আর কিছু চাহে না। তবে, একটা কাজ করিতে পারিলে তাহার মনটা আরও খুশি হইত। দুষ্ট রাক্ষসীরা সীতাকে কিরূপ কষ্ট দিত, তাহা সে নিজের চক্ষে দেখিয়াছে। সেই রাক্ষসীগুলির ঘাড় ভাঙিতে হনুমানের বড়ই ইচ্ছা ছিল। সীতার অনুমতি পাইলে সে ইহাদের কি দশা করিত, তাহা সেই জানে।

কিন্তু সীতার প্রাণে এতই দয়া যে, যাহারা তাঁহাকে এত কষ্ট দিয়াছে, তাহাদিগকেও কোনরূপ কষ্ট দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তাই তিনি হনুমানকে বলিলেন, 'বাছা, এমন কাজ করিও না! উহারা গরিব লোক, যাহা করিয়াছে রাবণের হুকুমেই করিয়াছে। আসলে উহাদের কোন দোষ নাই।'

তারপর সীতা রামের নিকট আসিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, যেরূপ আছেন ঠিক সেই রূপ মলিন বেশেই তিনি রামের কাছে আসেন। কিন্তু সকলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া, সুন্দর কাপড় আর অলঙ্কার পরাইয়া দিল। এতদিন পরে রামকে দেখিয়া তাঁহার মনে না জানি কতই সুখ হইয়াছিল। কিন্তু হায়! সে সুখ তাঁহার অধিকক্ষণ রহিল না।

সীতা আসিলে রাম তাঁহাকে বলিলেন, 'সীতা, তুমি রাক্ষসদিগের সঙ্গে এতদিন ছিলে। এখন তুমি আমাদিগকে আগেকার মতন ভালবাস কি না, তাহা কি করিয়া বলিব? আমি রাবণকে মারিয়া তাহার উচিত শাস্তি দিয়াছি। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে চলিয়া যাও।'

সীতা কত দুঃখই সহিয়াছেন, কিন্তু রামের এই কথায় তাঁহার মনে যে দুঃখ হইল, সে দুঃখ আর তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, 'হায় হায়, আমার আর বাঁচিয়া কি কাজ? লক্ষ্মণ, আগুন জ্বালিয়া দাও, আমি তাহাতে পুড়িয়া মরিব!'

তখন লক্ষ্মণ রাগে আর দুঃখে চিতা প্রস্তুত করিয়া আগুন জ্বালিয়া দিলেন, আর সেই আগুনে সীতা ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

আহা! সংসারের সকল সুখ দিলেও যে সীতার গুণের পুরস্কার হয় না, যাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য এত জনের প্রাণ দিতে হইল, সেই সীতার কিনা শেষে এই দশা!

কিন্তু কি আশ্চর্য! আগুনে সীতার মাথার একগাছি চুলও পুড়িল না। সকলে অবাক হইয়া দেখিল যে নিজে দেবতা অগ্নি সীতাকে কোলে করিয়া, চিতা হইতে উঠিয়া আসিতেছেন। সীতা দেখিতে সকালবেলার সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। তাঁহার পরনে লাল কাপড়, গায় অলঙ্কার, গলায় মালা। অগ্নি সীতাকে রামের কাছে দিয়া বলিলেন, 'সীতার কোন দোষ নাই।' তখন রাম মনের সুখে পরম আদরের সহিত সীতাকে লইলেন।

এদিকে রাম সীতাকে দেখিবার জন্য দেবতারা সকলে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে দশরথও আসিয়াছেন। দশরথকে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণ প্রণাম করিলেন। দশরথ রামকে আদর করিয়া বলিলেন, 'বাছা, স্বর্গে বড় সুখে আছি, কেবল কৈকেয়ীর সেই কথাগুলি মনে হইলে আজও খুব কষ্ট হয়। আজ তোমাদিগকে দেখিয়া আমার সে কষ্ট দূর হইল। আমার জন্য তুমি এতদিন বনে থাকিলে, আর রাবণকে মারিয়া দেবতাদের উপকার করিলে। এখন দেশে গিয়া সুখে রাজত্ব কর।'

রাম হাতজোড় করিয়া দশরথকে বলিলেন, 'বাবা, মা কৈকেয়ী আর ভাই ভরতের উপর আপনার যদি রাগ থাকে, তবে তাহা দূর করুন।' রামের এই কথায় দশরথ সম্মত হইয়া, রাম সীতা আর লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

দশরথ চলিয়া গেলে পর ইন্দ্র রামকে বলিলেন, 'রাম, আমরা তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর লও।'

রাম বলিলেন, 'তবে আমাকে এই বর দিন যে, আমার উপকার করিতে আসিয়া যে-সকল বানর মরিয়াছে, তাহারা আবার বাঁচিয়া উঠুক। আর তাহাদের দেশের গাছে অনেক ফল আর নদীতে অনেক জল হউক।'

ইন্দ্র বলিলেন, 'আচ্ছা, তাহাই হইবে।' এই কথা শেষ হইতে না হইতেই, যত বানর যুদ্ধে মরিয়াছিল সকলে আবার উঠিয়া বসিল—যেন এইমাত্র তাহাদের ঘুম ভাঙিয়াছে।

তারপর দেবতারা রাম লক্ষ্মণকে আদর করিয়া বলিলেন, 'এখন তোমরা মনের সুখে অযোধ্যায় চলিয়া যাও। সেখানে সকলেই তোমাদের জন্য দুঃখিত রহিয়াছে। আর সীতাও অনেক কষ্ট পাইয়াছেন, তাঁহাকে শান্ত কর।' এই বলিয়া দেবতারা আবার স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছিল ; কাজেই রাম সকলকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। সে রাত্রি সকলের কি সুখেই কাটিল। এমন সুখের রাত্রি খুব কমই হইয়া থাকে।

রাবণ মরিল, বনবাসেরও দিন ফুরাইয়া আসিল। এখন অযোধ্যায় ফিরিবার সময়। তাহা দেখিয়া বিভীষণ রামকে বলিল, 'আমার ভাই রাবণ কুবেরের পুষ্পক রথখানি কাড়িয়া আনেন। এখন সেই রথ আপনারই। এই রথে এক দিনেই অযোধ্যায় যাইতে পারিবেন। কিন্তু আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আর একটি দিন আমার এখানে থাকিয়া যাউন।'

রাম বলিলেন, 'বন্ধু বিভীষণ, তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ। কিন্তু ভাই, ভরত, মা কৌশল্যা, সুমিত্রা আর কৈকেয়ী প্রভৃতিকে দেখিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে। তুমি দুঃখ করিও না। আমি আর একদিনও থাকিতে পারিতেছি না, আমাকে এখনই বিদায় দাও।' তখন সারথি পুষ্পক রথ সাজাইয়া আনিল। রাম সীতা আর লক্ষ্মণের সহিত তাহাতে উঠিয়া, বিভীষণ, সুগ্রীব আর অন্যান্য বানরদিগের নিকট বিদায় চাহিলেন।

তাহারা সকলে হাতজোড় করিয়া বলিল, 'দয়া করিয়া আমাদিগকে আপনার সঙ্গে লউন। আমরা অযোধ্যায় গিয়া আপনার অভিষেক দেখিব, আর মা কৌশল্যাকে প্রণাম করিব।' এই কথায় রাম যার-পর-নাই সুখী হইয়া বলিলেন, 'তবে তোমরা শীঘ্র রথে উঠ।'

তাহারাও রথে উঠিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না। সুগ্রীব উঠিল, বিভীষণ সপরিবারে উঠিল, অন্যান্য বানরেরা সকলে উঠিল—তাহাদের আনন্দের আর সীমা নাই। তাহাদের সকলকে লইয়া সেই হাঁসে-টানা পুষ্পক রথ শোঁ-শোঁ শব্দে আকাশে উড়িয়া চলিল।

রথ কিষ্কিন্ধ্যায় আসিলে পর সীতা রামকে বলিলেন, 'আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে যে

বানরদিগের বাড়ির মেয়েদিগকে সঙ্গে করিয়া অযোধ্যায় লইয়া যাই।' সুতরাং কিষ্কিন্ধ্যার মেয়েরাও অনেকে পুষ্পক রথে উঠিয়া তাঁহাদের সঙ্গে অযোধ্যায় চলিল।

এইরূপে ক্রমে তাঁহারা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে রামের বনে থাকা চৌদ্দ বৎসরও ফুরাইল।

রামকে দেখিয়া ভরদ্বাজ বলিলেন, 'বাছা, যাইবার সময় তোমাকে দেখিয়া আমার মনে যেমন ক্লেশ হইয়াছিল, আজ তোমাকে আবার দেখিয়া আমার মনে তেমনই আনন্দ হইতেছে। তুমি বর লও।' রাম বলিলেন, এই বর দিন যে, অযোধ্যার পথে সকল গাছে যেন মিষ্ট ফল আর মধু পাওয়া যায়।'

মুনির বরে তখনই অযোধ্যার পথের গাছসকল মিষ্ট ফলে আর মধুতে ভরিয়া গেল। বানরেরা কত খাইবে।

তারপর হনুমানকে ডাকিয়া রাম বলিলেন, 'হনুমান, তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় যাও। সেখানে আমাদের সংবাদ দিবে আর সেখানকার সংবাদও লইয়া আসিবে। পথে শৃঙ্গবের নগরে আমার বন্ধু গুহ থাকেন, তাহাকে আমার কথা বলিও। তিনি তোমাকে অযোধ্যার পথ বলিয়া দিবেন।'

হনুমান তখনই মানুষের বেশ ধরিয়া শোঁ-শোঁ শব্দে আকাশে চলিল। পথে গুহের দেশ। সেখানে রামের সংবাদ দিয়া ভরতের নিকট পৌঁছিতে তাহার অধিক সময় লাগিল না।

ভরত তখন নন্দীগ্রামে ছিলেন। অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ দূরে হনুমান তাঁহার দেখা পাইল। তাঁহারও তপস্বীর বেশ, মাথায় জটা আর পরিধানে গাছের ছাল। ফল-মূল খাইয়া থাকেন আর রামের খড়ম দুইখানিকে সম্মুখে রাখিয়া রাজ্যের কাজ করেন।

হনুমান তাঁহার কাছে আসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, 'আপনারা যে রামের জন্য এত দুঃখ করিতেছেন, সেই রাম আপনাদের সংবাদ লইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। আর দুঃখ করিবেন না, শীঘ্রই তিনি সকলকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইবেন!'

এই কথা শুনিয়াই ভরত আনন্দে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। সুস্থ হইলে পর তিনি হনুমানকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'তুমি দেবতা না মানুষ, দয়া করিয়া আমার এখানে আসিয়াছ? আজ তুমি যে সংবাদ আমাকে শুনাইলে, তাহার পুরস্কার আমি তোমাকে কি দিব? তুমি এক লক্ষ গরু আর একশতখানি গ্রাম লও।'

তারপর হনুমান কুশাসনে বসিয়া রামের সকল সংবাদ ভরতকে শুনাইয়া শেষে বলিল, 'তিনি এখন ভরদ্বাজের আশ্রমে আছেন। কাল এইখানে আসিবেন।'

আজ যদি পৃথিবীতে সুখী কেহ থাকে, তবে সে এই অযোধ্যার লোক। সুখী কেন

হইবে না? চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া রামের দুঃখে তাহারা চক্ষের জল ফেলিয়াছে, ভাল করিয়া খায় নাই, ভাল কাপড় পরে নাই, সেই রাম এত দিনে দেশে ফিরিতেছেন। তাই আজ সকলে পথঘাট পরিষ্কার করিয়া, বাড়ি ঘর সাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, বাজনা বাজাইয়া, রামকে দেখিতে চলিল। পাল্কি চড়িয়া রানীরা চলিলেন, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ভরত চলিলেন—তাঁহার মাথায় রামের সেই খড়মজোড়া।

যেই রামের রথ দেখা গেল, অমনি সকলে 'ঐ রাম!' 'ঐ রাম!' শব্দে আকাশ ফাটাইয়া দিল।

তখন যে সকলের মনে খুবই আনন্দ হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর, সকলেই তখন যে রামকে প্রাণ ভরিয়া আদর করিবার জন্য ব্যস্ত হইবে, তাহাও আশ্চর্য নহে। যাহারা তাঁহার চেয়ে ছোট, তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লইল। রামও মা কৌশল্যা আর অন্যান্য রানীদিগকে আর বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিলেন।

তারপর ভরত রামের সেই খড়মজোড়া তাঁহার পায়ে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'দাদা, তোমার রাজ্য আমাকে রাখিতে দিয়া গিয়াছিলে, এখন তাহা তুমি ফিরাইয়া লও। তোমার রাজ্য এখন আগের চেয়ে দশগুণ বড় হইয়াছে।'

তারপর ক্ষুর হাতে ভাল ভাল ওস্তাদ নাপিতেরা আসিয়া রামের চৌদ্দ বছরের জটা চাঁছিয়া পরিষ্কার করিল। শত্রুঘ্ন রাম লক্ষ্মণকে স্নান করাইয়া নিজ হাতে তাঁহাদিগকে সাজাইয়া দিলেন। সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি আর যত লোক সঙ্গে আসিয়াছিল, কাহারও আদর যত্নের কোন ত্রুটি হইল না। নিজে মা কৌশল্যা যখন বানরের মেয়েদিগকে সাজাইলেন, তখন কিরূপ আদর-যত্ন হইল বুঝিতেই পার।

অবশেষে বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিরা রাম সীতাকে মানিকের পিঁড়ির উপর বসাইয়া তাঁহাদের অভিষেক করিলেন। সে অভিষেক কি চমৎকার হইয়াছিল, তাহা কি না দেখিলে বুঝিতে পারা যায়? দেবতারা পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন, অন্য কথায় আর কাজ কি?

যত ভাল ভাল তীর্থ আছে, সকল তীর্থের জল দিয়া রামকে স্নান করানো হইল। স্নানের পর রাম রাজবেশে রত্নের পিঁড়িতে সভা আলো করিয়া বসিলেন। তাঁহার মাথায় সেই মনুর সময় অবধি যাহা অযোধ্যার রাজারা মাথায় দিয়া আসিতেছেন, সেই আশ্চর্য মুকুট। দুই পাশে সাদা চামর হাতে সুগ্রীব আর বিভীষণ। পিছনে সাদা ছাতাখানি লইয়া শত্রুঘ্ন। তখন ইন্দ্রের হুকুমে পবন আসিয়া তাঁহার গলায় স্বর্গের সোনার পদ্মের মালা আর আশ্চর্য মোতির হার পরাইয়া দিলেন।

এইরূপ করিয়া দেবতা গন্ধর্বের গান আর আনন্দ-কোলাহলের ভিতরে রাম অযোধ্যার রাজা হইলেন। তেমন রাজা আর কেহ কখনও দেখে নাই। আজও খুব ভাল রাজার কথা বলিতে হইলে লোকে বলে, 'রামের মতন রাজা।'

সমাপ্ত

# মহাভারত

## আদিপর্ব

এখন আমরা যাহাকে দিল্লী বলি, সেই দিল্লীর কাছে, অনেকদিন আগে, হস্তিনা বলিয়া একটা নগর ছিল।

এই হস্তিনার রাজা বিচিত্রবীর্যের ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু নামে দুই পুত্র ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বয়সে বড় ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অন্ধ ছিলেন। অন্ধ যে, সে রাজ্য পায় না। কাজেই, বয়সে বড় হইয়াও ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইতে পারিলেন না ; রাজা হইলেন ছোট ভাই পাণ্ডু।

রাজ্য না পাওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত হইয়াছিলেন বৈকি! তবুও যদি পাণ্ডুর ছেলে হওয়ার আগে তাঁহার ছেলে হইত, তবে সে দুঃখ তিনি সহিয়া থাকিতে পারিতেন ; কারণ তাঁহাদের ছেলেদের মধ্যে যে বড়, তাহারই রাজ্য পাইবার কথা ছিল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের কপালে তাহাও হইল না ; পাণ্ডুর আগে ছেলে হইল। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা যখন বুঝিল, তাহারা রাজ্য পাইবে না, তখন হইতেই তাহারা প্রাণ ভরিয়া পাণ্ডব (অর্থাৎ পাণ্ডুর ছেলে)-দিগকে হিংসা করিতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের মধ্যে দুর্যোধন সকলের বড়, তারপর দুঃশাসন, তারপর আরো আটানব্বুই জন। সবসুদ্ধ তাহারা একশত ভাই। ইহা ছাড়া দুঃশলা নামে তাহাদের একটি বোনও ছিল।

পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র। সকলের বড় যুধিষ্ঠির, তারপর ভীম, তারপর অর্জুন, তারপর নকুল ও সহদেব নামে দুটি যমজ ভাই। ইঁহারা এক মায়ের ছেলে নহেন। পাণ্ডুর দুই রানী ছিলেন। বড়র নাম কুন্তী, ছোটর নাম মাদ্রী। যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুন, ইঁহারা কুন্তীর ছেলে। নকুল সহদেব মাদ্রীর ছেলে। দুই মা হইলে কি হয়? ইঁহাদের মধ্যে যে ভালোবাসা ছিল, তেমন ভালোবাসা এক মায়ের ছেলেদের ভিতরেও কম দেখা যায়।

এক-একজন দেবতা পাণ্ডুকে এই-সকল পুত্রের এক-একটি দিয়াছিলেন। ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে দিয়াছিলেন, পবন ভীমকে দিয়াছিলেন, ইন্দ্র অর্জুনকে আর অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবতা নকুল ও সহদেবকে। এইজন্য লোকে বলে যে, যুধিষ্ঠির ধর্মের পুত্র,

ভীম পবনের পুত্র, অর্জুন ইন্দ্রের পুত্র, নকুল সহদেব অশ্বিনীকুমারদিগের পুত্র। এই সকল দেবতা ইঁহাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।

কিন্তু হায়! এই পৃথিবীতে অল্পদিনই ইঁহারা সুখে কাটাইতে পারিয়াছিলেন। পাণ্ডু ইঁহাদিগকে খুব ছোট রাখিয়াই হঠাৎ মারা গেলেন। মৃত্যুর সময় মাতা মাদ্রী তাঁহার কাছে ছিলেন। তিনি মনের দুঃখ সহিতে না পারিয়া, পাণ্ডুর চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়া সেই দুঃখ দূর করিলেন। ইহার পর আর এমন কেহই রহিল না, যে আপনার বলিয়া মা কুন্তী আর পাঁচটি ভাইদের দিকে চায়।

যাহা হউক, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের সঙ্গেই রহিলেন। একশো পাঁচটি ছেলের একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে পড়া, একসঙ্গে খেলা, সবই একসঙ্গে হইতে লাগিল।

খেলার সময় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ভীমের হাতে বড়ই নাকাল হয়। ভীমের জ্বালায় উহারা ভালো করিয়া খেলিতেই পায় না। খেলা আরম্ভ করিলেই ভীম কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিয়া দেন। উহারা একশো ভাই, ভীম একেলা। তবুও উহারা কিছুতেই তাঁহাকে আঁটিতে পারে না। তিনি তাহাদিগকে আছড়াইয়া ফেলিয়া চুল ধরিয়া এমনি টান দেন যে, বেচারারা তাহাতে চ্যাঁচাইয়া অস্থির হয়। জলে নামিয়া খেলা করিতে গেলে, তিনি তাহাদের দশজনকে একসঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া ডুব দেন, আর তাহারা আধমরা না হইলে ছাড়েন না। বেচারারা হয়তো ফল পাড়িবার জন্য গাছে উঠিয়াছে, এমন সময় ভীম আসিয়া সেই গাছে লাথি মারিতে থাকেন। লাথির চোটে গাছ এমনি নড়িয়া উঠে যে, ফলের সঙ্গে সঙ্গে উহারাও মাটিতে পড়িয়া যায়। কাজেই উহারা ভীমকে বড়ই হিংসা করে, আর তাঁহার কাছে বড়-একটা ঘেঁষে না।

ভীমকে যতই দেখে, দুর্যোধনের মনে ততই ভয় হয়, আর ততই তাহার দুষ্টবুদ্ধি বাড়িয়া উঠে। সে কেবলই ভাবে, 'এই ভীমটাকে বড় হইতে দিলেই তো আমাদের সর্বনাশ! সুতরাং এইবেলা এটাকে মারিয়া ফেলিতে না পারিলে চলিতেছে না। ভীম মরিলে আর চারিটা ভাইকে বাঁধিয়া রাখিলেই চলিবে।'

দুষ্ট বসিয়া বসিয়া খালি এইরূপ ভাবে। তারপর একদিন সে সকলকে বলিল, "চল আজ গঙ্গাস্নানে যাই!" এই সহজ কথাটার ভিতর কি ভয়ানক ফন্দি রহিয়াছে, তাহা তো পাণ্ডবেরা জানেন না। তাঁহারা কেবল জানেন যে, গঙ্গায় ঝুটোপাটি করিয়া স্নান করিতে যারপরনাই আরাম। সুতরাং গঙ্গাস্নানের কথা শুনিয়াই সকলে 'যাইব!' 'যাইব!' বলিয়া প্রস্তুত হইলেন।

প্রমাণকোটিতে গঙ্গাস্নানের আয়োজন হইল। প্রমাণকোটি অতি চমৎকার স্থান। গঙ্গার ধারে বাগান আর সুন্দর বাড়ি ; জলযোগের আয়োজনটিও সেখানে ভালো মতোই হইয়াছে। কাজেই ছেলেদের আনন্দের আর সীমা নাই। বেশি খুশি অবশ্য মিঠাই দেখিয়া। মিঠাই যে তাঁহারা কি আনন্দ করিয়া খাইলেন, সে কি বলিব! আবার শুধু নিজে খাইয়া তৃপ্তি হয় না ; যেটা ভালো লাগে, সেটা ভাইদের মুখে তুলিয়া দেওয়া চাই।

তাহা দেখিয়া দুর্যোধন ভাবিল, 'এইবার আমার সুবিধা।' তারপর মিষ্ট-মিষ্ট কথা বলিয়া, আর যারপরনাই আদর দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে দুরাত্মা বিষ মাখানো সন্দেশ ভীমের মুখে তুলিয়া দিল। ভীম কি জানেন? তিনি সন্দেশের সঙ্গে বিষ খাইয়া ফেলিলেন, কোনো সন্দেহ করিলেন না।

তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান চলিল। শেষে ঝুটোপুটিতে ক্লান্ত হইয়া আর সকলেই কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘরে গেলেন, গেলেন না শুধু ভীম। বিষের তেজে, আর তাহার উপর পরিশ্রমে, তিনি এতই দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে, গঙ্গার ধারেই একটু না শুইয়া থাকিতে পারিলেন না।

সেইখানে ভীম কখন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, দুর্যোধন ছাড়া তাহা আর কেহই জানিতে পারে নাই। ভীম অজ্ঞান হইতেই সেই দুষ্ট, লতা দিয়া তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দিল।

ভীম জলে ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু ভগবান যাঁহাকে রাখেন, হাজার দুষ্ট-লোক মিলিয়াও তাঁহাকে মারিতে পারে না। ভীম ডুবিলেন বটে, আর অন্য স্থানে পড়িলে তিনি মরিয়াও যাইতেন, তাহাতে ভুল নাই; কিন্তু তাঁহাকে যেখানে ফেলিয়াছিল, ঠিক সেইখান দিয়া ছিল পাতালে যাইবার পথ—যেখানে সাপেরা আর তাহাদের রাজা বাসুকি থাকেন। ভীম সেই পাতালের পথ দিয়া ডুবিতে ডুবিতে একেবারে সেই সাপের দেশে গিয়া পড়িয়াছেন। আর পড়িবি তো পড়—একেবারে কতকগুলি সাপের ঘাড়ে! সে বেচারারা তাঁহার চাপে তখনই চেপ্টা হইয়া গেল।

তখন যে ভারি একটা গোলমাল হইল, তাহা বুঝিতেই পার। সাপের দল মহারাগে আসিয়া ভীমকে যে কি ভয়ানক কামড়াইতে লাগিল, তাহা আর বলিবার নয়।

ইহাতে কিন্তু ভীমের ভালোই হইল। কেননা, ভীমকে যে বিষ খাওয়ানো হইয়াছিল, সাপের বিষই হইতেছে তাহার ঔষধ। কাজেই সাপের কামড়ে ভীমের গায়ের বিষ কাটিয়া গেল। ভীম চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া দেখেন, একি আশ্চর্য ব্যাপার! তখন তিনি দুই মিনিটের মধ্যে বাঁধন ছিঁড়িয়া কিল চড়ের ঘায় সাপের বাছাদের কি দুর্দশাই করিলেন! সে কিল যাহারা খাইল, তাহারা তো মরিয়াই গেল। যাহারা পলাইতে পারিল, তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহাদের রাজা বাসুকিকে গিয়া বলিল, "রাজা মহাশয়! সর্বনাশ! একটা মানুষের ছেলে আসিয়া সব মাটি করিল! আপনি শীঘ্র আসুন!"

একথা শুনিয়াই বাসুকি ছুটিয়া দেখিতে আসিলেন, ব্যাপারখানা কি। আসিয়া দেখেন—আশ্চর্য! এ যে ভীম! "আরে তাইতো! ও ভীম! তুমি যে আমার নাতির নাতি! এসো ভাই কোলাকুলি করি!" বলিয়া বাসুকি ভীমকে জড়াইয়া কতই আদর করিলেন! আর ধনরত্নই-বা তাঁহাকে কত দিলেন!

শুধু তাহাই নহে, ইহার উপর আবার অমৃত। বাসুকির বাড়িতে অমৃতের ভাণ্ডার ছিল। চৌবাচ্চার পর চৌবাচ্চা সারি সারি সাজানো, তাহা ভরিয়া খালি অমৃত রাখিয়াছে। সাপেরা ভীমকে সেই অমৃতের কাছে নিয়া বলিল, "যত ইচ্ছা খাও!"

ভীম এক নিশ্বাসে এক চৌবাচ্চা খালি করিয়া দিলেন! তারপর আর-এক নিশ্বাসে

আর-এক চৌবাচ্চা! আর-এক নিশ্বাসে আর-এক চৌবাচ্চা! এমনি করিয়া আট চৌবাচ্চা অমৃত খাইয়া দেখিলেন, আর পেটে ধরে না।

যেমন খাওয়া তেমনি বিশ্রামটি তো চাই। ভীম আট চৌবাচ্চা অমৃত খাইয়া, আটদিন যাবৎ কেবলই ঘুমাইলেন।

যুধিষ্ঠির স্নান করিয়া বাড়ি ফিরিবার সময় ভীমকে দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু সেজন্য তখন তাঁহার মনে বেশি চিন্তা হইল না। তিনি ভাবিলেন, হয়তো ভীম আগেই চলিয়া আসিয়াছেন। বাড়ি ফিরিয়া মাকে প্রণাম করিয়াই যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, ভীম যে আমাদের আগে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকে তো দেখিতেছি না। তুমি কি তাহাকে কোথাও পাঠাইয়াছ?

এ কথা শুনিয়াই কুন্তী নিতান্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন. "সেকি কথা বাবা, আমি তো ভীমকে দেখিতে পাই নাই। হায় হায়, কি হইবে? শীঘ্র তার খোঁজ কর।"

তখনই বিদুরকে ডাকানো হইল। বিদুর যুধিষ্ঠিরের কাকা হন। এমন সরল সাধুলোক পৃথিবীতে খুব কমই জন্মিয়াছেন। বিদুর আসিলে কুন্তী সকল কথা তাঁহাকে জানাইয়া, শেষে বলিলেন, "বুঝি-বা দুর্যোধনই আমার ভীমকে মারিয়া ফেলিল। ও দুষ্ট ভীমকে বড়ই হিংসা করে!"

বিদুর বলিলেন, "বৌদিদি, চুপ, চুপ! আপনার এ কথা দুর্যোধন শুনিতে পাইলে বড়ই বিপদ ঘটাইবে। ভীমের জন্য আপনি কোনো চিন্তা করিবেন না। আমি ব্যাসদেবের মুখে শুনিয়াছি যে, আপনার ছেলেরা অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিবেন। ব্যাসের কথা কি মিথ্যা হইতে পারে? আপনার কোনো ভয় নাই; নিশ্চয় ভীম ফিরিয়া আসিবেন!" এই বলিয়া বিদুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কুন্তী আর তাঁহার পুত্রগণের মনের দুঃখ ঘুচিল না।

এদিকে ভীমও আটদিনের লম্বা ঘুমের শেষে জাগিয়া উঠিয়াছেন। অমৃত খাইয়া তাঁহার শরীরে দশহাজার হাতির বল হইয়াছে। সাপেরা তাঁহাকে স্নান করাইয়া সাদা কাপড় আর সাদা মালা পরাইয়া, পায়স রাঁধিয়া খাওয়াইয়া, পরম আদরের সহিত সেই প্রমাণকোটির স্নানের জায়গায় রাখিয়া গেল। সেখানে আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলিয়া আসিলেন।

মরা ছেলে বাঁচিয়া উঠিলে মা-বাপ যেমন খুশি হয়, ভীমকে পাইয়া সকলে তেমনি সুখী হইলেন। তারপর তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ভাই, সাবধান! এ-সব কথা যেন আর কেহ না জানে।"

তখন হইতে পাঁচ ভাই যারপরনাই সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন আর দুর্যোধনের মামা শকুনি কতরকমে তাঁহাদিগকে হিংসা করেন, তাঁহারা সে-সব জানিতে পারিয়াও চুপ করিয়া থাকেন। এইরূপ করিয়া দিন যাইতে লাগিল।

শিশুকাল হইতেই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের ছেলেরা ধনুর্বিদ্যা (অর্থাৎ ধনুক দিয়া তীর ছোঁড়া) শিখিতে আরম্ভ করে। যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন প্রভৃতি সকলেই একসঙ্গে কৃপাচার্য নামক একজন খুব ভালো শিক্ষকের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একদিন ছেলেরা শহরের বাহিরে একটা লোহার গোলা লইয়া খেলা করিতেছিল। খেলিতে খেলিতে গোলাটা একটা শুকনো কুয়ার ভিতরে পড়িয়া গেল ; ছেলেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাহা তুলিতে পারিল না। গোলা তুলিতে না পারায় অপ্রস্তুত হইয়া তাহারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছে, এমন সময় সেইখান দিয়া একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন। ছিপ্‌ছিপে, কালো হেন লোকটি, পাকাচুল, হাতে তীর-ধনুক। ছেলেদের দুর্দশা দেখিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'দুয়ো! দুয়ো! তোমরা ক্ষত্রিয় হইয়া এই গোলাটা তুলিতে পারিলে না! দুয়ো! দুয়ো! আমাকে কি খাইতে দিবে বল, আমি গোলা তুলিয়া দিতেছি! গোলাও তুলিব, আর আমার এই আংটি কুয়ায় ফেলিতেছি, তাহাও তুলিব।" এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার আংটিটিও কুয়ায় ফেলিয়া দিলেন।

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহাশয়, আপনি যদি গোলাটা তুলিতে পারেন, তবে চিরকাল খাইতে পাইবেন।"

ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে একমুঠা শর লইলেন। তারপর তাহার একটি শর গোলায় বিঁধাইয়া, সেই শরের পিছনে আর-একটি শর বিঁধাইয়া তাহার পিছনে আবার আর-একটি—এমনি করিয়া কুয়ার মুখ অবধি লম্বা একটা কাঠি প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। সেই কাঠি ধরিয়া গোলা টানিয়া তুলিতে আর কতক্ষণ লাগে।

ছেলেরা আশ্চর্য হইয়া বলিল, "আচ্ছা, আংটিটা তুলুন তো!' ব্রাহ্মণ তীরধনুক লইয়া দেখিতে দেখিতে আংটিও তুলিয়া আনিলেন। ছেলেরা তো অবাক! তখন তাহারা হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল ; তারপর বলিল, "আপনি নিশ্চয় কোনো মহাপুরুষ হইবেন। বলুন আপনি কে? আর আমরা আপনার কোন্ কাজ করিব?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমাদের আর কিছুই করিতে হইবে না। তোমরা তোমাদের ঠাকুরদাদা মহাশয়ের নিকট গিয়া বল যে, এইরকম এক বুড়া আসিয়াছে।"

অমনি সকলে ছুটিয়া গিয়া তাহাদের ঠাকুরদাদা ভীষ্মের নিকট সংবাদ দিল। ভীষ্ম সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি! দ্রোণাচার্য আসিয়াছেন। এ আর কাহারো কর্ম নহে।" ভীষ্মের অনেকদিন হইতেই ইচ্ছা, ছেলেদিগকে দ্রোণাচার্যের হাতে দেন। সেই দ্রোণাচার্য আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত। ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়া, ভীষ্ম তাঁহাকে পরম আদরের সহিত বাড়িতে লইয়া আসিলেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, ইঁহারা অতি মহৎ লোক ছিলেন। ইঁহাদের খালি নাম আর পরিচয় শুনিলেই হইবে না ; ইঁহাদের কথা আরো বেশি করিয়া জানা চাই।

দেবতাদের মধ্যে আটজনকে আট বসু বলে। এই বসুরা একবার তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে লইয়া সুমেরু পর্বতের কাছে একটি সুন্দর বনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই বনে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম ছিল। বশিষ্ঠের একটি গাই ছিল, তাহার নাম নন্দিনী। এমন সুন্দর গোরু আর কখনো হয় নাই, হইবেও না। যত দুধ চাই, নন্দিনী তত দুধই দিত, আর সে আশ্চর্য দুধ একবার খাইলে দশহাজার বৎসর সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকা যাইত।

বসুদের মধ্যে একজনের নাম দ্যু। তাহার স্ত্রীর বড়ই ইচ্ছা হইল, গাইটি লইয়া

যাইবেন। উশীনর রাজার কন্যা জিতবতী তাহার সখী। সখীকে একবার এই গোরুর দুধ খাওয়াইতে পারিলে তিনি দশহাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিবেন! আহা, তাহা হইলে কি সুখের কথাই হইবে!

দ্যুর স্ত্রী যতই এ কথা ভাবেন, ততই তাঁহার গাইটির জন্য মন পাগল হয় ; আর ততই তিনি তাঁহার স্বামীকে পীড়াপীড়ি করেন, "ওগো! লইয়া চল! লইয়া চল, গাইটি আর বাছুরটি।"

ইঁহার কথায় শেষে বসুরা আট ভাই মিলিয়া বাছুরসুদ্ধ গাইটিকে চুরি করিলেন।

বশিষ্ঠ ফলমূল আনিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি নন্দিনীকে লইয়া যাইবার সময় দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু মুনিরা ধ্যানে সকল কথাই জানিতে পারেন। কাজেই, তাঁহার চোর ধরিতে বেশি বিলম্ব হইল না। তিনি বসুদিগকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, "তোরা দেবতা হইয়া এমন কর্ম করিলি, এজন্য তোরা মানুষ হইয়া পৃথিবীতে জন্মাইবি।"

বসুদের আটজনের মধ্যে দ্যু-রই অধিক দোষ ছিল, অন্যদের দোষ তত নহে। তাই শেষে বশিষ্ঠ দয়া করিয়া বলিলেন যে, অপর সাতজন একবৎসর মানুষ থাকিয়াই আবার দেবতা হইতে পারিবে। কিন্তু দ্যু-কে, যত বৎসর মানুষ বাঁচে তত বৎসরই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে।

এখন বসুরা তো নিতান্তই সংকটে পড়িলেন। মুনির কথা মিথ্যা হইবার নহে, কাজেই মানুষ হইয়া জন্মিতেই হইবে। সুতরাং আর উপায় না দেখিয়া তাঁহারা গঙ্গাদেবীকে বলিলেন, "মা! পৃথিবীতে যদি জন্মিতেই হয়, তবে যে-সে বাপ-মায়ের ছেলে হইয়া যেন আমরা না জন্মাই, এমনি করিয়া দাও। হস্তিনার রাজা প্রতীপের শান্তনু নামক অতিশয় ধার্মিক পুত্র হইবেন, আমরা তাঁহারই পুত্র হইব। আর আমাদের মা হইবে তুমি নিজে। আমাদের জন্য মা তোমাকে মানুষ হইয়া পৃথিবীতে যাইতেই হইতেছে। তোমার সঙ্গে আমাদের এই কথা রহিল যে, আমাদের জন্মের পরেই তুমি আমাদিগকে জলে ফেলিয়া দিবে।"

বসুগণের মিনতি দেখিয়া গঙ্গা তাঁহাদের কথায় রাজি হইলেন।

পরম ধার্মিক রাজা প্রতীপ গঙ্গার ধারে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া ভগবানের চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গাদেবী একটি সুন্দরী কন্যা হইয়া তাঁহার কোলে গিয়া বসিলেন। প্রতীপ চক্ষু মেলিয়া নিতান্ত আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে মা, বৌমার মতন আসিয়া আমার কোলে বসিলে? আমার পুত্র হইলে তোমাকে তাহার সঙ্গে বিবাহ দিব।"

গঙ্গা বলিলেন, "আচ্ছা দিবেন। কিন্তু আমার একটি কথা রাখিতে হইবে। আমি যখন যাহা করিব, হাজার মন্দ বোধ হইলেও আপনার পুত্র তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন না, তাহার জন্য আমাকে তিরস্কার করিতে পারিবেন না।" রাজা এ কথায় সম্মত হইবামাত্র, গঙ্গা আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

প্রতীপের পুত্র হইলে, তাঁহার নাম শান্তনু রাখা হইল। শান্তনু দেখিতে যেমন ছিলেন, ধর্মে, বিদ্যায়, স্বভাবে এবং অন্য সকল গুণেও তেমনি। তাহা দেখিয়া প্রতীপ মনের সুখে

তাঁহার হাতে রাজ্যের ভার দিয়া, তপস্যা করিবার জন্য বনে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, একটি দেবতার মেয়ে আমার বৌমা হইতে রাজি হইয়াছিলেন। তাঁহার দেখা পাইলে তুমি তাঁহাকে বিবাহ করিবে, আর তাঁহার মন বুঝিয়া সর্বদা চলিতে চেষ্টা করিবে। তাঁহার কোনো কাজে কখনো বাধা দিও না, বা অসন্তুষ্ট হইও না।"

যুদ্ধের কাজটা রাজাদের খুব ভালো করিয়াই শিখিতে হয়, আর সর্বদা তাহার অভ্যাস রাখিতে হয়। এইজন্য শিকার তাঁহাদের খুব দরকারি কাজের মধ্যে এক। শান্তনু শিকার করিতে বড়ই ভালোবাসিতেন। একদিন শিকার করিতে করিতে তিনি গঙ্গার ধারে আসিয়া একটি পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। এমন সুন্দর মানুষ তিনি আর কখনো দেখেন নাই। তাঁহাকে তাঁহার এতই ভালো লাগিল যে, তিনি তাঁহার সঙ্গে কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না।

শান্তনু বলিলেন, "আপনি কি দেবতা, না দানব, না অপ্সরা, না যক্ষ, না মানুষ? আপনাকে আমার রানী করিতে পারিলে বড়ই সুখী হইব।"

সেই মেয়েটি আর কেহ নহেন, গঙ্গা। গঙ্গা বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার রানী হইব ; কিন্তু আমার একটা নিয়ম আছে। আমার কোনো কাজে আপনি বাধা দিতে পারিবেন না, বা অসন্তোষ দেখাইতে পারিবেন না। যদি কখনো বাধা দেন, বা অসন্তুষ্ট হন, তবে তখনই আমি চলিয়া যাইব।"

শান্তনু এই নিয়মে রাজি হইয়া পরমাসুন্দরী রানী লইয়া ঘরে ফিরিলেন। তারপর তাঁহাদের দিন খুবই সুখে যায়।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা ভারি দুঃখের বিষয় হইয়া উঠিল। রাজার দেবকুমারের মতো সুন্দর এক-একটি ছেলে হয়, আর অমনি রানী তাহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেন। দুঃখে রাজার বুক ফাটিয়া যায়, তবু কিছু বলিতে সাহস পান না, পাছে রানী বলেন, "আমি চলিলাম!"

একটি নয়, দুটি নয়, রানী ক্রমে সাতটি ছেলে এইভাবে জন্মের পরেই গঙ্গায় ফেলিয়া দিলেন ; সাতবার রাজা চুপ করিয়া দুঃখ সহ্য করিলেন। তারপর যখন আর-একটি ছেলে হইল, তখন রানী হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজার প্রাণে আর কত সহ্য হইবে? এই একটি ছেলেকে রাখিতে পারিলেও বুঝি তাঁহার প্রাণ একটু শীতল হয়! এই ভাবিয়া তিনি সকল কথা ভুলিয়া গিয়া এবারে রানীকে বাধা দিলেন। বলিলেন, "হায় হায়, এটিকে মারিও না। কেন তুমি এমন নিষ্ঠুর হইলে? এমন পাপ কি করিতে আছে?"

রানী বলিলেন, 'মহারাজ, এই লও তোমার ছেলে। কিন্তু নিয়মের কথা মনে আছে তো? আমি চলিলাম, তোমার মঙ্গল হউক!"

তখন গঙ্গা তাঁহার নিজের কথা আর আটজন বসুর কথা রাজাকে বুঝাইয়া বলিয়া, আর ছেলেটি তাঁহাকে দিয়া, আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

সেই ছেলেটির নাম দেবব্রত আর গাঙ্গেয়, এই দুই নাম রাখা হইল। দেবব্রত খুব ছোট থাকিতেই শান্তনু তপস্যা করিতে বনে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গার ধারেই সেই বন। সেখানে অনেক বৎসর ধরিয়া শান্তনু তপস্যা করিলেন,

ততদিনে দেবব্রতও বেশ বড় হইয়া উঠিলেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এই পৃথিবীতে দেবব্রতের সমান কেহ রহিল না।

এমন সময়, একদিন দেবব্রত হরিণ শিকারে বাহির হইয়াছেন। আর একটা হরিণ তাঁহার তীর খাইয়া পলায়ন করাতে, তাহাকে ধরিবার জন্য তিনি ভয়ংকর তীর ছুঁড়িয়া গঙ্গার জল প্রায় শুষিয়া ফেলিয়াছেন।

সেইখানে শান্তনু থাকেন। হঠাৎ গঙ্গার জল কেন শুকাইয়া গেল, তাহা জানিতে গিয়া, দেবব্রতের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। কিন্তু দেবব্রত তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। যাহাই হউক, শান্তনুর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এটি তাঁহারই পুত্র। তাই তিনি গঙ্গাকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "আমার পুত্রকে আবার দেখাও।"

তখন গঙ্গা দেবব্রতকে শান্তনুর নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "মহারাজ , এই তোমার সেই পুত্র। আমি ইহাকে বড় করিয়াছি। এই কুমার দেবতার অতিশয় প্রিয়পাত্র। বশিষ্ঠের নিকট সকল বেদ আর বৃহস্পতি ও শুক্রের নিকট সকল শাস্ত্র পড়িয়াছে। পরশুরাম ধনুর্বিদ্যা যত জানেন, সব ইহাকে শিখাইয়াছেন। ইহাকে লইয়া তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও।"

এমন সুন্দর পুত্র পাইয়া রাজা মনের সুখে আবার রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন, আর কিছুদিন পরেই তাঁহাকে যুবরাজ করিয়া দিলেন।

ইহার মধ্যে একদিন শান্তনু বনের ভিতরে বেড়াইতে গিয়া, দেবতার মতো সুন্দরী একটি কন্যা দেখিতে পাইলেন। সেই কন্যার দেহের এমনি অপরূপ সৌরভ, সমস্ত বন তাহাতে ভরিয়া গিয়াছে। রাজা আশ্চর্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

কন্যা বলিল, 'আমি জেলের মেয়ে।"

মেয়েটির নাম সত্যবতী। আসলে সে জেলের মেয়ে নহে ; জেলে তাহাকে একটা মাছের পেটের ভিতরে পাইয়া মানুষ করিয়াছিল। লোকে জানে যে, সে সেই জেলেরই মেয়ে। যাহা হউক, রাজা অবিলম্বে সেই জেলের কাছে গিয়া বলিলেন, "আমি তোমার মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহি।"

জেলে বলিল, "ইহার যে ছেলে হইবে, তাহাকে যদি আপনার সমস্ত রাজ্য দেন, তবে বিবাহ দিব, নহিলে দিব না।"

যদিও সেই মেয়েটিকে বিবাহ করিতে রাজার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, তথাপি দেবব্রতকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও রাজ্য দিতে তিনি কিছুতেই প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং সত্যবতীকে না লইয়া নিতান্ত দুঃখের সহিত তাঁহাকে ঘরে ফিরিতে হইল। সে দুঃখ এতই যে, তিনি তাহাতে দিন-দিন রোগা হইয়া যাইতে লাগিলেন।

দেবব্রত ভাবিলেন, 'তাইতো, বাবাকে কেন এমন দেখিতেছি?' একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কি হইয়াছে?"

রাজা বলিলেন, 'আর কি হইবে বাবা! তোমার জন্যই ভাবি, তোমার পাছে কোনো অসুখ হয়, তাই আমার চিন্তা।"

দেবব্রত বুড়া মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রীমহাশয়, বাবার তো বড়ই অসুখ!"

মন্ত্রী সকল কথাই জানেন ; তিনি সেই জেলের মেয়ের কথা দেবব্রতকে বলিলেন।

এ কথা শুনিবামাত্র, অমনি দেবব্রত সবান্ধবে জেলের নিকট গিয়া বলিলেন, "আমার পিতার সহিত আপনার মেয়ের বিবাহ দিন।"

জেলে দেবব্রতকে অতিশয় আদর করিয়া বলিল, "রাজপুত্র, আপনি যাহা বলিলেন, আমার পক্ষে তাহার চেয়ে সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে, এই বিবাহ হইলে শেষে একটা বিষম ঝগড়া-ঝাঁটির কারণ হইবে। আপনার মতো বীরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কি আর কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে?"

দেবব্রত বুঝিলেন যে, পাছে রাজ্য লইয়া সত্যবতীর ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার ঝগড়া হয়, জেলে সেই ভয় করিতেছে। তিনি তখনই বলিলেন, "আমার সঙ্গে আপনার নাতিদের ঝগড়া হইবার কোনো ভয় থাকিবে না। কারণ, আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি রাজ্য লইব না, আপনার নাতিই আমাদের রাজা হইবে।"

জেলে বলিল, "রাজপুত্র, আপনি অতি মহাশয় লোক—আপনি যে আপনার কথামত কাজ করিবেন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আপনার ছেলেরা তো এ কথায় রাজি না হইতে পারেন!"

দেবব্রত বলিলেন, "আমার যদি ছেলে না হয়, তবে তো আর সে রাজ্য চাহিতে আসিবে না! আমি আবার এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি বিবাহ করিব না।"

এ কথায় জেলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "তবে আপনার পিতাকেই মেয়ে দিব।"

এদিকে আকাশ হইতে দেবতারা দেবব্রতের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর তিনি যে ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার নাম দিলেন 'ভীষ্ম' অর্থাৎ ভয়ানক লোক। তখন হইতে সকলে তাঁহার 'দেবব্রত' নাম ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে 'ভীষ্ম' বলিয়াই ডাকিত।

জেলের অনুমতি লইয়া ভীষ্ম সত্যবতীকে বলিলেন, "মা, রথে উঠুন, ঘরে যাই!"

এইরূপে ভীষ্ম সত্যবতীকে আনিয়া পিতার সহিত বিবাহ দিলেন। শান্তনু তাঁহার এই কাজে কত সুখী হইলেন, বুঝিতেই পার। তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া বর দিলেন, "তোমার মরিতে ইচ্ছা না হইলে কিছুতেই তোমার মৃত্যু হইবে না।"

সত্যবতীর চিত্রাঙ্গদ আর বিচিত্রবীর্য নামে দুইটি পুত্র জন্মিবার পরে শান্তনুর মৃত্যু হয়। তখন চিত্রাঙ্গদ বড় হইয়াছেন, বিচিত্রবীর্য শিশু। ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজা করিলেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই এক গন্ধর্বের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া চিত্রাঙ্গদেরও মৃত্যু হইল। বিচিত্রবীর্যের তখনো রাজা হওয়ার বয়স হয় নাই ; ভীষ্ম তাঁহার হইয়া রাজ্যের কাজ দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে বিচিত্রবীর্যের বিবাহের বয়স হইল। এই সময়ে ভীষ্ম শুনিতে পাইলেন যে, কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা আর অম্বালিকার স্বয়ম্বর হইবে। স্বয়ম্বর, কিনা নিজে দেখিয়া বিবাহ করা। দেশ-বিদেশের রাজাদিগকে ডাকিয়া মস্ত সভা হয় ; কন্যা

মালা হাতে সেই সভাতে আসিয়া যাঁহার গলায় সেই মালা পরাইয়া দেন, তাঁহার সঙ্গেই তাঁহার বিবাহ হয়। ইহারই নাম 'স্বয়ম্বর'। স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়াই ভীষ্ম ভাবিলেন যে, তিনটি মেয়েকে আনিয়া তাঁহার ভাইয়ের সহিত বিবাহ দিবেন।

কাশীরাজের বাড়িতে স্বয়ম্বরের সভা আরম্ভ হইয়াছে, আর তাঁহার কন্যাদের রূপগুণের কথা শুনিয়া ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজাই তাঁহাদিগকে বিবাহ করিবার আশায় সেখানে আসিয়াছেন। এমন সময় ভীষ্ম তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি আমার ভাইয়ের জন্য এই মেয়ে তিনটিকে চাহিতেছি। ক্ষত্রিয়ের মেয়েদের যে কেবল স্বয়ম্বর করিয়াই বিবাহ হয়, তাহা তো নহে, বিবাহ অনেকরকমেই হইতে পারে। তাহার মধ্যে জোর করিয়া মেয়ে লইয়া গিয়া বিবাহ দিতে পারিলেই লোকে খুব ভালো বলিয়া থাকে। সুতরাং এই দেখ, আমি জোর করিয়া মেয়ে লইয়া যাইতেছি। তোমরা পার তো আমাকে আটকাও।"

এই বলিয়া তিনি মেয়ে তিনটিকে রথে তুলিয়া লইয়া চলিলেন। রাজারা সকলে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাদিগকে রাখিতে পারিলেন না। সকলের শেষে রাজা শাল্ব প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীষ্মের হাতে তাঁহারও খুবই দুর্দশা হইল।

তারপর ভীষ্ম সেই তিনটি মেয়েকে যারপরনাই আদরের সহিত বাড়িতে আনিয়া বিচিত্রবীর্যের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দিবার আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় অম্বা বলিলেন, "আমি শাল্বকে ভালোবাসি, আর মনে মনে তাঁহাকেই বিবাহ করিয়াছি।"

এ কথায় অম্বাকে ছাড়িয়া দিয়া, অম্বিকা আর অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হইল। সেই অম্বিকার ছেলে ধৃতরাষ্ট্র ; আর অম্বালিকার ছেলে পাণ্ডু।

ভীষ্ম এমনি মহাপুরুষ ছিলেন।

আর দ্রোণও নিতান্ত কম লোক ছিলেন না। দ্রোণ অর্থাৎ কলসীর ভিতর জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দ্রোণ ; তিনি ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। দ্রোণ অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন, সকলরকম বিদ্যা, বিশেষত, ধনুর্বিদ্যা খুব ভালোরূপেই শিখিয়াছিলেন। তারপর পরশুরামের নিকট তাঁহার সমস্ত অস্ত্র পাইয়া তিনি এমন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সামনে কেহ দাঁড়াইতেই পারিত না।

পাঞ্চাল দেশের রাজা পৃষতের পুত্র দ্রুপদের সহিত দ্রোণের ছেলেবেলায় বন্ধুতা হইয়াছিল। তখন দ্রুপদ দ্রোণকে বলিয়াছিলেন, "বন্ধু! আমি রাজা হইলে, সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার যাহা কিছু সব তোমারই হইবে।" সেই ছেলেবেলার কথা দ্রোণের মনে ছিল।

বড় হইয়া দ্রোণ কৃপাচার্যের ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং অশ্বত্থামা নামে তাঁহার একটি পুত্র হয়। দ্রোণ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন ; ছেলেকে দুধ কিনিয়া খাওয়াইবার শক্তি তাঁহার ছিল না। অন্য ছেলেদিগকে দুধ খাইতে দেখিয়া একদিন অশ্বত্থামা কাঁদিতে লাগিলেন। সেই ছেলেরা 'পিঠালি' গোলা জল আনিয়া তাঁহাকে বলিল, "এই দুধ খাও।" অশ্বত্থামা সেই পিঠালির জল খাইয়াই "দুধ খাইয়াছি" বলিয়া নাচিয়া অস্থির। তখন ছেলেরা হাততালি দিয়া বলিল, "ছি ছি! তোর বাপের পয়সা নাই, তোকে দুধ কিনিয়া

দিতে পারে না!"

ইহাতে দ্রোণের মনে খুব কষ্ট হওয়ায়, তিনি দ্রুপদের সেই ছেলেবেলার কথাগুলি মনে করিয়া ভাবিলেন, 'একবার বন্ধুর কাছে যাই, এ দুঃখ দুর হইবে।'

দ্রোণ অনেক আশা করিয়া দ্রুপদের কাছে গেলেন। কিন্তু দ্রুপদ আর সে দ্রুপদ নাই; বড় হইয়া আর রাজ্য পাইয়া, তিনি আর-এক হইয়া গিয়াছেন।

দ্রোণ বলিলেন, "বন্ধু! সেই যে তুমি বলিয়াছিলে, রাজা হইলে আমাকে কত সুখে রাখিবে ; তাই আমি আসিয়াছি।"

দ্রুপদ বলিলেন, "বল কি, ঠাকুর? আমি রাজা, আর তুমি ভিখারি, তুমি নাকি আবার আমার বন্ধু! ছেলেবেলায় তোমাকে কি বলিয়াছি, তাহা কে মনে রাখিয়াছে? চাহ তো না হয় তোমাকে একবেলা চারিটি খাইতে দিতে পারি।"

এইরূপ অপমান পাইয়া দ্রোণ সেখান হইতে হস্তিনায় চলিয়া আসিয়াছেন, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, 'ইহার শোধ লইতে হইবে।'

হস্তিনায় আসিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন প্রভৃতির গুরু হইলেন। তাঁহাদিগকে তিনি বলিলেন, "বাছাসকল! আমি খুব ভালো করিয়া তোমাদিগকে ধনুর্বিদ্যা শিখাইব ; কিন্তু শেষে তোমাদিগকে আমার একটা কাজ করিয়া দিতে হইবে।"

এ কথায় সকলেই চুপ করিয়া রহিল, কেবল অর্জুন বলিলেন, "হাঁ, গুরুদেব! আপনার কাজ অবশ্যই করিয়া দিব।"

আহা, এই কথাগুলি না জানি বুড়ার কাছে কতই মিষ্ট লাগিয়াছিল। তিনি অর্জুনকে জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জলে তাঁহাকে ভিজাইয়া দিলেন।

রাজপুত্রদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। দ্রোণের কাছে শিক্ষা পাইবার লোভে বাহিরেরও দু-একটি রাজপুত্র আসিলেন। আর-একটি ছেলে আসিলেন, তাঁহার নাম কর্ণ। লোকে বলে, কর্ণ অধিরথ নামক এক সারথির ছেলে।

কর্ণের সঙ্গে প্রথম হইতেই অর্জুনের শত্রুতা হইয়া গেল। কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে বড়ই রেষারেষি করেন, আর দুর্যোধনের সঙ্গে জুটিয়া যুধিষ্ঠির আর তাঁহার ভাইদিগকে অপমান করেন।

যাহা হউক, অর্জুনের সমান কেহই শিখিতে পারিল না। শিখিবার জন্য তাঁহার যত্ন দেখিয়া দ্রোণ বলিলেন, "তোমাকে এমনি ভালো করিয়া শিখাইব যে, তোমার সমান আর পৃথিবীতে কেহ থাকিবে না।"

ছেলেদের শিক্ষা বেশ ভালো করিয়াই হইল। দুর্যোধন আর ভীম গদা খেলায় খুব মজবুত হইলেন, নকুল সহদেব খড়্গে, রথ চালাইতে যুধিষ্ঠির ; আর ধনুকে যে অর্জুন, তাহা বুঝিতেই পার। ভীম আর অর্জুনের ক্ষমতা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আর হিংসায় বাঁচে না।

ইহাদের পরীক্ষা লইবার জন্য দ্রোণ চুপিচুপি এক কারিগরকে দিয়া এক নীল পক্ষী প্রস্তুত করাইলেন। তারপর সেটাকে এক গাছের আগায় রাখিয়া, রাজপুত্রদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা তীর-ধনুক লইয়া প্রস্তুত হও। এক-একবার এক-জনকে আমি তীর

ছুঁড়িতে বলিব। আমার কথা শেষ হইতে না হইতে তাহাকে ঐ পাখিটার মাথা কাটিয়া ফেলিতে হইবে।"

সকলের আগে যুধিষ্ঠিরের ডাক পড়িল। যুধিষ্ঠির ধনুক উঠাইয়া পাখির দিকে তাকাইয়া প্রস্তুত। দ্রোণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "গাছ দেখিতেছি, আপনাদের সকলকে দেখিতেছি, আর পাখিটাকে দেখিতেছি।"

ইহাতে এই বুঝা গেল যে, যুধিষ্ঠিরের নজর ঠিক হয় নাই, তিনি এদিক-ওদিক তাকাইতেছেন। কাজেই এ কথা শুনিয়া দ্রোণ মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, "তবে তুমি পারিবে না। তুমি সরিয়া দাঁড়াও।"

এইরূপে এক-একজন করিয়া সকলেই আসিলেন, সকলেই লজ্জা পাইয়া ফিরিয়া গেলেন।

শেষে আসিলেন অর্জুন। তাঁহাকেও দ্রোণ ধনুক উঠাইয়া পাখির দিকে তাকাইতে বলিয়া, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ?"

অর্জুন বলিলেন, "আমি কেবল পাখিই দেখিতে পাইতেছি, আর তো কিছু দেখিতেছি না।"

দ্রোণ বলিলেন, "সমস্তটা পাখিই দেখিতে পাইতেছ?"

অর্জুন বলিলেন, "না, পাখির কেবল মাথাটুকু দেখিতেছি, আর কিছু না।"

এইবার দ্রোণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তবে তীর ছাড়।"

কথাটা ভালো করিয়া শেষ হইতে না হইতেই অর্জুন তীর ছাড়িয়া দিলেন, আর কাটা মাথাসুদ্ধ পাখিও মাটিতে পড়িয়া গেল।

এমন আশ্চর্য শিক্ষা কি সকলের হয়? দ্রোণের আনন্দ আর ধরে না। তিনি অর্জুনকে বুকে চাপিয়া মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, 'আমার পরিশ্রম সার্থক হইল। অর্জুন আমার কাজ করিয়া দিতে পারিবে।'

আর-একদিন স্নানের সময় দ্রোণকে কুমিরে ধরিল। সে ভয়ংকর কুমির দেখিয়া রাজপুত্রদের বুদ্ধিসুদ্ধি কোথায় যে চলিয়া গেল! তাঁহারা খালি ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া আছেন, নড়িবার-চড়িবার ক্ষমতা নাই। অর্জুন ইহার মধ্যে ঝক্‌ঝকে পাঁচটি বাণ মারিয়া কুমিরকে খণ্ড-খণ্ড করিয়াছেন।

দ্রোণ ইচ্ছা করিলেই কুমির মারিয়া চলিয়া আসিতে পারিতেন। কিন্তু রাজপুত্রদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহা না করিয়া কেবল ডাকিতেছেন, "রাজপুত্রগণ! আমাকে বাঁচাও।" অর্জুনের বুদ্ধি আর সাহস দেখিয়া তিনি 'ব্রহ্মশিরা' নামক একটি আশ্চর্য অস্ত্র পুরস্কার দিলেন।

এটি বড় ভয়ঙ্কর অস্ত্র। তাই দ্রোণ অর্জুনকে সেই অস্ত্র ছাড়িবার আর থামাইবার সংকেত শিখাইয়া, তারপর সাবধান করিয়া দিলেন, "দেখিও, যেন মানুষের উপরে এ অস্ত্র কদাচ ছাড়িও না, তাহা হইলে সব ভস্ম হইয়া যাইবে। কোনো দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ হইলেই এ অস্ত্র ছাড়িতে পার।"

অর্জুন গুরুকে প্রণাম করিয়া, জোড়হাতে অস্ত্রখানি লইলেন।

এমনি করিয়া রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা শেষ হইল। সকলেই বড়-বড় বীর হইয়াছেন; এখন সকলকে ডাকিয়া ইঁহাদের বিদ্যার পরীক্ষা দেখাইবার সময় উপস্থিত। পরীক্ষার আয়োজন খুব ধুমধামের সহিত হইতে লাগিল। এক দিকে প্রকাণ্ড মাঠে শত-শত রাজমিস্ত্রী খাটিতেছে, আর-এক দিকে পরীক্ষার সংবাদ লইয়া দূতেরা দেশ-বিদেশে ঢোল পিটাইয়া ফিরিতেছে। লোকের উৎসাহের আর সীমা নাই। বুড়া ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত বলিলেন, "এতদিনে অন্ধ বলিয়া আমার মনে দুঃখ হইতেছে; এমন খেলা আমি দেখিতে পাইলাম না!"

পরীক্ষার দিন উপস্থিত। লোকজন যে কত আসিয়াছে, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। নিশানে, ঝালরে, মণি-মুক্তায় সভাটি ঝল্‌মল করিতেছে। খেলার জায়গা, অস্ত্র রাখিবার জায়গা, বাজনদারের জায়গা, স্ত্রীলোকদের বসিবার জায়গা, রাজারাজড়াদের বসিবার জায়গা, সাধারণ লোকদের বসিবার জায়গা, সব এমন সুন্দর করিয়া সাজানো আর গুছানো যে দেখিলে আশ্চর্য বোধ হয়। লোকের কোলাহল আর বাজনার শব্দ মিশিয়া সমুদ্রের গর্জনকে হারাইয়া দিতেছে। সভার মধ্যে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, কৃপাচার্য এবং আর-আর সকলে বসিয়াছেন। মেয়েদের জায়গায় কুন্তী, গান্ধারী (দুর্যোধনের মা) প্রভৃতি সকলে দাসী চাকরানী লইয়া উপস্থিত। এমন সময়ে দ্রোণাচার্য তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামাকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গভূমি অর্থাৎ খেলার জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চুল সাদা, দাড়ি সাদা, ধুতি সাদা, চাদর সাদা। বুকের উপরে সাদা পৈতা, গলায় সাদা ফুলের মালা, গায়ে শ্বেত চন্দন।

তারপর সকলের আগে দেবতার পূজা হইলে, চাকরেরা অস্ত্র-শস্ত্র আনিয়া রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিল।

এদিকে রাজপুত্রেরা সাজগোজ করিয়া প্রস্তুত! প্রত্যেকের পরনে সুন্দর দামী পোশাক, কোমরে কোমরবন্ধ। আঙ্গুলে আঙ্গুলপোষ (অর্থাৎ আঙ্গুল বাঁচাইবার জন্য চামড়ার ঢাকনা), হাতে ধনুক, পিঠে তূণ। যুধিষ্ঠির সকলের বড় বলিয়া সকলের আগে, তারপর যিনি যত ছোট, তিনি তত পিছনে, এমনি করিয়া তাঁহারা রঙ্গভূমির দিকে আসিতে লাগিলেন। রাজপুত্রদের সুন্দর পোশাক আর উজ্জ্বল চেহারা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইল। তারপর তাঁহারা নানারকম অস্ত্র ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলে, অনেকে খুব ভয়ও পাইল।

সেদিন দুর্যোধন আর ভীমের গদার খেলা বড়ই অদ্ভুত হইয়াছিল। এমন খেলা আর কেহ দেখে নাই। তাঁহারা বাহবাও পাইয়াছিলেন যতদূর হইতে হয়। এদিকে তাঁহাদের হাতির মতো গর্জন শুনিয়া দ্রোণ একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার পরই হয়তো ইঁহারা চটিয়া গিয়া মুস্কিল বাধাইবেন। কাজেই তাড়াতাড়ি ইঁহাদিগকে থামাইয়া দিতে হইল।

তারপর অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া লোকের আনন্দ আর ধরে না। কেহ বলে, "আরে ঐ অর্জুন!" কেহ বলে, "ইনি ভারি যোদ্ধা!" কেহ বলে, "ইনি বড়ই ধার্মিক!"

অর্জুন কি আশ্চর্য খেলাই দেখাইলেন! একবার অগ্নিবাণে ভীষণ আগুন জ্বালিয়া তিনি সকলের ত্রাস লাগাইয়া দিলেন; তার পরেই আবার বরুণবাণে জলের বন্যা বহাইয়া আগুন নিভাইয়া ফেলিলেন, এখন সকলে তল না হইলে বাঁচে! তখনই আবার বায়ুবাণ ছুটিল;

অমনি জল উড়িয়া গিয়া সব পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে! পর্জন্যাস্ত্রে তারপরের মুহূর্তেই মেঘ আসিয়া আকাশ অন্ধকার করিয়া ফেলিল!

ভৌমাস্ত্র মারিয়া তিনি মাটির ভিতর ঢুকিয়া গেলেন। পর্বতাস্ত্র মারিয়া কোথা হইতে বিশাল এক পর্বত আনিয়া ফেলিলেন। তারপর যখন অন্তর্ধান অস্ত্র মারিলেন, তখন আর কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না!

আর কত বলিব? অর্জুন সকলকে অবাক করিয়া তবে ছাড়িলেন।

এইরূপে খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, বাজনা থামিয়াছে, সকলে বাড়ি যাইবে এমন সময় ফটকের কাছে ও কিসের গর্জন? সকলে বলে, "একি, বাজ পড়িল? না পর্বত ফাটিল?"

বাজও পড়ে নাই, পর্বতও ফাটে নাই। উহা কর্ণের হুঙ্কার, আর কিছুই নহে। কর্ণকে যেমন-তেমন লোক মনে করিও না। কেহ বলে তিনি সূর্যের পুত্র, কেহ বলে তিনি অধিরথ নামক সারথির পুত্র। কিন্তু আসলে তিনিও কুন্তীরই পুত্র, অধিরথের কেহ নহেন। কুন্তী

ইয়াও তাঁহার প্রতি মায়ের কাজ করেন নাই, জন্মিবার পরেই তিনি তাঁহাকে
ন।
ওটিকে অধিরথ কুড়াইয়া পাইয়া তাহার স্ত্রী রাধার নিকট আনিয়া দিল, আর
য়া পরম যত্নে তাঁহাকে মানুষ করিতে লাগিল। নিজেদের ছেলেপিলে নাই,
সুন্দর শিশুটিকে পাইয়া তাহারা ভাবিল, যেন দেবতা দয়া করিয়া তাহাদিগকে
দিলেন। তখন হইতেই লোকে ভাবে যে, কর্ণ অধিরথ আর রাধার ছেলে।
দিগকে পিতা-মাতার মতন মান্য করেন আর ভালোবাসেন। তিনি জানেন না
যুধিষ্ঠিরদের ভাই।

ধই কর্ণের কানে কুণ্ডল আর পরনে কবচ (অর্থাৎ বর্ম বা যুদ্ধের পোশাক)
তে তিনি খুব উঁচু, খুব সুন্দর আর খুব ফরসা ; গায়ে সিংহের মতন জোর।
দেখিয়াই সকলে "ইনি কে?" "ইনি কে?" বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল।
ই অহঙ্কারী। আর জানই তো, অর্জুনের সঙ্গে তাঁহার কেমন শত্রুতা। তাই
নের প্রশংসা সহিতে না পারিয়া রাগের ভরে নিজের ক্ষমতা দেখাইতে
। আর যথার্থই তাঁহার ক্ষমতা কম ছিল না ; কারণ, অর্জুন যাহা কিছু
ন, তাহার সমস্তই তিনিও করিয়া দেখাইলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "আমি
ঙ্গে যুদ্ধ করিব।" ইহাতে সভার মধ্যে ভারি একটা হুলুস্থূল কাণ্ড উপস্থিত হইল।
দুর্যোধন কর্ণকে প্রশংসা করিতেছেন, আর পাণ্ডবদিগকে অপমানের কথা
, অপর দিকে অর্জুন তাহা সহিতে না পারিয়া রাগে কাঁপিতেছেন ; একটা
ঝি না হইয়া যায় না। নিজের দুই পুত্রের এমন ভাব দেখিয়া ভয়ে আর দুঃখে
মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন।

সময় কৃপাচার্য কর্ণকে বলিলেন, "বাপু, যুদ্ধ যে করিবে, তাহা তো বুঝিলাম,
র ছেলে তো আর যাহার তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে না। আগে বল দেখি,
রাজার বংশে জন্মিয়াছ, আর তোমার বাপ-মায়েরই-বা কি নাম?"

কৃপের কথা শুনিয়া লজ্জায় কর্ণের মাথা হেঁট হইল। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন বলিল, "রাজা হইলেই তো যুদ্ধ হইতে পারে। আচ্ছা, আমি এখনই কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজা করিয়া দিতেছি!" তখনই জল আসিল, ব্রাহ্মণ আসিল ; আর তখনই স্নান করাইয়া, ছাতা ধরিয়া, খই ছড়াইয়া, চামর দোলাইয়া, সোনা আর ফুল দিয়া, জয়-জয় শব্দে রাজা করিয়া দেওয়া হইল। কর্ণ ইহাতে চিরদিনের তরে দুর্যোধনের বন্ধু হইয়া গেলেন।

এদিকে সেই সারথি অধিরথ সংবাদ পাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে পাগলের মতন সেখানে ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই কর্ণ তাঁহার সেই রাজার সাজসুদ্ধ উঠিয়া তাড়াতাড়ি প্রণাম করিতে গেলেন ; কিন্তু অধিরথ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া নিজের চাদর দিয়া পা ঢাকিয়া রাখিলেন। তারপর 'বাপ! বাপ!' বলিয়া কর্ণকে আদর করিতে করিতে বুড়া চক্ষের জলে তাহার গা ভিজাইয়া দিল।

তাহা দেখিয়া ভীম বলিলেন, "সারথির ছেলে, তুই অর্জুনের হাতে প্রাণটা কেন দিতেছিস? ততক্ষণ রাশ ধরগে যা!"

তখন রাগে কর্ণের ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। দুর্যোধন পাগলা হাতির মতো ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কর্ণ রাজা হওয়াতে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, আসিয়া যুদ্ধ কর!"

ভাগ্যিস তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, নহিলে সেদিন কি হইত, কে জানে? সন্ধ্যা হওয়ায় কাজেই সকলকে ঘরে ফিরিতে হইল, বিপদও কাটিয়া গেল।

শিক্ষা শেষ হইলে গুরুকে দক্ষিণা দিতে হয়। রাজপুত্রদেরও শিক্ষা শেষ হইয়াছে, এখন দক্ষিণা দিবার সময়। দ্রোণ রাজপুত্রদিগকে বলিলেন, "তোমরা পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদকে ধরিয়া আনিয়া দাও। ইহাই আমার দক্ষিণা।"

সে কথায় রাজপুত্রেরা তখনই দ্রোণকে লইয়া দ্রুপদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চলিলেন। দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, ইঁহাদিগকে পাণ্ডবদের আগে যুদ্ধ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত দেখা গেল। ইচ্ছা যে বাহাদুরিটা তাঁহাদেরই হয়। পাণ্ডবদের তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না, কাজেই তাঁহারা দ্রোণের সঙ্গে একটু পিছনে থাকিলেন। কিন্তু দুর্যোধনেরা অনেক যুঝিয়াও বেশি কিছুই করিতে পারিলেন না এবং পাঞ্চালেরাই যেন 'মার্ মার্' করিয়া আরো তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের গর্জন এমনই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল যে, তাহা শুনিয়া অর্জুন আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

দ্রোণকে লইয়া পাণ্ডবেরা যুদ্ধে নামিলেন ; কিন্তু দ্রুপদের লোকেরা তবুও ভয় পাইল না। ভীমের গদায় কত হাতি ঘোড়ার মাথা ফাটিল, রথ চুরমার হইল, সৈন্য পিষিয়া গেল। অর্জুনের বাণেও কত হাতি ঘোড়া সিপাহী সৈন্য কাটিল, তাহার লেখাজোখা নাই। কিন্তু দ্রুপদ কাবু হওয়া দূরে থাকুক, বরং ভীম অর্জুনকে প্রশংসা করিয়া আরো ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাহার সেনাপতিরাও কম যুদ্ধ করিলেন না।

যাহা হউক, অর্জুনের হাতে ক্রমে সকলেরই জব্দ হইতে হইল, শেষে রহিলেন কেবল দ্রুপদ। তাহারও ধনুক নিশান সারথি, সব গিয়াছে। তখন অর্জুন ধনুক-বাণ ফেলিয়া, তলোয়ার হাতে সিংহনাদ পূর্বক, এক লাফে তাহার রথে উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদ মন্ত্রী সহ ধরা পড়িলেন, তাঁহার লোকজন পলাইয়া গেল, কাজেই যুদ্ধও

মিটিল। ভীমের কিন্তু এমন একটুখানি যুদ্ধ একেবারেই ভালো লাগিল না ; তাঁহার ইচ্ছা ছিল আরো অনেকক্ষণ যুদ্ধ করেন।

দ্রুপদকে দ্রোণের নিকট উপস্থিত করা হইলে, দ্রোণ তাঁহাকে বলিলেন, "দ্রুপদ! তোমার রাজ্যও গিয়াছে, নগরও গিয়াছে, তোমার প্রাণ অবধি আমাদের হাতে। এখন আমাদের বন্ধুতার খাতিরে তুমি কি চাহ বল?"

তারপর তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভয় নাই, আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষমা করাই আমাদের স্বভাব। তাহা ছাড়া শিশুকাল হইতে তোমাকে ভালোবাসি ; এখনো তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুতাই করিতে চাহি। তোমার রাজ্য এখন আমার হাতে, আমি তাহার অর্ধেক তোমাকে দিয়া অর্ধেক রাখিব। কেননা, আমার একটু রাজ্য না থাকিলে আবার তুমি বলিবে যে, 'তুই গরিব, তোর সঙ্গে বন্ধুতা করিব না!' এখন হইতে গঙ্গার দক্ষিণধারে তোমার, উত্তরধারে আমার জায়গা হইল। কি বল?"

দ্রুপদ আর কি বলিবেন? এইটুকু যে পাইয়াছেন, ইহাই তো ঢের বলিতে হইবে। কাজেই তিনি সবিনয়ে দ্রোণকে ধন্যবাদ দিয়া, দুঃখের সহিত ঘরে ফিরিলেন। সেই অবধি তাঁহার এই চিন্তা হইল যে, 'কি করিয়া দ্রোণকে মারিতে পারা যায়?'

ইহার পর এক বৎসর চলিয়া গেলে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করিলেন। যুধিষ্ঠির এমনি ধার্মিক, সরল, দয়ালু আর শান্ত ছিলেন যে, তাঁহার গুণে রাজ্যের সকল লোক মোহিত হইয়া গেল। এদিকে ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব মিলিয়া বাহিরের শত্রুদিগকে এমনি শাসনে রাখিলেন যে, তাহারা আর মাথা তুলিতে সাহস পায় না। আর তাহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে এমনি হিংসা হইল যে, রাত্রিতে তাঁহার আর ঘুম হয় না।

শেষে আর না থাকিতে পারিয়া তিনি তাঁহার মন্ত্রী কণিককে ডাকাইয়া বলিলেন, "মন্ত্রি! এই পাণ্ডবদের বাড়াবাড়ি তো আর আমি সহিতে পারিতেছি না। বল দেখি, ইহার কি উপায়?"

কণিক বলিলেন, "মহারাজ, ইহারা আর বেশি বড় না হইতেই এইবেলা ইহাদিগকে মারিয়া ফেলুন।"

একদিকে কণিকের এইরূপ পরামর্শ, আর-একদিকে দুর্যোধনের পীড়াপীড়ি।

রাজ্যের লোকেরা খালি যুধিষ্ঠির যুধিষ্ঠিরই বলে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, ভীষ্ম রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, কাজেই সকলে এমন গুণবাণ যুধিষ্ঠিরকে পাইয়া তাঁহাকেই রাজা করিতে চাহিতেছে। এ-সকল কথা যেন কাঁটার মতো দুর্যোধনের বুকে গিয়া বিঁধিতে লাগিল। তিনি কর্ণ, শকুনি (দুর্যোধনের মামা), দুঃশাসন প্রভৃতিকে লইয়া পরামর্শ করিলেন যে, পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিতে হইবে।

এইরূপ যুক্তি আঁটিয়া দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "বাবা! আর তো সহ্য হয় না। আপনি আর ভীষ্ম থাকিতে উহারা নাকি যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে। পাণ্ডবদের কাছে হাত জোড় করিয়াই কি শেষটা আমাদের থাকিতে হইবে? তাহা হইলে আর নরকে যাওয়ার বাকি কি রহিল? বাবা! এ অপমান হইতে কি রক্ষা পাওয়া যায় না?"

দুর্যোধনের কথায় ধৃতরাষ্ট্রের মন আরো খারাপ হইয়া গেল। তখন দুর্যোধন, কর্ণ,

শকুনি, দুঃশাসন, ইঁহারা বলিলেন, "মহারাজ! একটিবার যদি বুদ্ধি করিয়া ইহাদিগকে বারণাবত নগরে পাঠাইতে পারেন, তবেই আমাদের আপদ দূর হয়!"

ধৃতরাষ্ট্রের ইহাতে খুবই মত। ভয় শুধু এই যে, পাছে ইহাতে রাজ্যের লোক চটিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে মারিতে আসে। তাহাতে দুর্যোধন বলিলেন, "ভয় কি? টাকাকড়ি তো সব আমাদেরই হাতে! আমরা টাকা দিয়া সকলকে বশ করিব। একটিবার কুন্তী আর তাহার পাঁচটা ছেলেকে বারণাবতে পাঠাইয়া দিন। তারপর আমরা সব হাত করিয়া লইতে পারিলে যেন উহারা ফিরিয়া আসে।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমারও তো তাহাই মনে হয়। কিন্তু কাজটা কিনা ভালো নয়, তাই ভয় করি, পাছে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ ইঁহারা চটিয়া মুস্কিল বাধান।"

দুর্যোধন বলিলেন, "ভীষ্মের কাছে তো আমরা যেমন, পাণ্ডবেরাও তেমনি। অশ্বত্থামা আমারই পক্ষের লোক, কাজেই তাঁহার বাবা দ্রোণ আর মামা কৃপাচার্যও আমাদের পক্ষেই থাকিবেন। তারপর একা বিদুর আর আমাদের কি করিবেন?"

এইরকম তাঁহাদের পরামর্শ হয়; আর এদিকে টাকা দিয়া লোকজনকে বশ করিবার চেষ্টাও চলে। তারপর একদিন ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শে তাঁহাদের লোকেরা সভায় বসিয়া বলিতে লাগিল, "বারণাবত যে কি চমৎকার জায়গা, কি বলিব। আর সেখানকার শিবের মন্দিরে এই সময়ে বড়ই ধুমধাম; দেশ-বিদেশের লোক পূজা করিতে আসিয়াছে।"

এ-সকল কথা শুনিয়া পাণ্ডবদের বারণাবত যাইতে খুব ইচ্ছা হইল। তাহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "বাছাসকল! শুনিতেছি এটা নাকি বড়ই সুন্দর স্থান, পৃথিবীতে এমন স্থান আর নাই। তা তোমাদের ইচ্ছা থাকিলে তোমরা সপরিবারে একবার সেখানে গিয়া পরম সুখে কিছুদিন বাস কর। তারপর আবার ফিরিয়া আসিও।"

ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্টবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরের বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু কি করেন, চারিদিকেই ধৃতরাষ্ট্রের লোক, পাণ্ডবদের হইয়া দু কথা বলিবার কেহ নাই। কাজেই তিনি রাজি হইলেন। তারপর তিনি ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, গান্ধারী আর ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রভৃতি সকলের নিকট গিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন, "জ্যেঠামহাশয়ের কথায় আমরা বারণাবত চলিলাম, আপনারা আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন।"

তাঁহারা সকলেই বলিলেন, "ভালোয় ভালোয় ফিরিয়া আসিও। তোমাদের যেন কোনো অনিষ্ট না হয়।"

পাণ্ডবদের বারণাবত যাওয়া স্থির হইয়াছে দেখিয়া দুর্যোধনের আর আনন্দের সীমা রহিল না! তিনি গোপনে পুরোচন নামক তাহাদের একজন মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পুরোচন, তোমার মতো আর আমাদের বন্ধু কে আছে? এই যে রাজ্য দেখিতেছ, ইহা যে কেবল আমারই, তাহা নহে—তোমারও। বাবা আজ পাণ্ডবদিগকে বারণাবত পাঠাইতেছেন। তুমি খুব গাড়ি হাঁকাইয়া উহাদের ঢের আগেই সেখানে চলিয়া যাও। সেখানে গিয়া শহরের একপাশে, নির্জন স্থানে, গাছপালার আড়ালে একটি সুন্দর বাড়ি করিবে। গালা, ধুনা, চর্বি, তেল, শণ, কাঠ এমনি সব জিনিস দিয়া বাড়িটি প্রস্তুত হওয়া চাই, যাহাতে আগুন ছোঁয়াইবামাত্রেই তাহা দপ্-দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। সাবধান! যেন

বাড়ি দেখিয়া কেহ টের না পায় যে, তাহাতে এমন কোনো জিনিস আছে। তারপর কুন্তীকে তাহার পাঁচ ছেলেসুদ্ধ নিয়া সেই বাড়িতে রাখিবে। দিন কতক খুব আদর দেখাইয়া উহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া নিবে ; শেষে একদিন রাত্রিকালে পাণ্ডবেরা নিশ্চিন্তে ঘুমাইবার সময় দরজায় আগুন দিয়া তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারিবে। তাহা হইলে লোকে ভাবিবে, হঠাৎ আগুন লাগিয়াছে, আমাদের কেহ সন্দেহ করিবে না।"

দুষ্ট পুরোচন এ কথায় "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে পাণ্ডবদের যাত্রার সময় উপস্থিত, রথ প্রস্তুত। পাণ্ডবেরা গুরুজনকে প্রণাম, সমান বয়সীদের সঙ্গে কোলাকুলি, ছোটদিগকে আশীর্বাদ আর প্রজাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া রথ ছাড়িয়া দিলেন। বিদুর প্রভৃতি কয়েকজন লোক অতিশয় দুঃখের সহিত কিছুদূর তাঁহাদের পিছু পিছু চলিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণেরা ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ধৃতরাষ্ট্র দুষ্টলোক, তাই এমন কাজ করিল। পাণ্ডবেরা তো কোনোদিন তাহাদের কোনো ক্ষতি করে নাই। আর ভীষ্মকেই-বা কি বলি? তাঁহার চোখের সামনে এমন অধর্ম হইল, আর তিনি চুপ করিয়া রহিলেন! আইস, আমরাও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে চলিয়া যাই।"

যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে বলিলেন, "দেখুন, জ্যেঠামহাশয় আমাদের গুরুলোক, তাঁহার কথা শুনিয়া চলাই আমাদের উচিত! আপনারা আমাদের পরম বন্ধু, আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া এখন ঘরে ফিরুন। ইহাতে শেষে আমাদের উপকার হইবে।"

এ কথায় তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে আশীর্বাদ করিয়া ঘরে ফিরিলেন। বিদুর এতক্ষণ চুপিচুপি আসিতেছিলেন! তাঁহাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া সময় বুঝিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "বাবা যুধিষ্ঠির! বিপদ আসিলে বুদ্ধিমান লোকে তাহা এড়াইবার চেষ্টা করেন। গর্তের ভিতর থাকিলে আগুনে পোড়াইতে পারে না। লোহার অস্ত্র নয়, কিন্তু তাহাতে শরীর কাটে ; তাহার কথা যে জানে, শত্রুরা তাহাকে মারিতে পারে না। অন্ধ হইলে পথ দেখিতে পায় না ; ব্যস্ত হইলে বুদ্ধি ঠিক থাকে না। এইটুকু বলিলাম, বুঝিয়া লও। চলাফেরা করিলেই পথ জানা যায়, নক্ষত্র দিয়া দিক ঠিক করা যায়, আর নিজের মন বশে থাকিলে ভয়ে কাবু হইতে হয় না।"

এই কথাগুলি বিদুর যে কিরকম একটা ভাষায় বলিলেন, কেহ তাহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। কেবল যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'বুঝিয়াছি।' সকলে চলিয়া গেলে কুন্তী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! বিদুর যে কি বলিলেন, আর তুমিও বলিলে 'বুঝিয়াছি', আমি তো তাহার কিছু বুঝিতে পারিলাম না!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মা! দুর্যোধন নাকি আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিতে চাহে। তাই কাকা আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন, আর সর্বদা পথ-ঘাটের খবর লইতে, আর ভালো হইয়া চলিতে বলিলেন।"

তারপর কিছুদিন পথ চলিয়া তাঁহারা বারণাবতে পৌঁছিলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া সেখানকার লোকদিগের খুবই আনন্দ হইল। পাণ্ডবেরা নিতান্ত গরিবদেরও বাড়ি বাড়ি গিয়া দেখা করিলেন। পুরোচন তো প্রথমেই আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে জুটিয়াছে।

তাঁহাদিগকে পাইয়া যেন কত খুশি! দুষ্টের মুখে হাসি আর ধরে না, কুমিরের মতন তাহার দাঁত খালি বাহির হইয়াই আছে। পাণ্ডবদিগকে সে আগে অন্য একটা সুন্দর বাড়িতে খুব আদরের সহিত দশদিন রাখিয়া তারপর তাঁহাদিগকে সেই গালার বাড়িতে নিয়া উপস্থিত করিল। সে বাড়িতে গিয়াই যুধিষ্ঠির চুপিচুপি ভীমকে বলিলেন, "ভাই! আমি চর্বি আর গালার গন্ধ পাইতেছি। এ বাড়িটা নিশ্চয়ই গালা, চর্বি, শুকনো বাঁশ প্রভৃতি জিনিসের তৈরি। দুষ্ট আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য এইখানে আনিয়াছে! বিদুর কাকা ইহার কথা জানিতে পারিয়াই আমাকে ওরূপ বলিয়াছিলেন।"

এ কথা শুনিয়া ভীম বলিলেন, "তবে আসুন, আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "না আমাদের এখানে থাকাই ভালো। এখন চলিয়া গেলে উহারা আর কোনো ফন্দি করিয়া আমাদিগকে মারিবে। তাহার চেয়ে এই ঘর পোড়াইবার সময়

এদিকে ক্রমে ঢের রাত হইয়াছে, আর খুব বাতাসও বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, পুরোচনও নিদ্রায় অচেতন। সেই সুন্দর সুযোগ পাইয়া ভীম তখনই তাড়াতাড়ি তাহার ঘরের দরজায় আগুন লাগাইয়া দিলেন। তারপর বাড়ির চারিদিকে বেশ ভালোরূপে আগুন ধরাইয়া, পাঁচ ভাই মায়ের সঙ্গে সেই গর্তের ভিতর দিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। পুরোচন আর পাঁচপুত্র সমেত সেই নিষাদী পুড়িয়া মারা গেল।

আগুনের শব্দে শহরের লোকের জাগিতে অনেকক্ষণ লাগিল না। তাহারা আসিয়া হায় হায় করিতে করিতে পুরোচন আর দুর্যোধনকে গালি দিতে লাগিল। পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্যই যে পুরোচন দুর্যোধনের কথায় এই ঘর প্রস্তুত করিয়াছিল, এ কথা আর তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না। তাহারা বলিল, "দুষ্ট নিজেও পুড়িয়া মরিয়াছে; বেশ হইয়াছে! যেমন কর্ম তেমন ফল।"

এতক্ষণ পাণ্ডবেরা কি করিতেছেন? তাঁহারা প্রাণপণে বনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু চলা কি যায়? একে ভয়ে অস্থির, তাহাতে রাতজাগিয়া দুর্বল। অন্ধকার রাত্রি ; ঝড় বহিতেছে। তাঁহারা পদে পদে হোঁচট খাইতেছেন, পা আর চলে না। তখন ভীম আর উপায় না দেখিয়া মাকে লইলেন কাঁধে, আর নকুল সহদেবকে কোলে। তারপর যুধিষ্ঠির আর অর্জুনের হাত ধরিয়া লইয়া ঝড়ের মতন ছুটিয়া চলিলেন।

এদিকে বিদুর পাণ্ডবদিগের সাহায্য করিবার জন্য আর-একজন খুব পাকা লোক পাঠাইয়া দিলেন। সে খুঁজিতে খুজিতে গঙ্গার ধারে আসিয়া দেখিল যে, তাঁহারা নদী পার হইবার চেষ্টায় জল মাপিতেছেন। তখন সে সেই ম্লেচ্ছ ভাষার ঘটনার কথা বলিতেই তাহার প্রতি পাণ্ডবদের বিশ্বাস জন্মিল। তারপর একটি সুন্দর নৌকা আনিয়া তাঁহাদিগকে বলিল, "চলুন, আপনাদিগকে পার করিয়া দিই।"

নৌকা বাহিতে বাহিতে সেই লোকটি তাঁহাদিগকে বলিল, "বিদুর মহাশয় আপনাদিগকে অনেক আশীর্বাদ জানাইয়াছেন, আর বলিয়াছেন, আপনাদের কোনো ভয় নাই, শেষে আপনাদেরই জয় হইবে।"

পাণ্ডবেরা বলিলেন, "কাকাকে আমাদের প্রণাম জানাইবে।"

এইরূপ কথাবার্তায় নৌকা অপর পারে উপস্থিত হইলে, লোকটিকে বিদায় দিয়া পাণ্ডবেরা আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

এদিকে সকালবেলায় বারণাবতের লোকেরা পাণ্ডবদিগকে খুঁজিতে আসিয়া গালার ঘরের ছাইয়ের ভিতরে পুরোচন আর সেই নিষাদী আর তাহার পাঁচ ছেলের পোড়া হাড় পাইল। তাহারা নিষাদীর কথা জানিত না, কাজেই এই হাড় কুন্তী আর পাঁচ পাণ্ডবের মনে করিয়া তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "চল, আমরা দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্রকে গিয়া বলি, 'তোমার সাধ পূর্ণ হইয়াছে, পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিয়াছ।"

ইহার মধ্যে সেই যে লোকটি গর্ত খুঁড়িয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি ছাই উল্টাইবার ছল করিয়া সেই গর্ত কখন বুজাইয়া দিয়াছিল, কাজেই তাহার কথা কেহ জানিতে পারিল না।

ধৃতরাষ্ট্র শুনিলেন যে, পুরোচন আর পাণ্ডবেরা জতুগৃহের (গালার ঘরের) সঙ্গে পুড়িয়া মারা গিয়াছেন, তখন তিনি মনে মনে খুবই খুশি হইলেন, কিন্তু বাহিরে দেখাইলেন যেন পাণ্ডবদের দুঃখে তাঁহার বুক একেবারে ফাটিয়া গেল! তিনি কাঁদেন আর বলেন, "হায় হায়! শীঘ্র উহাদের শ্রাদ্ধ কর! হায় হায়! ঢের টাকা খরচ কর! হায় হায়! একটা নদী খোঁড়াও! হায় হায়! পাণ্ডবেরা ভালো করিয়া স্বর্গে যাউক!"

আর-একজন লোক এমনি কপট কান্না কাঁদিয়াছিলেন, কিন্তু সে অন্য কারণে। বিদুর তো জানেনই যে পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া আছেন, কাজেই তাঁহার কেন দুঃখ হইবে? কিন্তু দেশসুদ্ধ লোক পাণ্ডবদের জন্য হায় হায় করিয়া কাঁদিতেছে, ইহার মধ্যে তিনি চুপ করিয়া থাকিলে তো ভারি সন্দেহের কথা হয়। কাজেই তিনি আসল কথা জানিয়াও লোকের সন্দেহ দূর করিবার জন্য একটু কাঁদিলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা গঙ্গা পার হইয়া আবার ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন। তখনো রাত্রি প্রভাত হয় নাই, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার আর ভয়ঙ্কর বন। পিপাসায়, পরিশ্রমে আর ঘুমে ভীম ছাড়া আর সকলেই নিতান্ত কাতর। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ভীম! ভাই, আর যে পারি না। এখন উপায়?"

ভীম বলিলেন, "ভয় কি দাদা? এই যে আমি আপনাদিগকে লইয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি পূর্বের ন্যায় সকলকে বহিয়া লইয়া ছুট দিলেন।

ভীম সেদিন কি ভয়ানক বেগেই চলিয়াছিলেন: তাঁহার দাপটে গাছ ভাঙ্গে, মাটি উড়ে, আর যুধিষ্ঠিরেরা তো প্রায় অজ্ঞান! বনের পর বন পার হইয়া যাইতেছেন, তবুও তাঁহার বিশ্রাম নাই। রাত চলিয়া গেল, তারপর সমস্তটা দিন চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় একটা বনের ভিতর আসিয়া ভীম থামিলেন। ক্রমে ঘোর অন্ধকার আসিল, ঝড় উঠিল, চারিদিকে বাঘ ভাল্লুক ডাকিতে লাগিল, কিন্তু পাণ্ডবেরা আর কিছুতেই চলিতে পারেন না ; কাজেই সেখানে বিশ্রাম করা ভিন্ন আর উপায় নাই।

এমন সময় কুন্তী বলিলেন, "আর তো পারি না! পিপাসায় যে প্রাণ গেল!" মায়ের দুঃখ ভীমের সহ্য হয় না ; অথচ সে পোড়া বনে জল বা ফলমূল কিছুই নাই। কাজেই তিনি আবার সকলকে লইয়া আর-একটা সুন্দর বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় তাহাদিগকে রাখিয়া তিনি বলিলেন, "এইখানে তোমরা বিশ্রাম কর। ঐ সারসের ডাক শুনা যাইতেছে, জল কাছেই পাইব।"

ভীম সারসের ডাক শুনিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে দুই ক্রোশ দূরে একটা জলাশয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে স্নান আর জলপানের পর আর সকলের জন্য জল লইয়া আসিয়া দেখেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

হায়! রাজরানী, রাজার ছেলে, তাঁহারা কিনা আজ মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছেন! দুঃখে ভীমের চোখে জল আসিল। তখন শত্রুদিগের হিংসার কথা ভাবিয়া তিনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "দুষ্ট দুর্যোধন! তোর বড় ভাগ্য যে দাদা আমাকে বলেন না। নহিলে আজই তোদের সকলকে যমের বাড়ি পাঠাইতাম।" বলিতে বলিতে ভীমের ঝড়ের মতো নিশ্বাস বহিতে লাগিল।

এত কষ্টের পর সকলে ঘুমাইয়াছেন, কাজেই তাঁহাদিগকে জল খাওয়াইবার জন্য জাগাইতে ভীমের ইচ্ছা হইল না। তিনি জল হাতে করিয়া সেইখানে পাহারা দিতে লাগিলেন।

সেই বনের কাছে, এক প্রকাণ্ড শাল গাছের উপরে, হিড়িম্ব নামে একটা বিকট রাক্ষস থাকিত। তাহার তালগাছের মতো বিশাল দেহে ভয়ানক জোর, আগুনের মতো চোখ, জালার মতো মুখ, মূলার মতো দাঁত, গাধার মতো কান, ঝাঁকড়া তামাটে চুল-দাড়ি, বেলুনের মতো প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। অনেকদিন মানুষের মাংস খায় নাই, তাই পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া তাহার মুখে জল আর ধরে না। সে খালি মাথা চুলকায়, আর হাই তোলে, আর বারবার তাঁহাদিগকে চাহিয়া দেখে। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া সে তাহার বোন হিড়িম্বাকে বলিল, "বাঃ! কিএ মিঠ্ঠারে গন্ধো! ও বহিন্, ঝাট্ কোরে ধোরে লিয়ে আয়! মোরা খাবো! আর পেটমে ঢাক পিট্টায়কে নাচ্ছবো!"

হিড়িম্বা তাহার কথায় পাণ্ডবদের কাছে আসিল। কিন্তু রাক্ষসের মেয়ের প্রাণেও দয়া-মায়া খুব থাকিতে পারে। পাণ্ডবদিগকে মারিবার কোনো চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং সে আসিয়াই ভীমকে সকল কথা জানাইয়া বলিল, "শীঘ্র সকলকে জাগাও। আমি তোমাদিগকে রাক্ষসের হাত হইতে বাঁচাইয়া দিতেছি।"

ভীম বলিলেন, "আমি রাক্ষস-টাক্ষসকে ভয় করি না। ইঁহারা অনেক পরিশ্রমের পর ঘুমাইয়াছেন, ইঁহাদিগকে কি এখন জাগানো যায়? নাহয় তোমার ভাইকে পাঠাইয়া দাও, আমার তাহাতে আপত্তি নাই।"

এদিকে রাক্ষসের আর বিলম্ব সহ্য না হওয়ায়, সে নিজেই আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে হিড়িম্বা নিতান্ত ভয় পাইয়া বলিল, "শীঘ্র তোমরা আমার পিঠে উঠ, আমি এখনো তোমাদিগকে লইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতে পারি।"

ভীম বলিলেন, "তোমার কোনো ভয় নাই, আমার গায় ঢের জোর আছে। মানুষ বলিয়া আমায় অবহেলা করিও না।"

হিড়িম্বা বলিল, "ঐ দুষ্ট মানুষকে ধরিয়াই মারিয়া ফেলে, তাই আমি ভয় পাই। তোমাকে অবহেলা করিতেছি না।"

এ-সকল কথা শুনিয়া রাক্ষসের কিরূপ রাগ হইল, বুঝিতেই পার। সে ভীমকে আগে মারিবে না, হিড়িম্বাকেই আগে মারিবে, ঠিক করিতে পারিতেছে না। হাউ-মাউ করিয়া সে বন মাথায় করিয়া তুলিল।

ভীম বলিলেন, "মাটি করিল! আরে চুপ চুপ! হতভাগা, ইঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া দিবি?"

রাক্ষস ষাঁড়ের মতন শব্দ করিয়া বলিল, "মুহি তো তোদ্ধের্‌কে খাবো, ওহার্‌ লোকের ঘুম ভেঙ্গিবেক কেনে?" এই বলিয়া সে দুই হাত ছড়াইয়া ভীমকে ধরিতে গেল।

ভীম তাহার হাত দুটা ধরিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে খানিক দূরে লইয়া গেলেন। তখন বন তোলপাড়, গাছপালা চুরমার করিয়া দুজনে কি বিষম যুদ্ধই আরম্ভ হইল।

পাণ্ডবদের আর নিদ্রা যাওয়া হইল না। হিড়িম্বা সেইখানে বসিয়াছিল। কুন্তী চক্ষু মেলিয়া তাহাকে দেখিয়া যারপরনাই আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি কি এই বনের দেবতা, না কোনো অপ্সরা? এমন সুন্দর তো আমি কখনো দেখি নাই! তুমি কে, কিজন্য আসিয়াছ?"

হিড়িম্বা বলিল, "মা! আমি রাক্ষসের মেয়ে, আমার নাম হিড়িম্বা, আমার দাদা হিড়িম্ব আর আমি এই বনে থাকি। আপনাদিগকে দেখিয়া দাদা বলিল, 'উহাদিগকে ধরিয়া আন্, খাইব।' আপনারা ঘুমাইতেছিলেন, আর আপনার একটি ছেলে জাগিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া আপনাদিগকে পিঠে করিয়া এখান হইতে কোনো ভালো জায়গায় লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না। শেষে আমার দেরি দেখিয়া দাদা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দেখুন, আপনার সেই ছেলেটির সঙ্গে কেমন যুদ্ধ চলিতেছে।"

এ কথা শুনিবামাত্র যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল আর সহদেব ভীমের নিকট ছুটিয়া চলিলেন। অর্জুন ভীমকে ডাকিয়া বলিলেন, "দাদা! পরিশ্রম হইয়াছে কি? ভয় নাই, আমি তোমায় সাহায্য করিতেছি?"

ভীম বলিলেন, "ভয় নাই ভাই! হতভাগাকে কাবু করিয়া আনিয়াছি!"

অর্জুন বলিলেন, 'শীঘ্র উহাকে মারিয়া ফেল। নহিলে দুষ্ট আবার কোনো ফাঁকি-টাকি দিয়া বসিবে। ইহারা বড়ই ধূর্ত। তুমি নাহয় একটু বিশ্রাম কর, আমিই উহাকে মারিতেছি।"

ইহাতে ভীম তখনই ক্রোধভরে রাক্ষসকে তুলিয়া সাংঘাতিক এক আছাড় দিলেন। তারপর উহার দেহটাকে মট্ করিয়া ভাঙ্গিতেই উহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। মরিবার সময় রাক্ষসটা এমনি ভয়ানক চ্যাঁচাইতেছিল যে কি বলিব!

অমন ভীষণ স্থানে না থাকাই ভালো ; আর বোধ হইল যেন কাছেই নগর আছে। সুতরাং রাক্ষস মরিবার পরেই পাণ্ডবেরা তাড়াতাড়ি সে স্থান ছাড়িয়া চলিলেন। হিড়িম্বাও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল।

হিড়িম্বাকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া ভীম বলিলেন, "রাক্ষসেরা বড়ই দুষ্ট ; উহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই। তোর ভাইকে মারিয়াছি, আয়, তোকে মারি।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ছি ভীম! এমন কাজ করিতে নাই। স্ত্রীলোককে মারা বড় পাপ।"

ভীমের রাগ দেখিয়া হিড়িম্বা নিতান্ত দুঃখের সহিত জোড়হাতে কুন্তীকে বলিল, "মা, আমার কোনো দোষ নাই। আপনার ভীমকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি, আর আশা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন। আমাকে রক্ষা করুন।"

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ঠিক কথা। ভীম! তোমার ইঁহাকে বিবাহ করা উচিত।"

ততক্ষণে ভীমের রাগ চলিয়া গিয়াছে, আর দাদার কথা তিনি কখনো অমান্য করেন না। কাজেই তিনি হিড়িম্বাকে বিবাহ করিলেন।

ভীম আর হিড়িম্বার ঘটোৎকচ নামক এক পুত্র হইয়াছিল ; তাহার কথা আরো

শুনিতে পাইবে। ঘটোৎকচ ধার্মিক, বিদ্বান আর অসাধারণ বীর ছিল। জন্মমাত্রেই ঘটোৎকচ বড় মানুষের মতন করিয়া ভীমকে বলিল, "বাবা, এখন যাই। দরকার হইলে, যখন ডাকিবেন, তখনই আসিব।" এই বলিয়া সে সকলকে প্রণাম করিয়া তাহার মায়ের সহিত উত্তর দিকে চলিয়া গেল।

তারপর পাণ্ডবেরা গাছের ছাল পরিয়া আর মাথায় জটা পাকাইয়া তপস্বীর বেশে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হরিণ শিকার করিয়া খাওয়া, বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি পড়া, আর মায়ের সেবা করা, ইহাই তখন তাঁহাদের প্রধান কাজ ছিল। এইরূপে মৎস্য, ত্রিগর্ত, পাঞ্চাল, কীচক প্রভৃতি নানা দেশ ঘুরিয়া শেষে একদিন তাঁহারা ব্যাসদেবকে দেখিতে পাইলেন। ভীষ্ম যেমন ইঁহাদের ঠাকুরদাদা, ব্যাসও তেমনি। কাজেই পাণ্ডবদিগকে ব্যাস অনেক আদর করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি সব জানি। যদিও আমার কাছে তোমরা আর দুর্যোধনেরা দুইই সমান, তথাপি ইহাদের ব্যবহার দেখিয়া এখন আমি তোমদিগকেই অধিক ভালোবাসি ; আর তোমাদের উপকারের জন্যই এখানে আসিয়াছি। আমি আবার না আসা পর্যন্ত তোমরা ঐ নিকটের নগরটিতে গিয়া বাস কর।"

এই বলিয়া ব্যাস পাণ্ডবদিগকে একচক্রা নামক একটি নগরে পৌঁছাইয়া দিয়া, কুন্তীকে বলিলেন, "মা, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তোমার পুত্রেরা সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া পরম সুখে দিন কাটাইবে।"

ব্যাস তাহাদিগকে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। এক মাস পরে তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা রহিল।

সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে পাণ্ডবেরা বাস করিতে লাগিলেন। দিনের বেলা পাঁচ ভাই ভিক্ষা করিয়া আর নানা স্থান দেখিয়া বেড়ান। সন্ধ্যা হইলে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসেন। ভিক্ষার জিনিসগুলির সমান দুই ভাগ হয়। ইহার এক ভাগের সমস্তই ভীম খান, অপর ভাগ আর পাঁচজনে বাঁটিয়া খান। এইরূপে দিন যায়।

ইহার মধ্যে একদিন কি হইল শুন। সেদিন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল আর সহদেব ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। ভীমের সেদিন যাওয়া হয় নাই, তিনি মায়ের কাছেই রহিয়াছেন। ইহার মধ্যে হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণের বাড়ির ভিতরে ভয়ানক কান্না উঠিল।

কান্না শুনিয়া কুন্তী ভীমকে বলিলেন, "না জানি ব্রাহ্মণের কি ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে! ইনি আমাদিগকে এত স্নেহ করেন, আমরা কি ইঁহার কোনো উপকার করিতে পারি না, বাবা?"

ভীম বলিলেন, "মা, তুমি জানিয়া আইস, বিষয়টা কি? সাধ্য হইলে অবশ্য ব্রাহ্মণের উপকার করিব।" কথা শেষ হইতে না হইতেই আবার সেই কান্না। তখন কুন্তী ব্যস্তভাবে ছুটিয়া বাড়ির ভিতর গিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ স্ত্রী কন্যা আর পুত্র লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছেন, "হায়, কেন বাঁচিয়া আছি? বাঁচিয়া থাকায় কি সুখ? আমি আগেই এখান হইতে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম। গিন্নি! তুমি তো দিলে না! তোমার বাপের বাড়ি বলিয়া এ স্থান ছাড়িতে তোমার কষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে দেখ এখন কি কষ্ট

উপস্থিত! হায় হায়! আমি কাহাকে ছাড়িব? আর তোমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া নিজেই বা কি করিয়া যাইব? তাহার চেয়ে চল, আমরা সকলেই একসঙ্গে মরি।"

তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন, "ওগো, তুমি এমন কথা বলিও না। তোমরা থাক, আমি যাই! তুমি গেলে আমরা কেহই বাঁচিব না। কিন্তু আমি গেলে তুমি মেয়েটিকে আর ছেলেটিকে মানুষ করিতে পারিবে।"

বাপ মায়ের কথা শুনিয়া মেয়েটি বলিল, "মা, বাবা, তোমরা কেন কাঁদিতেছ? আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কর। দেখ বাবা, আমাকে আর তোমরা কয়দিন রাখিতে পারিবে? বিবাহ হইলে তো আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইব। তাহাই যদি হইল, তবে এখনই কেন আমি যাই না? তোমরা কেহ গেলে কি ভাইটি বাঁচিবে? ভাবিয়া দেখ, আমি গেলে সকল দিকই রক্ষা হয়।"

তখন ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী মেয়েটিকে জড়াইয়া ধরিয়া আরো ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন।

ছোট ছেলেটি ইহার মধ্যে কোথায় একগাছি খড় কুড়াইয়া পাইয়াছে, সেই খড় দেখাইয়া সে সকলকে বলিল, "থি! তাঁদে না! এই দান্দা দে, আমি নাথ্‌চ্ মালবো!" শিশুর কথায় সেই দুঃখের ভিতরেও সকলের হাসি পাইল। কুন্তী এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন। উঁহাদিগকে একটু হাসিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কিজন্য কাঁদিতেছেন? আপনাদের কিসের দুঃখ বলুন। আমাদের সাধ্য থাকিলে তাহা দূর করিব।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মা, আমাদের দুঃখ কি মানুষে দূর করিতে পারে? এই নগরের কাছেই বক বলিয়া একটা রাক্ষস থাকে। সে আমাদিগকে বাঘ ভাল্লুক আর শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করে, কিন্তু তাহার বদলে আমাদিগকে তাহার খাবার জোগাইতে হয়। রোজ একটি মানুষ, বিশ খারি ভাত আর দুটা মহিষ তাহার নিকট যাওয়া চাই। সে সেই ভাত মহিষ আর মানুষ সব খাইয়া শেষ করে। আমাদিগকে পালা করিয়া এক-একদিন এক-এক বাড়ি হইতে এ-সকল জিনিস পাঠাইতে হয়। যে না পাঠায়, দুষ্ট তাহার ছেলেপিলেসুদ্ধ সব মারিয়া খায়। এদেশের রাজা আমাদের কোনো খবর নেন না, তাই রাক্ষসের হাতে আমাদের এই দুর্দশা। আজ আমার পালা। আমার টাকা নাই যে একজন মানুষ কিনিয়া পাঠাইব। আপনার লোক কাহাকেই-বা কেমন করিয়া পাঠাই! তাই মনে করিয়াছি, আমরা সকলে মিলিয়া তাহার কাছে গিয়া একেবারে সকল দুঃখ দূর করিব।"

কুন্তী বলিলেন, 'ঠাকুর! আপনার কোনো চিন্তা নাই। আমার পাঁচ ছেলের একটি আজ রাক্ষসের নিকট যাইবে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তাহা কি হয় মা? আপনারা একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে অতিথি। আপনাদিগকে কিছুতেই আমি রাক্ষসের কাছে যাইতে দিব না।"

কুন্তী বলিলেন, "আপনার ভয় কি? রাক্ষস আমার ছেলের কিছুই করিতে পারিবে না। সে আরো বড়-বড় রাক্ষস মারিয়াছে। কিন্তু ঠাকুর, এ কথা কাহাকেও বলিবেন না। তাহা হইলে লোকে খামখা আসিয়া আমার ছেলেদিগকে কুস্তি শিখাইবার জন্য বিরক্ত

করিবে।"

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। কুন্তীর প্রতি তাহাদের কিরকম ভক্তি হইল বুঝিতেই পার। এদিকে কুন্তী আসিয়া ভীমকে সকল কথা বলাতে ভীম উৎসাহের সহিত রাক্ষসের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

যুধিষ্ঠির ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে এই সংবাদে বড় ভয় পাইলেন। তিনি বলিলেন, "মা! তুমি কি পাগল হইয়াছ যে, ভীমকে এমন কাজে পাঠাইতে রাজি হইলে? ভীমের যদি কিছু হয়, তবে আমাদের কি দশা হইবে?"

কুন্তী বলিলেন, "ভীমের গায় দশহাজার হাতির জোর। সে যে-সকল কাজ করিয়াছে, তাহা দেখ নাই? এ-সব কথা জানিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণের উপকার না করা ভালো বোধ হয় না।"

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মা, তুমি ঠিক বলিয়াছ, ভীমের যাওয়াই উচিত।"

পরদিন ভোরে ভীম রাক্ষসের খাবার লইয়া বনে গিয়াছেন। সেখানে গিয়া তিনি ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় হে! বক কাহার নাম? ও বক! খাবে নাকি এসো গো!" ডাকিতেছেন, আর এদিকে নিজেই ভাত খাইয়া শেষ করিতেছেন। ডাক শুনিয়া রাক্ষস দাঁত কড়মড় করিতে করিতে হাজির! কি বিকট চেহারা! এক কান হইতে আর-এক কান পর্যন্ত তাহার খালি দাঁত!

একেই তো রাগিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আবার আসিয়া দেখে, ভীম তাহার ভাত প্রায় শেষ করিয়াছেন। কাজেই বুঝিতেই পার। সে গর্জন করিয়া বলিল, "মোর ভাতটি খাইছিস্? তোকে যোম ঘর পেঠ্ঠাইব নি?"

কিন্তু তাহার কথা কে শোনে? ভীম খালি হাসেন আর খান। রাক্ষস হাত তুলিয়া ভয়ানক শব্দে ভীমকে মারিতে চলিল। ভীম তখনো হাসেন আর খান। রাক্ষস দুই হাতে ধাঁই ধাঁই করিয়া প্রাণপণে তাঁহার পিঠে চাপড় মারিতে লাগিল। তিনি তবুও খালি হাসেন আর খান! তখন রাক্ষস এক প্রকাণ্ড গাছ তুলিয়া লইয়া ভীমকে মারিতে আসিল। ততক্ষণে ভীমেরও ভাত কয়টি শেষ হইয়াছে। তখন তিনি ধীরে সুস্থে হাত মুখ ধুইয়া, হাসিতে হাসিতে রাক্ষসের হাত হইতে গাছটি কাড়িয়া লইলেন। তারপর দুজনের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে যখন আর গাছ রহিল না, তখন আরম্ভ হইল কুস্তি। দিন গেল, রাত্রিও যায়-যায়, তবু যুদ্ধ চলিয়াছে।

এইরূপে ক্রমে রাক্ষসকে কাবু করিয়া, শেষে ভীম তাহাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন। তারপর তাহার পিঠে হাঁটু দিয়া, গলা আর কোমরের কাপড় ধরিয়া এমনি বিষম টান দিলেন যে, সেই টানেই তাহার মেরুদণ্ড একেবারে দুইখান! তখনই চিৎকার আর রক্তবমি করিতে করিতে রাক্ষস মরিয়া গেল।

বকের চিৎকারে তাহার লোকজন সব ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভীম তাহাদিগকে বলিলেন, "খবরদার! আর মানুষ খাইতে পাইবি না। তাহা হইলে তোদেরও এমনি দশা করিব!"

তাহারা বলিল, "ওরে বাপ্পো! মোরা আর কখ্খনু মানুস্ খাবো নি!"

তখন হইতে উহারা ভদ্রলোক হইয়া গেল, আর মানুষ খায় না।

এদিকে ভীম রাক্ষস মারিয়া চুপিচুপি চলিয়া আসিয়াছেন। সকালবেলা সকলে উঠিয়া দেখিল, রাক্ষস মরিয়া পাহাড়ের মতো পড়িয়া আছে। সংবাদ পাইয়া একচক্রার ছেলে বুড়ো পুরুষ মেয়ে সকলে ছুটিয়া তাহা দেখিতে আসিল। কিন্তু এমন ভয়ানক কাজ কাহার? সকলে বলিল, "দেখ, কাল কাহার পালা গিয়াছে।"

পালা সেই ব্রাহ্মণের, আর কাহার হইবে? সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলুন তো ঠাকুর, কিরকম হইয়াছিল।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ঠিক কিরকমটি হইয়াছিল, তাহা তো জানি না। আমরা কান্নাকাটি করিতেছিলাম, এমন সময় এক মহাপুরুষ আসিয়া দয়া করিয়া আমাদিগকে বলিলেন, 'তোমাদের কোনো ভয় নাই, আমিই রাক্ষসের কাছে যাইব।' বোধহয় সেই মহাপুরুষ রাক্ষস মারিয়া থাকিবেন।"

এ কথায় সকলে অতিশয় আহ্লাদের সহিত নিজ নিজ ঘরে গিয়া দেবতার পূজা দিতে লাগিল।

ইহার কয়েকদিন পরে এক ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদিগের ঘরে আসিয়া রাত্রিতে থাকিবার জন্য একটু জায়গা চাহিলেন। ব্রাহ্মণটি অনেক দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন, পাণ্ডবদিগের যত্নে তুষ্ট হইয়া তিনি সেই-সকল দেশের অনেক আশ্চর্য কথা তাঁহাদিগকে শুনাইতে লাগিলেন। সেই ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, শীঘ্রই পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদের মেয়ে কৃষ্ণার স্বয়ম্বর হইবে।

কৃষ্ণার কথা অতি সুন্দর। দ্রুপদ রাজার কথা তো আগেই শুনিয়াছ। দ্রোণের নিকট তিনি কেমন সাজা পাইয়াছিলেন, তাহাও জান। সে সময়ে মুখে তিনি দ্রোণের সহিত বন্ধুতা করেন, কিন্তু মনে মনে সেই অবধি দ্রোণকে মারিবার উপায় খুঁজিতে থাকেন।

দ্রোণকে মারা যে সহজ কথা নহে, আর যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে মারা যে একেবারেই অসম্ভব, এ কথা দ্রুপদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাই তিনি স্থির করিলেন যে, কোনো মুনিকে ধরিয়া ইহার উপায় করিতে হইবে।

কল্মাষী নদীর ধারে অনেক মুনি তপস্যা করেন। সেইখানে খুঁজিতে খুঁজিতে দ্রুপদ যাজ আর উপযাজ নামক দুই ভাইকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা বড়ই ধার্মিক আর উঁহাদের ক্ষমতাও অসাধারণ। দেখিয়া দ্রুপদ মনে করিলেন যে, ইঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে আমার কাজ হইবে।'

দ্রুপদ অনেক কষ্টে যাজ ও উপযাজকে পাঞ্চাল দেশে আনিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। মুনি বলিলেন, "এই যজ্ঞে তোমার পুত্রও হইবে এবং কন্যাও হইবে।"

এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃত ঢালিবামাত্রই তাহার ভিতর হইতে আশ্চর্য মুকুট আর বর্ম পরা পরম সুন্দর এক কুমার ঝক্‌ঝকে রথে চড়িয়া গর্জন করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল ; তাহার হাতে ধনুর্বাণ আর ঢাল তলোয়ার। তখন আকাশ হইতে দেবতারা বলিলেন, "এই রাজপুত্র দ্রোণকে মারিবে।"

এদিকে আবার যজ্ঞের বেদী হইতে এক কন্যা উঠিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শরীরের

রঙ কালো, কিন্তু এমন অপরূপ সুন্দর কন্যা কেহ কখনো দেখে নাই। কালো কোঁকড়ানো চুল, পদ্মফুলের পাপড়ির মতো সুন্দর উজ্জ্বল দুটি চক্ষু, ভ্রু দুটি যেন তুলি দিয়া আঁকা। শরীরের সদ্যফোটা পদ্মের গন্ধে এক ক্রোশ পর্যন্ত ছাইয়া গিয়াছে। দেবতা ছাড়া মানুষ কখনো এমন সুন্দর হয় না। কন্যা জন্মিবামাত্র আকাশ হইতে দেবতারা বলিলেন, "এই কন্যা কৌরবদিগের ভয়ের কারণ হইবে।"

ছেলেটির নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন আর মেয়েটির নাম কৃষ্ণা রাখা হইল। কৃষ্ণাকে লোকে দ্রৌপদী অর্থাৎ দ্রুপদের কন্যা বলিয়াই বেশি ডাকিত। এই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া, পাণ্ডবদিগের তাহা দেখিতে যাইবার ইচ্ছা হইল। তাহা দেখিয়া কুন্তী বলিলেন, "চল বাবা আমরা সেইখানে যাই। এখানে আমরা অনেকদিন রহিয়াছি। বেশিদিন এক জায়গায় থাকা ভালো নহে।" সুতরাং স্থির হইল। তাঁহারা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দেখিতে পাঞ্চাল দেশে যাইবেন।

এই সময়ে ব্যাসদেবও আগেকার কথামত পাণ্ডবদিগকে দেখিবার জন্য একচক্রায় আসিলেন। ব্যাসেরও ইচ্ছা, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যান। কাজেই তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইয়া মায়ের সঙ্গে পাঞ্চাল যাত্রা করিলেন।

গঙ্গার ধারে সোমাশ্রয়ায়ণ নামে এক তীর্থ আছে, সেখানে আসিয়া পাণ্ডবদিগের রাত্রি হইল। তখন পথ দেখাইবার জন্য অর্জুন মশাল হাতে আগে আগে চলিলেন।

সেখানে এক গন্ধর্ব সপরিবারে স্নান করিতেছিল। সে পাণ্ডবদিগকে ধমকাইয়া বলিল, "এইয়ো! এদিকে আইস! জান আমি কে? আমি কুবেরের বন্ধু অঙ্গারপর্ণ। আমার ক্ষমতা এখনি দেখিতে পাইবে। মানুষ হইয়া এখানে আসিয়াছ, তোমাদের সাহস কেমন?"

অর্জুন বলিলেন, "এই তোমার বুদ্ধি যেমন! এটা গঙ্গার ধার, তোমার কেনা জায়গা তো নয় ; এখান দিয়া সকলেই যাইতে পারে। জোর বুঝি খালি তোমারই আছে, আমাদের নাই!"

ইহাতে তো গন্ধর্ব ভারি চটিয়া একেবারে ধনুক বাগাইয়া তীর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। অর্জুন তাড়াতাড়ি হাতের ঢাল আর মশাল ঘুরাইয়া তীর ফিরাইয়া দিলেন। তারপর ধনুকে আগ্নেয়াস্ত্র জুড়িয়া মারিতেই গন্ধর্ব মহাশয়ের রথ পুড়িয়া ছাই, আর তিনি নিজে মুখ থুবড়িয়া মাটিতে পড়িয়া একেবারে চক্ষু বুজিয়া অজ্ঞান! তখন অর্জুন তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত করিলেন।

এদিকে গন্ধর্বের স্ত্রী কুম্ভীনসীও যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছেন। কাজেই যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন, "ভাই, উহাকে ছাড়িয়া দাও।"

তখন অর্জুন গন্ধর্বকে বলিলেন, 'কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কাজেই তোমার আর কোনো ভয় নাই, নিশ্চিন্তে ঘরে চলিয়া যাও।"

তাহা শুনিয়া গন্ধর্ব বলিল, "আমি হার মানিলাম। ইহাতে আমার কোনো দুঃখ নাই বরং সুখের কথা। শত্রুকে কাবু করিয়া এমনভাবে দয়া কি যে-সে লোকে করিতে পারে?"

এই বলিয়া গন্ধর্ব অর্জুনকে চাক্ষুষী-বিদ্যা নামক এক আশ্চর্য বিদ্যা শিখাইয়া দিল। ত্রিভুবনের মধ্যে যে বস্তুই দেখিতে ইচ্ছা হইবে, এই বিদ্যা জানা থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া পাণ্ডবদিগকে সে একশতটি এমন আশ্চর্য ঘোড়া দিল যে, তাহারা কখনো কাহিল বা বুড়া হয় না, তাহাদের কোনো অসুখ বা মৃত্যু নাই, তাহাদের সমান ছুটিতেও কিছুতেই পারে না।

অর্জুন এই-সকলের বদলে গন্ধর্বকে ব্রহ্মাস্ত্র দিলেন ; আর স্থির হইল যে, ঘোড়াগুলি এখন গন্ধর্বের নিকটেই থাকিবে, পাণ্ডবদিগের দরকার হইলে তাঁহাদের নিকট আসিবে।

এইরূপে গন্ধর্ব আর অর্জুনে বন্ধুতা হইয়া গেল। গন্ধর্বের নাম অঙ্গারপর্ণ আর চিত্ররথ দুইই ছিল। চিত্ররথ বলিল, "এখন হইতে আমার চিত্ররথ নাম ঘুচিয়া দগ্ধরথ নাম হউক।"

চিত্ররথ অতিশয় পণ্ডিত লোক ; পাণ্ডবেরা তাহার নিকট অনেক নূতন কথা শিখিলেন। পাণ্ডবদের একটি পুরোহিত প্রয়োজন ছিল। তাই তাঁহারা চিত্ররথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, কাহাকে পুরোহিত করি?"

চিত্ররথ বলিলেন, "ধৌম্যকে পুরোহিত কর, এমন লোক আর পাইবে না। উৎকোচক নামক তীর্থে গেলে তাঁহার দেখা পাইবে।"

সুতরাং পাণ্ডবেরা উৎকোচক তীর্থে ধৌম্যের সন্ধানে চলিলেন। তাঁহাকে পুরোহিত করিয়া তাঁহাদের যে কত উপকার হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখন হইতে তাঁহাদের দলে ধৌম্য সমেত সাতজন লোক হইল। সাতজনে মিলিয়া তাঁহারা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দেখিতে চলিলেন।

পথে কয়েকটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। তাঁহারাও স্বয়ম্বরেরই যাত্রী। তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আজ্ঞে, আমরা একচক্রা হইতে আসিতেছি।"

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে চলুন! আজ পাঞ্চাল দেশে বড় ধুমধাম হইবে, আমরা তাহা দেখিতে চলিয়াছি। সেখানকার রাজা যজ্ঞসেনের মেয়ের স্বয়ম্বর। সেই মেয়ের গায়ের গন্ধ পদ্মের মতন। এক ক্রোশ দূর হইতে তাহা টের পাওয়া যায়। কত রাজা, কত পণ্ডিত, কত মুনি সেখানে আসিবেন, তাহার সীমা নাই। গান বাজনা বাজি কুস্তির কথা আর কি বলিব! পেট ভরিয়া ফলার পাইব, চোখ ভরিয়া তামাশা দেখিব, তারপর পুঁটলি ভরিয়া দান-দক্ষিণা লইয়া ঘরে ফিরিব। চলুন আমরা একসঙ্গেই যাই। আপনাদিগকে যেমন সুন্দর দেখিতেছি, চাই কি সেই মেয়ে আপনাদের কাহাকেও মালা দিয়া বসিতে পারে।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "যে আজ্ঞা! আমরা আ নাদের সঙ্গে চলিলাম।"

পাঞ্চালদেশে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবেরা এক কুমারের বাড়িতে বাসা লইলেন। সেইখানে তাঁহারা থাকেন, আর ভিক্ষা করিয়া খান।

দ্রুপদের ইচ্ছা, অর্জুনের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ হয়। সুতরাং যাহাতে অর্জুন ছাড়া আর কেহ দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে না পারে, তিনি তাহার এক আশ্চর্য উপায় স্থির

করিলেন।

একটা ভয়ংকর ধনুক, তাহাকে কেহই বাঁকাইতে পারে না ; সেই ধনুক বাঁকাইয়া তাহাতে গুণ পরাইতে হইবে। তারপর সেই ধনুকে তীর চড়াইয়া খুব উঁচুতে ঝুলানো একটা জিনিসকে বিঁধিতে হইবে। পথের মাঝখানে আবার একটা কলের মতন আছে, সেটার ভিতর দিয়া তীর গেলে তবে সেই জিনিসটাতে পৌঁছাইতে পারে।

এতখানি কাজ করিয়া যে লক্ষ্য (অর্থাৎ যে জিনিসটাকে বিঁধিবার কথা, তাহা) বিঁধিতে পারিবে, সে দ্রৌপদীকে পাইবে। দ্রুপদ বুঝিয়াছিলেন যে, অর্জুন ছাড়া আর কাহারো সে ক্ষমতা নাই, কিন্তু তিনি এ কথা কাহাকেও বলিলেন না।

স্বয়ম্বরের সংবাদ পাইয়া পৃথিবীতে যত রাজা আর রাজপুত্র আর যোদ্ধা আর বড়লোক সকলেই আসিয়া পাঞ্চাল দেশে উপস্থিত হইয়াছেন। কর্ণ, দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ কেহই আসিতে বাকি নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর মুনিঋষিতে পাঞ্চাল ছাইয়া গিয়াছে। দেবতারা পর্যন্ত না আসিয়া থাকিতে পারেন নাই।

স্বয়ম্বরের স্থানটি যে কি সুন্দর করিয়া করিয়াছে আর সাজাইয়াছে, তাহা না দেখিলে বলা কঠিন। বড়-বড় জমকালো ফটক, কাজকরা উঁচু পাঁচিল, রংবেরঙের ঝালর, নিশান, পর্দা আর চাঁদোয়া, এই-সকল একটা খুব ঘটা মনে করিয়া লও। আর মনে কর, ইহার চারিধারে খাল, তাহাতে জল টলটল করিতেছে, পদ্মফুল ফুটিয়াছে, হাঁস চরিতেছে আর লাল মাছ খেলিতেছে। রাজারাজড়ার জন্য উঁচু উঁচু জায়গা হইয়াছে, তাহাতে বসিয়া তাঁহারা ভালো মতে দেখিতে পাইবেন। সাধারণ লোকেরও ভালোমতেই দেখিবার ইচ্ছা, কিন্তু তাহাদের জন্য আর কে উঁচু জায়গা রাখিবে? কাজেই তাহারা গাছে উঠিয়া রাজাদের চেয়েও ভালো দেখিবার জোগাড় করিল। যাহারা দেখিবার বেশি সুবিধা পাইল না, তাহারা খালি গোলমাল করিয়াই সাধ মিটাইতে লাগিল। উহাদের গলার শব্দই বেশি হইয়াছিল, না বাজনার শব্দই বেশি হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত।

পনেরো দিন খালি গান-বাজনাই চলিল। ষোল দিনের দিন দ্রৌপদী স্নানের পর আশ্চর্য পোশাক এবং অলংকার পরিয়া সোনার মালা হাতে সভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি গোলমাল থামাইয়া, বাজনা থামাইয়া সারা সভাটি চুপচাপ।

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সভার মাঝখানে আনিয়া গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আপনারা সকলে শুনুন। এই ধনুর্বাণ আর ঐ লক্ষ্য আপনারা দেখিতেছেন। ঐ যে একটা কলের মতন, তাহাতে ছিদ্র আছে, তাহাও দেখুন। ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া পাঁচটি তীর মারিয়া লক্ষ্য বিঁধিয়া মাটিতে ফেলিতে হইবে। এ কাজ যিনি করিতে পারিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে পাইবেন।"

সভার সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এত রাজরাজড়ার মধ্যে না জানি কে আজ দ্রৌপদীকে লইয়া যায়। সেই সভায় কৃষ্ণ আর বলরামও উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বসিয়া আছেন। ইহাতে যারপরনাই আনন্দিত হইয়া তিনি চুপিচুপি বলরামকে এ কথা জানাইলেন। কিন্তু তাঁহারা দু'ভাই ভিন্ন আর কেহই পাণ্ডবদিগকে চিনিতে পারিল না।

তাহারা তামাশা দেখিতেই ব্যস্ত ছিল।

এদিকে বাজনা বাজিতেছে, আর রাজাদিগের মধ্য হইতে এক-একজন করিয়া লক্ষ্য বিঁধিয়া বিদ্যার পরীক্ষা দিতে যাইতেছেন। হায় হায়! সে সর্বনেশে ধনুক কাহারো হাতে বাগ মানিতে চাহে না! বরং তাহার ধাক্কায় রাজামহাশয়েরাই ঠিকরাইয়া পড়েন। বড়-বড় রাজা পর্যন্ত কেহ চিৎপাৎ হইয়া, কেহ ডিগবাজি খাইয়া, কাহারো পাগড়ি উড়িয়া গিয়া, নাকালের একশেষ। তাঁহাদের মুখে আর কথাটি নাই।

এমন সময় কর্ণ আসিয়া দেখিতে দেখিতে সেই ধনুকে গুণ আর তীর চড়াইয়া লক্ষ্য বিঁধিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহা দেখিয়া পাণ্ডবেরা মনে করিলেন, 'এই বুঝি লক্ষ্য বিঁধিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া যায়।'

কিন্তু কর্ণকে দেখিয়া দ্রৌপদী বলিলেন, "আমি সারথির ছেলের গলায় মালা দিতে পারিব না।" কাজেই কর্ণকে লক্ষ্য না বিঁধিয়াই ফিরিয়া যাইতে হইল।

সেদিন রাজামহাশয়দের যে দুর্দশা! শিশুপালের তো হাঁটুই ভাঙ্গিয়া গেল! জরাসন্ধ গুঁতা খাইয়া চিৎপাৎ! তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে সেই যে তিনি সেখান হইতে চলিলেন, আর একেবারে নিজের ঘরে না পৌঁছিয়া থামিলেন না। শল্যেরও প্রায় সেই দশা!

অর্জুন এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, রাজামহাশয়দের দুরবস্থা দেখিয়া এইবার তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অর্জুনকে লক্ষ্য বিঁধিতে যাইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা তাঁহাদের বসিবার হরিণের ছাল ঘুরাইয়া চিৎকার আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ যে আবার বিরক্তও না হইলেন, এমন নহে। তাঁহারা বলিলেন, 'আরে কর কি ঠাকুর? থামো, থামো! এ ব্যক্তি দেখিতেছি আমাদের সকলকে অপদস্থ করাইবে। বড়-বড় রাজারা যাহা পারিল না, সেটা ইহার না করিলেই নয়! বেচারার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে আর কি!"

তাহা শুনিয়া আরও অনেকে বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইয়াছ কেন? ইঁহাকে যাইতে দাও। ব্রাহ্মণে না করিতে পারে, এমন কাজ আছে? ইনি কোনো মহাপুরুষ হইবেন। দেখিতেছ না, ইঁহার কেমন চেহারা? ওঃ! গায়ে কি তেজ! কাঁধ কি চওড়া! হাত কি লম্বা! এমন সুন্দর আর-একটা মানুষ এখানে খুঁজিয়া বাহির কর দেখি। ইনি নিশ্চয় পারিবেন। তোমরা চুপ করিয়া দেখ। ঐ তিনি ধনুকে গুণ চড়াইতেছেন।"

অর্জুন ধনুকের কাছে একটু থামিয়া ব্রাহ্মণদিগের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। তারপর তিনি দেবতাকে স্মরণ করিয়া ধনুকখানি হাতে লইলেন। সে ধনুকে গুণ চড়ানো কি আর অর্জুনের কাছে একটা কঠিন কাজ? তিনি চক্ষের পলকে গুণ চড়াইয়া, পাঁচটি তীর হাতে লইলেন। তারপর দেখিতে দেখিতে লক্ষ্য বিঁধিয়া মাটিতে পড়িল। সকলে দেখিয়া অবাক!

তখন আকাশ হইতে দেবতারা জয়-জয় শব্দে অর্জুনের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, আর ব্রাহ্মণদিগের কথা কি বলিব! হরিণের ছাল, কুশাসন, চাদর, কোঁচা কিছুই তাঁহারা ঘুরাইতে বাকি রাখিলেন না। তারপর বাজনদারেরা যে তাহাদের

সকলগুলি ঢাক, ঢোল, সানাই কাড়া আর কাঁসি একসঙ্গে মিলাইয়া একটা কাণ্ড করিয়াছিল, তাহা যদি শুনিতে!

সেই আনন্দ কোলাহলের ভিতরে দ্রৌপদী হাসিতে হাসিতে অর্জুনকে মালা দিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এদিকে কিন্তু রাজামহাশয়দের মুখ ভার আর চোখ লাল। তাঁহারা নিজে যে সকলেই সেদিন কি অদ্ভুত বিদ্যা দেখাইয়াছেন, সে কথা আর তাঁহাদের মনে নাই। তাঁহারা থাকিতে ব্রাহ্মণ কেন মেয়ে লইয়া গেল, তাই তাঁহাদের রাগ! "এমন কথা? আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া অপমান করিল? অ্যাঁ! বলেন কি মহাশয়?"

"তাইতো! এমন কথা? অপমান করিল? অ্যাঁ!—মার্! মার্! দ্রুপদকে মার্, আর ঐ হতভাগা মেয়েটাকে পোড়াইয়া ফেল্?"

এই বলিয়া সকল রাজা একজোটে দ্রুপদকে আক্রমণ করিতে আসিল। দ্রুপদ আর উপায় না দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অর্জুন ইহার পূর্বেই ধনুক-বাণ লইয়া প্রস্তুত। ততক্ষণে ভীমও একটা বড়গোছের গাছ উপড়াইয়া ডাল-পাতা ঝাড়িয়া বেশ মজবুত একটি লাঠি প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন।

এদিকে এ-সকল কাণ্ড দেখিয়া কৃষ্ণ বলরামকে বলিতেছেন, "দাদা, এ ধনুক অর্জুন ভিন্ন আর কেহই এমন করিয়া বাগাইতে পারে না। আর এমন করিয়া গাছ ভাঙ্গিয়া লাঠি তয়ের করাও ভীম ছাড়া আর কাহারো কর্ম নহে। আর ঐ তিনজন নিশ্চয় যুধিষ্ঠির, নকুল আর সহদেব। শুনিয়াছিলাম, পিসীমা (অর্থাৎ কুন্তী; ইনি কৃষ্ণ বলরামের পিসীমা) আর পাণ্ডবেরা জতুগৃহ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এখন দেখিতেছি তাহা সত্য!"

বলরাম বলিলেন, "পিসীমা বাঁচিয়া আছেন শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।"

রাজারা যুদ্ধ করিতে আসিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের বড়ই রাগ হইল। তাঁহারা হরিণের ছাল আর কমণ্ডলু ঘুরাইয়া ভীম অর্জুনকে বলিলেন, "তোমাদের ভয় নাই। আমরা তোমাদের হইয়া যুদ্ধ করিব।"

অর্জুন তাহাতে একটু হাসিয়া বলেন, "আপনারা দাঁড়াইয়া দেখুন, আমরাই ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছি।"

তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কর্ণ অর্জুনকে আর শল্য ভীমকে মারিবার জন্য দাঁত কড়মড় করিতে করিতে ছুটিলেন, আর অন্য সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তাড়া করিলেন।

কর্ণও খুব রাগিয়া তীর মারেন, অর্জুনও তেমনি তেজের সহিত তাঁহাকে সাজা দেন। তাহা দেখিয়া কর্ণ বলিলেন, "আপনি কে ঠাকুর? আমার মনে হয়, আপনি স্বয়ং ধনুর্বেদ বা পরশুরাম বা সূর্য বা বিষ্ণু মানুষ সাজিয়া আসিয়াছেন। আমি রাগিয়া দাঁড়াইলে ইন্দ্র আর অর্জুন ছাড়া কেহ তো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে না।"

অর্জুন বলিলেন, 'আমি ধনুর্বেদও নহি, পরশুরামও নহি। আমি সাদাসিধা ব্রাহ্মণ, গুরুর কাছে অস্ত্র শিখিয়া তোমাকে সাজা দিতে আসিয়াছি।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "আপনার ব্রাহ্মণের তেজ, আপনার সঙ্গে আমি পারিব

কেন?" এই বলিয়া তিনি যুদ্ধ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে শল্য আর ভীমে মল্লযুদ্ধ চলিয়াছে। এক-একটা কিল পড়ে, যেন পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে। ক্রমাগত কেবল ধুপ্‌ধাপ্, টিপটাপ্, ঠকাঠক্, চটাপট্ ছাড়া আর কথাই নাই। এমন সময়ে ভীম শল্যকে তুলিয়া এক আছাড় দিলেন, আর তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, ভীম শল্যকে এমনি কাবু করিয়াও তাহাকে মারিলেন না।

এ-সকল কাণ্ড দেখিয়া রাজামহাশয়েরা ভয়ে জড়সড়। তাঁহারা আর যুদ্ধ করিবেন কি, এখন কোনো মতে ভীম আর অর্জুনের প্রশংসা করিয়া মানে মানে ফিরিতে পারিলে বাঁচেন। কাজেই তাঁহারা বলিলেন, "বাঃ! ইঁহারা খুব যুদ্ধ করিয়াছেন! যে-সে লোক তো কর্ণ আর শল্যকে আঁটিতে পারে না। ইঁহারা ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ হাজার দোষী হইলেও তাঁহাকে মাপ করিতে হয়। ইঁহাদের সহিত আমাদের যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই, যদিও দরকার হইলে অবশ্য আমরা একটা কাণ্ড-কারখানা করিয়া ফেলিতে পারিতাম!"

তাহা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "রাজামহাশয়েরা ঠিক বলিয়াছেন। ইঁহারা উচিত মতেই রাজকন্যাকে পাইয়াছেন, ইঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনাদের কাজ নাই!"

কাজেই তখন রাজারা চলিয়া গেলেন।

এদিকে কুন্তী সেই কুমারের ঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন, "পুত্রেরা কেন এখনো ভিক্ষা লইয়া ঘরে ফিরিল না? দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্রের লোকেরা কি তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল, না রাক্ষসেরা তাঁহাদের কোনো অনিষ্ট করিল?"

এমন সময় ভীম আর অর্জুন আসিয়া বাহির হইতে বলিলেন, "মা! আজ ভিক্ষায় গিয়া বড় সুন্দর জিনিস আনিয়াছি।"

কুন্তী ভিতরে ছিলেন, দেখিতে পান নাই। তিনি বেশি না ভাবিয়াই বলিলেন, "যাহা পাইয়াছ, তাহা তোমাদের সকলেরই হউক।"

বলিতে বলিতেই দেখেন, ওমা! কি সর্বনাশ! এতো সাধারণ জিনিস নহে, এ যে রাজকন্যা!

এখন উপায়? কুন্তী যে 'সকলেরই হউক' বলিয়া বসিয়াছেন, এখন উপায় কি? এ কথা মিথ্যা হইয়া গেলে কুন্তীর পাপ হয়। সত্য হইতে হইলে পাঁচ ভাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে হয়।

পাণ্ডবেরা বলিলেন, "তাহাই হউক, দ্রৌপদীকে আমরা সকলে মিলিয়া বিবাহ করিব; তবু মায়ের কথা মিথ্যা হইতে দিব না!"

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্তা ঠিক হইয়াছে, এমন সময় কৃষ্ণ আর বলরাম সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। কৃষ্ণকে দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কি আশ্চর্য! আমরা এখানে লুকাইয়া রহিয়াছি, তোমরা আমাদের কথা কি করিয়া জানিলে?"

কৃষ্ণ বলিলেন, "আগুন কি কাপড়ে চাপা থাকিতে পারে? যে কাণ্ড-কারখানা আজ হইয়াছে, আপনারা নহিলে আর কে তাহা করিবে? কি ভাগ্য যে আপনারা সেই দুষ্টদের হাত হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছেন!"

এইরূপ খানিক কথাবার্তা কহিয়া কৃষ্ণ আর বলরাম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এখানকার ঘটনা তো এইরূপ। ওদিকে দ্রুপদ আর তাঁহার লোকেরা না জানি কি করিতেছেন! তাঁহাদের মনে খুবই চিন্তা, তাহাতে আর ভুল কি? দ্রৌপদী কাহার হাতে পড়িলেন, যে দুজনে তাঁহাকে লইয়া গেল, তাহারা কে, কিরূপ লোক, কিছুই জানা নাই। এমন অবস্থায় আপনার লোকের মন কি স্থির থাকিতে পারে? কাজেই ধৃষ্টদ্যুম্ন কয়েকটি লোক লইয়া চুপিচুপি সেই দুজনের পিছু পিছু চলিলেন। "চল, আমরাও ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাই।"

ঐ সেই দুজন দ্রৌপদীকে লইয়া চলিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা অনেকেই উহাদের সঙ্গে যাইতেছেন। যে লক্ষ্য বিঁধিয়াছিল, দ্রৌপদী যেন খুব আহ্লাদের সহিত তাঁহার আসনখানি বহিয়া চলিয়াছেন। উহারা কোথায় যায়, দেখিতে হইবে।

তাইতো, উহারা যে কুমারের বাড়ি ঢুকিল! আচ্ছা দেখা যাউক, এরপর কি করে। সেখানে আরো কাহারা আছে তিনজন পুরুষমানুষ। ঠিক ইহাদেরই মতো তাহাদেরও চেহারা, নিশ্চয় ইহাদের ভাই হইবে। আর ঐ বুড়া স্ত্রীলোকটি কে? তাহার শরীরে কেমন তেজ দেখিয়াছ? খুব বড়ঘরের মেয়ে, তাহাতে সন্দেহ নাই, বোধ হয় ইহাদের মা। নহিলে উহারা আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিবে কেন?

দ্রৌপদীকে সেই স্ত্রীলোকটির কাছে রাখিয়া উহারা কোথায় বাহির হইয়া গেল? বোধ হয় ভিক্ষায়।

ঐ তাহারা ভিক্ষা লইয়া ফিরিয়াছে; আর দেখ, ছোট চারিজন তাহাদের ভিক্ষার জিনিস তাহাদের বড় ভাইটির সামনে আনিয়া রাখিতেছে। উহারা নিশ্চয় খুব ধার্মিক লোক! দেখ না, সকলের আগে ভিক্ষার জিনিস দেবতাকে দিল। আর দেখ, দাদা কেমন উহার ভিতর হইতে আবার ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা দিতেছে!

আচ্ছা উহারা তো সাতজন লোক, কিন্তু ভিক্ষার জিনিস মোটে দুইভাগ করিল কেন? ওহ! দেখিয়াছ? একভাগের তাবতই ঐ ষণ্ডাটি একলা নিল! তা উহার যেমন শরীর, আহারটি তো তেমন চাই। কম খাইলে কি আর এত বড় গাছ লইয়া রাজামহাশয়দিগকে এমন সাজাটি দিতে পারিত? উহার ওটুকু চাই। বাকি অর্ধেকের ছয়ভাগ হইল, আর ছয়জনে খাইবে।

বাঃ! ভিখারির খাওয়া-দাওয়া তো বেশ সহজ! ঐ শেষ হইয়া ইহারই মধ্যে সব পরিষ্কার। ছোট দুটি ভাই কুশ বিছাইতেছে। বিছানাও বেশ পরিষ্কার, কুশের উপর হরিণের ছাল, বেশ তো! পাঁচ ভাই দক্ষিণশিয়রী হইয়া শুইল। উহাদের মা উহাদের মাথার কাছে, আর ঐ দেখ দ্রৌপদী পায়ের কাছে শুইলেন। কিন্তু দেখিলে? পায়ের কাছে শুইয়াই কেমন সুখী!

শোন, শোন! উহারা কি কথাবার্তা বলে। যুদ্ধের কথা, অস্ত্র-শস্ত্রের কথা। কি সুন্দর কথাবার্তা! ইহারা নিশ্চয় ক্ষত্রিয় আর বড়লোক! চল যাই, রাজাকে বলি গিয়া।

এইরূপ দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও তাঁহার দলের লোক চলিয়া আসিলেন।

এদিকে দ্রুপদ যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া আছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিতেই তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন, "কি দেখিলে বাবা? আমাদের কৃষ্ণা কাহার হাতে পড়িল? সে লোকটি কি অর্জুন হইবে? আহা! কৃষ্ণা আমার কোনো ছোটলোকের হাতে পড়ে নাই তো?"

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন, "বাবা! কোনো চিন্তা করিবেন না। কৃষ্ণা যে সে লোকের হাতে পড়ে নাই। উহারা নিশ্চয় ক্ষত্রিয় আর খুবই বড়লোক হইবেন, তাহাতে ভুল নাই। শুনিয়াছি পাণ্ডবেরা নাকি সেই আগুনে পোড়া হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। আমার মনে হয় ইঁহারাই পাণ্ডব!"

আহা! কি আনন্দের কথা! ইঁহারা কি তবে পাণ্ডব? যাহা হউক, ইঁহাদিগকে উচিত আদর দেখাইতে হইবে।

তখনই রাজপুরোহিত ছুটিয়া সেই কুমারের বাড়িতে চলিলেন। সেখানে আসিয়া যখন যুধিষ্ঠিরের নিকট সকল কথাই জানিতে পারিলেন, তখন তাহার আনন্দ দেখে কে!

ইহারই মধ্যে রাজবাড়ি হইতে সোনার রথ লইয়া লোক উপস্থিত। সেই রথে চড়িয়া সকলে রাজবাড়ি আসিলেন। সেখানে কতরকম জিনিস দিয়া যে তাঁহাদিগকে আদর করিল, তাহার সীমা নাই। আর আহারের আয়োজনের কথা কি বলিব? তেমন মিঠাই সন্দেশ আমি কখনো দেখি নাই। পাণ্ডবেরা দামী পোশাক পরিয়া সোনার থালায় সেই-সকল মিষ্টান্ন আহার করিলেন। যে-সকল জিনিস তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া আর কিছু তাঁহারা লইলেন না। ইহাতে নিশ্চয় বুঝা গেল যে ইঁহারা ক্ষত্রিয়; তথাপি দ্রুপদ তাঁহাদিগকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "আপনারা কে, আমরা তাহা জানি না। আপনারা নিজের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে সুখী করুন।"

এ কথার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ! কোনো চিন্তা করিবেন না। আমরা ক্ষত্রিয়, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র। কুন্তীদেবী আমাদের মাতা। আমি সকলের বড়, আমার নাম যুধিষ্ঠির। ইঁহার নাম ভীম। ইনি অর্জুন, যিনি লক্ষ্য বিঁধিয়াছিলেন। মা আর দ্রৌপদীর সঙ্গে যে দুটি আছেন, তাঁহাদের নাম নকুল আর সহদেব।"

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া দ্রুপদ আহ্লাদে কিছুকাল কথা কহিতে পারিলেন না। তারপর কথাবার্তায় সকল ঘটনা জানিতে পারিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন, "তোমাদের রাজ্য নিশ্চয় তোমাদিগকে লইয়া দিব!"

তারপর বিবাহের কথা। পাঁচ ভাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন শুনিয়া তো সকলে অবাক। এমন কথা তো কেহ কখনো শুনে নাই। এও কি হয়?

সকলে এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময় ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা কেন ব্যস্ত হইয়াছ? এ কাজে কোনো মুস্কিলই নাই। দ্রৌপদীর সহিত যে ইঁহাদের বিবাহ হইবে, ইহা তো শিব অনেকদিন আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন। আর-এক জন্মে দ্রৌপদী এক মুনির কন্যা ছিলেন। যাহাতে খুব গুণবান লোকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, এইজন্যই সেই কন্যা শিবের তপস্যা করেন। শেষে যখন শিব বর দিতে আসিলেন, তখন কন্যা ব্যস্ত হইয়া ক্রমাগত পাঁচবার বলিলেন, 'সকল গুণ যাঁহার আছে, এমন লোকের সহিত আমার বিবাহ হউক।' শিব বলিলেন, 'তুমি পাঁচবার এ কথা বলিলে, কাজেই পাঁচজনের সহিত

তোমার বিবাহ হইবে।' সেই কন্যা এখন দ্রৌপদী হইয়াছেন। আর শিবের আজ্ঞা, কাজেই পাঁচজনের সহিত তাঁহার বিবাহ হইতেই হইবে।"

তারপর বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। কত লোক, কত বাদ্য, কত গান, কত সাজ, কত আলো, কত পূজা, কত আনন্দ! হাতি ঘোড়া, রত্ন অলংকার, দাস দাসী প্রভৃতি যৌতুকই (অর্থাৎ দ্রুপদ পাণ্ডবদিগকে যাহা দিলেন)-বা কত! যাহারা দেখিতে আসিয়াছিল, এত আয়োজন আর এমন সুন্দর বর-কন্যা দেখিয়া তাহাদের চক্ষু জুড়াইয়া গেল ; আর দামী পোশাক আর অলংকার উপহার পাইয়া তাহাদের মন খুশি হইয়া গেল।

দুর্যোধন আর তাঁহাদের দলের লোকেরা দেখিলেন যে, পাণ্ডবদিগকে তাঁহারা পোড়াইয়া মারিয়াছেন বলিয়া মনে মনে এত সুখ বোধ করিয়াছিলেন, সেই পাণ্ডবদিগের সহিতই দ্রৌপদীর বিবাহ হইয়াছে। যিনি লক্ষ্য বিঁধিয়াছিলেন তিনি অর্জুন, আর যিনি শল্যকে আছড়াইয়াছিলেন, তিনি ভীম ছাড়া আর কেহ নহেন।

তখন তাঁহাদের যে দুঃখ! তাঁহারা এত চেষ্টা করিলেন, তবুও পাণ্ডবেরা মরিলেন না, কি অন্যায়! সেই পুরোচনটা নিতান্তই গাধা ছিল, তাহারই বুদ্ধির দোষে পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া গিয়াছেন!

ক্রমে এই সংবাদ বিদুরের নিকট পৌঁছিল। তাহা শুনিবামাত্রই তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ! স্বয়ম্বর সভায় কৌরবেরাই জিতিয়াছে।"

অবশ্য পাণ্ডবেরাও তো কৌরব, কাজেই বিদুর ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বিদুর, কি সুখের সংবাদই শুনাইলে! শীঘ্র দুর্যোধন আর দ্রৌপদীকে এখানে নিয়া আসুক।"

বিদুর বলিলেন, "মহারাজ, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে পাইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ভালো আছেন; আর সেখানে তাঁহাদের অনেক বন্ধু জুটিয়াছে।"

এই সংবাদে ধৃতরাষ্ট্রের মনে খুবই দুঃখ হইল। কিন্তু তিনি সামলাইয়া গিয়া বলিলেন, "তা ভালোই হইয়াছে। আমি আমার নিজের ছেলেদের চেয়েও পাণ্ডবদিগকে ভালোবাসি। আমার ছেলেগুলি বড় দুষ্ট ; উহারা পাণ্ডবদের হাতে খুবই সাজা পাইবে।"

বিদুর বলিলেন, "মহারাজ, সকল সময়ই যেন আপনার এইরূপ বুদ্ধি থাকে।"

এই কথাবার্তার কথা জানিতে পারিয়া দুর্যোধন আর কর্ণ গোপনে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "আপনি বিদুরের কাছে শত্রুর প্রশংসা করিলেন কেন? উহাদিগকে এইবেলা জব্দ না করিতে পারিলে যে শেষে আমাদের বিপদ হইবে।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমারও সেই মত। কেবল বিদুরের কাছে মনের কথা লুকাইবার জন্য পাণ্ডবদের প্রশংসা করি। ও তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। সুযোধন! তুমি কি করিতে চাহ, বল।"

সুযোধন কে, বুঝিলে?—দুর্যোধন! বাপ কিনা ছেলেকে আদর করিয়া মিষ্টনামে ডাকিয়া থাকে, তাই ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বলিতেন, 'সুযোধন'।

দুর্যোধন পাণ্ডবদিগকে মারিবার জন্য কতরকম উপায়ের কথাই ভাবিয়া

রাখিয়াছেন—

'পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দিলে উহারা নিজেরাই কাটাকাটি করিয়া মরিবে।'

'দ্রুপদকে ধন দিয়া বশ করিলেও কাজ চলিতে পারে।'

'গুণ্ডা লাগাইয়া ভীমকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে তো আর কথাই নাই।'

'আর কিছু না হয়, তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া এখানে আনিয়া মারিবার ফন্দি করিলেও মন্দ হয় না।'

এ-সকল পরামর্শ কর্ণের তত ভালো লাগিল না। তাঁহার ইচ্ছা, এখনই যুদ্ধ করিয়া পাণ্ডবদিগকে বধ করেন।

যাহা হউক, ধৃতরাষ্ট্র ইঁহাদের কথায় নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ আর বিদুরকে ডাকাইলেন।

ভীষ্ম আর দ্রোণ দুইজনেই বলিলেন, "পাণ্ডবদিগকে অর্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সহিত বন্ধুতা করা উচিত, নহিলে বিপদ হইবে।" কিন্তু এ কথা কর্ণের একেবারেই পছন্দ হইল না। রাগের চোটে ভদ্রতা ভুলিয়া গিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! ইঁহারা আপনার টাকা খান, অথচ কি পরামর্শ দিলেন দেখুন। ইঁহারা কেমন লোক, আর আপনার কেমন বন্ধু, ইহাতেই বুঝিয়া লইবেন।"

বিদুর বলিলেন, "মহারাজ! ভালো কথা কেবল বলিলে কি হয়, তাহার মতো কাজ হইলে তবে তো উপকার হইবে। ভীষ্ম দ্রোণ ইঁহারা এক-একজন কিরূপ মহাপুরুষ, ভাবিয়া দেখুন। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ইহারা গোঁয়ার ; ইহাদের কথা শুনিয়া চলিলে আপনার সর্বনাশ হইবে, এ কথা আমি বলিয়া রাখিতেছি।"

কাজেই তখন ধৃতরাষ্ট্র আর কি করেন? তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ আর বিদুরের মতেই মত দিয়া বলিলেন, "বিদুর! তুমি গিয়া ইহাদের সকলকে আদরের সহিত লইয়া আইস।"

বিদুর এই সংবাদ লইয়া পাঞ্চালদেশে যাইতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। অনেকদিন পরে পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া তাঁহার যেমন সুখ হইল, পাণ্ডবদের তাঁহাকে দেখিয়া তেমনি, বরং তাহার চেয়ে অধিক সুখ হইল। দ্রুপদ, কৃষ্ণ, বলরাম ইঁহারা বিদুরকে যারপরনাই সম্মান দেখাইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ভালো বুদ্ধি হইয়াছে, ইহা তো বেশ সুখেরই বিষয়। কাজেই পাণ্ডবেরা দ্রুপদের অনুমতি লইয়া বিদুর কৃষ্ণ আর বলরামের সঙ্গে হস্তিনায় আসিলেন। আহা, নগরের লোকগুলির তাঁহাদিগকে দেখিয়া যে আনন্দ! তাহারা যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাইল।

তারপর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "বাবা যুধিষ্ঠির! তোমরা অর্ধেক রাজ্য লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস কর ; তাহা হইলে আর দুর্যোধনের সহিত তোমাদের কোনোরূপ ঝগড়া হইবে না।" সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণামপূর্বক পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে আসিয়া অর্ধেক রাজ্য লইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

খাণ্ডবপ্রস্থ দেখিতে দেখিতে হস্তিনার চেয়েও বড় আর সুন্দর হইয়া উঠিল। মঠ-

মন্দির, লোকজন, হাট-বাজার, দীঘি-পুকুর-বাগানে এমন শোভা আর অতি অল্প স্থানেই দেখা যায়।

এইরূপ সুখে তাঁহাদিগকে খাণ্ডবপ্রস্থে রাখিয়া কৃষ্ণ আর বলরাম দ্বারকায় (যেখানে তাঁহাদের বাড়ি) চলিয়া গেলেন।

ইহার মধ্যে কি হইল শুন।

পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই আর দ্রৌপদী, ইঁহাদের নিজেদের মধ্যে ব্যবহার অতিশয় মিষ্ট ছিল। দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁহারা যারপরনাই ভদ্রতা করিয়া চলিতেন। তিনি তাঁহাদের কোনো একজনের সহিত কথাবার্তা কহিবার সময় কখনো আর-একজন গিয়া তাহাতে বাধা দিতেন না। এমন-কি তাঁহাদের নিয়ম ছিল যে, যদি তাঁহাদের কেহ এরূপ অভদ্রতা করেন, তবে তাঁহাকে বারো বৎসর সন্ন্যাসী হইয়া বনে বাস করিতে হইবে।

ইহার মধ্যে একদিন এক ব্রাহ্মণের গোরু চোরে লইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ তো খাণ্ডবপ্রস্থে আসিয়া মহাকান্না জুড়িয়াছেন, "হে পাণ্ডবগণ! আমার গোরু চোরে লইয়া গেল! হায় হায়! আমার গোরু যে চোরে লইয়া গেল!"

ব্রাহ্মণের কান্না শুনিয়া অর্জুন বলিলেন, "ভয় নাই ঠাকুর! এই আমি চোরকে সাজা দিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি অস্ত্র আনিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল যে, অস্ত্রের ঘরে দ্রৌপদী আর যুধিষ্ঠির কথাবার্তা কহিতেছেন। তখন অর্জুন ভাবিলেন যে, 'এখন গিয়া ইঁহাদের কথাবার্তায় বাধা দিলে অভদ্রতা হইবে, আর বারো বৎসরের জন্য বনে যাইতে হইবে বটে, কিন্তু চোখের সামনে ব্রাহ্মণের গোরু চোরে লইয়া যাইতেছে, ইহা সহ্য হইবার নহে। বরং বনেই যাইব, তথাপি ব্রাহ্মণের গোরু চোরে নিতে দিব না।'

এই মনে করিয়া তিনি অস্ত্র লইয়া চোর ধরিতে বাহির হইলেন। চোরকে মারিয়া ব্রাহ্মণের গোরু আনিয়া দিতে তাঁহার বেশি বিলম্ব হইল না। ব্রাহ্মণ গোরু পাইয়া চিৎকারপূর্ব অর্জুনকে প্রশংসা আর আশীর্বাদ করিতে করিতে ঘরে ফিরিলেন।

তারপর অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া বলিলেন, "দাদা, নিয়ম যে ভাঙ্গিল! এখন অনুমতি করুন, বনে যাই।"

যুধিষ্ঠির তো শুনিয়াই অবাক! তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "সে কি ভাই, তোমার তো কিছুমাত্র অভদ্রতা হয় নাই। আর তুমি ব্রাহ্মণের কাজ করিতে গিয়াছিলে, সুতরাং একটা নিয়ম থাকিলেও তোমার না গেলেই দোষ হইত। আমি তো তোমার দাদা, আমার কথা তো মান্য কর, আমি বলিতেছি তোমার বনে যাওয়ার দরকার নাই। লক্ষ্মী ভাই! তুমি কোনো চিন্তা করিও না।"

অর্জুন বলিলেন, "দাদা! আপনি তো কহিয়াছেন, মিথ্যা বলিয়া ধর্মকর্মও করিবেন না। নিয়ম করিয়া তাহা ভাঙ্গিলে অন্যায় করা হইবে। আমি অস্ত্র ছুঁইয়া বলিতেছি, আমি তাহা পারিব না।"

কাজেই যুধিষ্ঠির আর বিদায় না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। অর্জুন তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বারো বৎসরের জন্য বনে চলিয়া গেলেন।

অর্জুন বনে থাকার সময় অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন তিনি গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিতেছেন, এমন সময় নাগরাজ কৌরবের কন্যা উলুপী তাঁহাকে ধরিয়া জলের ভিতর দিয়া একেবারে তাঁহাদের দেশে (অর্থাৎ পাতালে) নিয়া উপস্থিত করেন। তারপর যতক্ষণ না অর্জুন উলুপীকে বিবাহ করিতে রাজি হন, ততক্ষণ তিনি তাঁহাকে আসিতে দেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরে অর্জুন মণিপুর যান, আর সেখানকার রাজার কন্যা চিত্রাঙ্গদার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

ইহার পরে অর্জুন গঙ্গার ধারে আসিয়া পাঁচটি তীর্থ দেখিতে পাইলেন। তীর্থগুলি খুব সুন্দর, অথচ তাহাতে লোকজন নাই। ইহাতে তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কারণ কি?" তাহা শুনিয়া কয়েকজন মুনি বলিলেন, "এই পাঁচ তীর্থে কুমির আছে, কেহ জলে নামিলেই তাহারা তাহাকে ধরিয়া খায়। তাই এখানে কেহ স্নান করিতে আসে না।"

এ কথা শুনিয়া অর্জুন কুমির দেখিতে চলিলেন। মুনিরা অনেক নিষেধ করিলেও শুনিলেন না।

এই পাঁচ তীর্থের একটাতে গিয়া অর্জুন স্নান করিবার জন্য যেই জলে নামিয়াছেন, অমনি এক প্রকাণ্ড কুমির আসিয়া তাঁহার পা কামড়াইয়া ধরিয়াছে। আর অর্জুনও সেই মুহূর্তেই কুমিরকে ধরিয়া টানিতে টানিতে ডাঙ্গায় আনিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু একি আশ্চর্য! ডাঙ্গায় আসিয়াই কুমির আর কুমির নাই; সে পরমাসুন্দরী একটি কন্যা হইয়া গিয়াছে। অর্জুন তো দেখিয়া অবাক। তিনি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার অর্থ কি? তুমি কে?"

কন্যা বলিল, "মহাশয়, আমি অপ্সরা। আমার নাম বর্গা। আমার চারিটি সখী আছে, তাহাদের নাম—সৌরভেয়ী, সমীচি, বুদ্বুদা আর লতা। আমরা এক তপস্বীকে অমান্য করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি রাগিয়া আমাদিগকে কুমির করিয়া দেন। তপস্বী বলিয়াছিলেন যে, কোনো মানুষ আমাদিগকে জল হইতে টানিয়া তুলিতে পারিলেই আমাদের শাপ দূর হইবে। তাই আমরা পাঁচজন এই পাঁচ তীর্থে বাস করি, আর মানুষ জলে নামিলেই তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাই। কিন্তু এ পর্যন্ত আর কেহ আমাদিগকে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিতে পারে নাই, কাজেই আমরাও এতদিন কুমির থাকিয়া গিয়াছি। আজ আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন। এখন আমার সখী চারিটিকে দয়া করিয়া উদ্ধার করুন।"

অর্জুন তখনই আর চারি তীর্থে গিয়া সেখানকার চারিটি কুমিরকে টানিয়া তুলিলেন। পাঁচটি অপ্সরা পাপের দায় হইতে রক্ষা পাইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

ইহার পর নানাপ্রকার তীর্থ দেখিতে দেখিতে অর্জুন ক্রমে প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইলেন। এই তীর্থ কৃষ্ণের রাজ্যের মধ্যে। কৃষ্ণ অর্জুনের সংবাদ পাইয়া সেখানে আসিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন।

বলরাম এবং কৃষ্ণের একটি ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম সুভদ্রা। সুভদ্রার সহিত যেমন করিয়া অর্জুনের বিবাহ হইয়াছিল, সে এক আশ্চর্য কথা। রূপে গুণে সুভদ্রার মতো মেয়ে

অতি কমই দেখা যায়। তাঁহাকে দেখিয়া অর্জুনের বড়ই ভালো লাগিল।

কৃষ্ণ অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে চাহেন। ইহাতে তাঁহার মনে অতিশয় আনন্দ হইল ; কারণ অর্জুনকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, আর জানিতেন যে, সুভদ্রার সহিত বিবাহ দিবার জন্য এমন গুণবাণ লোক আর পাওয়া যাইবে না।

এখন এ বিবাহ কিরূপে হইতে পারে, কৃষ্ণ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়দের বিবাহের নানারূপ নিয়ম আছে ; কন্যাকে বলপূর্বক লইয়া গিয়া বিবাহ করা তাহার মধ্যে একটি। কৃষ্ণ বলিলেন, "এ নিয়মটি আমার বেশ লাগে। কেননা, ইহাতে বুঝা যায় যে, বর খুব বীরপুরুষ আর কন্যার জন্য সে অনেক বিপদ আর পরিশ্রম সহ্য করিতে প্রস্তুত।"

সুতরাং স্থির হইল যে, যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পাইলে অর্জুন সুভদ্রাকে জোর করিয়া বিবাহ করিবেন।

যুধিষ্ঠিরের অনুমতি সহজেই পাওয়া গেল, এখন বিবাহ হইলেই হয়। এ বিষয়ের সকল কথা কৃষ্ণ আর অর্জুন দুজনে ঠিক করিলেন ; দ্বারকার আর কেহ জানিতে পারিল না।

ইহার মধ্যে একদিন সুভদ্রা রৈবতক পর্বতে দেবতার পূজা করিতে গিয়াছেন। অর্জুন দেখিলেন, এই তাঁহার সুযোগ। তিনি তাড়াতাড়ি যুদ্ধের বেশে অস্ত্র-শস্ত্র হাতে সুন্দর রথে চড়িয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুভদ্রার পূজা-অর্চনা শেষ হইয়াছে, এখন দ্বারকায় ফিরিতে হইবে, এমন সময় অর্জুন আসিয়া তাঁহাকে রথে তুলিয়া দে ছুট! সঙ্গের লোকেরা তখন মহাকোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। কেহ দ্বারকায় সংবাদ দিতে যায়, কেহ প্রহরীদিগকে ডাকে, আর সকলে খালি হাউ-মাউ আর ছুটাছুটি করে!

এদিকে দ্বারকার বড়-বড় বীরেরা রাগে অস্থির! "এত বড় আস্পর্ধা! আমাদিগের এমন অপমান?" এই বলিয়া তাঁহারা সকলে বর্ম-চর্ম লইয়া রথ সাজাইয়া প্রস্তুত! বলরাম তো এতই রাগিয়াছেন যে, সেইদিনেই-বা সকল কৌরব মারিয়া শেষ করেন!

এমন সময় কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমরা যে চটিয়াছ, বল দেখি অর্জুনের কি দোষ? ক্ষত্রিয়েরা তো এইরূপ বিবাহকেই খুব ভালো বিবাহ মনে করে ; অর্জুন তাহাই করিয়াছেন। অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিবেন, ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত সুখেরই কথা। আর তিনি বীরপুরুষ, সুতরাং জোর দেখানো তাঁহার মতো লোকের উপযুক্ত কাজই হইয়াছে। তোমরা যে ইহাতে অপমান মনে করিতেছ, অপমান কিসে হইবে, জান? যদি অর্জুন সুভদ্রাকে লইয়া দেশে চলিয়া যায়, তবেই অপমান। আর সে কেমন বীর, তাহাও তো জান। জোর করিয়া তাহাকে কিছুতেই আটকাইতে পারিবে না। আমার কথা যদি শুন, তবে এইবেলা তাঁহাকে মিষ্ট কথায় খুশি করিয়া ফিরাও। তাহাকে ঘরে আনিয়া আদর করিয়া বিবাহ দাও ; তাহা হইলে আর অপমানের কথা থাকিবে না, আনন্দের কথা হইবে।"

কৃষ্ণের কথায় যাদবেরা তাড়াতাড়ি অর্জুনকে মিষ্ট কথায় ডাকিয়া ফিরাইলেন।

তারপর ধুমধামের সহিত তাঁহার আর সুভদ্রার বিবাহ হইল।

বিবাহের পর অর্জুন দ্বারকা হইতে পুরুষতীর্থে যান। এইরূপে ক্রমে তাঁহার বারো বৎসর বনবাস শেষ হওয়াতে তিনি সুভদ্রা এবং কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে চলিয়া আসিলেন! সেখানে কয়েকদিন খুব আনন্দেই কাটিল। তারপর কৃষ্ণ ছাড়া যাদবদিগের আর সকলে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর একদিন কৃষ্ণ আর অর্জুন, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতিকে লইয়া যমুনার ধারে বেড়াইতে যান। সেখানে সকলেই আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ আর অর্জুন খানিক দূরে একটি স্থানে বসিয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

এমন সময় জটাচীরধারী (অর্থাৎ মাথায় জটা আর গাছের ছাল পরা) আর পিঙ্গ লবর্ণের দাড়ি-গোঁফওয়ালা এই লম্বা এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রঙ কাঁচা সোনার মতো, আর তেজ প্রভাতের সূর্যের মতো।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, আমার একটু বেশি করিয়া খাওয়া অভ্যাস। আপনাদের নিকট আমি কিছু জলযোগের প্রার্থনা করি।

কৃষ্ণ আর অর্জুন বলিলেন, "আপনি কি খাইতে চাহেন বলুন, আমরা আনিয়া দিতেছি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মিঠাই মণ্ডা, ভাত ব্যঞ্জন আমি কিছুই খাই না! আমি খাণ্ডব নামক বনটিকে খাইব, আপনারা তাহারই উপায় করিয়া দিন।"

কি অদ্ভুত জলযোগ! আর ব্রাহ্মণটিও যে কম অদ্ভুত নহেন, তাহা তাঁহার পরিচয় শুনিলেই বুঝিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি অগ্নি। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, খাণ্ডব বনটাকে খাই! কিন্তু সেই বনে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক নাগ আর তাহার পরিবার থাকাতে, আমি সেখানে গেলেই ইন্দ্র বৃষ্টি ফেলিয়া আমাকে নিবাইয়া দেন। তাই আমি আপনাদের নিকট আসিয়াছি। আপনারা যদি বৃষ্টি থামাইয়া আর বনের জন্তুগুলিকে আটকাইয়া রাখিতে পারেন, তবে আমার কিঞ্চিৎ ভোজন হয়।"

ব্যাপারখানা কি জান? শ্বেতকী বলিয়া এক রাজা ছিলেন, তাঁহার প্রধান কাজ ছিল কেবল যজ্ঞ করা। সে কি যেমন-তেমন যজ্ঞ? তাঁহার যজ্ঞে খাটিয়া-খাটিয়া মুনিরা রোগা হইয়া গেলেন, ধোঁয়ায় তাঁহাদের চোখে ছানি পড়িল, শেষে আর না পারিয়া তাঁহারা রাজার কাজই ছাড়িয়া দিলেন।

ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শ্বেতকী শিবের তপস্যা আরম্ভ করাতে, শিব বলিলেন, "তুমি বারো বৎসর ক্রমাগত অগ্নিকে ঘি খাওয়াইয়া খুশি কর, তারপর দেখা যাইবে।"

রাজা ক্রমাগত বারো বৎসর অগ্নিকে ঘি খাওয়াইলেন। তাহাতে শিব সন্তুষ্ট হইয়া দুর্বাসা মুনিকে দিয়া তাঁহার যজ্ঞ করাইয়া দিলেন।

রাজার যজ্ঞ হইল বটে, কিন্তু এত ঘি অগ্নির সহ্য হইল না। তাঁহার পেট ভার হইল, ক্ষুধা মরিয়া গেল; কাজেই তখন বেচারা ব্যস্তভাবে ব্রহ্মার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "এত ঘি খাইয়াছ, তাই তোমার মন্দাগ্নি হইয়াছে (অর্থাৎ ক্ষুধা চলিয়া গিয়াছে)। এখন খুব খানিকটা মাংস খাও গিয়া, তবেই সারিয়া যাইবে।

খাণ্ডব বনে অনেক জন্তু থাকে, সেটাকে পোড়াইতে পার তো তোমার কাজ হয়!"

অগ্নি তখনই খাণ্ডব বনে চলিয়া আসিলেন। সেখানে আসিয়া তাঁহার কিরূপ দশা হইয়াছিল, তাহা শুনিয়াছ। তিনি কেবল ইন্দ্রের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু সেই বনের জন্তুরাও তাঁহাকে কম নাকাল করে নাই। সেখানকার হাতিগুলি শুঁড়ে করিয়া জল ঢালিয়া তাঁহাকে নিবাইয়া দিল। অন্য জন্তুরা তাহার কতই দুর্গতি করিল। সাতবার সেই বন পোড়াইতে গিয়া, সাতবারই তিনি এইরূপে জব্দ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

শেষে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কৃষ্ণ আর অর্জুনের কাছে যাও ; তাঁহারা চেষ্টা করিলে ইন্দ্রকেও আটকাইতে পারেন, জন্তুদিগকেও থামাইয়া রাখিতে পারেন!" তারপর কি হইয়াছে তোমরা জান?

অগ্নির কথা শুনিয়া অর্জুন বলিলেন, "আমার তেমন ভালো ধনুক বা রথ নাই, আর কৃষ্ণের হাতেও অস্ত্র নাই। আমাদিগকে এ-সকল জিনিস আনিয়া দিলে আমরা আপনার কাজ করিতে প্রস্তুত আছি।"

এ কথায় অগ্নি বরুণের নিকট হইতে গাণ্ডীব নামক ধনুক, অক্ষয় তূণ ও কপিধ্বজ নামক রথ আনিয়া অর্জুনকে দিলেন। সেই রথের উপরে এক ভয়ঙ্কর বানরের মূর্তি থাকাতে উহার 'কপিধ্বজ' নাম হয়। অতি আশ্চর্য রথ, বিশ্বকর্মার তৈরি ; ঘোড়াগুলি গন্ধর্বের দেশের! আর ধনুকের কথা কি বলিব? নিজে ব্রহ্মা উহা প্রস্তুত করেন। অর্জুন সে ধনুকে গুণ চড়াইবার সময় তাহার ভীষণ শব্দে ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিল।

অগ্নি অর্জুনকে এই-সকল জিনিস আর কৃষ্ণকে সুদর্শন নামক একখানি চক্র (অর্থাৎ চাকার ন্যায় অস্ত্র) আর কৌমদকী নামক একটি গদা দিলেন। সে চক্রকে কিছুতেই আটকাইতে পারে না। যাহাকে মারিবে, তাহার আর রক্ষা নাই। চক্র তাহাকে বধ করিয়া আবার হাতে ফিরিয়া আসিবেই আসিবে। অস্ত্র পাইয়া কৃষ্ণ আর অর্জুন অগ্নিকে বলিলেন, "আচ্ছা, তবে এখন আপনি গিয়া বন পোড়াইতে থাকুন। আমরা আপনার সাহায্য করিতেছি।"

অমনি খাণ্ডব বনের চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। খাণ্ডব দহনের (অর্থাৎ খাণ্ডব পোড়ানোর) ন্যায় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড খুব কমই হইয়াছে। আগুনের শিখা হড়্-হড়্ ঘড়্-ঘড়্ গর্জনে আকাশ ছাইয়া ফেলিল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে পর্বতাকার কালো ধোঁয়া উঠিয়া দিনকে অমাবস্যার রাত্রির মতো করিয়া দিল। জীব-জন্তু সকলে চিৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াও কৃষ্ণ আর অর্জুনের ভয়ে পলাইতে পারিল না। কৃষ্ণের চক্র এমনি যে, কোনো জন্তু বাহিরে দেখা দিতে না দিতেই সে তাহাকে কাটিয়া দুইখান করে। অর্জুনের তীর এমনি যে, ফড়িংটিকে পর্যন্ত উড়িয়া পলাইতে দেয় না। তাঁহার রথ সে সময়ে এমনি বেগে সেই বনের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, উঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া দেখিতেই পাওয়া যায় না! কত জন্তু, কত পাখি যে পুড়িয়া মরিল, তাহা ভাবিয়াও শেষ করা যায় না! খাল-বিলের জল টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল ; মাছ, কচ্ছপ, কুমির সকলই সিদ্ধ হইয়া গেল। আগুনের শব্দ আর জন্তুদিগের চিৎকার মিলিয়া ঝড় বজ্রপাত আর সমুদ্রের গর্জনকেও হারাইয়া দিল।

আগুনের তেজে দেবতারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিলেন, "হে ইন্দ্র! আজ অগ্নি কিজন্য পৃথিবীকে ভস্ম করিতে গিয়াছেন? আজ কি সৃষ্টির শেষ দিন উপস্থিত?"

তাঁহাদের কথায় ইন্দ্র অমনি উনপঞ্চাশ পবন আর ঘোরতর কালো মেঘ সকলকে লইয়া আগুন নিবাইতে চলিলেন। কিন্তু সে আগুনের তেজে তাঁহার মেঘ-বৃষ্টি আকাশেই শুষিয়া গেল। মেঘ হারিলে ইন্দ্র মহামেঘদিগকে ডাকিলেন—যাহারা মনে করিলে ব্রহ্মাণ্ড তল করিয়া দিতে পারে। কিন্তু সেই সাংঘাতিক মেঘও অর্জুনের বাণে উড়িয়া গেল।

সেই বনে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক সাপের বাড়ি। তক্ষক তখন বাড়ি ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী-পুত্র ছিলেন। তক্ষকের পুত্র অশ্বসেনের মা তো পুড়িয়া মারাই গেলেন। ইহার মধ্যে ইন্দ্র একবার ফাঁকি দিয়া অর্জুনকে অজ্ঞান করিতে পারিয়াছিলেন, তাই রক্ষা ; নহিলে অশ্বসেনকেও তাঁহার মায়ের সঙ্গেই যাইতে হইত।

বৃষ্টি করিয়া, বাজ ফেলিয়া, পর্বত ছুঁড়িয়া কিছুতেই ইন্দ্র কৃষ্ণ আর অর্জুনকে জব্দ করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রের পর্বত অর্জুনের বাণে ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইল, তখন বোধ হইল, যেন আকাশের গ্রহগুলি ছুটিয়া পড়িতেছে!

দেবতাদের বড় খোলা মন। তাই ইন্দ্র যখন দেখিলেন যে, তিনি কিছুতেই কৃষ্ণ আর অর্জুনকে আঁটিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

তখন খাণ্ডব বন পোড়াইতে কোনো বাধাই রহিল না। সেই ভয়ানক আগুনের হাত হইতে কেবল ছয়টি প্রাণী রক্ষা পাইয়াছিল।

এই ছয়টির একটি অবশ্য অশ্বসেন, আর-একটি ময় নামক দানব। এই ব্যক্তি হাত জোড় করিয়া অর্জুনকে এমনি মিনতি করিতে লাগিল যে, অর্জুন দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

আর চারিটি প্রাণী চারিটি বকের ছানা। ইহাদিগকে অগ্নি দয়া করিয়া পোড়ান নাই।

খাণ্ডববন খাইয়া অগ্নির অসুখ ছাড়িয়াছিল কি না, তাহা মহাভারতে লেখা নাই। সে যাহা হউক, তিনি ভোজন করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। ইন্দ্র যে কৃষ্ণ আর অর্জুনের উপর খুব খুশি হইয়াছিলেন, এ কথা তো আগেই বলিয়াছি। তিনি বলিলেন, "তোমরা যাহা করিলে, দেবতারাও তাহা করিতে পারেন না। এক্ষণে তোমরা কি বর চাও?"

তাহাতে অর্জুন বলিলেন, "আমাকে সকলরকম অস্ত্র দিন, এই আমার প্রার্থনা।"

ইন্দ্র বলিলেন "তুমি তপস্যা করিয়া শিবকে তুষ্ট কর। তাহা হইলেই আমি অস্ত্র দিব।'

কৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জুনের সহিত আমার বন্ধুতা যেন চিরদিন থাকে।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তথাস্তু।" (অর্থাৎ "তাহাই হউক")

তারপর অগ্নি, কৃষ্ণ আর অর্জুনের অনেক প্রশংসা করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; আর কৃষ্ণ, অর্জুন এবং ময়দানব যমুনার ধারে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

# সভাপর্ব

গ্নি আর ইন্দ্র চলিয়া গেলে পরে ময়দানব জোড়হাতে অর্জুনকে বলিলেন, "আপনি আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন ; অনুমতি করুন, আমি আপনার কি উপকার করিব?'

অর্জুন বলিলেন, "তুমি যে সন্তুষ্ট হইয়াছ, ইহাই আমার উপকার। আর কিছু করিতে হইবে না।"

কিন্তু ময় ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। সে যে-সে লোক নহে। দেবতাদের মধ্যে বিশ্বকর্মা যেমন সকলরকম কারিকুরির ওস্তাদ, আর অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক, দানবদিগের মধ্যে ময়ও সেইরূপ। তাহার নিতান্ত ইচ্ছা যে, অর্জুনের জন্য সে বড়রকমের কোনো কাজ করে। তাহার মিনতি দেখিয়া, শেষে অর্জুন বলিলেন, "তুমি কৃষ্ণের কোনো কাজ করিয়া দাও, তবে আমাদের উপকার হইবে।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন একটা সভা-ঘর করিয়া দাও যে আর কেহ তেমন করিতে না পারে।"

ময় সন্তোষের সহিত এ কথায় রাজি হইল। তারপর কৃষ্ণ আর অর্জুন তাহাকে সঙ্গে করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে অবশ্য তাহার আদর যত্নের কোনো ত্রুটি হইল না।

তারপর সভা-গৃহের আয়োজন আরম্ভ হইল। সভাটি যে কিরূপ, তাহা ইহাতেই বুঝিতে পারিবে যে সেটি পাঁচহাজার হাত লম্বা ছিল। এমন সভার আয়োজন কি যেখানে-সেখানে মিলে? এ দেশে সে-সব জিনিস জন্মায়ই না। বহুকাল পূর্বে দানবরাজ বৃষপর্বা যজ্ঞের জন্য কৈলাস পর্বতের উত্তরে এই ময়কে দিয়াই এক অতি আশ্চর্য সভা প্রস্তুত করান। যুধিষ্ঠিরের সভার জন্য ময় সেই সভার মণি-মুক্তা আর স্ফটিক লইয়া আসিল। সেখানে বিন্দু সরোবর নামে একটি সরোবরের ভিতরে বৃষপর্বার সোনার গদা আর বরুণের দেবদত্ত নামক বিশাল শঙ্খও ছিল।

ময় ভীমের জন্য সেই গদা আর অর্জুনের জন্য বরুণের শঙ্খটি আনিতে ভুলিল না।

চৌদ্দ মাসে সভা-ঘর প্রস্তুত হইল। সে সভা কিরূপ সুন্দর হইয়াছিল, তাহা আমি কি বলিব! ইঁটের বদলে তাহা স্ফটিক দিয়া গাঁথা। সেই স্ফটিকের উপরে সূর্যের আলোক পড়িয়া না জানি কেমন ঝক্-ঝক্ করিত! সেখানে বাগান তো ছিলই ; তাহার গাছপালা ছিল সোনার, ফুল মণি-মাণিক্যের। আর ভিতরের সাজ কাজ, সে-যে কি আশ্চর্যরকমের

ছিল, তাহা বুঝাইব কি, আমিই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি তো গরিব মানুষ, বড়-বড় রাজাদেরই তাহাতে ধোঁকা লাগিয়া গিয়াছিল। স্ফটিকের পুকুর দেখিয়া তাঁহারা তাহাকে পুকুর বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা গিয়াছিলেন তাহার উপর দিয়া হাঁটিতে। তারপর একটা হাসির কাণ্ড হইয়া গেলে তবে বুঝিলেন যে উহা জল!

এমনি সুন্দর বাড়ি, এমনি সুন্দর বাগান, আর তাহাতে তেমনি সুন্দর মাছের খেলা, ফুলের গন্ধ আর পাখির গান। বুঝিয়া লও, সভাটি কেমন ছিল। আটহাজার বিকট রাক্ষস সেই সভায় পাহারা দিত।

সভা দেখিয়া পাণ্ডবেরা খুশি হইবেন, তাহা আশ্চর্য কি? তেমনি সভা খালি স্বর্গেই আছে, পৃথিবীতে তেমন আর কেহ দেখে নাই। পৃথিবীর রাজা-রাজড়া, মুনি-ঋষি ইঁহারা সকলেই সে সভা দেখিতে আসিলেন। স্বর্গ হইতে নারদ, পারিজাত, রৈবত, সুমুখ, ধৌম্য প্রভৃতি দেবর্ষিরা অবধি সভা দেখিতে আসিবার লোভ সামলাইতে পারিলেন না।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের আর ব্রহ্মার সবার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য সংবাদ শুনাইলেন। ইহা ছাড়া মহারাজ পাণ্ডুরও সহিত তাঁহার দেখা হয়। তখন পাণ্ডু তাঁহাকে বলেন, "মহর্ষি! আপনি পৃথিবীতে যাইতেছেন, যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন, যেন রাজসূয় যজ্ঞ করে। রাজসূয় যজ্ঞের গুণে রাজা হরিশচন্দ্র ইন্দ্রের সভায় কত সুখে বাস করিতেছেন। যুধিষ্ঠির সে যজ্ঞ করিলে আমিও সেইরূপ সুখে সেখানে থাকিতে পাইব।"

নারদ যুধিষ্ঠিরকে এই সংবাদ দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

রাজসূয় অতি কঠিন যজ্ঞ। পৃথিবীর তাবৎ রাজার নিকট কর আদায় করিয়া তাহার দ্বারা এই যজ্ঞ করিতে হয়; সুতরাং এই যজ্ঞে বাধা দিতে অন্য রাজারা বিধিমতে চেষ্টা করে। নিজের বল-বুদ্ধি আর বন্ধু-বান্ধব খুব বেশিরকম না থাকিলে ইহা করা সম্ভবই হয় না। কাজেই রাজসূয়ের কথা শুনিয়া পাণ্ডবেরা বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। এ যজ্ঞ না করিলেই নয়, অথচ কাজটি ভারি কঠিন।

বল-বুদ্ধি পাণ্ডবদের যথেষ্ট, বন্ধু-বান্ধবেরও অভাব নাই। যুধিষ্ঠিরকে সকলে প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসে। ভীম অর্জুনের সাহস আর ক্ষমতায় প্রজার সকল ভয় দূর হইয়াছে, শত্রুরা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। নকুলের ন্যায়বিচারে আর সহদেবের মিষ্ট ব্যবহারে লোক মোহিত। সুতরাং এ-সকল বিষয়ে পাণ্ডবদের বেশ ভরসার কথাই ছিল। মন্ত্রীরা একবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞ করিতে উৎসাহ দিলেন।

কিন্তু ইঁহাদের কথায় যুধিষ্ঠিরের চিন্তা দূর হইল না। পরামর্শ দিবার একটি লোক আছেন—কৃষ্ণ। তিনি বলিলে তবে এ-কাজে হাত দেওয়া যায়। এই ভাবিয়া যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে আনাইলেন।

কৃষ্ণ আসিলে যুধিষ্ঠির তাহাকে বলিলেন, "ভাই, রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তুমি কি বল? আর সকলে তো খুবই উৎসাহ দিতেছে, কিন্তু ইহার মধ্যে ভয়ের একটা কথা আছে। মগধের রাজা জরাসন্ধের এখন অসাধারণ ক্ষমতা। পৃথিবীর সকল রাজাকে সে পরাজিত করিয়াছে। শিশুপাল উহার সেনাপতি, সেও একজন অসাধারণ যোদ্ধা। তারপর বক্র, ভগদত্ত, শল্য, পৌণ্ডক, ভীষ্মক প্রভৃতি অনেক বড় যোদ্ধা উহার বন্ধু। উহার

ভয়ে কত শত রাজা যে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এমন-কি, আমরা নিজে উহার ভয়ে মথুরা ছাড়িয়া দ্বারকায় আসিয়া বাস করিতেছি। অনেক রাজাকে ধরিয়া আনিয়া দুষ্ট তাহার দুর্গের ভিতরে বন্দী করিয়াছে। এ ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার রাজসূয় হওয়া অসম্ভব। ইহাকে আগে মারিয়া বন্দী রাজাদিগকে ছাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করুন, নহিলে রাজসূয় করিতে পারিবেন না।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এই জরাসন্ধকে লইয়া তো বড় মুস্কিল দেখিতেছি। তুমি নিজে উহাকে এত ভয় কর, আমাদের সাহস কিসে হইবে? তুমি, বলরাম, ভীম আর অর্জুন, এই চারিজনের কেহ কি উহাকে মারিতে পার না?"

ইহা শুনিয়া ভীম বলিলেন, "কৃষ্ণের বুদ্ধি আছে, আমার বল আছে, আর অর্জুনের সাহস আছে। আমরা তিনজনে মিলিয়া জরাসন্ধকে বধ করিব।'

কৃষ্ণ বলিলেন, "জরাসন্ধ ছিয়াশিটি বড়-বড় রাজাকে আনিয়া ছাগলের মতো বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আর চৌদ্দটি আনিতে পারিলেই একশতটি হয় ; তখন উহাদিগকে বলি দিবে। এই-সকল রাজাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করা উচিত হইতেছে। যে জরাসন্ধকে মারিয়া এ কাজ করিতে পারিবে, সে সম্রাট হইতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমি সম্রাট হওয়ার লোভে তোমাদিগকে এমন বিপদে ফেলিতে পারিব না। আমার রাজসূয়ে কাজ নাই।"

এই সময়ে অর্জুন সেখানে আসিলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা ভালো ভালো অস্ত্র পাইয়াছি, আমাদের বলও যথেষ্ট আছে। এ-সব থাকিতে শত্রুর সামনে চুপ করিয়া থাকা ভালো নহে। আমরা যুদ্ধ করিব।"

জরাসন্ধ মগধের রাজা, উহার পিতার নাম বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের দুই রানী ছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত ইঁহাদের সন্তান না হওয়ায় রাজার মনে বড় দুঃখ ছিল। ইহার মধ্যে একদিন মহর্ষি চণ্ডকৌশিক রাজবাড়ির নিকটে এক আম-গাছের তলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। এ কথা শুনিবামাত্র রাজা মুনির নিকটে গিয়া তাঁহার অনেক সেবাপূর্বক নিজের দুঃখের কথা জানাইলেন। তখন মুনি ধ্যানে বসিতেই গাছ হইতে একটি সুন্দর আম তাঁহার কোলের উপর পড়িল। সেই আমটি রাজাকে দিয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ, রাণীরা এই আম খাইলেই তোমার পুত্র হইবে।"

দুই রানী সেই আমটিকে ভাগ করিয়া খাইলেন। ইহাতে তাঁহাদের দুজনের দুটি ছেলে হইল বটে, কিন্তু সে অতি অদ্ভুতরকমের ছেলে। তাহাদিগকে মানুষ বলা যায় না, আধখানা মানুষ বলিতে হয়। একখানা করিয়া পা, একটি মাত্র হাত, একটি চোখ, একটি কান, আধখানি মাথা, আধখানি শরীর। এমন ছেলে দিয়া কি হইবে? কাজেই তাহাদিগকে কাপড়ে মুড়িয়া চৌমাথায় ফেলিয়া দেওয়া হইল।

জরা নামে এক রাক্ষসী সেই দুইখানি অর্ধেক ছেলে কুড়াইয়া পায়। রাক্ষসী ভাবিল, দুটাকে এক সঙ্গে জড়াইয়া লইলে বহিবার সুবিধা হইবে। এই ভাবিয়া যেই সে দুই অর্ধেক একত্র করিয়াছে, অমনি তাহা জুড়িয়া একটি ছেলে হইয়া গেল। বজ্রের মতো শক্ত প্রকাণ্ড খোকা, রাক্ষসী তাহাকে কি সহজে বহিয়া নিতে পারে? সে খোকা আস্ত হইয়াই হাতের

মুঠি মুখে ঢুকাইয়া ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাইতে আরম্ভ করিল।

খোকার সেই ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনিয়া রাজা, মন্ত্রী, লোকজন সকলে সেখানে ছুটিয়া আসিল। রাক্ষসীও ছেলেটিকে অমনি রাজাকে দিয়া বলিল, "এই নাও, তোমার ছেলে।"

সেই ছেলেই জরাসন্ধ (অর্থাৎ জরা যাহাকে জুড়িয়াছিল)। বড় হইয়া সে বড়ই ভয়ঙ্কর লোক হইয়াছে। হংস আর ডিম্ভক নামক দুই বীর তাহার বন্ধু ছিল। এই তিনজন একত্র হইলে ত্রিভুবন জয় করিতে পারিত।

হংস আর ডিম্ভকের ভালোবাসার কথা বড় সুন্দর। হংস নামক আর একজন লোকের মৃত্যুর কথা শুনিয়া ডিম্ভক ভাবিল, বুঝি তাহার বন্ধুই মরিয়া গিয়াছে। সেই দুঃখে সে যমুনায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সে সংবাদ পাইয়া হংসও যমুনায় ডুবিয়া মারা গেল।

ইহাদের মৃত্যুতে জরাসন্ধের বল অনেক কমিয়া গেল বৈকি, কিন্তু তাহার একেলার ক্ষমতাও কম নহে! একবার সে কৃষ্ণকে মারিবার জন্য একটা প্রকাণ্ড গদা নিরানব্বইবার ঘুরাইয়া মগধ হইতে ছুঁড়িয়া মারে। সেই গদা মথুরার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল।

মগধের চারিধারে বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামে পাঁচটি প্রকাণ্ড পর্বত থাকাতে সৈন্য লইয়া গিয়া সে দেশ জয় করা একেবারে অসম্ভব। তাহার উপরে আবার জরাসন্ধ নিজে এমন বীর আর তাহার এত সহায়। এইজন্য কৃষ্ণ বলিলেন যে, উহাকে অন্য উপায়ে মারিতে হইবে। কৃষ্ণ, ভীম আর অর্জুন এই তিনজন সাধারণ লোকের মতো মগধ দেশে গেলে সহজেই জরাসন্ধের দেখা পাওয়ার কথা। তখন ভীম যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মারিবেন।

এইরূপে পরামর্শের পর তিনজনে স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা ক্রমে কুরুজাঙ্গল দেশে, তারপর গণ্ডকী, সরযূ প্রভৃতি নদী পার হইয়া কোশলায়, সেখান হইতে মিথিলায়, মিথিলা হইতে মালয়, তারপর চর্মণ্বতী, গঙ্গা আর শোন পার হইয়া শেষে মগধে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরের সিংহদ্বারের পাশেই একটি সুন্দর চৈত্য (জয়স্তম্ভ) আর তিনটা বিশাল দুন্দুভি (ডঙ্কা) ছিল। সেখানে আসিয়া তাঁহাদের প্রথম কাজই হইল সেই জিনিসগুলিকে চুরমার করা। তারপর তাঁহারা খুব খুশি হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজপথের দুইধারে ময়রা, সওদাগর, মালাকার প্রভৃতির দোকান ছিল, তাহা হইতে জোর করিয়া মালা লইয়া তাঁহারা গলায় পরিলেন! এ-সকল কাণ্ড দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, না জানি ইঁহারা কে!

এইরূপে ক্রমে তাঁহারা জরাসন্ধের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে, জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ ভাবিয়া অনেক আদর-যত্ন করিল। কিন্তু ভীম আর অর্জুন তাহার কোনো কথায় উত্তর দিলেন না। কৃষ্ণ বলিলেন, "ইহাদের নিয়ম আছে, এখন কথা কহিবেন না। দুই প্রহর রাত্রির সময় আপনার সহিত ইঁহাদের কথাবার্তা হইবে।"

রাত্রি দুই প্রহরের সময় জরাসন্ধের কথাবার্তা আরম্ভ হইলে জরাসন্ধ বলিল, "আপনাদের পোশাক স্নাতক ব্রাহ্মণের মতো। কিন্তু স্নাতক ব্রাহ্মণেরা তো এমন সময়ে মালা-চন্দন পরেন না। আপনাদের হাতে ধনুর্গুণের দাগ দেখিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়াই বোধ

হয়, অথচ আপনারা ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়াছেন, আবার চৈত্যটি ভাঙিয়াছেন! আমি আদর-যত্ন করিলাম, তাহারও আপনারা ভালো করিয়া উত্তর দেন নাই! যাহা হউক, আপনারা কিজন্য আসিয়াছেন?"

কৃষ্ণ বলিলেন, "স্নাতক তো ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যেরাও হইতে পারে, আমাদিগকে ব্রাহ্মণ মনে করিবার প্রয়োজন কি? মালা পরিলে দেখায় ভালো, তাই আমরা মালা পরিয়াছি। গায়ের জোর দেখানো ক্ষত্রিয়ের উচিত কাজ, তাহা কিছু দেখাইয়াছি। আপনার দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে আজই আরো ভালো করিয়া দেখিতে পাইবেন। শত্রুর ঘরে আসিয়া তাহার নিকট হইতে আদর লওয়া আমরা ভালো মনে করি না, তাই আপনার আদর-যত্নের উত্তর দেই নাই।"

এ কথায় জরাসন্ধ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি করিয়া আপনাদের শত্রু হইলাম, তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না! আপনাদের বোধ হয় ভুল হইয়া থাকিবে।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে ধরিয়া বলি দিতে আনিয়াছ, সুতরাং তুমি সকল ক্ষত্রিয়েরই শত্রু। তাই আমরা তোমাকে বধ করিতে আসিয়াছি। আমরা ব্রাহ্মণ নহি! আমি বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ, আর ইঁহারা দুজন মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র। এখন, হয় এই সকল রাজাদিগকে ছাড়িয়া দাও ; না হয় আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যমের বাড়ি যাও।"

জরাসন্ধ বলিল, "আমি যাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছি, তাহাদিগকে লইয়া আমার যাহা খুশি করিব। আমি কাহাকেও ভয় করি না। আমি একেলা দুই তিন মহারথীর (খুব বড় বীরের) সহিত যুদ্ধ করিতে পারি।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "আমাদের কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে?"

জরাসন্ধ ভীমকে দেখাইয়া বলিল, "ইহার সহিত।"

তখন পুরোহিত আসিয়া স্বস্ত্যয়ন (জরাসন্ধের মঙ্গলের জন্য দেবতার পূজা) করিলে, জরাসন্ধ বর্ম আঁটিয়া, চুল বাঁধিয়া, বলিল "আইস ভীম! যুদ্ধ করি।"

তারপর দুজনে কি ভয়ানক যুদ্ধ হইল! যতরকম কুস্তির প্যাঁচ আছে, সমস্তই দুজনে দুজনের উপর খাটাইলেন। ঝড়ের মতন করিয়া তাঁহাদের নিশ্বাস বহিতে লাগিল ; কপালে কপালে ঠেকিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল।

তেরো দিন এইরূপ যুদ্ধের পর চৌদ্দ দিনের রাত্রিতে জরাসন্ধ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "আহা! বড় কাহিল হইয়া পড়িয়াছে! ভীম, আর মারিও না, তাহা হইলে মরিয়া যাইবে!"

আসল কথা ভীমকে জানাইয়া দেওয়া যে জরাসন্ধ কাহিল হইয়াছে। তাহা বুঝিতে পারিয়া ভীম বলিলেন, "হতভাগা এমনি কাপড় জড়াইয়াছে যে উহাকে বধ করা কঠিন দেখিতেছি।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমার জোর একবার ভালো করিয়া দেখাও না।"

তখন ভীম আগে জরাসন্ধকে শূন্যে তুলিয়া একশত পাক ঘুরাইলেন। তারপর হাঁটু দিয়া তাহার পিঠ ভাঙ্গিলেন। শেষে দুই পা ধরিয়া তাহাকে দুই ভাগে চিরিয়া ফেলিলেন।

সে সময়ে জরাসন্ধের চিৎকারে অতি অল্প লোকই টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল।

আর সেই বন্দী রাজাদের কথা কি বলিব? তাঁহারা দারুণ অপমান আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, ইহার মধ্যে হঠাৎ তাঁহাদের সকল দুঃখ দূর হইয়া গেল। তাঁহারা কৃষ্ণ, ভীম আর অর্জুনের অশেষ স্তুতি করিয়া জোড়হাতে বলিলেন, "এখন আপনাদের এই ভৃত্যেরা আপনাদের কি সেবা করিবে, অনুমতি করুন।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে চাহেন, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া তাহাতে সাহায্য করিবেন।"

রাজারা পরম আনন্দের সহিত এ-কথায় সম্মত হইলেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব কৃষ্ণ আর ভীমার্জুনকে বিস্তর ধনরত্ন উপহার দিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন, "আমি যজ্ঞে সাহায্য করিব।" তাঁহারা তাঁহাকে মগধের সিংহাসনে বসাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিলেন।

তারপর যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ হইল। রাজাদিগের নিকট হইতে কর আনাই প্রথম কাজ। এজন্য মহাবীর চারিভাই অসংখ্য সৈন্য লইয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলিলেন। অর্জুন উত্তরে, ভীম পূর্বদিকে, সহদেব দক্ষিণে নকুল পশ্চিমে।

অর্জুন ক্রমে কুলিন্দ, কালকূট, আনর্ত, শাকলদ্বীপ প্রভৃতি জয় করিয়া শেষে প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার রাজা ভগদত্ত কিরাত, চীন ও সাগরপারী সৈন্য লইয়া আটদিন তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। তারপর অর্জুনের ক্ষমতা আর সাহসে আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "আমি ইন্দ্রের বন্ধু! লোকে বলে, আমার ইন্দ্রের সমান ক্ষমতা। কিন্তু তবুও তো তোমাকে কিছুতেই আঁটিতে পারিতেছি না! তুমি কি চাও?"

অর্জুন বলিলেন, "আপনি ইন্দ্রের বন্ধু, সুতরাং আমার গুরু লোক। আপনাকে কি আমি কিছু বলিতে পারি? আপনি স্নেহ করিয়া কিছু কর দিন।"

ভগদত্ত অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "কর তো দিবই। আর কি করিতে হইবে বল।"

এইরূপে ভগদত্তকে বশ করিয়া, অর্জুন আবার উত্তর দিকে চলিলেন, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, উলূক, কাশ্মীর, ত্রিগর্ত, দারু, কোকনদ, বাহ্লিক, দরদ, কাম্বোজ, লোহ, পরম, ঋষিক প্রভৃতি কত দেশ জয় হইল; করই-বা কতরকম আদায় হইল। হিমালয় পর্বতের ওপারে কিম্পুরুষবর্ষ, হাটক প্রভৃতি কোনো দেশ হইতেই কর না লইয়া ছাড়া হইল না। তারপর অর্জুন উত্তর কুরুদেশে উপস্থিত হইলেন। সে অতি অদ্ভুত দেশ, সেখানে কোথায় কি আছে, কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং যুদ্ধ কি করিয়া হইবে? সেখানে তিনি উপস্থিত হইবামাত্র পর্বত প্রমাণ প্রহরীগণ আসিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিল, "আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিয়াছি যে আপনি সামান্য মানুষ নহেন। ইহাতেই আপনার এ দেশ জয় করা হইয়াছে। এখন আপনার কি চাই বলুন, আমরা তাহাই দিতেছি।"

অর্জুন বলিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য আমাকে কিছু কর দিলেই হইবে, আমি আর কিছু চাহি না।"

এই কথা শুনিয়াই উহারা নানারূপ আশ্চর্য কাপড় আর হরিণের ছাল প্রভৃতি আনিয়া অর্জুনের নিকট উপস্থিত করিল। এইরূপে ক্রমে সমস্ত উত্তর দিক জয় করিয়া অর্জুন কত ধনরত্ন যে দেশে আনিলেন, তাহার লেখাজোখা নাই।

ভীম পূর্বদিকে গিয়া পাঞ্চাল, বিদেহ, গণ্ডক, দশার্ণ, অশ্বমেধ, পুলিন্দ, চেদী, কুমার, কোশল, অযোধ্যা, গোপালকক্ষ, মল্ল প্রভৃতি অল্পদিনের ভিতরেই জয় করিয়া ফেলিলেন।

ভল্লাট, শক্তিমান, বৎসদেশ, ভর্গ প্রভৃতি আরো কত দেশ দেখিতে দেখিতে তাঁহার বশে আসিল। কর্ণকেও যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কর আনিতে বাকি রহিল না।

এইরূপে মণি-মুক্তা, চন্দন, কাপড়, কম্বল, সোনা, রূপা প্রভৃতি নানারূপ জিনিস আনিয়া ভীম ভাণ্ডার বোঝাই করিয়া ফেলিলেন।

সহদেবও সমস্ত দক্ষিণদিক জয় করিয়া কর আনিলেন। কিষ্কিন্ধ্যার বানরদিগের সহিত তাঁহার ক্রমাগত সাতদিন ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল ; তথাপি বানরেরা হটে নাই বা ভয় পায় নাই। কিন্তু সহদেবের যুদ্ধ দেখিয়া তাহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইল। আর সহদেবকে অনেক ধনরত্ন দিয়া বলিল, "এ-সব লইয়া তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। তোমার ভালো হউক।"

দক্ষিণে যাইতে যাইতে সহদেব শেষে সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হ'ন। সেইখানে লঙ্কা; বিভীষণ তখনো সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। এখানে কোনোরূপ যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নাই ; কারণ, বিভীষণ সংবাদ পাইবামাত্র আহ্লাদের সহিত বোঝায় বোঝায় মহামূল্য মণি-মুক্তা দিয়া সহদেবকে বিদায় করিলেন।

নকুলও পশ্চিমদিক হইতে কম কর আনেন নাই। একহাজার হাতি সে-সকল ধন অতিকষ্টে বহিয়া আনিয়াছিল।

যজ্ঞের সময় ক্রমে যতই কাছে আসিল, ততই নানা দেশের রাজারা, মুনিরা আর ব্রাহ্মণেরা দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ ইহার পূর্বেই আসিয়া সকলরকম আয়োজন আরম্ভ করাইয়াছেন। রাজাদিগের নিকট নিমন্ত্রণ গিয়াছে, পুরোহিতরা প্রস্তুত হইয়াছেন ; যজ্ঞের জন্য চমৎকার স্থান প্রস্তুত হইয়াছে ; ভোজনের ঘটা লাগিয়া গিয়াছে।

নকুল হস্তিনায় গিয়া জোড়হস্তে মিষ্ট কথায় ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দুর্যোধন প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারাও আনন্দের সহিত যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন। অন্য রাজরাজড়া কত আসিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। ইঁহাদের জন্য সুন্দর বাগানে ঘেরা, মণি-মুক্তোর কাজ করা, সোনার দরজা জানালা দেওয়া বিশাল বিশাল পুরী পূর্বেই বহুমূল্য আসন, গালিচা, পালঙ্ক প্রভৃতি দিয়া সাজানো ছিল। মিঠাই মণ্ডার তো কথাই নাই। আর সুগন্ধের কথা কি বলিব! ফুলের গন্ধ, চন্দনের গন্ধ, লুচি সন্দেশের গন্ধ!

এক-একজন এক-একটা কাজে বিশেষ মজবুত ; তাঁহাদের উপরে সেই সেই

কাজের ভার পড়িয়াছে। দুঃশাসনের উপর খাবার জিনিস দেখাশুনার ভার ; অশ্বত্থামার উপর ব্রাহ্মণদিগের আদর-যত্নের ভার ; সঞ্জয়ের উপর রাজাদিগের সেবার ভার। ভীষ্ম, দ্রোণ কাজের হুকুম দিবেন ; কৃপাচার্য ধনরত্ন রক্ষা করিবেন ; উপহার আসিলে দুর্যোধন লইবেন; আর নিজে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের পা ধোওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

ক্রমে যজ্ঞের পূজা অর্চনার কাজ শেষ হইয়া গেল। মহারাজ যুধিষ্ঠির, যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

তারপর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "রাজাদিগকে এবং যাঁহারা অর্ঘ্য (মান্য দেখাইবার জন্য উপহার) পাইবার উপযুক্ত, তাঁহাদিগকে এক-একটি করিয়া অর্ঘ্য আনিয়া দাও। তারপর এখানে যিনি সকলের চেয়ে বড়, তাঁহাকে আর-একটি অর্ঘ্য দিতে হইবে।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "সকলের বড় বলিয়া অর্ঘ্য কাহাকে দিব?"

ভীষ্ম বলিলেন, "কৃষ্ণই সকলের চেয়ে বড়। তাঁহার সমান মান্য লোক এখানে আর কেহই উপস্থিত নাই।"

তারপর ভীষ্মের কথায় সহদেব কৃষ্ণকে অর্ঘ্য আনিয়া দিলেন। কিন্তু চেদীর রাজা শিশুপালের ইহা কিছুতেই সহ্য হইল না। তিনি যুধিষ্ঠিরকেই-বা কত বকিলেন, ভীষ্মেরই-বা কত নিন্দা করিলেন আর কৃষ্ণকেই-বা কত অপমানের কথা বলিলেন। তারপর আর-আর রাজাদিগকে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেও ছাড়িলেন না।

রাজাদের মধ্যে অনেকে শিশুপালের সঙ্গে জুটিয়া যজ্ঞ ভাঙ্গিবার আর কৃষ্ণকে মারিবার জন্য পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, ইঁহারা শিশুপালকে বুঝাইয়া থামাইতে পারিলেন না। তাহাতে সহদেব রাগিয়া বলিলেন, "যে কৃষ্ণের সম্মান সহ্য করিতে না পারে, আমি তাহার মাথায় পা তুলিয়া দিই।"

এইরূপ তর্ক আরম্ভ হইয়া ক্রমে বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইল। কৃষ্ণের উপর শিশুপালের অনেকদিন হইতেই রাগ ছিল, আর তিনি নানারকমে তাঁহাকে অপমান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কৃষ্ণ এতদিন তাহা সহিয়া থাকিবার কারণ এই যে, তিনি শিশুপালের মায়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'আপনার পুত্রের একশত অপরাধ ক্ষমা করিব।'

শিশুপালের একশত অপরাধ ইহার পূর্বেই হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আর তাঁহাকে ক্ষমা করিবার কোনো কারণ নাই।

শিশুপাল ভয়ানক অপমানের কথা বলিয়া কৃষ্ণকে গালি দিতে দিতে শেষে বলিলেন, "আইস! আজ তোমাকে আর পাণ্ডবদিগকে যমের বাড়ি পাঠাইতেছি!"

তখন কৃষ্ণ সভার সকলকে বলিলেন, "আমি অনেক সহিয়াছি ; কিন্তু এতগুলি রাজার সম্মুখে এমন অপমান আমি কিছুতেই সহিতে পারিব না।"

তাহা শুনিয়া শিশুপাল হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে আরো বেশি অভদ্রভাবে কৃষ্ণকে গালি দিতে লাগিলেন।

এমন সময় চাকার মতন একটা অতি ভয়ঙ্কর জিনিস সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে হাতে করিয়া লইলেন। ইহা কৃষ্ণের সেই সুদর্শন চক্র নামক অস্ত্র ; কৃষ্ণ তাহাকে মনে মনে ডাকাতে অমনি ছুটিয়া আসিয়াছে। আজ আর শিশুপালের রক্ষা নাই।

চক্র হাতে লইয়া কৃষ্ণ সকলকে বলিলেন, "এই দুষ্টের একশত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, আর ক্ষমা করিব না। এই দেখুন, ইহাকে বধ করিলাম।"

এ কথা বলিবামাত্রই চক্র ছুটিয়া গিয়া শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিল। সভার সকল লোক পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিল, কাহারো মুখে কথা সরিল না।

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হইল। তারপর রাজারা দেশে চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া গিয়াছেন, দুর্যোধন আর শকুনি তখনো যান নাই, তাঁহারা সভা দেখিতেছেন। এমন সভা দুর্যোধন আর কখনো দেখেন নাই। যত দেখেন, ততই তাঁহার ধাঁধা লাগিয়া যায়। ইহারই মধ্যে কয়েকবার তিনি স্ফটিকের মেঝেকে জল মনে করিয়া কাপড় গুটাইয়াছেন ; আবার জলকে স্ফটিক ভাবিয়া, কাপড়চোপড়সুদ্ধ তাহাতে হাবুডুবুও খাইয়াছেন। সকলে হাসিয়াছে ও যুধিষ্ঠিরের চাকরেরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অন্য কাপড় আনিয়া দিয়াছে।

স্ফটিকের দেওয়াল, তাহাকে দুর্যোধন মনে করিলেন, বুঝি দরজা। তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইতে গিয়া মাথায় ঠকাস্ করিয়া এমনি লাগিল যে, একেবারে মাথা ঘুরিয়া পড়িবার গতিক! তারপর বেচারার আর ভালো করিয়া চলিতেই ভরসা হয় না, খালি 'কানা মাছি ভোঁ ভোঁ'র মতন হওয়াতে হাত বুলাইতে বুলাইতে পা বাড়াইতেছেন। এমনি করিয়া শেষে একবার একেবারে বাহিরে গিয়া ধপাস! তারপর দরজা দেখিলেই আগে থাকিতে দাঁড়ান!

বাস্তবিক এমন করিয়া নাকাল হইলে বড্ড রাগ হয়। অথচ সে রাগ দেখাইবার জো নাই, কারণ তাহাতে লোকে আরো হাসে। কাজেই দুর্যোধন জিব ঠোঁট কামড়াইয়া কোনোমতে রাগ হজম করিয়া সেখান হইতে বিদায় হইলেন। এদিকে কিন্তু হিংসায় তিনি জ্বলিয়া মরিতেছেন। পথে শকুনি তাঁহাকে কত কথা বলিয়াছেন, তিনি কিছুরই উত্তর দেন নাই। শেষে শকুনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে দুর্যোধন? কথা কহিতেছ না যে?"

দুর্যোধন বলিলেন, "মামা! কথা কহিব কোন্ লজ্জায়? আমার কি আর বাঁচিয়া লাভ আছে? যে শত্রুকে মারিতে এত চেষ্টা করিলাম, তাহারই কিনা শেষে এত বাড়াবাড়ি!"

শকুনি বলিলেন, "সে কি কথা, দুর্যোধন? উহারা নিজের গুণে বড় হইয়াছে, তাহাতে তোমার দুঃখ কেন? ইচ্ছা করিলে তুমিও তো ঐরূপ করিতে পার।"

দুর্যোধন বলিলেন, "মামা! যুদ্ধ করিয়া উহাদের সভা আর রাজ্য কাড়িয়া লই।"

শকুনি বলিলেন, "কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ আর ধৃষ্টদ্যুম্ন ইঁহাদিগকে দেবতারাও যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন না। তুমি কি করিয়া করিবে? ইঁহাদিগকে জব্দ করিবার অন্য উপায় আছে।"

দুর্যোধন বলিলেন, "কি উপায়, মামা?"

শকুনি বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলায় বড় শখ, অথচ তিনি ভালো খেলিতে জানেন না। আবার, পাশা খেলায় ডাকিলে তাঁহার 'না' বলিবারও জো থাকিবে না। একটিবার আনিয়া তাঁহাকে খেলিতে বসাইতে পারিলে, আমি ফাঁকি দিয়া তাঁহার রাজ্য-পাট সব জিতিয়া লইতে পারি। আমার মতো পাশা পৃথিবীতে কেহ খেলিতে জানে না। আগে তুমি তোমার বাবাকে বলিয়া খেলার অনুমতি লও, তারপর আমি সব ঠিক করিয়া দিব।"

দুর্যোধন বলিলেন, "আমার বাবাকে বলিতে সাহস হয় না, আপনি বলুন।"

শকুনি বাড়ি আসিয়াই ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "দুর্যোধন তো বড়ই রোগা হইয়া যাইতেছে! আপনি সে খবর নেন না?"

অমনি ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া দুর্যোধনকে বলিলেন, "আহা! বাছার তো তবে বড়ই অসুখ হইয়াছে। কি অসুখ তোমার, বাবা?"

দুর্যোধন বলিলেন, "বাবা! আমার ভয়ানক অসুখ হইয়াছে! আপনার চেয়ে পাণ্ডবেরা বড় হইয়া গেল, এ কথা ভাবিলে কি আর আমি ভালো থাকিতে পারি? উহাদের বাড়িতে রোজ দশহাজার লোক সোনার থালায় পোলাও খায়। উহাদের মতো এত ধন ইন্দ্রেরও নাই, যমেরও নাই, বরুণেরও নাই, কুবেরেরও নাই। কাজেই আমার যারপরনাই ভয়ানক অসুখ হইয়াছে।"

তখন শকুনি বলিলেন, "আমি পাশা খেলিয়া উহাদের সব ধন জিতিয়া দিতে পারি। ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে বা পাশায় ডাকিলে তাহার 'না' বলিবার জো থাকে না। যুধিষ্ঠিরকে আমরা পাশায় ডাকিলে তাহার আসিতেই হইবে। অথচ সে খেলিতে জানে না, কাজেই আমি ফাঁকি দিয়া তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইতে পারিব।"

এ কথায় ধৃতরাষ্ট্র সহজে রাজি হন নাই। তাঁহার নিজেরও এ কাজটা ভালো লাগিল না, তারপর বিদুরকে ডাকিলে, তিনিও বারবার নিষেধ করিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের পীড়াপীড়িতে ধৃতরাষ্ট্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আর তাঁহার নিজের মনেও পাণ্ডবদের প্রতি যথেষ্ট হিংসা ছিল। কাজেই তিনি শেষে বলিলেন, "হাজার থাম আর একশত দুয়ারওয়ালা একটা জমকালো সভা প্রস্তুত করাও।"

সভা অল্পদিনের মধ্যেই প্রস্তুত হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বলিলেন, "বিদুর! শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।"

বিদুর বলিলেন, "মহারাজ! ইহা তো ভালো কথা হইল না। পাশা খেলা বড় অন্যায়। উহাতে বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "কি হইবে? আমরা তো থাকিব। তুমি শীঘ্র যাও।"

বিদুর আর কি করেন? তিনি কাজেই ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে পাশা খেলিতে ডাকিয়াছেন, তুমি চল।"

এ কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কাকা, পাশা খেলা কি ভালো? আপনি কি অনুমতি করেন?"

বিদুর বলিলেন, "আমি অনেক নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি আমাকে পাঠাইলেন। এখন তোমার যাহা ভালো মনে হয়, কর।"

যুধিষ্ঠির অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমাকে যখন পাশা খেলিতে ডাকিয়াছে, তখন আর না গিয়া উপায় নাই। কিন্তু উহারা বড় ধূর্ত ; খেলার সময় ফাঁকি দেয়। না যাইবার উপায় থাকিলে আমি কখনই যাইতাম না।"

পরদিন ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতিকে লইয়া যুধিষ্ঠির বিদুরের সহিত হস্তিনায় আসিলেন। তাহার পরের দিন সকালে খেলা হওয়ার কথা। এই খেলা পণ অর্থাৎ বাজি রাখিয়া হয়। খেলিবার পূর্বে কথা থাকে যে, 'আমি হারিলে তোমাকে এই জিনিস দিব, আর তুমি হারিলে আমাকে এই জিনিস দিবে।' এইভাবে যথা সময়ে খেলা আরম্ভ হইল।

যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা দেখিবার জন্য সভায় লোকের বড়ই ভিড় হইয়াছে। অনেক রাজা, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত এবং সাধারণ লোক সেখানে উপস্থিত। পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই সভার মাঝখানে বসিয়াছেন, তাঁহাদের সামনেই শকুনিকে সর্দার করিয়া দুর্যোধনের দল। শকুনি বলিলেন, "যুধিষ্ঠির, সকলে বসিয়া আছেন, খেলা আরম্ভ কর।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তোমরা সরল ভাবে খেলা করিও, ফাঁকি দিও না যেন।"

শকুনি বলিলেন, "যাহার বেশি বুদ্ধি, সেই ফাঁকি দেয়। ইহাতে দোষের কথা কি হইল? তোমার যদি ভয় থাকে, তবে নাহয় খেলিও না।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ডাকিয়াছ যখন, তখন খেলিতেই হইবে। কাহার সহিত খেলিব, বল।"

এ কথায় দুর্যোধন বলিলেন, "পণের জিনিস সব আমি দিব, কিন্তু আমার হইয়া মামা খেলিবেন।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "একজনের হইয়া আর-একজনের খেলা অন্যায়। যাহা হউক, খেলা আরম্ভ কর।"

খেলা আরম্ভ হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র সভায় আসিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতিও দুঃখিত ভাবে তাঁহার সঙ্গে আসিলেন।

তারপর যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে বলিলেন, "আমার এই গলার হার পণ রাখিলাম, তুমি কি রাখিলে?"

দুর্যোধন বলিলেন, "আমার ধনরত্ন অনেক আছে। এখন তুমি বাজি জিতিলেই হয়।"

এই কথা বলিতে বলিতেই অমনি শকুনি পাশা ফেলিলেন, "এই দেখ, জিতিলাম,।" সকলে দেখিল বাস্তবিকই শকুনির জিত।

ইহাতে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আইস, আবার খেলিতেছি। এবারে এক লক্ষ আট হাজার সোনার কুম্ভ, আর আমার ভাণ্ডারের সকল ধনরত্ন পণ রহিল।"

শকুনি তখনই "এই জিতিলাম" বলিয়া সে-সব জিতিয়া লইলেন। তাঁহার ফাঁকি কেহ ধরিতে পারিল না।

হায় হায়! পাশায় কি সর্বনাশ হইল! যুধিষ্ঠির যত হারেন, ততই তাঁহার জেদ চড়িয়া

যায়, আর ততই তিনি বলেন, "আরো খেলিব!" ধূর্ত শকুনির জুয়াচুরি কাহারো ধরিবার সাধ্য নাই। পণ রাখিবামাত্রই তিনি "এই জিতিলাম" বলিয়া পাশা ফেলেন, আর যুধিষ্ঠির হারিয়া যান।

এইরূপে ক্রমে তাঁহার দাসী গেল, চাকর গেল, হাতি গেল, ঘোড়া গেল, রথ গেল, সৈন্য গেল—সব গেল।

সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "মহারাজ! মরিবার সময় রোগী ঔষধ খাইতে চাহে না, আমার কথাও হয়তো আপনার ভালো লাগিবে না। দুর্যোধন যে মারা যাইবার জোগাড় করিতেছে, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? পাণ্ডবেরা একবার ক্ষেপিয়া দাঁড়াইলে ছেলেপিলে চাকরবাকর সুদ্ধ যমের বাড়ি যাইতে হইবে। এই বেলা দুর্যোধনকে সাজা দিয়া পাণ্ডবদিগকে তুষ্ট করুন। একে তো পাশা খেলায় এত দোষ, তাহাতে শকুনি এমন জুয়াচোর, উহাকে শীঘ্র চলিয়া যাইতে বলুন।"

এ কথায় দুর্যোধন ক্রোধভরে বিদুরকে গালি দিতে আরম্ভ করিলে বিদুর বলিলেন, "তোমাদের ভালোর জন্যই দুটা কথা বলিয়াছিলাম। দেখিতেছি তাহা তোমার পছন্দ হয় নাই। কাজ কি বাপু তোমার যাহা খুশি তাহাই কর। তোমাকে নমস্কার!"

কাজেই আবার খেলা চলিল। যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আর ধার্মিক এই পৃথিবীতে ছিল না, সেই যুধিষ্ঠির পাশার ধাঁধায় পড়িয়া শেষে অবোধ মাতালের মতো কাজ করিতে লাগিলেন।

ধন গেলে গাই বাছুর, তারপর লোকজন, তারপর রাজ্য। এইরূপে সর্বস্ব হারিয়া ফকির হইয়াও চৈতন্য নাই। শেষে একটি-একটি করিয়া ভাইদিগকে হারিতে লাগিলেন।

কি দুর্দশা! শেষে শকুনিই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "পাশা খেলিতে গিয়া লোকে এমন পাগলামি করিতে পারে, এ কথা তো স্বপ্নেও জানিতাম না।"

কিন্তু ইহাতেও যুধিষ্ঠিরের দুর্গতির শেষ হয় নাই। ভাইদিগকে হারিয়া শেষে নিজেকে পর্যন্ত হারিলেন, তথাপি তাঁহার জেদ থামে না!

ভাবিতেও দুঃখ আর লজ্জা হয়; যখন আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তখন দয়া, ধর্ম, সদাচার সকল ভুলিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এবার দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম।"

এ কথা শুনিবামাত্র সভার লোক 'ছি! ছি!' করিয়া উঠিল, রাজাগণের চোখে জল আসিল, লাজে দুঃখে আর অপমানে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপের শরীর ঘামিয়া গেল; বিদুর হেঁট মুখে বসিয়া সাপের মতন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

ভালোলোকেদের মনে এইরূপ কষ্ট, আর নির্লজ্জ ধৃতরাষ্ট্র আনন্দে অস্থির হইয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "জয় হইল নাকি? জয় হইল নাকি?"

কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতি তখন কিরূপ আনন্দ করিতেছিলেন, তাহা ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারেই বুঝিতে পার।

ধূর্ত শকুনি যখন পাশা খেলিয়া দ্রৌপদীকে অবধি জিতিয়া লইলেন, অমনি দুর্যোধন বিদুরকে বলিলেন, "শীঘ্র দ্রৌপদীকে লইয়া আইস, হতভাগী আমাদের চাকরানীদের

সঙ্গে গিয়া ঘর ঝাঁট দিক।"

বিদুর বলিলেন, "মূর্খ! তোমাদের যে মরিবার গতিক হইয়াছে, এ কথা না বুঝিতে পারিয়াই তুমি এরূপ বলিতেছ। এমন কথা নিতান্ত নীচ লোক ছাড়া আর কেহ বলে না।"

ইহাতে দুর্যোধন বিদুরকে গালি দিয়া একটা দারোয়ানকে বলিলেন, "তুই দ্রৌপদীকে লইয়া আয়! তোর কোনো ভয় নাই।"

দরোয়ান দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল, "যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় আপনাকে দুর্যোধনের নিকট হারিয়াছেন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, ধৃতরাষ্ট্রের ঘর ঝাঁট দিতে হইবে।

এ কথায় দ্রৌপদী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "তুই একি পাগলের মতো কথা বলিতেছিস! রাজারা কি স্ত্রীকে পণ রাখিয়া খেলা করে? যুধিষ্ঠিরের কি আর জিনিস ছিল না?"

দরোয়ান বলিল, "যুধিষ্ঠির আগে ধনদৌলত, তারপর ভাইদিগকে, তারপর নিজেকে হারিয়া, শেষে আপনাকে হারিয়াছেন।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "তুই সভায় গিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি আগে নিজেকে, কি আমাকে হারিয়াছেন।"

দরোয়ান আবার সভায় আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল, "দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আপনি কাহাকে আগে হারিয়াছেন? আপনার নিজেকে, না দ্রৌপদীকে?

যুধিষ্ঠির চুপ করিয়া রহিলেন, এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না। তখন দুর্যোধন বলিলেন, "দ্রৌপদীর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, এখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করুক।"

দরোয়ান নিতান্ত দুঃখিত হইয়া আবার দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল, "মা! এবার দেখিতেছি কৌরবদের সর্বনাশ হইবে। দুষ্ট, দুর্যোধন আপনাকে সভায় ডাকিয়াছেন।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "বাছা, ভগবানই সব করেন। এ সময়ে আমি যেন ধর্ম রাখিয়া চলিতে পারি। তুমি আর একটিবার সভায় গিয়া ধার্মিক গুরুজনদিগকে জিজ্ঞাসা কর, এখন আমার কি করা উচিত। তাঁহারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

দরোয়ান সভায় আসিয়া দ্রৌপদীর কথা বলিলে, সকলে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। দুর্যোধনের ভয়ে কাহারো মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সেই দুষ্ট আবার বলিল, "তুই দ্রৌপদীকে এখানে লইয়া আয়।"

দরোয়ান দুর্যোধনের চাকর, তথাপি সে তাঁহার কথায় কান না দিয়া আবার সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি দ্রৌপদীকে কি বলিব?"

তখন দুর্যোধন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ বেটা দেখিতেছি বড়ই ভীতু! দুঃশাসন, তুমি দ্রৌপদীকে লইয়া আইস।"

বলিবামাত্র সেই দুষ্ট দুই চোখ লাল করিয়া দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল "আমরা তোমাকে জিতিয়া লইয়াছি। চল! সভায় চল!"

দুঃশাসনের ভাবগতিক দেখিয়া দ্রৌপদী ভয়ে তাড়াতাড়ি গান্ধারী প্রভৃতির নিকট

আশ্রয় লইতে গেলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার পূর্বেই দুরাত্মা তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিতে টানিতে তাঁহাকে সভায় লইয়া চলিল। তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কত মিনতি করিয়া বলিলেন, "দুঃশাসন, তুমি আমাকে এমন করিয়া সভায় লইয়া যাইও না!" কিন্তু হায়! সে দুষ্টের মনে কিছুতেই দয়া হইল না। সে দাঁত কড়মড় করিয়া বলিল, "তোকে জিতিয়া লইয়াছি। এখন তো তুই আমাদের দাসী! চল্!" এই বলিয়া দুরাত্মা আরো নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল।

হায় হায়! তখন কেহই সেই দুরাত্মার মাথা কাটিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসিলেন না! দ্রৌপদী "হা কৃষ্ণ! হা অর্জুন!" বলিয়া কত কাঁদিলেন, সকলই বৃথা হইল।

এইরূপে দুঃশাসন তাঁহাকে সভায় উপস্থিত করিলেও কেহই তাহাকে নিষেধ করিলেন না। তখন দ্রৌপদী বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম, আমার স্বামী তাহার মতোই কাজ করিয়াছেন, তাঁহার দোষ কি? কিন্তু এই দুরাত্মা আমাকে অপমান করিতেছে, দেখিয়াও যখন সভার সকলে চুপ করিয়া আছেন, তখন বুঝিলাম যে, কুরুবংশের লোকেরা ধর্ম ভুলিয়া গিয়াছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ইঁহাদের আর কিছু তেজ নাই!"

দ্রৌপদীর অপমানে পাণ্ডবেরা ক্রোধে অধীর হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মুখে কথা নাই। এদিকে সেই পাষণ্ড দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে তাঁহাকে অজ্ঞানপ্রায় করিয়া 'দাসী! দাসী!' বলিয়া হাসিতেছে, আর কর্ণ শকুনি বলিতেছেন, 'বেশ! বেশ!'

ভীষ্ম দ্রৌপদীকে বলিলেন, "যুধিষ্ঠির তোমাকে পণ রাখিয়া খেলিতে পারেন কি না, এ কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি অতিশয় ধার্মিক, কখনো অধর্মের কাজ করেন নাই। তিনি নিজেই শকুনির সহিত খেলিতে আসিয়াছেন, আর তোমার অপমান দেখিয়াও চুপ করিয়া আছেন। কাজেই আমি বুঝিতেছি না, কি বলিব।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "উঁহাকে দুষ্টেরা ডাকিয়া আনিল, তথাপি কি করিয়া বলিতেছেন যে উনি নিজেই খেলিতে আসিয়াছেন? আর তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া হারাইয়াছে! আপনাদের অনেকেরই পুত্র আর পুত্রবধূ আছেন, তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আমার কথার বিচার করুন।" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে থাকিলে, দুঃশাসন তাঁহাকে আরো অপমান করিতে লাগিল।

তখন ভীম আর সহিতে না পারিয়া বলিলেন, "দেখ যুধিষ্ঠির! তোমার দোষেই দ্রৌপদীর এত অপমান হইল। যে হাতে তুমি পাশা খেলিয়াছ, সে হাত আজ পোড়াইয়া ফেলিব। সহদেব! শীঘ্র আগুন আন!"

অর্জুন তখন ভীমকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'কর কি দাদা! চুপ চুপ! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম রাখিতে গিয়াই উনি এরূপ করিয়াছেন, তাহা কি বুঝিতেছ না?"

ভীম বলিলেন, "ধর্ম রাখিতে গিয়াছিলেন বলিয়াই তো এতক্ষণ উঁহার হাত পোড়াই নাই।"

এমন সময় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিকর্ণ বলিলেন, "আপনারা চুপ করিয়া আছেন কেন?

দ্রৌপদীর কথা বিচার করুন। আমার তো বোধ হয়, যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদীকে ওরূপ করিয়া পণ রাখার কোনো ক্ষমতা ছিল না! সুতরাং তিনি হারিলেও দ্রৌপদীর তাহা মানিয়া চলার কথা নহে।"

এ কথায় সভার লোক চিৎকার করিয়া বিকর্ণের প্রশংসা আর শকুনির নিন্দা করিতে লাগিল। কিন্তু কর্ণ বিকর্ণকে গালি দিয়া, দুঃশাসনকে বলিলেন, "দুঃশাসন, তুমি ইহাদের সকলের গায়ের কাপড় কাড়িয়া লও।"

এ কথা বলিবামাত্র পাণ্ডবেরা নিজ নিজ চাদর কয়খানি ছাড়িয়া দিলেন। দ্রৌপদীর গায়ের কাপড় দুঃশাসন নিজেই কাড়িয়া লইতে গিয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! দেবতার কৃপায় সে সময়ে তাঁহার গায় এতই কাপড় হইল যে, দুঃশাসন প্রাণপণে টানিয়াও তাহা শেষ করিতে পারে না। সে যত টানে, ততই লাল, নীল, হলদে, সোনালি, নানা রঙ্গের হইয়া কাপড় বাড়িয়া যায়। শেষে অপ্রস্তুত হইয়া হতভাগা বসিয়া পড়িল।

এদিকে এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া সভায় ঘোরতর কলরব উপস্থিত হইয়াছে। রাজাগণ দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে করিতে দুঃশাসনকে গালি দিতেছেন, আর ভীম রাগে অস্থির হইয়া কাঁপিতেছেন। তারপর সভার সকলকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা সকলে শোন! আমি ভীষণ যুদ্ধে এই দুরাত্মা দুঃশাসনের বুক চিরিয়া তাহার রক্ত খাইব, তবে ছাড়িব। যদি না খাই, তবে যেন আমার স্বর্গলাভ না হয়।"

এমন সময় বিদুর দুহাত তুলিয়া সকলকে থামাইয়া বলিলেন, 'দ্রৌপদী এমন করিয়া কাঁদিতেছেন, তবুও আপনারা কথা কহিতেছেন না, একাজটা কি ভালো হইল? শীঘ্র ইঁহার কথার বিচার করুন।"

তথাপি সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। তখন কর্ণের কথায় আবার দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে ঘরে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা দ্রৌপদীকে কত অপমান, আর পাণ্ডবদিগকে কতপ্রকার বিদ্রূপ করিল, তাহা বলিয়া আর তোমাদিগকে কষ্ট দিব না। যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল আর সহদেব সমস্তই চুপ করিয়া সহ্য করিলেন। কিন্তু ভীম রাগী লোক, তিনি তাহা সহিতে পারিবেন কেন? যখন যুধিষ্ঠিরকে অপমান করিয়াও দুর্যোধনের মন উঠিল না, তখন হাসিতে হাসিতে আবার দ্রৌপদীকে পা দেখাইলেন—আবার তাহা দেখিয়া কর্ণ হাসিতে লাগিলেন—তখন ভীম আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভয়ঙ্কর শব্দে সভা কাঁপাইয়া বলিলেন, "আমি যদি গদা দিয়া এই দুষ্টের উরু না ভাঙ্গি, তবে যেন আমার স্বর্গে যাওয়া না হয়!"

এতক্ষণে আর কাহারো বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এ-সকল ঘটনার ফল বড়ই ভয়ঙ্কর হইবে। তখন ধৃতরাষ্ট্র প্রাণের ভয়ে আর নিন্দার ভয়ে দুর্যোধনকে তিরস্কার করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন, "মা! তুমি আমার বধূগণের সকলের বড়। বল, তুমি কি চাহ।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "যদি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তবে যুধিষ্ঠিরকে ছাড়িয়া দিন।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তাহাই হইবে। তুমি আর কি চাহ, বল!"

দ্রৌপদী বলিলেন, "ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেবকে তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র সুদ্ধ

ছাড়িয়া দিন।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তাহাই হইবে। তুমি আর কি চাহ, বল!"

দ্রৌপদী বলিলেন, "আমি আর কিছুই চাহি না। ইঁহারা মুক্তি পাইলেই আমার সব পাওয়া হইল।"

তারপর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "মহারাজ! এখন আমাদিগকে কি অনুমতি করেন?"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তোমার মঙ্গল হউক। তুমি তোমার রাজ্যধন সমস্ত লইয়া গিয়া সুখে রাজত্ব কর।"

এইরূপে যুধিষ্ঠির সেখান হইতে বিদায় হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুর্যোধন, কর্ণ আর শকুনির ইহা সহ্য হইবে কেন? তাঁহারা বলিলেন, "এত কষ্ট করিয়া যাহা জিতিলাম, এত সহজেই তাহা লইয়া যাইবে? এ কখনই হইতে পারে না।"

দুষ্ট লোকে না করিতে পারে এমন কাজ নাই। তিন দুষ্ট মিলিয়া তখনই আবার ধৃতরাষ্ট্রের মত ফিরাইয়া দিলেন। স্থির হইল, আবার যুধিষ্ঠিরকে পাশায় ডাকিতে হইবে। এবারের পণ বনবাস। যে হারিবে, সে হরিণের ছাল পরিয়া তেরো বৎসর বনবাস করিবে। এই তেরো বৎসরের শেষ বৎসর অজ্ঞাতবাস, অর্থাৎ এমনভাবে লুকাইয়া থাকা, যেন কেহ সন্ধান না পায়। সন্ধান পাইলে আবার বারো বৎসর বনবাস। বনবাসের পরে অবশ্য আবার আসিয়া রাজ্য পাইবার কথা রহিল। কিন্তু দুর্যোধন স্থির করিয়া রাখিলেন যে, একবার পাণ্ডবদিগকে তাড়াইতে পারিলে আর তাঁহাদিগকে রাজ্যে ঢুকিতে দিবেন না।

ডাকিলেই যখন খেলিতে হইবে, তখন কাজেই যুধিষ্ঠিরকে আবার আসিতে হইল, আর সেই ধূর্ত শকুনির ফাঁকিতে হারিয়া তেরো বৎসরের জন্য বনেও যাইতে হইল। যাইবার সময় দুষ্টেরা সকলে মিলিয়া পাণ্ডবদিগকে কম বিদ্রূপ করে নাই। পাণ্ডবেরা তখন কিভাবে চলিতেছেন, দুর্যোধন কতই ভঙ্গিতে তাহার নকল করিলেন।

তাহাতে ভীম বলিলেন, "মূর্খ! তোমার বিদ্রূপে আমাদের কোনো ক্ষতি হইবে না। আমি আবার বলিতেছি, যুদ্ধের সময় তোমাকে বধ করিব। আর দুঃশাসনের বুক ভাঙ্গিয়া রক্ত খাইব।"

অর্জুন বলিলেন, "আমি কর্ণকে মারিব। হিমালয়ও যদি নড়িয়া যায়, সূর্যও যদি নিভিয়া যায়, তথাপি আমার এ কথা মিথ্যা হইবে না।"

সহদেব শকুনিকে বলিলেন, "দুষ্ট! তুই নিশ্চয় জানিস, আমি তোকে বধ করিব।"

যুধিষ্ঠির সকলের নিকট, এমন-কি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিকটেও বিনয়ের সহিত বিদায় চাহিয়া বলিলেন, "আবার আসিয়া আপনাদের সহিত দেখা করিব।" লজ্জায় কেহ তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু মনে মনে সকলেই তাঁহাকে অনেক আশীর্বাদ করিলেন। বিদুর বলিলেন, "কুন্তী বনে গেলে বড় ক্লেশ পাইবেন, তাঁহাকে আমার নিকটে রাখিয়া যাও।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমাদের পিতা নাই, আপনিই আমাদের পিতার মতন। আপনি

যাহা বলিবেন, তাহাই হউক। আমাদিগকে আর কি উপদেশ দেন?"

বিদুর বলিলেন, "তোমাদের মতো ধার্মিক লোককে আর বেশি উপদেশ কি দিব? আশীর্বাদ করি, তোমাদের ভালো হউক।"

কুন্তীর নিকট বিদায় লইবার সময় সকলেরই খুব কষ্ট হইয়াছিল, বিশেষত কুন্তীর। তাঁহার কান্নায় বুঝি তখন পাষাণও গলিয়াছিল।

এইরূপে সকলের নিকট বিদায় হইয়া পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত বনবাসে যাত্রা করিলেন।

দুষ্ট দুঃশাসনের টানে দ্রৌপদীর মাথার বেণী খুলিয়া গিয়াছিল, সে বেণী আর তিনি বাঁধেন নাই, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, এই দুরাত্মাগণের উচিত শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহা আর বাঁধিবেন না।

পাণ্ডবেরা চলিয়া গিয়াছেন, ধৃতরাষ্ট্র বিদুর প্রভৃতিকে লইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন; এমন সময় হঠাৎ নারদ অন্যান্য অনেক মুনির সহিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আজ হইতে তেরো বৎসর পরে, চতুর্দশ বৎসরে, দুর্যোধনের দোষে ভীমার্জুনের হাতে কৌরবদের সকলের মৃত্যু হইবে।"

এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন, আর ধৃতরাষ্ট্র বসিয়া নিজের দুর্বুদ্ধির কথা ভাবিতে লাগিলেন।

গুবেরা সকলের নিকট বিদায় হইয়া, অস্ত্র হাতে ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিতে লাগিলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চৌদ্দজন চাকরও সপরিবারে গাড়ি চড়িয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। তখন অনেক ধার্মিক ব্রাহ্মণ কৌরবদিগের উপরে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই দুষ্টগণের রাজ্যে বাস করিতে নাই, আমরাও পাণ্ডবদিগের সঙ্গে যাইব।"

এই-সকল ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আনন্দও হইল, কষ্টও হইল। নিজেদের এইরূপ অবস্থা, কি খাইবেন তাহার ঠিক নাই, তাহার মধ্যে রোজ এতগুলি ব্রাহ্মণের আহার জোগান তো সহজ কথা নহে ; তাই যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদিগকে এত স্নেহ করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন, কিন্তু বনের ভিতরে আপনাদিগকে কি দিয়া খাওয়াইব, তাহা ভাবিয়া আমি অস্থির হইতেছি। আমাদের সঙ্গে আসিলে আপনাদের ক্লেশ হইবে, আপনারা ঘরে ফিরিয়া যান।"

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, আমরা আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আমাদের আহারের জন্য আপনার কোনো চিন্তা নাই, আমরা নিজে ভিক্ষা করিয়া খাইব।"

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠির ধৌম্যকে বলিলেন, "ইঁহাদিগকে খাইতে দিবার শক্তি আমার নাই, অথচ ইঁহাদিগকে ছাড়িতেও পারিতেছি না! এখন উপায় কি, বলুন।"

ধৌম্য বলিলেন, "মহারাজ, সূর্যের পূজা করুন ; ইহার উপায় হইবে।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির সূর্যের পূজা আরম্ভ করিলে, সূর্যদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি তোমার পূজায় তুষ্ট হইয়া এই থালি খানা আনিয়াছি। আমার আশীর্বাদে, এবং এই থালির গুণে, বারো বৎসর তোমার অন্নের চিন্তা থাকিবে না। প্রতিদিন দ্রৌপদী যতক্ষণ না আহার করিবেন, ততক্ষণ এই থালির নিকট ফল, ফুলুরি, মাংস, মিঠাই যত চাও ততই পাইবে। তেরো বৎসর পরে তোমার রাজ্য ফিরিয়া পাইবে।" এই বলিয়া তিনি আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

সে আশ্চর্য থালি পাইয়া আর যুধিষ্ঠিরের কোনো চিন্তা রহিল না। বারো বৎসর পর্যন্ত, যতক্ষণ দ্রৌপদীর খাওয়া না হইত, ততক্ষণ উহা নানারূপ খাবার জিনিসে পরিপূর্ণ থাকিত। যত লোকই আসুক না কেন, উহা শেষ করিতে পারিত না। কিন্তু দ্রৌপদীর

খাওয়া শেষ হওয়ামাত্রই সব ফুরাইয়া যাইত।

পাণ্ডবেরা প্রথমে যে বনে বাস করেন, তাহার নাম কাম্যক বন। সেইখানে একদিন বিদুর আসিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে বিদুরকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের ভয় হইয়াছিল, বুঝি-বা আবার পাশা খেলিবার ডাক আসে। কিন্তু বিদুর সেজন্য আসেন নাই। পাণ্ডবদিগের সহিত বন্ধুতা করার কথা বলাতে, ধৃতরাষ্ট্র রাগিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, "তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। খালি পাণ্ডবদের হইয়া কথা বল, তোমার মন বড় কুটিল।" তাই বিদুর পাণ্ডবদিগকে খুঁজিতে খুঁজিতে কাম্যক বনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

এদিকে বিদুর চলিয়া আসাতে ধৃতরাষ্ট্র বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। বিদুরকে তিনি ভালোবাসিতেন, আর বিদুরের মতন একজন বুদ্ধিমান লোক পাণ্ডবদের দলে গেলে তাঁহাদের বল খুবই বাড়িয়া যাইবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার যথেষ্ট হিংসাও হইয়াছিল। সুতরাং তিনি সঞ্জয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "সঞ্জয়! শীঘ্র বিদুরকে ফিরাইয়া আন, নহিলে আমি বাঁচিব না।"

কাজেই আবার বিদুরকে ফিরিয়া আসিতে হইল। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন বলিলেন, "ঐ দেখ, আপদ আবার আসিয়াছে। বন্ধুসকল! শীঘ্র একটা কিছু কর, নহিলে এ কখন বাবাকে দিয়া পাণ্ডবদিগকে ফিরাইয়া আনে, তাহার ঠিক কি!"

কিন্তু কর্ণের এ কথা পছন্দ হইল না। তাঁহার ইচ্ছা, পাণ্ডবদিগকে এখনই গিয়া মারিয়া আসেন। কারণ, এখন তাঁহাদের দুঃখের অবস্থা। সহায় নাই, আর মনে কষ্ট, কাজেই তেজ কম। এইবেলা তাঁহাদিগকে মারিবার খুব সুবিধা।

এ কথায় সকলেই যারপরনাই উৎসাহের সহিত রথ সাজাইয়া পাণ্ডবদিগকে মারিতে চলিয়াছিল, ইহার মধ্যে হঠাৎ ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া তাহাদিগকে থামাইয়া দিলেন।

এদিকে কাম্যক বনে পাণ্ডবদের কিরূপ দিন যাইতেছে? বনটি বড়ই ভয়ানক। রাক্ষসের ভয়ে মুনি-ঋষিরা সেখান হইতে পলাইয়া গিয়াছেন। পাণ্ডবেরা সেখানে গিয়াই দেখিলেন, ভয়ানক একটা রাক্ষস হাঁ করিয়া তাঁহাদের পথ আগলাইয়া গর্জন করিতেছে। দ্রৌপদী তো তাহাকে দেখিয়াই চক্ষু বুজিয়া প্রায় অজ্ঞান!

যুধিষ্ঠির রাক্ষসটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? তোমার কি কাজ করিতে হইবে বল।"

রাক্ষস বলিল, "আর্‌র্‌রে মুহি কিড়্‌ম্মিঢ়্‌ঢ়্‌ রে! মোর নাম কিড়্‌ম্মিঢ়্‌ঢ়্‌ আছে! বগ্‌গের ভাই। তোহরা কে বটেক্? তোদ্দের্‌র্‌কে মুহি মজ্জাসে খাবো!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কীর্মির! আমরা পাণ্ডুর পুত্র। আমাদের নাম যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব।" ভীমের নাম শুনিয়াই রাক্ষস বলিল, "হুঁ-অ-অঃ? বভীম্? কোন্ বেটা ব্‌ভীম রে? ওভার্‌র্‌কেই তো মুহি আগ্‌গেমে খাবো। বেট্টা মোর ভাইটাকে মারিলেক।"

ভীমের তাহাতে ভয় পাওয়ার কোনো কথাই নাই; তিনি ইহার পূর্বেই একটা গাছ লইয়া প্রস্তুত আছেন। তারপর যুদ্ধটাও খুব জমাটরকমই হইল, তাহার কথা আর

বাড়াইয়া বলিবার দরকার নাই। এই রাক্ষসটা খুব জোয়ান ; হাত দিয়া, দাঁত দিয়া, নখ দিয়া, পাথর ছুঁড়িয়া সে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিল, শেষে ভীম তাহার হাত-পা মোচড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বন্ বন্ শব্দে ঘুরাইতে আরম্ভ করিলে সে চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে অজ্ঞান হইয়া গেল। তারপর তাহার গলায় ভীমের হাতের দুই টিপ পড়িতে কার্য শেষ।

পাণ্ডবদের বনবাসের সংবাদে সকলে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যদুবংশের আর পাঞ্চাল দেশের আত্মীয়েরা এবং আরো অনেকে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে কৌরবদিগকে অনেক ধিক্কার দিলেন। উঁহারা সকলেই বলিলেন, "এই দুষ্টদিগকে মারিয়া আমরা আবার যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিব।"

মুনি-ঋষিরা সর্বদাই পাণ্ডবদিগকে দেখিতে আসিতেন। সাধারণ লোকেরাও দলে দলে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সেই বনেই থাকিয়া যাইত।

কাম্যক বনেই যে তাঁহারা আগাগোড়া ছিলেন, তাহা নহে। কখনো কাম্যক বনে, কখনো দ্বৈত বনে, কখনো-বা নানান্ তীর্থে, এইরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহারা সময় কাটাইতেন। একস্থানে অধিক দিন থাকিলে ফল-মূল মিলানো কঠিন হয়, শিকারও ফুরাইয়া যায় ; কাজেই ঘুরিয়া বেড়াইবার বিশেষ দরকার ছিল।

বনে থাকায় খুবই কষ্ট তাহাতে সন্দেহ কি? আর শত্রুদিগকে সাজা দিবার ইচ্ছাও সকলেরই হয়। সুতরাং দ্রৌপদী যে পাণ্ডবদিগের দুঃখ দেখিয়া কাতর হইবেন, আর শত্রুদিগকে তাড়াইয়া নিজের রাজ্য লইবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে বার বার পীড়াপীড়ি করিবেন, ইহা আশ্চর্য নহে। এ-সকল সময়ে ভীম সর্বদাই দ্রৌপদীর কথায় সায় দিতেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহাতে ব্যস্ত না হইয়া, মিষ্ট কথায় তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, ইহারা অন্যায় কাজ করিয়াছে বলিয়া পাণ্ডবদিগেরও তাহা করা উচিত নহে। ক্ষমা করাই যথার্থ ধর্ম, রাগের বশ হইয়া কাজ করিলে ধর্ম নষ্ট হয়।

তাহা ছাড়া, যুধিষ্ঠির বেশ জানিতেন যে দুর্যোধনের পক্ষে কর্ণ প্রভৃতি বড়-বড় যে সকল বীর আছেন, তাঁহাদিগকে ইচ্ছা করিলেই হারাইয়া দেওয়া যায় না। ইহার জন্য বিশেষ আয়োজন চাই। তিনি ভীমকে বলিতেন, "ভাই! কর্ণ যে কত বড় যোদ্ধা, এ কথা ভাবিয়া আমার ঘুম হয় না।"

এ কথার উত্তর দেওয়া ভীমের পক্ষেও সহজ ছিল না, তাই তিনি মুখভার করিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন।

এই সময়ে ব্যাসদেব পাণ্ডবদিগকে দেখিতে আসেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "তোমাকে প্রতিস্মৃতি নামক বিদ্যা শিখাইয়া দিতেছি। তুমি অর্জুনকে ইহা শিখাইবে। ইহার গুণে তিনি মহাদেব, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের প্রভৃতি দেবতাকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া সহজেই বড়-বড় অস্ত্রলাভ করিতে পারিবেন।"

এই বিদ্যা পাইয়া পাণ্ডবদের মনে খুবই আশা হইল। যুধিষ্ঠিরের নিকট ইহা শিখিবার পর অর্জুন তখনই তপস্যায় বাহির হইতে আর বিলম্ব করিলেন না। কবচ, গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণ প্রভৃতি লইয়া তপস্যায় বাহির হইলেন। যাত্রা করিবার সময় সকলে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "তোমার সিদ্ধিলাভ হউক।"

তারপর হিমালয় আর গন্ধমাদন পর্বত পার হইয়া ইন্দ্রকীল নামক পর্বতে উপস্থিত হইলেন। এমন সময় কোথা থেকে একটি কৃষ্ণকায় তপস্বী আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কে হে তুমি, ধনুর্বাণ লইয়া এখানে আসিয়াছ? এখানে ধনুর্বাণ দিয়া কি করিবে? উহা ফেলিয়া দাও!"

অর্জুন ইহাতে ধনুক বাণ না ফেলায় তপস্বী খুশি হইয়া বলিলেন, "বাছা, বর লও। আমি ইন্দ্র।"

অর্জুন জোড়হাতে ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনার নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতে আসিয়াছি। দয়া করিয়া আমাকে সেই বর দিন।"

ইন্দ্র বলিলেন, "আগে শিবকে সন্তুষ্ট কর, তারপর অস্ত্র পাইবে।" এই বলিয়া ইন্দ্র চলিয়া গেলেন, অর্জুনও হিমালয়ের নিকটে আসিয়া শিবের তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

ক্রমাগত চারি মাস ধরিয়া তিনি অতি ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রথম মাসে তিনদিন অন্তর আহার করিতেন, দ্বিতীয় মাসে ছয়দিন অন্তর, তৃতীয় মাসে পনেরো দিন অন্তর। চতুর্থ মাসে কেবল বাতাস ভিন্ন আর কিছুই খান নাই ; অঙ্গুষ্ঠামাত্র ভর করিয়া ঊর্দ্ধ হস্তে, সারাটি মাস দাঁড়াইয়া, কেবলই তপস্যা করিয়াছিলেন।

এদিকে সেখানকার মুনি-ঋষিগণের মনে বড়ই ভাবনা উপস্থিত! অর্জুনের সেই ভয়ানক তপস্যার তেজে ইহারই মধ্যে চারিদিক ধোঁয়ার মতো হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা সকলে ব্যস্তভাবে শিবের নিকট গিয়া বলিলেন, "প্রভো! আমরা অর্জুনের তপস্যার তেজ সহিতে পারিতেছি না। ইঁহাকে শীঘ্র থামাইয়া দিন।"

মহাদেব কহিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমি আজই অর্জুনকে সন্তুষ্ট করিয়া দিতেছি।" সুতরাং মুনিরা নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

ততক্ষণে শিব আর দুর্গাও কিরাত-কিরাতিনীর বেশে অর্জুনের তপস্যার স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভূতগুলিও নানা সাজে সঙ্গে চলিয়াছে।

এদিকে আবার কোথাকার একটা দানব শূকর সাজিয়া অর্জুনকে মারিতে আসিয়াছে, অর্জুনও গাণ্ডীব টানিয়া তাহাকে বধ করিতে প্রস্তুত। এমন সময় ব্যাধের বেশে মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "আরে থামো ঠাকুর! আমি আগে নিশানা করিয়াছি (ধনুক উঠাইয়াছি)।"

সামান্য ব্যাধের কথা অর্জুনের গ্রাহ্যই হইল না। তিনি তাহা তুচ্ছ করিয়া শূকরের উপর তীর ছুঁড়িলেন। ব্যাধও ঠিক তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এক তীর ছুঁড়িল। এখন এই কথা লইয়া দুজনে ভয়ানক তর্ক উপস্থিত।

অর্জুন বলিলেন, "আমার শিকারে তুমি কেন তীর ছুঁড়িতে গেলে? দাঁড়াও, তোমাকে সাজা দিতেছি।"

ব্যাধ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি আগে নিশানা করিয়াছিলাম, আমার তীরেই শূকর মরিয়াছে! তুমি দেখিতেছি বেয়াদব! দাঁড়াও তোমাকে সাজা দিতেছি।"

এ কথায় অর্জুন বিষম রাগিয়া ব্যাধের উপরে কতই বাণ মারিলেন। ব্যাধ বাণ খাইয়া খালি হাসে, আর বলে, "আরো মার! দেখি তোর কত অস্ত্র আছে!"

অর্জুনের যত বড়-বড় বাণ আর ভারি-ভারি অস্ত্র ছিল, তিনি তাহার কোনোটাই ছুঁড়িতে বাকি রাখিলেন না। ব্যাধ বাণ খায়, আর কেবলই হাসে। অর্জুনের এমন যে অক্ষয় তূণ, ক্রমে তাহাও খালি হইয়া গেল। কিরাত তাহার সকল বাণ গিলিয়া খাইয়া তখনো হাসিতেছে! বাণ ফুরাইলে অর্জুন গাণ্ডীব দিয়াই কিরাতকে মারিতে গেলেন, সে সর্বনেশে মানুষ তাহাও কাড়িয়া লইল! তারপর খড়্গ লইয়া দু হাতে কিরাতের মাথায় মারিলেন, খড়্গ দুখানা হইয়া গেল! সকল অস্ত্র শেষ হইলে গাছ পাথর ছুঁড়িতে লাগিলেন, তাহাতেও কিছু ফল হইল না। শেষে ভয়ানক রাগের ভরে কিরাতকে জড়াইয়া ধরিতে গেলে, সে তাঁহাকে ধরিয়া এমনি চাপিয়া দিল যে, তাহাতে তিনি একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

জ্ঞান হইলে অর্জুন মাটির শিব গড়িয়া, ফুলের মালা দিয়া তাহার পূজা করিতে বসিলেন। সেই ফুলের মালা অর্জুনের গড়া শিবে না পড়িয়া, একেবারে সেই কিরাতের মাথায় গিয়া উপস্থিত। তাহা দেখিয়া অর্জুনও তাড়াতাড়ি তাহার পায়ে গিয়া পড়িলেন। কারণ, তখন আর তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, 'এ ব্যাধ নয়, স্বয়ং শিব।' অর্জুন বলিলেন, "প্রভো, না জানিয়া যুদ্ধ করিয়াছি অপরাধ ক্ষমা করুন।"

মহাদেব বলিলেন, "অর্জুন! আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই লও, তোমার গাণ্ডীব। তোমার তূণও আবার অক্ষয় হইল। তুমি যথার্থ বীর পুরুষ, এখন বর লও।"

অর্জুন বলিলেন, 'দয়া করিয়া আমাকে আপনার পাশুপত নামক অস্ত্র দান করুন।"

তখন মহাদেব তাঁহাকে সেই অস্ত্র দিয়া, তাহা ছাড়িবার এবং থামাইবার মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন। সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্রের তেজে তখন ভূমিকম্প আর বজ্রপাতের মতো শব্দ হইয়াছিল।

অর্জুনকে অস্ত্র দিয়া মহাদেব চলিয়া গেলে পর, বরুণ, কুবের, যম আর ইন্দ্রও সেখানে আসিয়া তাঁহাকে নানারূপ অস্ত্র দিলেন। যমের দণ্ড, বরুণের পাশ প্রভৃতি অতি আশ্চর্য এবং ভয়ঙ্কর অস্ত্র। এ অস্ত্রসকল তো অর্জুন পাইলেনই, তারপর স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রের এবং দেবতাদিগের নিকটে কত আদর, কত মান্য, কত শিক্ষা পাইলেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইন্দ্রের নিকটে যে-সকল আশ্চর্য অস্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা অর্জুন নিবাত কবচ নামক দৈত্যদিগকে বধ করেন। তাহাতে দেবতাদের অনেক উপকার হয়। ইহা ছাড়া চিত্রসেন নামক গন্ধর্বের নিকট শিক্ষা করিয়া, তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন, আর ইহাতে তাঁহার কত উপকার হইয়াছিল, তাহা শীঘ্রই দেখিতে পাইবে। এইরূপে স্বর্গে তাঁহার পাঁচ বৎসর পরম সুখে কাটিয়া যায়।

এদিকে কাম্যক বনে পাণ্ডবেরা অর্জুনের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত দুঃখিতভাবে দিন কাটাইতেছেন। তিনি কোথায় কিভাবে আছেন, কত দিনে ফিরিবেন, কিছুই তাঁহাদের জানা নাই, সুতরাং দুঃখ হইবারই কথা। মাঝে মাঝে কোনো ধার্মিক মুনি-ঋষি আসিলে, তাঁহার সহিত কথাবার্তায় কয়েকদিন তাহাদের মন একটু ভালো থাকে। একবার বৃহদশ্ব মুনি আসিয়া তাঁহাদের নিকট কিছুদিন রহিলেন। ইনি আশ্চর্যরকম পাশা খেলা জানিতেন। এই সুযোগে তাঁহার নিকট খুব ভালো করিয়া সেই খেলা শিখিয়া

লওয়ায়, যুধিষ্ঠিরের অনেক উপকার হইল।

ইহার কিছুদিন পরে লোমশ মুনি স্বর্গ হইতে অর্জুনের সংবাদ লইয়া কাম্যক বনে আসেন। তাঁহার নিকটে সকল কথা শুনিয়া অর্জুনের সম্বন্ধে পাণ্ডবদের ভয় দূর হইল।

লোমশ বলিলেন যে, 'অর্জুন পাণ্ডবদিগকে নানারূপ তীর্থ দেখিয়া বেড়াইতে বলিয়াছেন।' সুতরাং তাঁহারা লোমশ মুনির সঙ্গেই তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। ভারতবর্ষের প্রায় কোনো তীর্থই তাঁহারা দেখিতে বাকি রাখিলেন না। প্রভাস নামক তীর্থে কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। সেই সময়ে যদুবংশের সকলে পাণ্ডবদিগের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যত শীঘ্র পারেন, তাঁহারা কৌরবদিগকে মারিয়া পাণ্ডবদিগকে রাজা করিবেন। তাঁহারা তখনই যুদ্ধ আরম্ভ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কৃষ্ণ অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাদিগকে থামাইয়া রাখিলেন। কারণ পাণ্ডবেরা নিজের কথামত বনবাস শেষ না করিয়া কিছুতেই রাজ্য লইতে সম্মত হইতেন না।

এইরূপে তীর্থ দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাঁহারা কৈলাস পর্বতের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ-সকল স্থান অতি ভয়ানক। একে তো পর্বতের উপর দিয়া চলাই খুব কঠিন, তাহাতে আবার রক্ষ রাক্ষসেরা ক্রমাগত সেখানে পাহারা দেয়। সুতরাং ভয়ের কথাই বটে। এ সময়ে ভীম সকলকে সাহস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি? চলিতে না পারিলে আমি পিঠে করিয়া লইব।"

পাণ্ডবেরা গন্ধমাদন পর্বতে উঠিবামাত্র ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হইল। ঘোরতর গর্জনে হাওয়া চলিয়াছে, পাথর ছুটিয়া আসিতেছে, চারিদিক অন্ধকার, প্রাণ থাকে কি যায়। ভীম অনেক কষ্টে দ্রৌপদীকে লইয়া একটা গাছ ধরিয়া রহিলেন। অন্যেরাও কেহ গাছ ধরিয়া, কেহ উইঢিপি আঁকড়াইয়া, কেহ-বা গুহার ভিতর ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। এত শ্রম আর কষ্টের পর দ্রৌপদীর আর চলিবার শক্তি রহিল না। তাঁহার দুঃখে অন্য সকলেরও দুঃখের একশেষ হইল। তখন ভীম মনে মনে ঘটোৎকচকে ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র ঘটোৎকচ অনেক রাক্ষস সহ আসিয়া বলিল, "বাবা! কেন ডাকিতেছ? কি করিতে হইবে?"

ভীম বলিলেন, "বাছা! দ্রৌপদী চলিতে পারিতেছে না, তাঁহাকে বহিয়া লইয়া চল।"

ঘটোৎকচ তখনই দ্রৌপদীকে আর তাহার সঙ্গের রাক্ষসেরা অন্য সকলকে কাঁধে লইয়া চলিল। ইহাদের সাহায্য না পাইলে পাণ্ডবদিগের খুবই কষ্ট হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহারা তাঁহাদিগকে অনেক কঠিন স্থান পার করিয়া বদরী নামক তীর্থে পৌঁছাইয়া দিল। এই স্থানের নিকট হইতেই অর্জুন স্বর্গে গিয়াছিলেন, আর এখানেই তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা। সুতরাং পাণ্ডবেরা এইখানে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইহার মধ্যে একদিন কোথা হইতে এক আশ্চর্য পদ্মফুল আসিয়া দ্রৌপদীর নিকট পড়িল। সে ফুলের এমনি চমৎকার গন্ধ যে, তাহা নাকে ঢুকিবামাত্র প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। দ্রৌপদী ফুলটি পাইয়া ভীমকে বলিলেন, "কি চমৎকার ফুল! আমাকে এইরূপ

আরো অনেকগুলি ফুল আনিয়া দিতে হইবে। আমি কাম্যক বনে লইয়া যাইব।"

এ কথায় ভীম আহ্লাদের সহিত তখনই ফুল আনিতে চলিলেন। ফুলটি ঈশান কোণ (অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব কোণ) হইতে হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়াছিল সুতরাং ভীম বুঝিতে পারিলেন যে, ঐদিকে গেলে আরো ফুল পাওয়া যাইবে। সেদিকে অনেক দূর গিয়া তিনি একটা প্রকাণ্ড সরোবরে উপস্থিত হইলেন। সরোবরে স্নান করিয়া তিনি আবার ফুলের খোঁজে চলিয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন যে মস্ত একটা বানর তাঁহার পথের উপরে শুইয়া আছে।

বানরটাকে তাড়াইবার জন্য ভীম সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বানর তাহা বড়-একটা গ্রাহ্য করিল না। সে খালি একটু মিটি-মিটি চাহিয়া বলিল, "আহা! অমন চ্যাঁচাইও না, একটু ঘুমাইতে দাও। আমার অসুখ করিয়াছে।"

ভীম বলিলেন, "আমি পাণ্ডুর পুত্র। লোকে আমাকে পবনের পুত্রও বলে। আমার নাম ভীম। তুমি কে?"

বানর একটু হাসিয়া বলিল, "আমি বানর।"

ভীম বলিলেন, "পথ ছাড়, নহিলে সাজা পাইবে।"

বানর বলিল, "বড় অসুখ করিয়াছে ; উঠিতে পারি না। আমাকে ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যাও।"

ভীম বলিলেন, "সকল প্রাণীর শরীরেই ভগবান আছেন ; তোমাকে ডিঙ্গাইলে তাঁহার অমান্য করা হইবে। আমি তাহা পারিব না।"

বানর বলিল, "বুড়া হইয়াছি, উঠিতে পারি না। আমার লেজটা সরাইয়া পাশ দিয়া চলিয়া যাও।"

ভীম মনে মনে বলিলেন, 'বটে! আচ্ছা দাঁড়াও, এই লেজ ধরিয়া তোমাকে ধোপার কাপড় কাচা দেখাইতেছি।'

এই মনে করিয়া তিনি বাঁ হাতে বানরের লেজ ধরিলেন, কিন্তু তাহা নাড়িতে পারিলেন না! তারপর দু হাতে ধরিয়া টানিলেন, তবুও নাড়িতে পারিলেন না। প্রাণপণ করিয়া টানিলেন, তাঁহার চোখ বাহির হইয়া আসিবার গতিক হইল, ভ্রূ আর কপাল ভয়ানক কোঁচকাইয়া গেল, মুখ কালো হইয়া উঠিল, গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল—তবুও লেজ নড়িল না। তখন তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া জোড়হাতে বলিলেন, "মহাশয়, আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি কে?"

বানর বলিল, "আমি পবনের পুত্র, আমার নাম হনুমান।"

তখন ভীম তাড়াতাড়ি হনুমানের পায়ের ধূলা লইতে পারিলে বাঁচেন। হনুমান বড় ভাই, ভীম ছোট ভাই, কাজেই দুজনে দুজনকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। ভীম বলিলেন, "দাদা, শুনিয়াছি সমুদ্র পার হইবার সময় আপনার বড় ভয়ঙ্কর চেহারা হইয়াছিল। সেই চেহারাটি আমি একবার দেখিতে চাই।

হনুমান বলিলেন, "ভাই, ও চেহারা দেখিয়া কাজ নাই ; তুমি ভয় পাইবে।"

কিন্তু ভীম ছাড়িবেন কেন? তাঁহার যে বীর বলিয়া বেশ একটু অহঙ্কার আছে।

কাজেই শেষটা হনুমানকে সেই চেহারা দেখাইতে হইল।

কি ভয়ঙ্কর বিশাল চেহারা! কোথায়-বা তাহার মাথা, কোথায়-বা তাহার লেজ। সে শরীর বন ছাড়াইয়া, পর্বত ছাড়াইয়া আকাশ পর্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিল। জ্বলন্ত সোনার মতো তাহার তেজে ভীমের চক্ষু আপনা হইতেই বুজিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া হনুমান বলিলেন, "আর কাজ নাই, তাহা হইলে ভয় পাইবে।"

ভীম বলিলেন, "সত্যি দাদা, আমি আর তাকাইতে পারিতেছি না। এখন ওটাকে গুটাইয়া লউন।"

তখন হনুমান তাহার শরীর ছোট করিয়া ভীমের সহিত কোলাকুলি করিলেন, তারপর বলিলেন, "ভাই, ঘরে যাও। দরকার হইলে আমাকে ডাকিও, আমি উপস্থিত হইব। যুদ্ধের সময় তুমি সিংহনাদ করিলে আমি তাহা বাড়াইয়া দিব, আর অর্জুনের রথের চূড়ায় বসিয়া এমন চিৎকার করিব যে, তাহাতেই শত্রু আধমরা হইয়া যাইবে।"

হনুমান ভীমকে এই কথা বলিয়া, আর তাঁহাকে পদ্মফুলের সন্ধান বলিয়া দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কৈলাস পর্বতের উপরে কুবেরের সরোবরে এই ফুল ফোটে। ফুলগুলি সোনার, তাহার বোঁটা বৈদূর্যমণির ; আর তাহার গন্ধের কথা তো পূর্বেই বলিয়াছি। কুবেরের শত শত রাক্ষস প্রহরী সরোবরে পাহারা দেয়। ইহারা ভীমকে নিষেধ করিয়া বলিল, "হারে ই কিমন লোক বটেক্? কুব্বেরর্ মহারাজ্জকু বলিলেক্ নি, পুচ্ছিলেক্ নি, আউ পুল লেবেকে চলিলেক্!"

ভীম বলিলেন, "কোথায় তোদের কুবের মহারাজ যে তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব? আমার নাম ভীম, পাণ্ডুর পুত্র। আমরা ক্ষত্রিয়, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করি না। পাহাড়ের উপরে ফুল ফুটিয়াছে। তাহা তোদের কুবেরের যেমন, আমারও তেমনি; জিজ্ঞাসা আবার কাহাকে করিব?"

এই বলিয়া ভীম জলে নামিলেন। আর রাক্ষসেরাও অমনি "ধর্! মার্! কাট্! বাঁধ্! খা!" বলিতে বলিতে ভোমর পট্টিশ হাতে দাঁত কামড়াইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু ভীমের গদা যে কেমন জিনিস, তাহা তাহারা জানিত না! সেই গদা ঘুরাইয়া ভীম যখন নিমেষের মধ্যে একশোটা রাক্ষসের মাথা ফাটাইয়া ফেলিলেন, তখন আরগুলি অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে কুবেরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। কুবের তাহাদের নিকট সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি জানি, ভীম দ্রৌপদীর জন্য ফুল নিতে আসিয়াছে। উঁহার যত ইচ্ছা ফুল লইয়া যাইতে দাও।"

সুতরাং রাক্ষসেরা আর ভীমকে বাধা দিল না, তিনি সাধ মিটাইয়া ফুল লইলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা ভীমের বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ঘটোৎকচের সাহায্যে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কুবেরের কথায় কিছুদিন তাঁহাদিগকে সেই স্থানে থাকিতে হইল। তারপর সেখান হইতে বিদায় লইয়া আবার বদরিকাশ্রমে আসিয়া তাঁহারা অর্জুনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ভীম আর-একটা রাক্ষস মারেন। এটার নাম জটাসুর। হতভাগা এমনি

চমৎকার ব্রাহ্মণ সাজিয়া আসিয়াছিল যে, পাণ্ডবেরা তাহাকে রাক্ষস বলিয়া চিনিতেই পারেন নাই। তাঁহারা তাহাকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া আদরের সহিত সঙ্গে রাখিয়াছেন, আর ইহার মধ্যে দুষ্ট কোন্ সুযোগে একদিন যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব আর দ্রৌপদীকে লইয়া ছুট দিয়াছে। তাহার সাজাটাও ভীমের হাতে সে তেমনি করিয়া পাইল।

তারপর ক্রমে অর্জুনের ফিরিবার সময় কাছে আসিলে, পাণ্ডবেরা আবার গন্ধমাদন পর্বতে যান। ইহার কিছুদিন পরেই ইন্দ্রের রথে চড়িয়া অর্জুন স্বর্গ হইতে তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অর্জুনকে পাইয়া পাণ্ডবদের এবং দ্রৌপদীর সুখের সীমা রহিল না।

ইহার পরে আবার পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার সময় অবশ্য পথে অনেক ঘটনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কথা বিশেষ করিয়া বলিবার দরকার নাই। কেবল ভীম একটা সাপের মুখে পড়িয়া কিরূপ নাকাল হইয়াছিলেন, তাহা একটু শুন।

বদরিকাশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া কিছুদিন পরে পাণ্ডবেরা সুবাহু নামক এক কিরাত রাজার দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে যামুন নামক একটা পর্বত আছে, তাহার কাছে বনের ভিতরে নানারকম শিকার মিলে। ভীম খুবই উৎসাহের সহিত শিকার করিয়া বেড়ান। ইহার মধ্যে একদিন এক ভয়ঙ্কর সাপ তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়াছে! ধরিবামাত্রই ভীমের বল সাহস সব কোথায় যেন চলিয়া গেল ; তিনি কিছুতেই সাপের বাঁধন এড়াইতে পারিলেন না।

সাপটা আবার মানুষের মতো কথা কয়। সে বলিল, যে বহুকাল পূর্বে পাণ্ডবদেরই বংশে সে নহুষ নামে রাজা ছিল, অগস্ত্য মুনির শাপে এখন সাপ হইয়াছে। ভীমের পরিচয় পাইয়া সে বলিল, "দেখিতেছি, তুমি আমারই বংশের লোক। কিন্তু তথাপি তোমাকে না খাইয়া থাকিতে পারিতেছি না।"

ভীমের বড় ভাগ্য যে, সেই সময়ে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীমের দশা দেখিয়া তো তিনি একেবারে অবাক! তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সাপকে অনেক মিনতি করিলেন। কিন্তু সে তাহাতে রাজি হইল না। শেষে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইলে তুমি ভীমকে ছাড়িতে পার?"

সাপ বলিল, "আমার কথার উত্তর দিতে পার তো ইহাকে ছাড়িয়া দিই ; কেননা, তাহা হইলে আমার শাপ দূর হইবে।"

যুধিষ্ঠির তাহাতেই সম্মত হইলেন। কিন্তু সে সর্বনেশে সাপ আবার এমনি ভয়ানক পণ্ডিত যে, ব্রহ্মাণ্ডের যত উৎকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সে যুধিষ্ঠিরকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। যাহা হউক, সে তাঁহাকে ঠকাইতে পারিল না! শেষে খুশি হইয়া বলিল, "তোমার বিদ্যা দেখিয়া আমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং তোমার ভাইকে খাইব না।"

বাস্তবিক যুধিষ্ঠির না আসিলে সেদিন সাপের হাতে পড়িয়া নিশ্চয় ভীমের প্রাণ যাইত।

পাণ্ডবেরা কাম্যক বন হইতে দ্বৈত বনে গিয়া একটি সুন্দর সরোবরের ধারে এক কুঁড়ে ঘরে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে কি-একটা হইল শুন। দুষ্ট লোকেরা

সাধুদিগকে কেবল ক্লেশ দিয়াই সন্তুষ্ট হয় না, ক্লেশটা কেমন হইতেছে, তাহা আবার দেখিতে চাহে। পাণ্ডবেরা নিতান্ত কষ্টে বনবাস করিতেছেন, এ কথা দুর্যোধন প্রভৃতিরা শোনেন, আর তাঁহাদের খালি দুঃখ হয়, 'আহা উহারা কেমন কষ্ট পাইতেছে, তাহার তামাশা একবার দেখিতে পাইলাম না, আর আমাদের জাঁকজমকটাও উহাদিগকে দেখাইতে পারিলাম না।' যতই তাঁহারা এ কথা ভাবেন, ততই তাঁহাদের মনে হয় যে, এ কাজটা না করিলেই চলিতেছে না। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে? ধৃতরাষ্ট্র কি সহজে তাহাদিগকে দ্বৈত বনে যাইতে দিবেন?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে তাঁহারা ইহার এক উপায় স্থির করিলেন। দ্বৈত বনে দুর্যোধনের অনেক গোয়ালা প্রজা বাস করে, রাজার গোরু-বাছুর রাখার ভার তাহাদের উপরে। এ-সকল গোরুর খবর নেওয়া রাজার একটা কাজ ; সুতরাং এই কাজের ছল করিয়া দুর্যোধন দ্বৈত বনে যাইতে চাহিলে ধৃতরাষ্ট্রের অমত হইবে না।

এই প্রস্তাব শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে বলিলেন, "ওখানে গিয়া কাজ নাই। ওখানে পাণ্ডবেরা আছেন; কি জানি, যদি কোনো কথায় তাঁহাদের সহিত ঝগড়া হয়।"

এ কথায় শকুনি বলিলেন, "রাম রাম! আমরা কি তাহাদের কাছে যাইব? আমরা গোরু দেখিয়া আর দূরে দূরে একটু শিকার করিয়াই চলিয়া আসিব, উঁহাদের সঙ্গে আমাদের দেখাই হইবে না।"

কাজেই ধৃতরাষ্ট্র শেষে রাজি হইলেন। হুকুম পাওয়ামাত্র হাতি ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত, সাজিয়া প্রস্তুত। একলক্ষ গোরু দেখিতে হইবে। তাহার জন্য দশলক্ষ লোক পৃথিবী কাঁপাইয়া দ্বৈত বনে যাত্রা করিল। রাজপুত্রেরা নিজে গিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না, আবার পরিবারদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

গোরু দেখার কাজ দেখিতে দেখিতেই শেষ হইয়া গেল, শিকারেও খুব বেশি সময় লাগিল না। তারপর ক্রমে তাঁহারা সেই সরোবরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যাহার ধারে পাণ্ডবদিগের আশ্রম। সে সময়ে সেই সরোবরে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন সপরিবারে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গের মেয়েদের স্নানের সুবিধার জন্য সরোবরটিকে বেড়া দিয়া ঘেরা হইয়াছিল।

গন্ধর্বের দরোয়ানেরা দুর্যোধনের লোকদিগকে সরোবরে যাইতে নিষেধ করে ; দুর্যোধন আবার তাহা শুনিয়া গন্ধর্বদিগকে তাড়াইয়া দিবার হুকুম দেন। এইরূপে ক্রমে দুই দলে গালাগালি হইয়া শেষে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

কৌরবদের সাহস খুব ছিল, আর কর্ণ, দুর্যোধন ইঁহারা যোদ্ধাও কম ছিলেন না ; কাজেই প্রথমে তাঁহারা গন্ধর্বের লোকদিগকে বেশ একটু জব্দই করিয়া তোলেন। কিন্তু তারপর যখন চিত্রসেন নিজে অসংখ্য গন্ধর্ব লইয়া ক্রোধভরে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তখন কৌরবদের আর দুর্দশার সীমাই রহিল না। সৈন্যেরা তো প্রাণপণে তাহাদের মা-বাপের নাম লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলই, এমন যে কর্ণ, তিনিও শেষে আর দুর্যোধনের দিকে না চাহিয়াই তাহাদের পিছু পিছু পলায়ন করিলেন।

আর দুর্যোধন? সে লজ্জার কথা আর কি বলিব? গন্ধর্বেরা তাঁহাকে আর তাঁহার

ভাইদিগকে তাঁহাদের সমস্ত জাঁকজমক সুদ্ধ সপরিবারে বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

এদিকে যাহারা পলাইয়াছিল, তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে পাণ্ডবদিগের নিকট আসিয়া দুর্যোধনের দুর্দশার কথা জানাইল। তাহাদের কথা শুনিয়া ভীম বলিলেন, "বাঃ! আমরা অনেক কষ্টে যাহা করিতাম, গন্ধর্বেরাই আজ আমাদের সে কাজ করিয়া দিল। যেমন দুষ্ট, তাহাদের তেমনি সাজা হইয়াছে।"

যুধিষ্ঠির তখন একটা যজ্ঞ করিতেছিলেন। ভীমের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ছিঃ, ভীম! এমন সময় কি এরূপ কথা বলিতে আছে? উহাদের অপমান হইলে তো আমাদেরই বংশের অপমান। তাহা ছাড়া উহারা এখন আমাদের আশ্রয় চাহিতেছে। তুমি, অর্জুন, নকুল আর সহদেব শীঘ্র গিয়া উহাদিগকে ছাড়াইয়া আন। আমি যজ্ঞে ব্যস্ত আছি, নহিলে আমি নিজে যাইতাম।" কাজেই তখন অর্জুন, নকুল আর সহদেব ছুটিয়া চলিলেন।

তাহারা প্রথমে মিষ্টকথায় গন্ধর্বদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। গন্ধর্বেরা তাহা না শুনাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, আর অর্জুনের সহিত খানিক যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের এমনি দুর্দশা হইল যে, বেচারাদের টিকিবারও সাধ্য নাই, পলাইবার পথ নাই, মাটি ছাড়িয়া আকাশে উঠিয়াও স্থির হইবার জো নাই। ইহা দেখিয়া তাহাদের রাজা বিষম রাগে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অর্জুনের কাছে তাঁহারও পরাজয়ের বিলম্ব হইল না। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি বিপাকে পড়িয়া বলিলেন, "অর্জুন! আমি যে তোমার বন্ধু চিত্রসেন।"

তখন অর্জুন দেখেন সত্যিই তো, এ যে চিত্রসেন—সেই স্বর্গে যাঁহার নিকট গান বাজনা শিখিয়াছিলেন। অমনি যুদ্ধ ছাড়িয়া দুই বন্ধুতে কোলাকুলি আরম্ভ হইল।

তারপর অর্জুন বলিলেন, "একি, বন্ধু, কৌরবদিগকে কেন বাঁধিয়া আনিলে?"

চিত্রসেন বলিলেন, "হতভাগারা তোমাদিগকে অপমান করিতে আসিয়াছিল, তাই ইন্দ্রের কথায় ইহাদিগকে বাঁধিয়া নিয়া যাইতেছি।"

অর্জুন বলিলেন, "তাহা হইবে না! দুর্যোধন আমাদের ভাই। যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত ইচ্ছা, ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।"

চিত্রসেন বলিলেন, "এমন দুষ্টকে কখনই ছাড়া উচিত নহে। চল আমরা গিয়া যুধিষ্ঠিরকে সকল কথা বলি, তারপর তিনি যাহা বলেন, তাহাই হইবে।"

যুধিষ্ঠির যে উঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, তাহা বোধহয় আর না বলিলেও চলে। তাঁহাদের দুষ্টবুদ্ধির কথা শুনিয়া তিনি কেবল বলিলেন, "ভাই, আর কখনো এমন সাহস করিও না, এখন সুখে বাড়ি চলিয়া যাও।"

হায় রে মহারাজ দুর্যোধন! যে পাণ্ডবদিগকে জব্দ করিবার জন্য এত জাঁকজমকের সহিত আসিলেন, এখন সেই পাণ্ডবদের কৃপায় প্রাণ লইয়া তিনি চোরের মতন ঘরে ফিরিতেছেন। আর ঘরে ফিরিবেনই-বা কোন মুখে? তাহার চেয়ে বরং মৃত্যুই তাঁহার ভালো বোধ হইল। সঙ্গের লোকদিগকে তিনি বলিলেন, "আমার আর বাঁচিয়া কাজ কি? তোমরা ঘরে যাও, দুঃশাসন রাজা হউক। আমি এইখানেই পড়িয়া মরিব।"

দুঃশাসন তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কর্ণ আর শকুনি তাঁহাকে বুঝাইয়া

বলিলেন, "সে কি দুর্যোধন, তোমার কিসের লজ্জা? পাণ্ডবেরা তোমার রাজ্যে বাস করে, কাজেই তাহারা তোমার প্রজা, সুতরাং আপদ-বিপদে তোমাকে রক্ষা করা তো তাহাদের কাজ হইল! ইহাতে তাহাদেরই বাহাদুরী কি, আর তোমারই-বা লজ্জার কথা কি?"

তবুও সহজে দুর্যোধন শান্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে বুঝাইতে দুটি দিন লাগিয়াছিল।

দুষ্টলোকের সাজা হয়, কিন্তু তাহাতে তাহার শিক্ষা হয় না। দুর্যোধন কোথায় ইহার পর হইতে পাণ্ডবদিগের সহিত ভালো ব্যবহার করিবেন, না তাঁহার হিংসা আরো বাড়িয়া চলিল।

ইহার মধ্যে একদিন দুর্বাসা মুনি দশহাজার শিষ্য সমেত হস্তিনায় আসিলেন। এমন বিষম বদরাগী সর্বনেশে মানুষ এই পৃথিবীতে আর জন্মায় নাই। কথায় কথায় তিনি যাহাকে তাহাকে শাপ দিয়া বসেন! রাত দুপুর হউক না কেন; 'খাইব' বলিতেই খাবার আনিয়া উপস্থিত করিতে না পারিলে নিশ্চয় শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন। আবার তাড়াতাড়ি আনিতে পারিলে হয়তো বলিবেন, 'খাইব না'। সঙ্গে সঙ্গে দুটা গালি দেওয়া আশ্চর্য নহে।

দুর্যোধন প্রাণপণে এই দুর্বাসা মুনির সেবা করিয়া তাঁহাকে যারপরনাই খুশি করিয়া ফেলিলেন। দুর্বাসা বলিলেন, "আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি চাহ?"

দুর্যোধন বলিলেন, "আপনি যদি দয়া করিয়া একটিবার দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হইবার পরে, আপনার এই দশ হাজার শিষ্য লইয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমে আহার করিতে যান, তবেই আমার ঢের হয়, আমি আর কিছু চাহি না।"

দুর্বাসা বলিলেন, "আচ্ছা, আমি অবশ্য যাইব।"

এই বলিয়া দুর্বাসা চলিয়া গেলেন; আর দুর্যোধনও এই ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন যে, 'দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হইলে আর পাণ্ডবেরা দুর্বাসাকে খাইতে দিতে পারিবেন না, সুতরাং মুনি তাঁহাদিগকে শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন।'

ইহার পর একদিন সত্যসত্যই দুর্বাসা গিয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, থালায় আর খাবার নাই। সে যাত্রা কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে রক্ষা না করিলে তাঁহাদের বড়ই বিপদ হইত। একজনেরও ভাত নাই, অথচ দশহাজার শিষ্য লইয়া মুনি উপস্থিত। এখন উপায়? যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে স্নান-আহ্নিক করিবার জন্য গঙ্গায় পাঠাইয়া দিলেন; আর দ্রৌপদী মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'হায় হায়! স্নান করিয়া আসিলে ইঁহাদিগকে কি খাওয়াইব?'

উপায় না দেখিয়া দ্রৌপদী মনে মনে কৃষ্ণকে ডাকিলেন। কৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নহেন, তিনি দেবতা। কাজেই দ্রৌপদীর দুঃখের কথা জানিতে পারিয়া সেই মুহূর্তেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ আসিয়াই বলিলেন, "দ্রৌপদী, বড় ক্ষুধা হইয়াছে, কিছু খাইতে দাও।"

দ্রৌপদী লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "থালায় তো কিছুই নাই, কি খাইতে দিব।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "অবশ্য কিছু আছে, থালাখানি আন তো।"

কাজেই দ্রৌপদী থালা আনিয়া উপস্থিত করিলেন। উহার একপাশে তখনো এক কণা শাক-ভাত লাগিয়াছিল। কৃষ্ণ সেই এক বিন্দু শাক-ভাত মুখে দিয়া বলিলেন, "ইহাতেই বিশ্বাত্মা তুষ্ট হউন।" তারপর ভীমকে বলিলেন, "মুনিদিগকে ডাক।"

এ-সকল কথা বলিতে যত সময় লাগিল, কাজেও তাহার চেয়ে বড় বেশি লাগে নাই। মুনিরা ততক্ষণে সবে স্নান শেষ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে হঠাৎ তাঁহাদের পেট ভরিয়া গেল! সকলে আশ্চর্য হইয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। পেটে আর একটি হজমিগুলির স্থান নাই। এদিকে যুধিষ্ঠির হয়তো কত কষ্ট করিয়া আহারের আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট গিয়া কি করিয়া মুখ দেখাইবেন? ভাবিয়া-চিন্তিয়া দুর্বাসা বলিলেন, "এ যাত্রা আমরা বড়ই বেল্লিক হইয়া গেলাম। এখন যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইতে অতিশয় লজ্জাবোধ হইতেছে, চল এখান হইতেই পলায়ন করি।" কাজেই বিপদ কাটিয়া গেল।

এই সময়ে পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে বাস করিতেছিলেন। সেখানে আর-একটা ঘটনা হয়, তাহার কথা এখন বলিতেছি।

দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলাকে যে বিবাহ করিয়াছিল, তাঁহার নাম জয়দ্রথ। এই হতভাগা একদিন অনেক সৈন্য আর বন্ধু-বান্ধব লইয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমের নিকট দিয়া যাইতেছিল। পাণ্ডবেরা তখন শিকার করিতে গিয়াছেন, দ্রৌপদীর নিকট এক ধৌম্য ছাড়া আর কেহ নাই। দ্রৌপদীকে দেখিবামাত্র জয়দ্রথ 'কেমন আছ? সব ভালো তো?' বলিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিল।

একজন ভদ্রলোক বাড়িতে আসিলে তাহার আদর-যত্ন না করিলে নয়। কাজেই দ্রৌপদী জয়দ্রথকে বসিবার জায়গা আর পা ধুইবার জল দিয়া বলিলেন, "জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করুন, পাণ্ডবেরা শীঘ্রই আসিবেন।" কিন্তু জয়দ্রথ বসিবার জন্য আসে নাই। দুষ্ট ভাবিয়াছে, পাণ্ডবেরা আসিবার পূর্বেই দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করিবে।

সে প্রথমে দ্রৌপদীকে অনেক মিনতি করিল, তারপর লোভ দেখাইল, শেষে ভয় দেখাইতেও ছাড়িল না। দ্রৌপদী রাগে, ভয়ে, ঘৃণায়, তাহাকে গালি দিতে দিতে ধৌম্যকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু দুরাত্মা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া দ্রৌপদীকে টানিয়া লইয়া চলিল। দ্রৌপদী তাঁহার গায়ে হাত দিতে বার বার নিষেধ করিলেন। তাহা শুনিল না দেখিয়া ভয়ানক রাগের ভরে তাহাকে টানিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু সেই দস্যুর সহিত যুদ্ধ করা কি তাঁহার কাজ? পাপিষ্ঠ ধৌম্যের সম্মুখেই তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইয়া চলিল।

ধৌম্য পুরুত মানুষ, তিনি আর কি করিবেন? তিনি তাহাকে গালি দিতে দিতে রথের পিছু পিছু চলিলেন।

এদিকে পাণ্ডবদিগের আর শিকার ভালো লাগিতেছে না; আর তাঁহাদের মনেও যেন কেমন একটা ভয় আসিয়াছে—যেন তাঁহাদের কোনো বিপদ উপস্থিত। তাঁহারা

তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরিয়া দেখিলেন, দাসী ধাত্রেয়িকা কাঁদিতেছে। সে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগকে সকল কথাই জানাইল। পাঁচ ভাই তাহা শুনিয়া আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করিলেন না।

কোথায় সে দুরাত্মা? আজ তাহার মাথাটা জানি কয় টুকরা হয়! পাঁচ ভাই গর্জন করিতে করিতে রথ হাঁকাইয়া চলিয়াছেন। কোথায় সে দুরাত্মা? ঐ ধুলা উড়িতেছে! ঐ পথে দুষ্ট পলায়ন করিতেছে! ঐ শুন ধৌম্যের গলার শব্দ! মার্, মার্! কাট্, কাট্! হতভাগাদের একটারও বুঝি আর মাথা থাকিবে না। ইহার মধ্যে কত সৈন্য কাটা গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। একটা প্রকাণ্ড হাতি শুঁড় উঠাইয়া নকুলকে মারিতে আসিল, নকুল খড়্গ দিয়া তাহার দাঁতসুদ্ধ শুঁড় কাটিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু দুরাত্মা জয়দ্রথ কোথায়? ঐ দেখ, পাষণ্ড দ্রৌপদীকে ফেলিয়া পলাইতেছে! যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী, ধৌম্য আর নকুলকে রথে তুলিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সেই দুরাত্মা পলাইয়া গেল নাকি? কোথায় যাইবে? ভীম আর অর্জুন যাহার পিছু ছুটিয়াছেন, তাহার কি আর পলাইবার জো আছে? এখনই তাঁহারা পাপিষ্ঠের চুলের মুঠি ধরিবেন। আর তাহাকে কি আস্ত রাখিবেন?

যুধিষ্ঠিরও ভাবিতেছেন যে, ভীমার্জুনের হাতে পড়িলে আর হতভাগা আস্ত থাকিবে না। তাই তিনি বলিতেছেন, 'উহাকে মারিও না যেন, তাহা হইলে দুঃশলার আর জ্যাঠাইমার বড়ই কষ্ট হইবে।"

কিন্তু সে দুরাত্মা গেল কোথায়? দুষ্ট বনের ভিতরে লুকাইয়াছিল। সেইখানে গিয়া ভীম তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে কি আছড়ান আছড়াইলেন! আছাড় খাইয়া উঠিতে না উঠিতেই আবার তাহার মাথায় বিষম লাথি! তারপর বুকে হাঁটু দিয়া, উঃ! কি ভয়ানক সাজা! হতভাগা চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে শেষে অজ্ঞান হইয়া গেল।

অর্জুন দেখিলেন যে জয়দ্রথ মারা যায়, তাই তিনি ভীমকে তাড়াতাড়ি যুধিষ্ঠিরের কথা মনে করাইয়া দিলেন। তখন ভীম তাহাকে আর মারিলেন না বটে, কিন্তু অর্ধচন্দ্র বাণ দিয়া তাহার মাথার খানিক মুড়াইয়া আর পাঁচ জায়গায় পাঁচটি ঝুঁটি রাখিয়া তাহাকে এমনি উৎকট সঙ সাজাইলেন যে, দেখিলে বুঝিতে! তারপর দুই ধমক দিয়া বলিলেন, "খবরদার! ভুলিস না যেন—সকলের কাছে বলিবি, তুই আমাদের গোলাম।"

জয়দ্রথ কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাতেই রাজি!

এইভাবে তাহাকে আনিয়া যুধিষ্ঠিরের সামনে উপস্থিত করা হইল। তাহার চেহারা দেখিয়া কি আর কেহ হাসি থামাইয়া রাখিতে পারে? যুধিষ্ঠির অবধি হাসিয়া অস্থির! ভীম বলিলেন, "মহারাজ, এই হতভাগা আমাদের গোলাম হইয়াছে! এখন ইহাকে ছাড়িব কিনা, দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করুন।"

সাজাটা যে ভালোরকমই হইয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই! কাজেই উহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই মত হইল। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "যাও, এমন কাজ আর করিও না।"

সেখান হইতে বিদায় হইয়াই জয়দ্রথ শিবের তপস্যা আরম্ভ করিল। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া যখন শিব বর দিতে আসিলেন, তখন সে বলিল, 'আমি পাঁচ পাণ্ডবকে যুদ্ধে

পরাজিত করিব।"

শিব বলিলেন, "তুমি চারিজনকে পরাজয় করিবে, কিন্তু অর্জুনকে পারিবে না। অর্জুনকে পরাজয় করিবার শক্তি দেবতাদিগেরও নাই।" এই বলিয়া শিব চলিয়া গেলেন, জয়দ্রথও বাড়ি ফিরিল।

এই সময়ে আর-একটা ঘটনা ঘটে। কর্ণ কেমন বীর ছিলেন, তাহা শুনিয়াছ। কর্ণ কানে অতি আশ্চর্য কুণ্ডল আর শরীরে কবচ (বর্ম) লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই কুণ্ডল আর কবচ শরীরে থাকিতে তাঁহাকে মারিবার ক্ষমতা কাহারো ছিল না। অর্জুনকে ইন্দ্র বিশেষ স্নেহ করিতেন, আর কর্ণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহার বড়ই বিপদের আশংকা দেখিয়া দুঃখিত থাকিতেন। তাই তিনি ভাবিলেন, 'এই কুণ্ডল আর কবচ লইয়া আসিব।'

কর্ণ গঙ্গায় স্নান করিয়া সূর্যের স্তব করিতেন। সে সময়ে কেহ তাঁহার নিকট কিছু চাহিলে, তিনি তাহাকে ফিরাইতেন না, এই তাঁহার নিয়ম ছিল। একদিন ঠিক এইরূপ সময়ে, ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র যে কর্ণকে ফাঁকি দিয়া কুণ্ডল আর কবচ আনিতে যাইবেন, এ কথা সূর্যদেব আগেই জানিতে পারিয়া কর্ণকে সাবধান করিয়া দেন, আর উহা দিতে নিষেধ করেন। কিন্তু কর্ণ কখনো নিয়ম ভঙ্গ করিতেন না, কাজেই তিনি বলিলেন, "আমার যখন নিয়ম আছে, তখন না দিয়া পারিব না।"

এ কথায় সূর্য বলিলেন, "তাহাই যদি হয়, তবে কুণ্ডল আর কবচের বদলে ইন্দ্রের নিকট হইতে এক-পুরুষ-ঘাতিনী নামক শক্তি চাহিয়া লইবে।"

কর্ণ প্রথমে ইন্দ্রকে সামান্য ব্রাহ্মণ মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আপনার কি চাই?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমার ঐ কুণ্ডল আর কবচ আমাকে দাও।"

কর্ণ কুণ্ডল আর কবচের বদলে কত কিছু দিতে চাহিলেন—ধনরত্ন, গোরু, বাছুর, এমন-কি রাজ্যের কথা পর্যন্ত বাকি রাখিলেন না। ব্রাহ্মণ কি তাহা শোনেন? তিনি কেবলই বলেন, "আমার ঐ কুণ্ডল আর কবচটি চাই।"

তখন কর্ণ বুঝিতে পারিলেন, এ ব্রাহ্মণ যে-সে ব্রাহ্মণ নহে ; স্বয়ং ইন্দ্র। কাজেই তিনি বলিলেন, "আমি যদি কুণ্ডল আর কবচ দেই, তাহা হইলে আমাকে 'এক-পুরুষ-ঘাতিনী' শক্তি দিতে হইবে।"

ইন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক! এই আমার 'এক-পুরুষ-ঘাতিনী' শক্তি তোমাকে দিতেছি, কিন্তু ইহার একটা নিয়ম আছে। যেখানে আর কোনো অস্ত্রেই কাজ হইবার নহে, কেবল সেই স্থলেই এ অস্ত্র ছুঁড়িলে নিশ্চয় মৃত্যু। যেখানে-সেখানে ছুঁড়িয়া বসিলে ইহা তোমারই গায়ে পড়িবে। এ অস্ত্রে একজনের বেশি লোক মরে না। সেই একজন শত্রু যত বড় যোদ্ধাই হউক, তাহাকে মারিয়া আমার শক্তি আমার নিকটে চলিয়া আসিবে।"

কর্ণ তাহাতেই রাজি হইয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে শক্তি লইলেন এবং নিজের কুণ্ডল

আর কবচ তাহাকে খুলিয়া দিলেন।

ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডল আর কবচ লইয়া গিয়াছেন, এ কথা শুনিয়া দুর্যোধনের দলের যেমন দুঃখ হইল, পাণ্ডবেরা তেমনই আনন্দ পাইলেন।

এই সময়ে পাণ্ডবেরা কাম্যক বন হইতে দ্বৈত বনে চলিয়া আসেন। ইহার কিছুদিন পরে একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা হইয়াছিল।

কাঠে কাঠে ঘষিলে আগুন বাহির হয়। এই উপায়ে পূর্বকালের মুনিঋষিরা অনেক সময় আগুন জ্বালিতেন। যাঁহাদের গৃহে প্রত্যহ অগ্নির পূজা হইত, তাঁহাদের যখন-তখন আগুন জ্বালিবার একটা ব্যবস্থা না রাখিলেই চলিত না। তাঁহাদের সকলেরই 'অরণী' নামক দুখানি কাঠ থাকিত। এই কাঠ দুখানি ঘষিয়া তাঁহারা আগুন জ্বালিতেন।

ইহার মধ্যে হইয়াছিল কি—দ্বৈত বনের এক তপস্বী ব্রাহ্মণ একটা গাছে তাঁহার অরণীটি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। একটা হরিণ আসিয়া সেই গাছে গা ঘষিতে আরম্ভ করে, ঘষিতে ঘষিতে ব্রাহ্মণের অরণীখানি কেমন করিয়া তাহার শিঙে আটকাইয়া যায়, তাহাতে হরিণও ভয় পাইয়া সেই অরণীসুদ্ধ বেগে পলায়ন করে।

তখন ব্রাহ্মণটি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পাণ্ডবদিগকে তাঁহার অরণী আনিয়া দিতে বলায়, পাঁচ ভাই মিলিয়া সেই হরিণের পিছু পিছু তাড়া করিলেন। কিন্তু তাহাকে তাঁহারা ধরিতে বা মারিতে তো পারিলেনই না, লাভের মধ্যে এই হইল যে, পিপাসা আর পরিশ্রমে তাহাদের প্রাণ যায়-যায়। তখন তাঁহারা বিশ্রামের জন্য একটা গাছের তলায় বসিয়া নকুলকে জল আনিতে পাঠাইলেন।

নিকটেই একটি জলাশয় ছিল। নকুল তাহাতে নামিয়া জল খাইতে যাইতেছেন, এমন সময় এক যক্ষ আকাশ হইতে তাহাকে বলিল, "বাছা নকুল! ও জল আগে আমি দখল করিয়াছি। আমার কথার উত্তর দিয়া, তবে জল খাও।"

নকুল যক্ষের কথা গ্রাহ্য না করিয়া জল তুলিয়া মুখে দিলেন। সে জল পান করিবামাত্র তাহার মৃত্যু হইল।

এদিকে যুধিষ্ঠির নকুলের বিলম্ব দেখিয়া, সহদেবকে বলিলেন, "নকুলের কেন এত বিলম্ব হইতেছে? তুমি শীঘ্র তাহার অনুসন্ধান কর।"

সহদেব নকুলকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই জলাশয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মৃতদেহ দেখিবামাত্র কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। তারপর ভয়ানক পিপাসা হওয়াতে, তিনিও জলাশয়ে নামিয়া জল খাইতে গেলেন। তখন সেই যক্ষ তাঁহাকেও বাধা দিয়া বলিল, "আগে আমার কথার উত্তর দাও, তারপর জল খাইতে পাইবে।"

যক্ষের সে কথা অমান্য করিয়া সহদেব যেই জল খাইলেন, অমনি তাঁহারও মৃত্যু হইল।

এইরূপে ক্রমে সহদেবকে খুঁজিতে আসিয়া অর্জুন, এবং অর্জুনকে খুঁজিতে আসিয়া ভীম সেই যক্ষের নিষেধ অমান্য করিয়া জলাশয়ের জল খাওয়ায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

সর্বশেষে যুধিষ্ঠিরও তাঁহাদের অন্বেষণে সেই জলাশয়ের ধারে আসিয়া তাঁহাদের মৃত শরীর দর্শনে অনেক দুঃখ করার পর, জল পান করিতে উদ্যত হওয়াতে, একটা

বক তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, "বাছা যুধিষ্ঠির! আমিই তোমার ভাইদিগকে মারিয়াছি। আমার কথার উত্তর দিয়া তবে জল খাও।"

বকের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এ-সকল মহাবীরকে বধ করা পাখির কর্ম নহে! আপনি কে?"

তখন সেই বক তালগাছ প্রায় বিশাল যক্ষরূপ ধরিয়া বলিল, "আমি যক্ষ। তোমার ভ্রাতারা আমার কথা অবহেলা করিয়া জল পান করাতে, তাহাদিগকে বধ করিয়াছি। তুমি আগে আমার কথার উত্তর দিয়া, তারপর জল খাও।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আপনার প্রশ্ন কি বলুন, যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।"

এ কথায় যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে অনেক প্রশ্ন করিল, যুধিষ্ঠির তাহার সকলগুলির উত্তর দিলেন। সকল প্রশ্নের কথা লিখিবার স্থান এ পুস্তকে নাই; দু-একটি কথা মাত্র বলিতেছি।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "পৃথিবীর চেয়ে ভারি কে? স্বর্গের চেয়ে উঁচু কে? বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী কে? তৃণের চেয়েও কাহার সংখ্যা বেশি?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মাতা পৃথিবীর চেয়ে ভারি, পিতা আকাশের চেয়ে উঁচু, মন বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী, আর চিন্তার সংখ্যা তৃণের চেয়েও বেশি।"

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "কে ঘুমাইলে চোখ বোজে না? কে জন্মিয়া নড়েচড়ে না? কাহার হৃদয় নাই? কে নিজের বেগেতেই বড় হয়?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মাছ ঘুমাইলে চোখ বোজে না, ডিম জন্মিয়া নড়েচড়ে না, পাথরের হৃদয় নাই, নদী নিজের বেগের দ্বারা বড় হয়।"

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, সুখী কে? আশ্চর্য কি? পথ কি? সংবাদ কি?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "যাহার ঋণ নাই, আর নিজের ঘরে থাকিয়া দিনের শেষে যে চারিটি শাক-ভাত খাইতে পায়, সেই সুখী। প্রতিদিন জীবের মৃত্যু হইতেছে, তথাপি যে লোকে চিরদিন বাঁচিতে চায়, ইহাই আশ্চর্য। মহাপুরুষেরা যে পথে যান, তাহাই পথ। সময় যেন পাচক, সে যেন প্রাণীদিগকে দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিতেছে, ইহাই সংবাদ।"

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ বলিল, "তোমার ইচ্ছামত একটি ভাইকে বাঁচাইতে পার।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তবে দয়া করিয়া নকুলকে বাঁচাইয়া দিন।"

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "ভীম আর অর্জুনকে ছাড়িয়া তুমি নকুলকে বাঁচাইতে বলিলে, ইহার কারণ কি?

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মাতা কুন্তীর এক পুত্র আমি জীবিত রহিয়াছি, এখন নকুল বাঁচিলে মাতা মাদ্রীরও একটি পুত্র থাকে; এইজন্য আমি নকুলকে বাঁচাইতে বলিয়াছি।"

এ কথায় যক্ষ অতিশয় তুষ্ট হইয়া ভীম, অর্জুন, নকুল সহদেব চারিজনকেই বাঁচাইয়া দিল। তারপর সে নিজের পরিচয় দিয়া বলিল, "বাছা! আমি ধর্ম। তোমার মহত্ত্ব দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি বর লও।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তবে সেই ব্রাহ্মণ যাহাতে তাঁহার অরণীখানি পান, তাহা করুন।"

ধর্ম বলিলেন, "তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমিই হরিণ সাজিয়া অরণী হরণ করিয়াছিলাম; ব্রাহ্মণ তাহা পাইবেন। এক্ষণে তুমি অন্য বর চাহ।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমাদের বনবাসের বারো বৎসর শেষ হইয়াছে, ইহার পরে আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। সে সময়ে যেন কেহ আমাদিগকে চিনিতে না পারে, দয়া করিয়া এই বর দিন।"

ধর্ম বলিলেন, "বাছা! তোমরা ছদ্মবেশ না করিয়াও যদি পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াও, তথাপি তোমাদিগকে কেহ চিনিতে পারিবে না। এখন আর একটি বর চাহ।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার যেন পাপে মতি না হয়, সর্বদা যেন ধর্মপথে চলিতে পারি।"

ধর্ম বলিলেন, "এ-সকল তো তোমার আছেই, এখন তাহা আরো বেশি করিয়া হইবে।" এই বলিয়া তিনি আকাশে মিলাইয়া গেলেন। তাহার পূর্বে অবশ্য ব্রাহ্মণের অরণীখানি ফিরিয়া দিতে ভুলিলেন না।

এইরূপে পাণ্ডবদিগের বনবাসের বারো বৎসর কাটিয়া গেল. আর একটি বৎসর ভালোয়-ভালোয় কাটিলেই তাঁহাদের দুঃখের শেষ হয়। কিন্তু এই শেষের বৎসরটি অতি ভয়ানক বৎসর। এই সময়টুকু এমনভাবে কাটাইতে হইবে, যেন কেহই তাঁহাদের খবর জানিতে না পারে ; জানিতে পারিলে আবার বারো বৎসর বনবাস। এ সময়ে দুর্যোধনের লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। এই-সকল ধূর্তকে ফাঁকি দিয়া, একটা বৎসর কিরূপে কাটানো যায়, সকলে মিলিয়া সাবধানে তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

# বিরাটপর্ব

জ্ঞাতবাসের সময় উপস্থিত। এই একটি বৎসর বড়ই বিপদের সময়। কোন্ দেশে কি ভাবে থাকিলে এ বিপদে রক্ষা পাওয়া যায়?

পাঞ্চাল, চেদী, মৎস্য, সুরাষ্ট্র, অবন্তী প্রভৃতি অনেক ভালো ভালো দেশ আছে। ইহাদের মধ্যে মৎস্য দেশের রাজা বিরাট অতি ধার্মিক লোক। ধার্মিকেরা ধার্মিকের আশ্রয় ছাড়িয়া আর কোথায় থাকিবে? সুতরাং পাণ্ডবেরা বিরাটের নিকটেই কোনোরূপ কাজ লইয়া থাকা স্থির করিলেন।

যুধিষ্ঠির সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে কি কাজ করিতে পারিবে, বল তো?" এ কথার উত্তরে অর্জুন বলিলেন, "আপনি কি কাজ করিবেন?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ সাজিয়া বিরাটের সভাসদ (অর্থাৎ সভার লোক) হইব। বলিব, 'আমার নাম কঙ্ক, খুব পাশা খেলিতে পারি।' আরো জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, 'আমি যুধিষ্ঠিরের বন্ধু ছিলাম।' এখন ভীম বল তো তুমি কি বলিবে?" ভীম বলিলেন, 'আমি রাঁধুনি ব্রাহ্মণ সাজিয়া যাইব। পরিচয় চাহিলে বলিব, 'আমার নাম বল্লভ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পাচক ছিলাম, একটু-আধটু পালোয়ানীও জানি।' সে দেশের রাঁধুনিদের চেয়ে ঢের ভালো ব্যঞ্জন রাঁধিয়া, আর এই-বড় কাঠের বোঝা বহিয়া আনিয়া হুকুম পাইলে দু-একটা পালোয়ান বা খ্যাপা হাতিকেও ঠ্যাঙ্গাইয়া আমি রাজাকে খুশি রাখিব।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, আচ্ছা, অর্জুন কি করিবে?" অর্জুন বলিলেন "আমি রাজবাড়ির মেয়েদের সঙ্গীতের শিক্ষক হইয়া থাকিব। এ-সব লোক স্ত্রীলোকের পোশাক পরে, আমিও তাহাই পরিব। ধনুকের গুনের ঘষায় হাতে যে দাগ হইয়াছে, বালা পরিয়া তাহা ঢাকিব। স্ত্রীলোকের মতন কাপড় পরিব, মাথায় বেণী রাখিব, কানে কুণ্ডল দুলাইব, কথাবার্তাও স্ত্রীলোকের মতন করিয়া কহিব। তাহা হইলেই কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না। পরিচয় চাহিলে বলিব, "আমার নাম বৃহন্নলা, আমি দ্রৌপদীর নিকট ছিলাম।"

তারপর যুধিষ্ঠির নকুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নকুল, তুমি কি করিবে?"

নকুল বলিলেন, "আমি বলিব, আমার নাম গ্রন্থিক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঘোড়াশালের কর্তা ছিলাম। ঘোড়ার কথা আমার মতন কেহই জানে না।"

তারপর যুধিষ্ঠির সহদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সহদেব কি করিবে?"

সহদেব বলিলেন, "আমি গোরু দেখা-শোনার কাজ লইব। বলিব, 'আমার নাম তন্ত্রিপাল, আমি গোরু সম্বন্ধে সকলরকম কাজ বিশেষরূপে জানি।"

সকলের শেষে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্রৌপদী তো কখনো কোনো ক্লেশের কাজ করেন নাই, তিনি এই এক বৎসর কি করিয়া কাটাইবেন?"

দ্রৌপদী বলিলেন, "আমি বিরাট রাজার রানী সুদেষ্ণার নিকট কাজ লইব। জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, 'আমি সৈরিন্ধ্রী (অর্থাৎ যে চুল বাঁধা, মালা গাঁথা ইত্যাদি কাজ করে,) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বাড়িতে দ্রৌপদীর নিকট ছিলাম।"

এইরূপে সকল পরামর্শ স্থির করিয়া পাণ্ডবেরা সঙ্গের লোকদিগকে বিদায় দিলেন। চাকরদিগকে বলিলেন, "তোমরা দ্বারকায় চলিয়া যাও।" ধৌম্যকে বলিলেন, "সারথি, পাচকগণ, আর দ্রৌপদীর দাসীকে লইয়া আপনি রাজা দ্রুপদের বাড়িতে গিয়া থাকুন।"

তারপর তাঁহারা উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও মুনিদিগের আশীর্বাদ লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

অবশ্য আমরা জানি, তাঁহারা মৎস্যদেশে গিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও বর্ম প্রভৃতি ছিল।

পাহাড়ের আড়াল দিয়া, বনের ভিতর দিয়া, বহু-কষ্টে, অতি সাবধানে পথ চলিয়া পাণ্ডবেরা ক্রমে দশার্ণ, পাঞ্চাল, শূরসেন প্রভৃতি দেশ অতিক্রম পূর্বক শেষে বিরাট নগরের কাছে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের মনে এই চিন্তা হইল যে, 'এই সকল অস্ত্র লইয়া নগরের ভিতরে গেলে, লোকে আমাদিগকে চিনিয়া ফেলিবে। সুতরাং এইগুলিকে একটা ভালো জায়গায় লুকাইয়া রাখা আবশ্যক।'

সেইখানে একটা শ্মশানের পাশে পাহাড়ের উপরে প্রকাণ্ড এক শমী গাছ ছিল। অর্জুন বলিলেন, "এই গাছে অস্ত্র-শস্ত্র রাখিলে কেহই জানিতে পারিবে না।"

সেই শমী গাছে উঠিয়া নকুল তাঁহাদের ধনুক, তূণ, শঙ্খ, বর্ম, খড়্গ প্রভৃতি বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। তারপর শ্মশান হইতে একটা মড়া আনিয়া তাহাও ঐ গাছে বাঁধিলেন। মড়া বাঁধিবার কারণ এই যে, তাহা হইলে গন্ধে, আর ভূতের ভয়ে, কেহ আর সে গাছের নিকটে আসিবে না।

তারপর তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যেকের আর-একটি করিয়া নাম রাখিলেন। যুধিষ্ঠির, 'জয়' ; ভীম, 'জয়ন্ত' ; অর্জুন, 'বিজয়' ; নকুল, 'জয়ৎসেন' ; সহদেব 'জয়দ্বল' ; এগুলি হইল তাঁহাদের গোপনীয় নাম, অর্থাৎ এসকল নামের কথা আর কেহ জানিতে পারিল না। কাজেই ইহার কোনো-একটা নাম লইলে কেহ বুঝিয়া ফেলিবারও ভয় রহিল না।

মহারাজ বিরাট পাত্রমিত্র সমেত বসিয়া আছেন, এমন সময় যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের বেশে, পাশা হাতে ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া বিরাট সভার লোকদিগকে বলিলেন, "উনি কে আসিতেছেন? গরিবের মতো পোশাক বটে, কিন্তু চেহারা দেখিলে মনে হয় যেন কোনো রাজা হইবেন।"

যুধিষ্ঠির আস্তে আস্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজের জয় হউক।

দুঃখে পড়িয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। দয়া করিয়া আশ্রয় দিলে বড় উপকার হয়।"

বিরাট বলিলেন, "তুমি কে বাপু? কোথা হইতে আসিতেছ? কি কাজ করিতে পার?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ ; আমার নাম কঙ্ক। রাজা যুধিষ্ঠিরের বন্ধু ছিলাম। আমি পাশা খেলায় বিশেষ দক্ষ।"

বিরাট যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়াই ভালোবাসিয়াছিলেন, তাহাতে আবার তাঁহার নিজের পাশা খেলার খুব সখ। কাজেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে আদর করিয়া কাছে রাখিলেন। সকলকে বলিয়া দিলেন, "ইনি আমার বন্ধু, তোমরা আমাকে যেমন মান্য কর, ইঁহাকে তেমনি মান্য করিবে।"

তারপর রসুয়ে বামুনের সাজে ভীম আসিয়া উপস্থিত। হাতা-বেড়ি হাতে সিংহের মতন চেহারা। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই বিরাট ভারি আশ্চর্য হইয়া গেলেন। রাজার হুকুমে কয়েকজন লোক ছুটিয়া ভীমের পরিচয় লইতে গেল ; ভীম তাহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া, একেবারে রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার নাম বল্লভ, আমি পাচক, অতি উত্তম ব্যঞ্জন রাঁধিতে পারি, আমাকে রাখিতে আজ্ঞা হউক।"

বিরাট কহিলেন, "তোমার চেহারা দেখিয়া তো তোমাকে রাঁধুনি বলিয়া মনে হয় না!"

ভীম বলিলেন, "মহারাজ! আমি রাঁধুনিই বটে ; আপনার চাকর। পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রধান পাচক ছিলাম। অল্প-অল্প পালোয়ানীও জানি। মহারাজ আমার কাজ দেখিলে সন্তুষ্ট হইবেন।"

এইরূপে ভীম বিরাট রাজার রসুই মহলের কর্তা হইয়া, পরম সুখে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে দ্রৌপদী একখানি ময়লা কাপড় পরিয়া সৈরিন্ধ্রীর বেশে রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন। পথের লোক এমন সুন্দর মানুষ আর কখনো দেখে নাই। তাহারা আশ্চর্য হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে; তিনি বলেন, "আমি সৈরিন্ধ্রী ; কাজ খুঁজিতেছি।" কিন্তু তাঁহার এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না।

রানী সুদেষ্ণাও ছাদ হইতে দ্রৌপদীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ডাকাইয়া, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রৌপদী বলিলেন, "আমার স্বামী পাঁচজন গন্ধর্ব। কোনো কারণে তাঁহারা এখন বড়ই দুঃখে পড়িয়াছেন, আর আমি সৈরিন্ধ্রীর কাজ করিয়া দিন কাটাইতেছি। আগে আমি সত্যভামা আর দ্রৌপদীর নিকট কাজ করিয়াছিলাম। এখন আপনার নিকট আসিয়াছি; দয়া করিয়া আশ্রয় দিলে এখানে থাকিব।"

সুদেষ্ণা আহ্লাদের সহিত দ্রৌপদীকে সৈরিন্ধ্রীর কাজে নিযুক্ত করিলেন। দ্রৌপদী বলিলেন, "মা, আমি কখনো উচ্ছিষ্ট ছুঁই না, বা কোনো নীচ কাজ করি না। আমার গন্ধর্ব স্বামীরা যদিও দুঃখে পড়িয়াছেন, তবুও তাঁহারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করেন। কেহ আমার অপমান করিলে, তাঁহারা তাহাকে মারিয়া ফেলেন।"

এইরূপে ক্রমে অর্জুন, সহদেব আর নকুল এক-একজন করিয়া বিরাট রাজার নিকট কাজ লইলেন। অর্জুন হইলেন রাজকুমারী উত্তরার গানের শিক্ষক। সহদেব আর নকুল হইলেন গোশাল আর ঘোড়াশালের কর্তা। অর্জুন এখন স্ত্রীলোকের মতন পোশাক পরেন, আর বাড়ির ভিতরেই থাকেন। ভীমও তাহার কাজ সারিয়া রান্নার মহলের বাহিরে আসিবার অবসর পান না। কাজেই তাঁহাদের কথা কেহ জানিতেই পারিল না।

এইরূপে দিন যায়। পাণ্ডবদের কাজ দেখিয়া বিরাট তাঁহাদের সকলের উপরেই বিশেষ সন্তুষ্ট। ভীম ইহার মধ্যেই জীমূত নামক একটা পালোয়ানকে হারাইয়া রাজার নিকট অনেক পুরস্কার পাইয়াছেন! সুতরাং মোটের উপরে তাঁহারা সুখেই আছেন বলিতে হইবে।

কিন্তু হায়! দ্রৌপদীর সময় নিতান্তই কষ্টে কাটিতে লাগিল। সুদেষ্ণা তাঁহাকে খুবই স্নেহ করিতেন, কিন্তু সুদেষ্ণার ভাই কীচক তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই অপমান করিত। দ্রৌপদী তাহা সহিতে না পারিয়া তাঁহাকে কত গালি দিতেন, কত মিনতি করিতেন, কত ভয় দেখাইতেন। দুরাত্মা তথাপি আরো বেশি করিয়া তাঁহাকে অপমান করিত।

একদিন সুদেষ্ণা কিছু খাবার আনিবার জন্য দ্রৌপদীকে কীচকের বাড়িতে পাঠান। সেদিন তাঁহার প্রতি সে এত অভদ্রতা করে যে, তিনি রাগ থামাইতে না পারিয়া তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেন। তারপর ভয়ে তিনি ছুটিয়া একেবারে রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হন।

পাপিষ্ঠ সেইখানে তাঁহার পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া, তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া, তাঁহার গায়ে লাথি মারিল। সেখানে যুধিষ্ঠির আর ভীম উপস্থিত ছিলেন ; তাঁহাদের মনে ইহাতে কি ভয়ানক ক্লেশ হইল বুঝিতে পার। ভীম রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমাগত একটা গাছের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির দেখিলেন, সর্বনাশ উপস্থিত! ভীম হয়তো তখন ঐ গাছ লইয়া সভায় সকলকে গুঁড়া করিবেন। তাই তিনি ভীমকে শান্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "কি পাচক ঠাকুর, কাঠের জন্য গাছের দিকে তাকাইতেছ? কাঠের গাছ বাহিরে গিয়া খোঁজ।"

সভার লোকেরা কীচকের অনেক নিন্দা করিতে লাগিল, কিন্তু রাজা তাহাকে কিছুই বলিলেন না। কীচককে তিনি বড়ই ভয় করিতেন। সে তাঁহার সেনাপতি ছিল ; তার জোরেই তিনি রাজ্য করিতেন। বাস্তবিক বিরাট কেবল নামেই সে দেশের রাজা ছিলেন, দেশ শাসন করিত কীচক।

দ্রৌপদীর কষ্ট দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'সৈরিন্ধ্রী! ঘরে যাও, তোমার গন্ধর্ব স্বামীরা সময় বুঝিয়া হয়তো ইহার বিচার করিবেন।"

এ কথায় দ্রৌপদী চোখের জল মুছিয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন। সেখানে সুদেষ্ণা তাঁহার নিকট সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি যদি বল, তবে দুষ্টকে এখনই কাটিয়া ফেলি।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "আমার যাঁহারা আছেন, তাঁহারাই তাহাকে বধ করিবেন।"

রাত্রিতে দ্রৌপদী চুপিচুপি ভীমের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীম আগে

হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছেন! এতক্ষণ যে কীচককে মারেন নাই, সে কেবল লোকে জানিতে পারার ভয়ে। নির্জন স্থানে তাহাকে পাইলে আর তিনি এক মুহূর্তও দেরি করিতেন না।

রাজবাড়ির মেয়েদের সঙ্গীতের ঘরটি ঠিক এইরূপ নিরিবিলি স্থান ছিল। সে স্থানে দিনের বেলায় মেয়েরা নাচ-গান করিত, রাত্রিতে কেহ সেখানে থাকিত না। কোনো কারণে সেদিন ভোর রাত্রে কীচকের একেলা সেই ঘরে যাওয়ার দরকার ছিল। ভীম তাহা জানিতে পারিয়া তাহার আগেই চুপিচুপি সেখানে গিয়া, চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলেন।

অনেক রাত্রে কীচক সেখানে আসিয়াছে। অন্ধকারে ভীমকে দেখিয়া সে মনে করিল, বুঝি দ্রৌপদী সেখানে শুইয়া আছেন। তাই দুষ্ট তাহার সঙ্গে তামাশা আরম্ভ করিল। সে বলিল, "বাড়ির লোক বলে, আমার মতন সুন্দর মানুষ আর নাই।"

তাহাতে ভীম বলিলেন, "আর আমার এই হাতখানির মতো মোলায়েম হাতও আর কো-থা-ও নাই।"

এই বলিয়াই তিনি সেই দুষ্টের চুলের মুঠি ধরিলেন। তারপর কি হইল বুঝিয়া লও।

কীচকও যেমন-তেমন বীর ছিল না, সে খানিকক্ষণ খুবই যুদ্ধ করিল। কিন্তু ভীমের কাছে তাহার বড়াই আর কতক্ষণ খাটিবে? সেই 'মোলায়েম' হাতের চড় ভালো মতে খাইয়া আর তাহার বেশি কথা কহিতে হইল না। তখন ভীম সেই দুষ্টকে ধরিয়া তাহার এমনি সাজা করিলেন যে, তাহার হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া, হাত-পা আর মাথা পেটের ভিতরে ঢুকিয়া, একতাল মাংস মাত্র অবশিষ্ট রহিল। আজও কেহ কাহাকেও নিতান্ত ভয়ানক সাজা দিলে, 'লোকে বলে, 'কীচক বধ করিয়াছে।'

তারপর দ্রৌপদীকে ডাকিয়া কীচকের দশা দেখাইয়া ভীম চুপিচুপি নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। লোকে দ্রৌপদীর নিকট শুনিল যে, তাঁহার গন্ধর্ব স্বামীগণের হাতেই কীচকের সাজা হইয়াছে।

এই ঘটনার সংবাদে কীচকের ভাইয়েরা সেখানে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে শ্মশানে লইয়া চলিল। তাহারা তাহাকে লইয়া ঘরের বাহিরে আসিবার সময় দ্রৌপদী সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র দুষ্টেরা বলিল "এই হতভাগীর জন্যই তো আমাদের দাদার প্রাণ গেল। চল, তাঁহার সঙ্গে ইহাকেও নিয়া পোড়াই।" এই বলিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি বিরাটের নিকট গিয়া বলিল, "যাহার জন্য কীচক মরিয়াছেন, সেই হতভাগী সৈরিন্ধ্রীকেও আমরা তাঁহার সঙ্গে পোড়াইতে চাহি।"

বিরাট এই-সকল দুষ্ট লোককে বড়ই ভয় করিতেন, সুতরাং তিনি উহাদের কথায় রাজি হইলেন।

হায় হায়! যাঁহার পায়ের ধুলা পাইলে লোকে আপনাকে ধন্য মনে করিত, দেবতারা পর্যন্ত যাঁহাকে সম্মান করিয়া চলিতেন, সেই দ্রৌপদী দেবীর কপালে কিনা এতই দুঃখ আর অপমান ছিল! দুরাত্মারা তাঁহাকে কীচকের সঙ্গে শ্মশানে লইয়া চলিল, একটি লোকও তাহাদিগকে বারণ করিল না। দ্রৌপদী কেবল এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন,

"হে জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়দ্বল তোমরা কোথায়? আমাকে রক্ষা কর!"

ভীম তাঁহার ভয়ানক কার্য শেষ করিয়া সবে গিয়া একটু নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় দ্রৌপদীর সেই কান্না তাঁহার কানে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি পোশাক বদলাইয়া একটা গোপনীয় পথে শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দশ ব্যাম (পঁয়ত্রিশ হাত ; সাড়ে তিন হাতে এক ব্যাম) লম্বা প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল ; সেই গাছ তুলিয়া লইয়া তিনি যখন ঘোরতর গর্জনে সেই দুরাত্মাদিগকে তাড়া করিলেন, তখন তাঁহাকে নিতান্তই ভয়ঙ্কর দেখা গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্রই "বাবা গো, ঐ গন্ধর্ব আসিতেছে!" বলিয়া দ্রৌপদীকে ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল। কিন্তু পলাইয়া আর কতদূর যাইবে? ভীম সেই গাছ দিয়া দেখিতে দেখিতে তাহাদের মাথা গুঁড়া করিয়া দিলেন। উহারা একশত পাঁচজন ছিল ; তাহারা একটিও প্রাণ লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিল না।

তারপর দ্রৌপদীকে শান্ত করিয়া ভীম পুনরায় ঘরে চলিয়া আসিলেন।

এদিকে দেশের সকল লোক গন্ধর্বের ভয়ে নিতান্তই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজে রাজা আসিয়া রানীকে বলিলেন, "এই মেয়েটি আমাদের এখানে থাকিলে তো বড়ই ভয়ের কথা দেখিতেছি। ইহাকে বল, সে অন্যত্র চলিয়া যাউক।"

দ্রৌপদী ঘরে ফিরিবামাত্রই সুদেষ্ণা তাঁহাকে এ কথা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া দ্রৌপদী বলিলেন, "মা, আর তেরোটি দিন দয়া করিয়া অপেক্ষা করুন, তারপর আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব। এই সময়ের মধ্যেই আমার স্বামীগণের দুঃখ দূর হইবে।"

দুঃখ দূর হওয়ার অর্থ বোধহয় বুঝিয়াছ। অর্থাৎ আর তেরো দিন গেলেই অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর শেষ হইবে।

অজ্ঞাতবাসের সময় ফুরাইয়া আসিল। এতদিন দুর্যোধনের দলের লোকেরা কি করিতেছিলেন? তাঁহারা দেশ-বিদেশে লোক পাঠাইয়া প্রাণপণে পাণ্ডবদিগকে খুঁজিয়াছেন, কিন্তু কোনোমতেই তাঁহাদের সন্ধান করিতে পারেন নাই। দূতেরা ফিরিয়া আসিয়া খালি এক কথাই বলে, "মহারাজ, কত খুঁজিলাম, কোথাও পাণ্ডবদিগকে দেখিতে পাইলাম না।"

দূতগণের কথা শুনিয়া কৌরবেরা যারপরনাই চিন্তিত হইলেন। যাহা হউক, দূতেরা এই একটা ভালো সংবাদ আনিল যে, বিরাটের সেনাপতি কীচক মারা গিয়াছে। এই কীচকের জন্য সকল রাজাই বিরাটকে ভয় করিয়া চলিতেন। দুর্যোধনের সভায় তখন ত্রিগর্ত দেশের রাজা সুশর্মা উপস্থিত ছিলেন। বিরাট কীচকের সাহায্যে এই সুশর্মাকে বার বার পরাজয় করাতে, ইঁহার মনে বিরাটের উপরে চিরকালই ভারি রাগ ছিল। এখন কীচক মারা যাওয়াতে সুশর্মা ভাবিলেন যে, সেই-সকল পরাজয়ের শোধ লওয়ার উত্তম সুযোগ উপস্থিত। তাই তিনি এই বেলা বিরাটের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার ধনরত্ন ও গোরু বাছুর কাড়িয়া লইবার জন্য কৌরবদিগকে খ্যাপাইয়া তুলিলেন।

কৌরবদিগের মধ্যে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতির মতো লোক থাকিতে কি আর অন্যায় কাজের জন্য তাঁহাদিগকে খ্যাপাইয়া তুলিতে বেশি সময় লাগে? সুশর্মা কথাটা

পাড়িতে না পাড়িতেই স্থির হইল যে, তিনি তখনই বিরাটের গোয়ালাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার গোরু চুরি করিতে যাইবেন, কৌরবেরা তাহার পরের দিনই দলবল সমেত গিয়া সেই সৎকার্যের সহায়তা করিবেন। এমন সুযোগ পাইয়া সুশর্মা আর একটুও সময় নষ্ট করিলেন না।

বিরাট সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় এক গোয়ালা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখানে আসিয়া সংবাদ দিল "মহারাজ! ত্রিগর্ত দেশের লোকেরা আমাদিগকে পরাজয় করিয়া হাজার হাজার গোরু লইয়া গিয়াছে।"

যেই এ সংবাদ দেওয়া, অমনি রাজ্যময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। চারিদিকে কেবলই 'সাজ, সাজ!' 'ধর, ধর!' 'মার, মার'! শব্দ। সিপাহী, সৈন্য, রথ, হাতি, ঘোড়া সব সাজিয়া প্রস্তুত হইল ; নিশান উড়িতে লাগিল। মেঘের গর্জনের ন্যায় রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। তাহার সহিত অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ মিশিয়া গেল।

যোদ্ধারা বর্ম আঁটিয়া অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত। নিজে বিরাট সাজিয়াছেন ; তাঁহার ভাই শতানিক সাজিয়াছেন ; জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্খও সাজিয়াছেন ; আর আর যোদ্ধার তো কথাই নাই। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল আর সহদেবকেও রাজা যুদ্ধের পোশাক পরাইয়া উত্তম-উত্তম অস্ত্র দিয়া চমৎকার রথে চড়াইয়া সঙ্গে লইয়াছেন।

বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় দুই দলের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অন্ধকারের সহিত সেই যুদ্ধ আরো ঘনাইয়া আসিল।

দুঃখের বিষয়, আয়োজনের ঘটা যেমন হইয়াছিল, আসল যুদ্ধটা তেমন করিয়া হইতে পারে নাই। প্রথমে কয়েক ঘণ্টা খুবই যুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরেই দেখা গেল যে, সুশর্মা বিরাটের সারথিকে মারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। তখন বিরাটের সৈন্যগণ রণস্থল ছাড়িয়া যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিল।

এদিকে যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিতেছেন, "ভীম, দেখিতেছ কি? বিরাটকে তো লইয়া গেল! শীঘ্র তাঁহাকে ছাড়াইয়া আন! এতদিন যাঁহার আশ্রয়ে সুখে বাস করিলাম, এ সময়ে তাঁহার উপকার করা উচিত।"

ভীম বলিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়! এই দেখুন না ; আমি এই গাছ দিয়া—"

গাছের নাম শুনিয়া যুধিষ্ঠির ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না না! গাছ লইয়া নয়। তাহা হইলেই তোমাকে চিনিয়া ফেলিবে। তুমি সাধারণ লোকের মতো অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যাও। নকুল তোমার সঙ্গে যাউক।"

ভীম তাহাতেই রাজি হইয়া চলিয়া গেলেন। হাতে গাছ না থাকিলেই কি! ভীম তো! বিরাটকে তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই!" তাহা শুনিয়া সুশর্মা পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটা কি অদ্ভুত মানুষ ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসিতেছে! দেখিতে দেখিতে সেই অদ্ভুত মানুষ গদার ঘায় তাঁহার হাতি, ঘোড়া, সিপাহী প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল!

সুশর্মা আর উপায় না দেখিয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ আর করিবেন কি, তাহার পূর্বেই ভীমের গদার ঘায় তাঁহার রথের ঘোড়া আর সারথি চুরমার

হইয়া গিয়াছে। ততক্ষণে সহদেব প্রভৃতিও ভীমের সাহায্য করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। নিজে বিরাটও ভরসা পাইয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন।

সুশর্মা ভাবিলেন, 'বড় বিপদ! এই বেলা পলাই!'

কিন্তু হায়! যুদ্ধের সময় ভীমের সম্মুখ হইতে পলাইবার যেমন দরকার হয়, কাজটা তেমনি কঠিন হইয়া উঠে! সুশর্মা কয়েক পা যাইতে না যাইতেই ভীম তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া বসিলেন! তারপর আছাড় কীল চড় প্রভৃতি কোনো সাজাই বাকি রহিল না—বাকি রহিল খালি প্রাণ বাহির করিয়া দেওয়া।

তখন বিরাটের গোরু ও সুশর্মাকে লইয়া সকলে এক জায়গায় আসিয়া মিলিলেন। সেখানে যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছামত সুশর্মাকে কিছু মিষ্ট উপদেশ দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই ঘটনায় বিরাট যে পাণ্ডবদের উপর নিতান্তই সন্তুষ্ট হইলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। তিনি বলিলেন, "আপনাদের কৃপায় আজ আমার প্রাণ, মান সবই বজায় রহিল। এখন বলুন, আপনাদিগকে কি দিয়া সন্তুষ্ট করিব?"

এ কথার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ যে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, ইহাই আমাদের যথেষ্ট পুরস্কার। আপনি সুখে থাকুন।"

তারপর যুদ্ধ জয়ের সংবাদ লইয়া দূতেরা বিরাট নগরের দিকে ছুটিয়া চলিল। অন্য সকলে সে রাত্রি যুদ্ধক্ষেত্রে কাটাইয়া পরদিন বাড়ি ফিরিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিরাট নগরে অনেক বড়-বড় ঘটনা ঘটিতেছিল। বিরাট দলবল লইয়া ত্রিগর্ত দেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, বাড়িতে রাজপুত্র উত্তর আর কয়েকজন কর্মচারী ছাড়া আর কেহ নাই। ইহার মধ্যে দুর্যোধন অসংখ্য সৈন্য আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি বড়-বড় বীর সমেত আসিয়া মৎস্য দেশে উপস্থিত। তাঁহারা আসিয়াই বিরাটের গোয়ালাদিগকে ঠেঙ্গাইয়া, একেবারে ষাট হাজার গোরু লইয়া প্রস্থান করিলেন। গোয়ালারা মার খাইয়া চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে আসিয়া রাজবাড়িতে খবর দিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, তখন রাজবাড়িতে আর যোদ্ধা ছিল না ; ছিলেন কেবল রাজপুত্র উত্তর। তিনি বাড়ির ভিতর হইতে এই সংবাদ শুনিয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট বাহাদুরি লইবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "কি করি, একজন সারথি নাই। ভালো একজন সারথি পাইলে, আমি ভীষ্ম-টিষ্ম মারিয়া, এখনই গোরু ছাড়াইয়া আনিতাম। কৌরবেরা দেশ খালি পাইয়া গোরু চুরি করিয়া নিতেছে ; আমি সেখানে থাকিলে দেখিতাম, কেমন করিয়া নেয়।"

এ কথা শুনিয়া অর্জুন চুপিচুপি দ্রৌপদীকে কি যেন শিখাইয়া দিলেন, তারপর দ্রৌপদী আসিয়া উত্তরকে বলিলেন, "রাজপুত্র, আপনাদের বৃহন্নলা নামক ঐ হাতি হেন সুশ্রী ওস্তাদটি আগে অর্জুনের সারথি ছিলেন, উনি তাঁহারই শিষ্য, আর যুদ্ধেও তাঁহার চেয়ে বড় কম নহেন। পাণ্ডবদের ওখানে থাকার সময় তাঁহার কথা আমি বেশ করিয়া জানিয়াছি। এমন সারথি আর কোথাও নাই।"

উত্তর বলিলেন, "তাহা তো বুঝিলাম ; কিন্তু আমি নিজে উঁহাকে কেমন করিয়া আমার সারথি হইতে বলি?"

দ্রৌপদী বলিলেন, "আপনার ভগ্নী উত্তরা বলিলে উনি নিশ্চয় রাজি হইবেন। আর উঁহাকে সঙ্গে নিলে, আপনারও যুদ্ধে জিতিয়া আসা নিশ্চিত।"

উত্তরাকে অর্জুন নিজের কন্যার মতো স্নেহ করিতেন। তাঁহার আব্দার তিনি কিছুতেই না রাখিয়া পারিতেন না। উত্তরের কথায় রাজকুমারী যখন অর্জুনের নিকট আসিয়া, মধুর স্নেহ আর আদরের সহিত, তাঁহাকে সারথি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন আর তাঁহার "না" বলিবার উপায় রহিল না। আর তাঁহার "না" বলিবার ইচ্ছাও ছিল না। সুতরাং তিনি উত্তরার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুত্রের নিকট চলিলেন। উত্তর তাঁহাকে বলিলেন, "বৃহন্নলা! আমি কৌরবদের হাত হইতে গোরু ছাড়াইয়া আনিতে যাইব। তুমি আমার সারথি হইবে?

অর্জুন বলিলেন, "আমি গাইয়ে-বাজিয়ে মানুষ, সারথি-ফারথি হওয়া কি আমার কাজ? নাচিতে বলিলে বরং চেষ্টা করিতে পারি।"

উত্তরা বলিলেন, "আগে তো সারথির কাজটা চালাইয়া দাও, শেষে নাচিবে এখন।"

এইরূপে হাসি তামাশার ভিতরে অর্জুন সারথির সাজ পরিতে লাগিলেন।

ভঙ্গির আর সীমা নাই। যেন কতই আনাড়ি, জন্মেও যেন বর্ম চোখে দেখেন নাই। সেটাকে উল্টো করিয়া পরিয়াই বসিলেন। মেয়েরা তো তাহা দেখিয়া হাসিয়া কুটিপাটি।

যাহা হউক, শেষে সাজগোজ করিয়া দুজনেই রওয়ানা হইলেন। যাইবার সময় উত্তরা বলিলেন, "ভীষ্ম, দ্রোণ, এদের পোশাকগুলি কিন্তু আনা চাই ; আমরা পুতুল সাজাইব।"

তাহাতে অর্জুন হাসিয়া বলিলেন, "তোমার দাদা যদি উহাদিগকে পরাজয় করিতে পারেন, তবে আনিব।"

এইরূপে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। উত্তরের উৎসাহ আর ধরে না ; তিনি ক্রমাগতই বলিতেছেন, "কোথায় গেল কৌরবেরা? বৃহন্নলা, শীঘ্র চল! এখনই গোরু ছাড়াইয়া আনিব!"

অর্জুন রথ চালাইতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। খানিক পরেই তাঁহারা সেই শ্মশানে আর শমী গাছের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে কৌরবদিগের সৈন্য দেখা যাইতেছিল, যেন সাগরের জল, পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে!

সেই সৈন্যের দল দেখিয়াই ভয়ে উত্তরের মুখ শুকাইয়া গেল! তিনি বলিলেন, "ও বৃহন্নলা! আমাকে এ কোথায় আনিলে? আমি ছেলেমানুষ, এত এত সৈন্য আর ভয়ানক বীরের সহিত কেমন করিয়া যুদ্ধ করিব? ওমা! আমার কি হইবে? আমাকে ঘরে নিয়া চল!"

অর্জুন বলিলেন, "সে কি রাজপুত্র! এত বড়াই করিয়াছিলেন, সে-সব এখন কোথায়? এখন খালি হাতে ফিরিলে লোকে বলিবে কি? আমি তো গোরু না লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিব না।"

উত্তর বলিলেন, "গোরু যায়, সেও ভাল! গালি খাই, সেও ভালো! আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না।"

এই বলিয়া রাজপুত্র রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দে ছুট!

কি বিপদ! বুঝি বেচারা সবই মাটি করে। কাজেই অর্জুনকেও তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে হইল। ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার মাথার লম্বা বেণী এলাইয়া গেল ; গায়ের চাদর হাওয়ায় উড়িতে লাগিল।

এদিকে কৌরবের লোকেরা এ-সকল ঘটনার অর্থ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। উত্তরকে পলাইতে আর অর্জুনকে ছুটিতে দেখিয়া প্রথমে কেহ কেহ হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরেই তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল "এ ব্যক্তি কে? স্ত্রীলোকের মতো কতকটা চেহারা বটে, কিন্তু আবার পুরুষের মতোও দেখিতেছি। মাথা, ঘাড়, আর হাত ঠিক অর্জুনের মতো। এ ব্যক্তি নিশ্চয় অর্জুন ; নহিলে এমন তেজীয়ান চেহারা কাহার? আর এমন সাহসই-বা কাহার, যে একেলা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে?"

এদিকে অর্জুন একশত পা গিয়াই উত্তরের চুল ধরিয়াছেন। তখন যে উত্তরের কান্না! "ও বৃহন্নলা! শীঘ্র ঘরে চল! তোমাকে মোহর দিব, হীরা দিব, ঘোড়া দিব, রথ দিব, হাতি দিব, আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

অর্জুন তাহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, "রাজপুত্র, তোমার কোনো ভয় নাই। তুমি যুদ্ধ করিতে না চাহ, আমার সারথি হও। আমি যুদ্ধ করিয়া গোরু ছাড়াইব।"

এইরূপে উত্তরকে শান্ত করিয়া অর্জুন তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে দ্রোণ ভীষ্মকে বলিতেছেন, "ভীষ্ম! আজ কিন্তু অর্জুনের হাতে আমাদের রক্ষা নাই। যুদ্ধে শিবকে খুশি করিয়াছে, তারপর এতদিন ক্লেশ পাইয়া রাগিয়া আছে, ও কি আমাদিগকে সহজে ছাড়িবে?"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "আমার আর দুর্যোধনের যে ক্ষমতা, অর্জুনের তাহার একআনাও নাই।"

দুর্যোধন বলিলেন, "এ যদি অর্জুন হয়, তবে তো ভালোই হইল। অজ্ঞাতবাস শেষ না হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই আবার বারো বৎসর ইহাদিগকে বনবাস করিতে হইবে।"

ইঁহাদের এইরূপ কথাবার্তা চলিয়াছে। ততক্ষণে অর্জুন উত্তরকে লইয়া সেই শমীগাছের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। শমীগাছের তলায় আসিয়া তিনি বলিলেন, "রাজপুত্র, গাছে উঠিয়া ঐ অস্ত্রগুলি নামাও।"

এ কথায় উত্তর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'ও গাছে তো মড়া বাঁধা রহিয়াছে। ছুঁইলে অশুচি হইবে যে।"

অর্জুন বলিলেন, "উহা মড়া নহে, অস্ত্র। মড়া ছুঁইতে আমি তোমাকে কেন বলিব?"

তখন উত্তর গাছে উঠিয়া অস্ত্র নামাইলেন। তারপর তাহাদের বাঁধন খুলিয়া তাহাদের চেহারা দেখিয়া, তিনি তো একেবারে অবাক। এমন অস্ত্র তিনি আর কখনো দেখেন

নাই। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃহন্নলা, এ-সকল কাহার অস্ত্র?"

অর্জুন বলিলেন, "এ-সব অস্ত্র পাণ্ডবদিগের।"

পাণ্ডবদিগের নাম শুনিয়া উত্তর আরো আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "এ-সব যদি পাণ্ডবদিগের অস্ত্র হয়, তবে তাঁহারা এখন কোথায়?"

অর্জুন বলিলেন, "তাঁহারা তোমাদের বাড়িতেই আছেন। আমি অর্জুন ; তোমার পিতার যে কঙ্ক নামে সভাসদ আছেন, তিনি যুধিষ্ঠির ; বল্লভ নামক ঐ ষণ্ডা পাচকটি ভীম ; গ্রন্থিক নামক যে লোকটি ঘোড়াশালে কাজ করে, সে নকুল ; আর গোশালার-কর্তা তন্ত্রিপাল সহদেব ; তোমাদের বাড়িতে যিনি সৈরিন্ধ্রীর কাজ করেন, তিনি দ্রৌপদী।"

উত্তরের নিকট এ-সকল কথা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের ন্যায় মহাপুরুষেরা তাঁহাদের বাড়িতে সামান্য চাকরের মতো বাস করিতেন, এ কথা কি সহজে বিশ্বাস হয়? কাজেই অর্জুনের কথা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "শুনিয়াছি, অর্জুনের দশটি নাম আছে, আপনি যদি সেই অর্জুন হন, তবে সেই দশটি নাম আর তাহাদের অর্থ বলুন দেখি।"

অর্জুন বলিলেন, "অর্জুন মানে সাদা, নির্মল। আমি নির্মল কাজ করি, এইজন্য আমি অর্জুন। দেশ জয় করিয়া ধন আনি, তাই আমি 'ধনঞ্জয়'। যুদ্ধে আমি সর্বদাই জয়লাভ করি, তাই আমি 'বিজয়'। আমার রথের ঘোড়াগুলি সাদা, তাই আমি 'শ্বেতবাহন'। আমার জন্মের দিন উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র ছিল, তাই আমি 'ফাল্গুনি'। দৈত্যদিগকে হারাইয়া ইন্দ্রের নিকট কিরীট, অর্থাৎ মুকুট পুরস্কার পাইয়াছিলাম, তাই আমি 'কিরীটী'। যুদ্ধের সময় আমি 'বীভৎস' অর্থাৎ নিষ্ঠুর কাজ করি, তাই আমি 'বীভৎসু'। আমি সব্য অর্থাৎ বাম হাতেও ডান্ হাতের ন্যায় তীর ছুঁড়তে পারি, তাই আমি 'সব্যসাচী'। ভয়ানক শত্রুকেও আমি জয় করিয়া থাকি, তাই আমি 'জিষ্ণু'। আর রঙ কালো বলিয়া আমি 'কৃষ্ণ'।"

তখন উত্তর জোড়হাতে অর্জুনকে নমস্কার করিয়া, বিনয়ের সহিত বলিলেন, "মহাশয়! আমি না জানিয়া আপনার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন।"

অর্জুন বলিলেন, "আমি তোমার উপর কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হই নাই। ভয় পাইও না; অস্ত্রগুলি রথে তোল, তোমার গোরু ছাড়াইয়া দিতেছি।"

এতক্ষণে উত্তরের খুবই সাহস হইয়াছে। কারণ অর্জুন সঙ্গে থাকিলে আর কিসের ভয়? এরপর আর সারথির কাজ করিতে তিনি কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না।

তারপর অর্জুন হাত হইতে বালার গোছা খুলিয়া, ঝকঝকে সোনালি কবচ আঁটিয়া পরিলেন। সাদা কাপড় দিয়া মাথার বেণী বেশ করিয়া বাঁধিলেন। শেষে সেই সুন্দর রথ চড়িয়া, নানারূপ অস্ত্র মনে মনে ডাকিবামাত্র তাহারা উপস্থিত হইয়া জোড়হাতে বলিল, "আমরা আসিয়াছি, কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।"

অর্জুন বলিলেন, "তোমরা যুদ্ধের সময় আমার সঙ্গে থাকিয়া আমার কাজ করিবে।"

এইরূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া, অর্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার ও তাঁহার বিশাল শঙ্খে ফুঁ দিবামাত্র, উত্তর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রথের ভিতরে বসিয়া পড়িলেন।

তাহা দেখিয়া অর্জুন বলিলেন, "কি হইয়াছে? ভয় পাইতেছ কেন?"

উত্তর বলিলেন, "উঃ! আমার কান ফাটিয়া গেল! মাথা ঘুরিয়া গেল! শঙ্খের আর ধনুকের শব্দ এমন ভয়ানক হইতে পারে, তাহা তো আমি জানিতাম না!"

যাহা হউক, শেষে উত্তরের ভয় গেল।

এদিকে সেই ধনুকের টঙ্কার আর শঙ্খের শব্দ শুনিয়া, কৌরবদের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, উহা অর্জুনের ধনুক আর শঙ্খ। দুর্যোধনের তখন ভারি আনন্দ। তিনি ভাবিলেন যে, অর্জুনের সময় ফুরাইবার পূর্বেই দেখা দিয়াছেন, সুতরাং পাণ্ডবদিগকে আবার বারো বৎসর বনবাস করিতে হইবে।

কর্ণের খুবই উৎসাহ। তিনি ভাবিলেন, অর্জুনকে মারিয়া একটা নিতান্তই বাহাদুরি কাণ্ড করিবেন।

যাঁহারা একটু শান্ত আর ধার্মিক, তাঁহারা বলিলেন, "আজ অর্জুনের হাতে বড়ই বিপদ দেখা যাইতেছে, সকলে সাবধানে থাকুন!"

এইরূপ নানারকম কথাবার্তা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, "অজ্ঞাতবাসের এখনো বাকি আছে।" কেহ বলিতেছেন, "না, বাকি নাই, তাহা হইলে অর্জুন কখনোই এমন করিয়া আসিতেন না।" শেষে ভীষ্ম ভালোমতে হিসাব করিয়া বলিলেন, "আমি দেখিতেছি পাণ্ডবদের তেরো বৎসর পূর্ণ হইয়া পাঁচ মাস ছয় দিন হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের যাহা করার কথা ছিল, তাহা ভালোরূপেই করিয়াছেন। তাহাতে ভুল নাই।"

তারপর ভীষ্মের কথায় সৈন্যদিগকে চারি ভাগ করিয়া, এক ভাগের সহিত দুর্যোধন নিজেকে বাঁচাইবার জন্য, হস্তিনায় যাত্রা করিলেন ; আর একভাগ গোরু লইয়া চলিল; আর দুইভাগ লইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি অর্জুনকে আটকাইতে প্রস্তুত হইলেন।

এমন সময়ে অর্জুনের দুটি বাণ আসিয়া দ্রোণের পায়ের কাছে পড়িল। আর দুটি বাণ তাঁহার কানের কাছ দিয়া চলিয়া গেল। দ্রোণ হইলেন অর্জুনের গুরু ; এতদিন পরে দেখা হইল, প্রণাম করিয়া দুটি কুশল মঙ্গল তো জিজ্ঞাসা করা চাই। এত দূরে থাকিয়া, সে কাজ আর কিরূপে হইবে? তাই অর্জুন গুরুর পায়ের কাছে বাণ ফেলিয়া তাঁহাকে প্রণাম জানাইলেন, আর কানের কাছে বাণ পাঠাইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আর এই-সব কাজের অর্থ বুঝিতে পারিয়া দ্রোণের বিশেষ আনন্দ হইল।

এদিকে অর্জুন যখন দেখিলেন যে দুর্যোধনের পলায়ন করিবার চেষ্টা, তখন তিনি উত্তরকে বলিলেন, "আগে ঐ হতভাগার কাছে চল।"

অর্জুনের রথকে দুর্যোধনের দিকে ছুটিতে দেখিয়া কৃপ দ্রোণকে বলিলেন, "আর গোরুর ভাবনা ভাবিয়া কাজ নাই। ঐ দেখ দুর্যোধনের এখন বড়ই বেগতিক।"

অর্জুন দুর্যোধনের দিকে চলিয়াছেন, তাঁহাকে আটকাইবার জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। কিন্তু অর্জুনকে আটকায় কাহার সাধ্য? যে তাঁহার সামনে আসিতেছে, তাহারই তিনি দুর্দশার একশেষ করিতেছেন। কেহ পলাইতেছে, কেহ মারা যাইতেছে।

অনেকে ভ্যাবাচাকা লাগিয়া মার খাইতেছে।

অর্জুনকে আটকাইতে গিয়া কর্ণের এক ভাই মরিয়া গেল। কর্ণ তাহাতে বিষম রাগের সহিত আসিয়া অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। দুজনে কিছুকাল এমনি ভয়ানক যুদ্ধ হইল যে, তাহার আর তুলনা নাই। শেষে দেখা গেল যে, কর্ণ হাতে, মাথায়, উরুতে, কপালে আর ঘাড়ে, বিষম বাণের খোঁচা খাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছেন।

এইরূপে একে একে সকলেই অর্জুনের হাতে নাকাল হইতে লাগিলেন। কর্ণ পলাইলে আসিলেন কৃপ ; কৃপ পলাইলে দ্রোণ। দ্রোণকে অর্জুন কিছুতেই অস্ত্র মারিতে চাহেন নাই। কিন্তু দ্রোণ অর্জুনের গায় বাণ মারিতে আরম্ভ করিলে কাজেই অর্জুনকেও যুদ্ধ করিতে হইল। তাহার ফলে দ্রোণও বেশ ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। ইহার মধ্যে অশ্বত্থামা আসিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করাতে, সেই ফাঁকে দ্রোণ সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া রক্ষা পাইলেন!

তারপর কর্ণ আবার আসিয়াছিলেন, আর তাহার তেমনি সাজাও হইয়াছিল। এবার বুকে সাঙঘাতিক বাণ খাইয়া তিনি রণস্থলেই অজ্ঞান হইয়া যান। তারপর কোনমতে উঠিয়া পলায়ন করেন।

এইরূপে কত লোক অর্জুনের কাছে জব্দ হইল, তাহা কত বলিব? সকলে একসঙ্গে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। নিজে ভীষ্ম অজ্ঞান হইয়া গেলেন, তখন সারথি রথ হাঁকাইয়া তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

দুর্যোধন দু'বার অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন। প্রথম বারে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে অর্জুন অনেক ঠাট্টা করায় রাগের ভরে আবার আসেন। এবারে ভীষ্ম প্রভৃতি সকলে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া অর্জুনের উপরে বাণ মারিতে আরম্ভ করিলে অর্জুন অতি চমৎকার উপায়ে তাঁহাদিগকে জব্দ করেন। এবার কাহাকেও মারিবার চেষ্টা না করিয়া, তিনি 'সম্মোহন' নামক অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। সেই আশ্চর্য অস্ত্র ছাড়িয়া শঙ্খে ফুঁ দিবামাত্রই সকলে অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। তখন উত্তরার সেই কথা মনে করিয়া তিনি উত্তরকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র গিয়া দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা আর দুর্যোধনের গায়ের কাপড়গুলি লইয়া আইস। সাবধান ভীষ্মের কাছে যাইও না। তিনি এই অস্ত্র থামাইবার সঙ্কেত জানেন ; হয়তো তিনি অজ্ঞান হন নাই।"

অর্জুনের কথা যে ঠিক, তাহার পরিচয় হাতে হাতেই পাওয়া গেল। কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতির কাপড় আনিয়া, উত্তর ভালো করিয়া রথে বসিতে না বসিতেই, ভীষ্ম উঠিয়া আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু অর্জুনের দশ বাণ খাইয়া বুড়ার আর যুদ্ধ করিতে হইল না।

এদিকে দুর্যোধন জাগিয়া উঠিয়াই ভারি চোটপাট আরম্ভ করিয়াছেন, "আপনারা কিজন্য অর্জুনকে এত সহজে ছাড়িয়া দিতেছেন? শীঘ্র উহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিন।"

তখন ভীষ্ম হাসিয়া বলিলেন, "দুর্যোধন, এতক্ষণ তোমার বুদ্ধি কোথায় ছিল? অজ্ঞান হইয়া যখন গড়াগড়ি যাইতেছিলে, তখন অর্জুন ইচ্ছা করিলেই তো তোমাদের

কর্ম শেষ করিয়া দিতে পারিত! সে ধার্মিক লোক, তাই দয়া করিয়া তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাই ঢের ; এখন প্রাণ থাকিতে ঘরে ফিরিয়া চল।

আর কি দুর্যোধনের মুখে কথা আছে! তাঁহার মাথা হেঁট হইয়া গিয়াছে, লম্বা নিশ্বাস বহিতেছে। এদিকে অর্জুন বাণের দ্বারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া, আর-এক বাণে দুর্যোধনের মুকুটটি দুইখান করিয়া গোরু লইয়া শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে ঘরে ফিরিলেন। ফিরিবার সময় পথে অর্জুন উত্তরকে বলিলেন, "সাবধান! ঘরে ফিরিয়া কিন্তু আমার নাম করিও না। আমরা যে তোমাদের এখানে আছি, তাহা যেন তোমাদের লোকেরা না জানিতে পারে।"

তারপর সেই শমী গাছের নিকট আসিয়া অর্জুন আবার বৃহন্নলার বেশে, রাজপুত্রের সারথি হইয়া বসিলেন। গোয়ালারা তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে বসাইয়া, তাড়াতাড়ি নগরে সংবাদ পাঠাইল যে, "যুদ্ধে জিতিয়া গোরু ছাড়ানো হইয়াছে।"

এদিকে রাজা বিরাট দেশে ফিরিয়া, মেয়েদের নিকট শুনিলেন যে, উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া, কৌরবদিগের নিকট হইতে গোরু ছাড়াইয়া আনিতে গিয়াছেন। এই সংবাদে তাঁহার মনে কিরূপ চিন্তা ও ভয় হইল, তাহা বুঝিতেই পার। তিনি তাড়াতাড়ি সৈন্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র তাহাকে খুঁজিতে যাও। হায় হায়! একে ছেলেমানুষ, তাহাতে বৃহন্নলা সারথি ; সে কি আর এতক্ষণ বাঁচিয়া আছে?"

এ কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ, কোনো ভয় নাই বৃহন্নলা যখন সারথি, তখন দেব, দানব, যক্ষ প্রভৃতি সকলে মিলিয়াও রাজকুমারের কিছু করিতে পারিবে না।"

এই সময় সংবাদ আসিল, "যুদ্ধ জিতিয়া গোরু ছাড়ানো হইয়াছে।" তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "বৃহন্নলা যাহার সারথি, তাহার তো জয় হইবেই।"

এই সংবাদ শুনিয়া বিরাটের কি আনন্দই হইল। তিনি দূতগণকে পুরস্কার দিয়া তখনই নগরে একটা ভারি ধুমধামের ব্যবস্থা করিলেন।

তারপর সৈরিন্ধ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাশা আন ; আমি কঙ্কের সহিত পাশা খেলিব।"

পাশা আসিল। খেলা আরম্ভ হইল। রাজার মন আজ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি পাশা খেলিতে খেলিতে বলিলেন, "কঙ্ক, আজ আমার পুত্র কৌরবদিগকে হারাইয়া দিয়াছে!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ! বৃহন্নলা সারথি, হারাইবেন না তো কি?"

এ কথায় রাজা তো একেবারে চটিয়া লাল!—"কি? আমার পুত্র কি উহাদিগকে হারাইতে পারে না? তুমি যে বারবার কেবল 'বৃহন্নলা' 'বৃহন্নলা' করিতেছ? খবরদার! প্রাণের মায়া থাকে তো আর এমন বেয়াদবি করিও না!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এ-সকল বীরকে কি বৃহন্নলা ছাড়া আর কেহ হারাইতে পারে?"

ইহার পর রাজা আর রাগ থামাইতে না পারিয়া যুধিষ্ঠিরের মুখে পাশা ছুঁড়িয়া মারিলেন। পাশার ঘায় যুধিষ্ঠিরের নাক দিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িয়া, তাঁহার অঞ্জলি

ভরিয়া গেল। দ্রৌপদী তাড়াতাড়ি সোনার গামলায় জল আনিয়া, তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দ্বারী আসিয়া বলিল, "রাজকুমার বৃহন্নলার সহিত দরজায় উপস্থিত হইয়াছেন।" তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "শীঘ্র তাহাদিগকে এখানে লইয়া আইস।

যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে সর্বনাশ উপস্থিত ; অর্জুন আসিয়া তাঁহার সেই অবস্থা দেখিলে, আর বিরাটকে আস্ত রাখিবেন না। কাজেই তিনি দ্বারীর কানে কানে বলিয়া দিলেন, 'বৃহন্নলা যেন এখন এখানে না আসে।' সুতরাং উত্তর একাই সেখানে আসিলেন।

উত্তর যুধিষ্ঠিরের মুখে রক্ত দেখিয়াই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! এমন অন্যায় কাজ কে করিল? ইঁহাকে কে আঘাত করিল?"

রাজা বলিলেন, "আমি করিয়াছি! আমি যতই তোমার প্রশংসা করি, ততই এ বামুন খালি বৃহন্নলার কথা বলে। কাজেই আমি শেষে উহাকে মারিয়াছি।"

উত্তর বলিলেন "ব্রাহ্মণ রাগিলে সর্বনাশ হইবে। শীঘ্র ইঁহাকে সন্তুষ্ট করুন।"

এ কথায় রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ, আমি ইহার পূর্বেই ক্ষমা করিয়াছি।"

যুধিষ্ঠিরের রক্ত পরিষ্কার হইলে, বৃহন্নলা সেখানে আসিয়া রাজাকে নমস্কার করিলেন। রাজা বৃহন্নলার সামনেই উত্তরকে বলিতে লাগিলে, "বাবা, তুমি আমার নাম রাখিয়াছ। তোমার মতন পুত্র কি আর কাহারো হয়! এতগুলি মহা মহা বীরের সহিত না জানি কেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলে!"

উত্তর বলিলেন, "বাবা! আমার কিছুই করিতে হয় নাই। এক দেবপুত্র আসিয়া আমার হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; তিনিই কৌরবদিগকে তাড়াইয়া গোরু ছাড়াইয়া আনিয়াছেন।"

এ কথা শুনিয়া বিরাট বলিলেন, "তবে তো সেই দেবপুত্রের পূজা করিতে হয়! তিনি কোথায়?"

উত্তর বলিলেন, "তিনি কাল পরশু আবার আসিবেন।"

যুদ্ধের সংবাদে সকলেই খুব খুশি হইল। আর উত্তরা সেই কাপড়গুলি পাইয়া যে কত খুশি হইলেন, তাহা আর লিখিয়া কি বুঝাইব?

এইরূপে অজ্ঞাতবাস শেষ হইল। পাঁচ ভাই উত্তরকে লইয়া পরামর্শ করিলেন যে, আর দুদিন পরে তাঁহারা নিজের পরিচয় দিবেন। কিরূপ করিয়া পরিচয় দেওয়া হইবে, তাহাও স্থির হইল।

যেদিন পরিচয় দিবার কথা, সেদিন পাণ্ডবেরা স্নানের পর সুন্দর সাদা পোশাক আর অলঙ্কার পরিয়া, বিরাটের সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। বিরাট সভায় আসিয়া দেখেন, একি আশ্চর্য ব্যাপার! সভাসদ কঙ্ক সাজগোজ করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তিনি বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি কঙ্ক! আমার সিংহাসনে কেন বসিতে গেলে?"

এ কথায় অর্জুন হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রের সিংহাসনে বসিতে পারেন। আপনার সিংহাসনে বসাতে তাঁহার অন্যায় কি হইল?"

বিরাট বলিলেন, "ইনিই যদি রাজা যুধিষ্ঠির হন, তবে তাঁহার ভ্রাতাগণ আর দ্রৌপদী দেবী কোথায়?"

এ প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন একে একে সকলেরই পরিচয় দিলেন। তারপর উত্তর অর্জুনের অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "যে দেবপুত্র কৌরবদিগের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া গোরু ছাড়াইয়াছিলেন, তিনি এই অর্জুন।"

সকল কথা শুনিয়া বিরাটের যেমন আশ্চর্য বোধ হইল, তেমনি তিনি আনন্দিতও হইলেন। পাণ্ডবদিগকে যতপ্রকারে আদর দেখানো সম্ভব মনে হইল, তিনি তাহার কিছুই বাকি রাখিলেন না। তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, "আমার কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য?" বিশেষত অর্জুনের প্রতি তাঁহার যে কিরূপ স্নেহ হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, নিজের কন্যা উত্তরার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।

কিন্তু এ কথায় অর্জুন রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি উত্তরার গুরু; তাঁহাকে সর্বদা আমার কন্যার মতো ভাবিয়া স্নেহ করিয়াছি। তিনিও আমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছেন। তাঁহার সহিত কি আমার বিবাহের কথা হইতে পারে? আমার পুত্র অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হউক।"

এ প্রস্তাবে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বীরত্বে অভিমন্যুর মতো এমন সুপাত্র আর হয় না। কাজেই, সুন্দর দিন দেখিয়া, মহাসমারোহে অভিমন্যু আর উত্তরার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে নানা দেশ হইতে বিরাট এবং পাণ্ডবদিগের আত্মীয়-স্বজন আর রাজারা আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণ, বলরাম, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি কেহই আসিতে বাকি ছিল না।

# উদ্যোগপর্ব

ভিমন্যু আর উত্তরের বিবাহের পরে, বিরাটের বাড়িতে রাজা এবং যোদ্ধাদিগের মস্ত এক সভা হইল। বিবাহে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বড়-বড় বীর এবং সকলেই পাণ্ডবদিগের বন্ধু। ইঁহারা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, এখন কি উপায়ে, পাণ্ডবেরা নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইতে পারেন। সেই কপট পাশা খেলায় হারিয়া, পাণ্ডবেরা বারো বৎসর বনবাস আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞা করেন। সে প্রতিজ্ঞা তাঁহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। তথাপি দুরাত্মা দুর্যোধনের দল এখন বলিতেছে যে, তেরো বৎসর না যাইতেই তাঁহাদের সন্ধান পাইয়াছে। আসলে তাহাদের রাজ্য ছাড়িয়া দিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। তাই পাণ্ডবদিগের বন্ধুগণ স্থির করিলেন, যদি সহজে উহারা রাজ্য ছাড়িয়া না দেয়, তবে যুদ্ধ করিয়া তাহা আদায় করিতে হইবে।

এদিকে দুর্যোধন প্রভৃতিও চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না। পাণ্ডবেরা যে তাঁহাদের রাজ্য সহজে ছাড়িবেন না, এ কথা তাঁহারা বেশ জানিতেন। সুতরাং দুই দলেই যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইল। একদিকে যেমন সৈন্য-সামন্ত এবং অস্ত্র-শস্ত্রের জোগাড় হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমন বড়-বড় বীরদিগকে ডাকিয়া নিজেদের দলে আনিবার চেষ্টারও ত্রুটি হইল না।

কৃষ্ণের সাহায্য পাওয়া একটা মস্ত কথা। সেজন্য দুর্যোধন আর অর্জুন প্রায় এক সময়েই দ্বারকায় যাত্রা করেন, একই সময়ে সেখানে উপস্থিত হন। কৃষ্ণ তখন নিদ্রায়। দুর্যোধন আগেই তাঁহার শয়ন-ঘরে গিয়া, তাঁহার মাথার নিকটে একটি বড় আসন অধিকার করিলেন ; পরে অর্জুন আসিয়া বিনীতভাবে কৃষ্ণের পায়ের কাছে বসিলেন।

ঘুম ভাঙ্গিলে প্রথমে পায়ের দিকেই চোখ পড়ে। কাজেই কৃষ্ণ জাগিয়া আগে দেখিলেন অর্জুনকে, তারপর দেখিলেন দুর্যোধনকে। দুজনকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য আসিয়াছ?"

দুর্যোধন হাসিমুখে বলিলেন, "যুদ্ধে আপনার সাহায্য চাহিতে আসিয়াছি। আর আমি আগে আসিয়াছি, কাজেই আমার কথাই আপনাকে রাখিতে হইবে।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "আপনি আগে আসিয়াছেন সত্য। আর আমি আগে অর্জুনকে দেখিয়াছি, এ কথাও সত্য। সুতরাং আমি দুজনকেই সাহায্য করিব। একদিকে 'নারায়ণী সৈন্য' নামক আমার অতি ভয়ঙ্কর এক অর্বুদ সৈন্য থাকিবে, অপরদিকে আমি নিজে শুধু

হাতে থাকিব, কিন্তু যুদ্ধ করিব না। এই দুয়ের মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা নিতে পার। অর্জুন বয়সে ছোট, সুতরাং তাহাকেই আগে জিজ্ঞাসা করি। বলতো অর্জুন, ইহার কোন্‌টা তোমার পছন্দ হয়।"

অর্জুন বলিলেন, "আমি সৈন্য চাহি না, আপনাকেই চাহি।"

কাজেই অর্জুন পাইলেন কৃষ্ণকে, আর দুর্যোধন পাইলেন এক অর্বুদ সৈন্য। দুজনেই মনে করিলেন, 'আমি খুব জিতিয়াছি।'

সেখান হইতে দুর্যোধন বলরামের নিকট গেলেন। কিন্তু বলরাম বলিলেন, "আমি তোমাদের কাহাকেও সাহায্য করিব না, তোমরা প্রস্থান কর।"

এদিকে কৃষ্ণ আর অর্জুন স্থির করিলেন যে, যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হইবেন।

শল্য কি করিয়াছিলেন, শুনিবে? সে হাসির কথা, শল্য পাণ্ডবদিগের মাতুল ; মাদ্রীর ভাই। তিনি পাণ্ডবদিগের সাহায্য করিবার জন্য, বিস্তর সৈন্য লইয়া তাঁহার রাজ্য মদ্রদেশ হইতে যাত্রা করিলেন। পথে দুর্যোধন, তাহাকে হাত করিবার জন্য, তাঁহার এতই সমাদর করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে দেবতারও মন ভুলিয়া যায়। যেখানেই শল্য বিশ্রাম করিবেন, সেইখানেই দুর্যোধন চমৎকার একটি বৈঠকখানা করিয়া রাখিয়াছেন। বৈঠকখানাগুলি দেখিয়া শল্য ভাবিলেন, 'বাঃ! পাণ্ডবেরা আমার কতই যত্ন করিতেছে!' এ যে দুর্যোধনের চাতুরি, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিলেন না। একটা বৈঠকখানার কারুকার্য তাঁহার বড়ই ভালো লাগায়, তিনি বলিলেন, ইহার কারিগরকে ডাক, বকশিস দিব।" অমনি নিজে দুর্যোধন কারিগর সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত! শল্য তাঁহাকে বলিলেন, "কারিগর বল, তুমি কি পুরস্কার চাও? আমি তাহাই দিতেছি।"

দুর্যোধন বলিলেন, "মামা! আপনার কথা যেন মিথ্যা না হয়! আমি এই চাই যে, আপনি আমার দলে আসিয়া সেনাপতি হউন।"

সে-সকল লোক কথায় বড় খাঁটি ছিলেন। শল্যের আর পাণ্ডবদিগের সাহায্য করা হইল না। দুর্যোধনকে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা তুমি ঘরে যাও, আমি যুধিষ্ঠিরের সহিত দেখা করিয়া আসিতেছি।"

যুধিষ্ঠিরের সহিত দেখা হইলে, শল্য তাহাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "তোমাদের দুঃখের শেষ হইয়াছে, এখন তোমাদের শত্রুদিগকে মারিয়া সুখে রাজ্য কর।" তারপর, পথে দুর্যোধনের ফাঁকিতে পড়িয়া যে-সকল কথা বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। সে কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মামা! আপনি আপনার কথা রাখিয়া ভালোই করিয়াছেন ; কিন্তু আমাদের একটি উপকার করিতে হইবে। কর্ণ আর অর্জুনের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আপনি কর্ণের সারথি হইয়া, এমন উপায় করিবেন, যাহাতে তাহার তেজ কমিয়া যায়।"

শল্য বলিলেন, "সে বিষয়ে তোমরা কোনো চিন্তা করিও না। আমার যতদূর সাধ্য, তোমাদের উপকার নিশ্চয় করিব।"

এইরূপে বড়-বড় বীরগণ ক্রমে দুই দলের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

পাণ্ডবদিগের দলে আসিলেন সাত্যকি। ইনি অসাধারণ যোদ্ধা, কৃষ্ণের আত্মীয় এবং অর্জুনের ছাত্র ও বন্ধু। ইঁহার সঙ্গে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য আসিল। তারপর চেদি দেশের রাজা মহাবীর ধৃষ্টকেতু এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া আসিলেন। তারপর মগধের রাজা জরাসন্ধের পুত্র জয়ৎসেন এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া আসিলেন। তারপর মহাবীর পাণ্ডা এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া আসিলেন।

তারপর দ্রুপদ, বিরাট ইঁহারাও অনেক লক্ষ যোদ্ধা আর সৈন্যের জোগাড় করিলেন। এইরূপে পাণ্ডবদের পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল।

দুর্যোধনের দলে—ভগদত্তের এক অক্ষৌহিণী, ভূরিশ্রবার এক অক্ষৌহিণী, শল্যের এক অক্ষৌহিণী, কৃতবর্মার এক অক্ষৌহিণী, জয়দ্রথের এক অক্ষৌহিণী, কম্বোজের রাজা সুদক্ষিণের এক অক্ষৌহিণী, ইহা ছাড়া দক্ষিণাপথ, অবন্তী প্রভৃতি নানা দেশ হইতে আরো পাঁচ অক্ষৌহিণী, সবসুদ্ধ এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল।

এইরূপে দুই দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আর অল্পদিনের মধ্যেই ভয়ঙ্কর মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইবে, রক্তে দেশ ভাসিয়া যাইবে, ঘরে ঘরে কান্না উঠিবে। দেশের যত ক্ষত্রিয় বীর, প্রায় সকলেই যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। হায়! আর অল্পদিন পরে হয়তো উহাদের কেহই বাঁচিয়া থাকিবে না।

যুদ্ধ কি ভয়ঙ্কর কাজ, আর ক্ষত্রিয়ের কর্ম কি কঠিন! মানুষকে মারিয়া মানুষ মনে করিবে যে, 'ধর্ম করিলাম!' কয়েকজন লোক একটা রাজ্য লইয়া ঝগড়া করিতেছে, তাহার জন্য দেশসুদ্ধ লোক কাটাকাটি করিয়া মরিবে!

এমন যুদ্ধ কে সহজে করিতে চায়? পাণ্ডবেরা তো তাহা চাহেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "আমাদের সমুদয় রাজ্য না দেয়, কেবল আমরা নিজ হাতে যেটুকু জয় করিয়া লইয়াছিলাম, তাহাই দেউক। তাহাও যদি না দেয়, পাঁচজনকে পাঁচখানি গ্রাম মাত্র দিলেও আমরা সন্তুষ্ট হই।"

কিন্তু দুষ্ট লোকে লোভে পড়িলে কি আর তাহার ভালো-মন্দ জ্ঞান থাকে? কত লোক দুর্যোধনকে বুঝাইল, কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য হইল না। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, সঞ্জয় প্রভৃতি সকলে মিলিয়া কত চেষ্টা করিলেন? কিন্তু যে ইচ্ছা করিয়া শুনিবে না, তাহার কাছে কথা বলিয়া কি ফল? কর্ণ, শকুনি প্রভৃতিরা, দুর্যোধনকে ক্রমাগত যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহ দিয়া, এমন করিয়া তুলিয়াছেন যে, তিনি আর কাহারো কথায় কান দিতে চাহেন না।

ধৃতরাষ্ট্র মুখে দুর্যোধনের নিন্দা করিয়াছিলেন, আর পাণ্ডবদিগের সহিত বন্ধুতা করার কথা বারবার বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহা সরলভাবে বলেন নাই, কাজেই তাহার কোনো ফল হয় নাই।

সকলের শেষে কৃষ্ণ এই যুদ্ধ থামাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার কথা রাখা দূরে থাকুক, দুর্যোধন তাঁহাকে অপমান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। রাজ্য দিবার কথায় রাজি করিতে না পারিয়া, কৃষ্ণ দুর্যোধনের নিকট পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচখানি গ্রাম মাত্র চাহিলেন। তাহার উত্তরে দুর্যোধন বলিলেন কি যে, "খুব সরু ছুঁচের

আগায় যতটুকু জায়গা বিঁধে, তাহার অর্ধেকও বিনা যুদ্ধে দিব না!"

ইহার উপরে আবার বুদ্ধিমানেরা কৃষ্ণকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন! কিন্তু তাঁহার চেহারা দেখিয়া, আর কাজে তাহা করিতে সাহস হয় নাই। তিনি ধমকের চোটে দুষ্টদিগকে জব্দ করিয়া, সেখান হইতে চলিয়া আসেন।

আসিবার পূর্বে কৃষ্ণ কর্ণকে নির্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "কর্ণ, তুমি কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছ? জান কি, পাণ্ডবেরা তোমার ছোট ভাই? তুমি এখনই আমার সঙ্গে চল, তোমার ভাইদের সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিই। পাণ্ডবেরা তোমাকে চিনিতে পারিলে, তোমায় মাথায় করিয়া রাখিবেন। তখন এই পৃথিবীর রাজা হইবে তুমি, আর পাণ্ডবদের প্রধান কাজ হইবে তোমার সেবা করা, আর তোমার আজ্ঞা পালন করা। তুমি আর অর্জুন দুভাই মিলিয়া এই পৃথিবীতে কত বড়-বড় কাজ করিবে আর তাহা দেখিয়া আমাদের চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।"

কর্ণ বলিলেন, "কৃষ্ণ! তোমার সকল কথাই সত্য। কিন্তু তুমি আমাকে কি মনে করিয়াছ? দুর্যোধনের অনুগ্রহে আমি রাজ্য পাইয়া সুখে বাস করিতেছি। এই দুর্যোধনকে আমার ভরসায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিয়া, আমি তাহাকে ছাড়িয়া যাইব? আমাদ্বারা তাহা কখনই হইবে না। পাণ্ডবেরা আমার ভাই হইলেই কি? লোকে তো জানে, আমি অধিরথ সারথির পুত্র। এখন যুদ্ধের আরম্ভেই যদি আমি পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিতে যাই, তবে সকলে বলিবে, আমি কাপুরুষ। না কৃষ্ণ! তোমার কথা আমি রাখিতে পারিব না!"

বনবাসে যাইবার সময় কুন্তীকে পাণ্ডবেরা বিদুরের বাড়িতেই রাখিয়া যান। কৃষ্ণও যুদ্ধ থামাইবার চেষ্টায় আসিয়া এবারে বিদুরের বাড়িতেই ছিলেন। কাজেই তাঁহার নিকট কুন্তীর কোনো কথাই জানিতে বাকি থাকে নাই।

কৃষ্ণ চলিয়া যাইবার পরে, যুদ্ধের কথা ভাবিয়া কুন্তীর প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। পুত্রগণ যুদ্ধ করিয়া একজন আর-একজনকে মারিবে, মার প্রাণে এ কথা কি সহ্য হইতে পারে? তাই তিনি মনে করিলেন, তিনি নিজে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

কর্ণ রোজ গঙ্গায় স্নান করিয়া সূর্যের স্তব করিতেন। স্নানের সময় কুন্তী গঙ্গার ধারে গিয়া, এই স্তবের শব্দে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং তাঁহারই ছায়ায় বসিয়া, স্তব শেষ হইবার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্তবের শেষে কর্ণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জোড়হাতে কহিলেন, "হে দেবি, আমি অধিরথ এবং রাধার পুত্র কর্ণ ; আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনার কি চাহি?"

কুন্তী বলিলেন, "বাছা, তুমি আমারই পুত্র। রাধার পুত্র তুমি কখনই নহ ; সারথির ঘরে তোমার জন্মও হয় নাই। নিজের ভাইদিগকে না চিনিতে পারিয়া, কেন বাবা তুমি দুর্যোধনের সেবা করিতেছ? তোমার ভাইদের কাছে তুমি আইস। যেমন কৃষ্ণ বলরাম দুভাই, তেমনি আমার কর্ণ আর অর্জুন হউক! পাঁচ ভাইয়ের প্রভু হইয়া সুখে রাজ্য কর। সারথির পুত্র বলিয়া যেন তোমার দুর্নাম না থাকে।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "আপনার কথায় আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না। জন্মকালে আপনি আমাকে ফেলিয়া দিয়াছিলেন ; মায়ের কাজ আমার প্রতি কিছুই করেন নাই। এখন যে আমাকে স্নেহ দেখাইতেছেন, তাহাও কেবল আপনার পুত্রদিগের উপকারের জন্য। এমন অবস্থায়, আমি আপনার কথায় দুর্যোধনকে ছাড়িতে যাইব কেন? তবে আপনি কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন; তাই এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ইহাদের কাহারো আমি কোনো অনিষ্ট করিব না। কিন্তু অর্জুনকে ছাড়িতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নহি। যুদ্ধে হয় আমি তাহাকে মারিব, না হয় সে আমাকে মারিবে। আপনার পাঁচ পুত্রই লোকে জানে, অধিক পুত্র আপনার থাকা ভালো নহে।"

এই বলিয়া কর্ণ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কুন্তীও কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিলেন।

যুদ্ধ আর কিছুতেই থামিল না। সুতরাং তাহার আয়োজন বিধিমতেই হইতে লাগিল। কুরুক্ষেত্রের প্রকাণ্ড মাঠের ভিতর দিয়া হিরণ্বতী নদী বহিতেছে। সেই নদীর ধারে যুধিষ্ঠির তাঁহার সৈন্য সাজাইতে লাগিলেন। দুর্যোধনের লোকেরাও তাহারই সামনে আসিয়া শিবির প্রস্তুত করিল। দেখিতে দেখিতে সেই মাঠের চেহারা এমনি বদলাইয়া গেল যে, তাহাকে চেনা ভার। খাল, পুকুর, রাস্তা, তাঁবু ইত্যাদিতে সে মাঠ নগরের মতো হইয়া গিয়াছে। তাহার ভিতরে মিস্ত্রী, মজুর, পাচক, বৈদ্য কিছুরই অভাব নাই। আটা, ঘি, ডাল, চাউল, ঔষধ-পত্র, কাঠ, কয়লা ইত্যাদি কোনো দরকারি জিনিসেরই ত্রুটি দেখা যায় না।

আর অস্ত্রের কথা কি বলিব? মানুষের বুদ্ধিতে মারিবার যত-রকম উৎকট উপায় হইতে পারে, সকলই প্রস্তুত। রাশি রাশি তোমর (লোহার কাঁটা পরানো ডাণ্ডা) আছে; ইহার ঘায় হাড় গুঁড়া এবং বুক ফোঁড়া এক সঙ্গেই হইতে পারে। ভালো মতে এপিঠ-ওপিঠ করিয়া ফুঁড়িতে হইলে তাহার জন্য শক্তির (লোহার বল্লম) আয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে। পাশ (ফাঁস) আছে আঁটি আঁটি। এ জিনিস শত্রুর গলায় লাগাইয়া টানিলে, বুঝিতেই পার। আর যদি শত্রুর চুলে ধরিয়া টানিয়া তাহাকে কাবু করিতে হয়, তাহার জন্য অসংখ্য 'কচ-গ্রহ-বিক্ষেপ' (লম্বা লাঠির আগায় সাংঘাতিক আঠা) রহিয়াছে। কিংবা যদি আঁকশি লাগাইয়া তাহাকে টানিবার দরকার পড়ে, সে আঁকশিরও ঐ পর্বতাকার ঢিপি! এ অস্ত্রের নাম 'কর-গ্রহ-বিক্ষেপ'। বালি তৈল আর ঝোলা গুড়ের অন্তই নাই। এ-সব জিনিস গরম করিয়া শত্রুর গায় ঢালিয়া দিতে হইবে ; তাহার জন্য এই বড়-বড় হাতাও আছে। মুখবাঁধা ভারী ভারী হাঁড়ির ভিতরে ভয়ানক ভয়ানক সাপ। শত্রুর ভিড়ের মধ্যে এই সকল হাঁড়ি ফেলিয়া দিতে পারিলে বেশ কাজ দেয়! ধূপ-ধূনা জ্বালাইয়া ফেলিতে পারিলেও মন্দ হয় না, তাহার ঢিপি পর্বত প্রমাণ, কুল কাঁটার মতন বাঁকানো কাঁটা পরানো ভয়ানক বল্লম, তাহার নাম 'অঙ্কুশ তোমর', এ অস্ত্র শত্রুর পেটে বিঁধাইয়া টানিলে পেটের ভিতরের জিনিস তখনই বাহির হইয়া আসে।

ইহা ছাড়া, ঢাল, তলোয়ার, খাঁড়া, বর্শা, লাঠি, গদা, তীর, ধনুক প্রভৃতি সাধারণ অস্ত্র যে কত আছে, তাহার তো হিসাবই হয় না। দা, কুড়াল, খুন্তি, কোদাল, এমন কি লাঙ্গ

ল পর্যন্ত বাদ যায় নাই।

এ-সকল অস্ত্র বোধ হয় সাধারণ সৈন্যদের জন্য। বড়-বড় ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা এ-সকল অস্ত্রের কোনো-কোনোটা ব্যবহার করিতেন না, এমন নহে ; মোটের উপর তাঁহাদের যুদ্ধ-কৌশল ইহা অপেক্ষা অনেক উঁচুদরের। আর তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্রও যে অতি আশ্চর্যরকমের, তাহাও আমাদের দেখিতে বাকি নাই।

সকল আয়োজন শেষ হইলে দুর্যোধন জোড়হাতে ভীষ্মকে বলিলেন, "হে পিতামহ! আপনি যুদ্ধবিদ্যায় শুক্রের সমান পণ্ডিত, আপনি আমাদের সেনাপতি হউন। আপনার পশ্চাতে আমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে যাইব।"

ভীষ্ম বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক। তোমাকে কথা দিয়াছি, সুতরাং তোমার হইয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব ; কিন্তু আমার কাছে তোমরা যেমন, পাণ্ডবেরাও তেমনি। এইজন্য আমি কখনো তাহাদিগকে বধ করিতে পারিব না। তোমার অপর শত্রু আমি রোজ হাজার হাজার মারিব।"

কর্ণের বড়ই লম্বা-চওড়া কথা কহিবার অভ্যাস, সেজন্য তিনি ভীষ্মের নিকট অনেক বকুনি খান, কাজেই দুজনের মধ্যে একটু চটাচটি আছে। তাহার উপরে আবার দুর্যোধনের দলের রথী এবং মহারথীদিগের নাম করিতে গিয়া, ভীষ্ম কর্ণকে অর্ধরথ (অর্থাৎ আধখানা রথী) বলাতে এই বিরোধ আরো বাড়িয়া গেল।

শেষে ভীষ্ম বলিলেন, "কর্ণ আমার সঙ্গে বড়ই রেষারেষি করে, আমি তাহার সঙ্গে মিলিয়া যুদ্ধ করিতে পারিব না।" তাহাতে কর্ণ বলিলেন, "আমিও ভীষ্ম থাকিতে এ যুদ্ধে হাত দিতেছি না। উনি মারা যাউন, তারপর আমি অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব।"

এইরূপে দুর্যোধনের পক্ষে ভীষ্মকে সেনাপতি করিয়া অন্যান্য যোদ্ধারা তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

পাণ্ডবদিগের পক্ষে দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী ও জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, এই সাতজনকে সেনাপতি করা হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন হইলেন প্রধান সেনাপতি। ইঁহাদের আবার পরিচালক হইলেন অর্জুন।

এই সময়ে দুর্যোধন একদিন উলুক নামক এক দূতকে বলিলেন, "তুমি পাণ্ডবদিগকে আর কৃষ্ণকে খুব করিয়া গালি দিয়া আইস।"

কিরূপ গালি দিতে হইবে, তাহাও দুর্যোধন অবশ্য বলিয়া দিলেন ; তত কথা লিখিবার স্থান নাই। আর থাকিলেই-বা তাহা লিখিয়া দরকার কি? ভালো কথা হইত, তবে নাহয় লিখিতাম। দুর্যোধনের হুকুম পাওয়ামাত্র উলুক পাণ্ডবদিগের নিকট গিয়া, তাঁহার কথাগুলি অবিকল মুখস্থ বলিয়া দিল।

এই-সকল গালির উত্তরে পাণ্ডবেরা বলিলেন, "উলুক! দুর্যোধনকে বলিবে যে, তাহার উচিত সাজা পাওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আর বেশি বিলম্ব নাই।"

উলুক চলিয়া গেলে পাণ্ডবেরা সৈন্য ভাগ করিয়া গুছাইতে লাগিলেন। বড়-বড় সেনাপতিগণ কে কোন্ কোন্ দলের কর্তা হইবেন, এ-সকল ঠিক করাই সকলের প্রথম কাজ। এ কাজ শেষ হইয়া গেলে আর আয়োজনের কিছুই বাকি রহিল না ; এখন শত্রু

আসিলেই হয়।

দুর্যোধনের দলেও অবশ্য এইরূপ আয়োজন চলিতেছিল। দুই পক্ষের যোদ্ধাদিগের কে কেমন বীর, ভীষ্ম দুর্যোধনকে তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার জন্য আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব। কৃষ্ণই হউন, আর অর্জুন হউন, কাহাকেই আমি সহজে ছাড়িব না। উহাদের মধ্যে কেবল শিখণ্ডীর গায়ে আমি অস্ত্রাঘাত করিতে প্রস্তুত নহি, আর সকলের সহিতই যুদ্ধ করিব।"

এ কথায় দুর্যোধন আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? শিখণ্ডীর গায়ে আপনি যে অস্ত্রাঘাত করিবেন না, তাহার কারণ কি?"

ভীষ্ম বলিলেন, "স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, তাই মারিব না।"

দুর্যোধন বলিলেন, "শিখণ্ডী তো দ্রুপদের পুত্র। সে স্ত্রীলোক হইল কিরূপে?"

ভীষ্ম বলিলেন, "শিখণ্ডীর কথা তবে বলি, শুন। আমার ভাই বিচিত্রবীর্যের সহিত বিবাহ দিবার জন্য আমি কাশীরাজার তিনটি কন্যাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে জোর করিয়া লইয়া আসি। ইহাদের বড়টির নাম অম্বা। অম্বা বলিল, "আমি মনে মনে শাল্বকে বিবাহ করিয়াছি।' কাজেই আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া আর দুটি মেয়ের সহিত ভাই-এর বিবাহ দিলাম।

'অম্বা শাল্বের কাছে গেল, কিন্তু আমি তাহাকে জোর করিয়া আনায় অপমান বোধ করিয়া, আর হয়তো কতকটা আমার ভয়েও, সে তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। এইরূপে সেই কন্যা নিতান্ত দুঃখে পড়িয়া ভাবিল, 'এখন কোথায় যাই? শাল্ব অপমান করিল, পিতার ঘরে গেলেও তাহারা আমাকে ঘৃণা করিবে। হায়! ভীষ্মই আমার এই দুঃখের কারণ! উহাকে শাস্তি দিতে পারিলে তবে আমার মন শান্ত হয়। এই মনে করিয়া সে কত দেশ যে ঘুরিল, কত মুনি-ঋষির নিকট নিজের দুঃখের কথা বলিয়া কাঁদিল। শেষে আমার গুরু পরশুরাম, তাহার প্রতি দয়া করিয়া আমায় শাসন করিতে আসিলেন। তাঁহার সহিত আমার ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে তিনি আমাকে হারাইতে না পারিয়া অম্বাকে বলিলেন, "আমি তো অনেক যুদ্ধ করিলাম, কিন্তু ভীষ্ম আমাকে হারাইয়া দিল। আমার ক্ষমতা নাই, তুমি চলিয়া যাও।"

"তারপর অম্বা, অনেক তপস্যা করিয়া, আমাকে মারিবার জন্য শিবের নিকট বরলাভ করে। সেই বরের জোরে সে এখন শিখণ্ডী হইয়া জন্মিয়াছে। আমি জানি, এ সেই অম্বা—এ পুরুষমানুষ নহে। কাজেই আমি ইহার গায়ে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিব না।"

যুদ্ধের পূর্বে দুর্যোধন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদামহাশয়, আপনি একেলা যথাসাধ্য যুদ্ধ করিলে কত সময়ের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সকল সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে পারেন?"

ভীষ্ম বলিলেন, "আমি ইচ্ছা করিলে এক মাসে পাণ্ডবদের সকল সৈন্য মারিতে পারি।"

এই কথা একে একে দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা আর কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলে, দ্রোণ

বলিলেন, "আমিও এক মাসে পারি।"

কৃপ বলিলেন, "আমার দুমাস লাগে।"

অশ্বত্থামা বলিলেন, "আমার দশদিন লাগে।"

কর্ণ বলিলেন, "আমি পাঁচদিনেই উহাদের সকল সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে পারি।"

কর্ণের কথা শুনিয়া ভীষ্ম হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অর্জুনের সঙ্গে কিনা এখনো দেখা হয় নাই, তাই তুমি এমন কথা বলিতেছ।"

যুধিষ্ঠিরের চরেরা ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির এই-সকল কথা শুনিয়া তাহা যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া বলাতে, তিনি অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অর্জুন, তুমি কতক্ষণে কৌরবদিগের সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে পার?"

অর্জুন বলিলেন, "কৃষ্ণ সহায় থাকিলে, আমি এক নিমেষে সকল শেষ করিয়া দিতে পারি। শিব আমাকে পাশুপত নামক যে অস্ত্র দিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট আছে। ইহা দিয়া তিনি প্রলয়ের সময়ে সকল সৃষ্টি নাশ করেন। এ অস্ত্রের সংকেত ভীষ্মও জানেন না, দ্রোণও জানেন না; কৃপ অশ্বত্থামা বা কর্ণও জানেন না। এ-সকল বড় বড় অস্ত্র সাধারণ যুদ্ধে ব্যবহার করিতে নাই। আমরা সাদাসিধা যুদ্ধ করিয়াই জয়লাভ করিব।"

কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমভাগে দুর্যোধনের শিবির হইয়াছিল। যুদ্ধের দিনের নির্মল প্রভাতে, তাঁহার লোকেরা স্নানান্তে মালা আর সাদা কাপড় পরিয়া অসীম উৎসাহভরে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মাঠের পূর্বভাগে পশ্চিমমুখ হইয়া যুধিষ্ঠিরের দলও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সহস্র সহস্র ঢাক আর অযুত শঙ্খ মহাঘোররবে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে।

# ভীষ্মপর্ব

দ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্বে এইরূপ নিয়ম হইল যে, যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলিয়া যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়াছে, যে আশ্রয় চাহিতেছে, আর যে অন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত, এরূপ লোককে কেহ বধ করিবে না। যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময় দুই দলের লোকই বন্ধুর মতো ব্যবহার করিবে। গালির উত্তরে শুধু গালিই দিবে, অস্ত্রাঘাত করিবে না। যুদ্ধের স্থান হইতে কেহ বাহির হইয়া গেলে, আর তাহাকে মারিবে না। রথী রথীর সহিত, হাতি হাতির সহিত, ঘোড়া ঘোড়ার সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, এইভাবে যুদ্ধ হইবে। মারিবার সময় বলিয়া মারিবে। অচেতন লোককে, আর সারথি, সহিস, অস্ত্রবাহক, বাজনদার ইহাদিগকে কখনো প্রহার করিবে না।

এই সময়ে, ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত জানিয়া, ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিতে আসিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের তখন নিতান্তই দুঃখের অবস্থা। পুত্রগণের ব্যবহার, আর যুদ্ধের ভীষণ ফলের কথা ভাবিয়া তিনি আর কুল কিনারা পাইতেছেন না। এমন সময় ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "যাহা হইবার, তাহা হইবেই ; তুমি দুঃখ করিও না। যদি যুদ্ধ দেখিতে চাও, আমি তোমাকে চক্ষু দিতে পারি।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আত্মীয়গণের মৃত্যু আমি দেখিতে পারিব না। আপনার কৃপায় যুদ্ধের সকল সংবাদ যেন শুনিতে পাই।"

এ কথায় ব্যাস সঞ্জয়কে দেখাইয়া বলিলেন, "তোমার এই সঞ্জয়ের নিকট তুমি সকল কথাই শুনিতে পাইবে। আমার বরে, যুদ্ধের কোনো সংবাদই ইহার অজানা থাকিবে না। দেখা হউক, অদেখা হউক, সকল ঘটনাই, এমন কি লোকের মনের কথা পর্যন্ত, সে জানিতে পারিয়া তোমাকে শুনাইবে। যুদ্ধের ভিতর গিয়াও সে সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিবে ; অস্ত্রে তাহার কোনো অনিষ্ট হইবে না।"

এই কথা বলিয়া ব্যাসদেব আবার ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "এ কাজটা ভালো হইতেছে না ; তুমি ইহাদিগকে বারণ কর। তোমার রাজ্যের এতটা কি প্রয়োজন যে, তাহার জন্য এমন পাপ করিতে যাইতেছ? পাণ্ডবদের রাজ্য তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমি তো যাহাতে ধর্ম হয় তাহাই চাই, কিন্তু উহারা যে আমার কথা শুনে না।"

এইরূপ কথাবার্তার খানিক পরে ব্যাসদেব সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে পাণ্ডব ও কৌরবদিগের সৈন্য সকল যুদ্ধক্ষেত্রে সামনাসামনি ব্যূহ বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে ; যুদ্ধ আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই।

'ব্যূহ' বাঁধা কাহাকে বলে জান? সৈন্যেরা তো যুদ্ধের সময় তাহাদের ইচ্ছামত এলোমেলো ভাবে দাঁড়াইতে পায় না ; তাহাদিগকে কোনো একটা বিশেষ নিয়মে, বেশ জমাটরূপে গুছাইয়া দাঁড় করাইতে হয়। এইরূপ কায়দা করিয়া দাঁড়ানোর নাম 'ব্যূহ'। এক-এক রকম ব্যূহের এক-এক রকম নাম ; যেমন 'চক্র' ব্যূহ, 'গরুড়' ব্যূহ ইত্যাদি।

পাণ্ডবদিগের ব্যূহ দেখিয়া দুর্যোধন দ্রোণকে বলিলেন, 'গুরুদেব! দেখুন পাণ্ডবদের কত সৈন্য ; ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদের ব্যূহ নির্মাণ করিয়াছে। উহাদের দলে খুব বড় বীর আছে; তেমনি আমাদেরও তাহার চেয়ে বেশি আছে। তাহা ছাড়া, আমাদের সৈন্য ঢের, উহাদের সৈন্য কম। আমাদের ব্যূহের মাঝখানে ভীষ্ম রহিয়াছেন ; তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যূহে ঢুকিবার পথে পথে আপনারা সকলে আছেন।"

এ কথা শুনিয়া ভীষ্ম সিংহনাদপূর্বক তাঁহার শঙ্খে ফুঁ দিলেন। সেই শঙ্খের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার শঙ্খ, শিঙ্গা, ঢাক প্রভৃতি বাজিয়া রণস্থলে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিল।

ইহার উত্তরে পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইতে কৃষ্ণের 'পাঞ্চজন্য', অর্জুনের 'দেবদত্ত', ভীমের 'পৌণ্ড্র', যুধিষ্ঠিরের 'অনন্তবিজয়', নকুলের 'সুঘোষ', আর সহদেবের 'মণিপুষ্পক' নামক মহাশঙ্খের ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রভৃতি সকলের শঙ্খের শব্দ মিলিয়া আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া কৌরবদিগের আতঙ্ক জন্মাইয়া দিল।

তখন অর্জুন গাণ্ডীব হাতে করিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, "একবার দুই দলের মাঝখানে রথ লইয়া চলুন, কে কে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে—দেখিয়া লই।"

এ কথায় কৃষ্ণ দুই দলের মাঝখানে রথ লইয়া গেলে, অর্জুন দেখিলেন যে, খুড়া, জ্যাঠা, মামা, ভাই, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, বন্ধু প্রভৃতি যত ভক্তি, মান্য, স্নেহ এবং ভালোবাসার পাত্র, সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ; রাজ্যের জন্য সকলেই কাটাকাটি করিয়া প্রাণ দিতে আসিয়াছে। ইহা দেখিয়া দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণকে বলিলেন, "হায়! আমি কাহাকে মারিয়া রাজ্য লইতে আসিয়াছি। এমন রাজ্য পাইয়া ফল কি? এইরূপ ভয়ানক পাপ করার চেয়ে, শত্রুর হাতে মারা যাওয়াই ভালো।"

এই বলিয়া তিনি গাণ্ডীব ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সেদিন কৃষ্ণ সঙ্গে না থাকিলে আর কি অর্জুনের যুদ্ধ করা হইত? তাঁহার মনের দুঃখ দূর করিয়া, তাঁহাদ্বারা যুদ্ধ করাইতে কৃষ্ণকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে যে-সকল উপদেশ দেন, তাহাতে 'ভগবদ্‌গীতা' নামক অমূল্য পুস্তকই হইয়া গিয়াছে; বড় হইয়া তোমরা তাহা পড়িবে। যাহা হউক, কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের মন শান্ত হওয়াতে, আবার তাঁহার যুদ্ধের উৎসাহ আসিল।

এমন সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির, বর্ম আর অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক রথ হইতে নামিয়া,

কিসের জন্য ভীষ্মের রথের দিকে হাঁটিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব আর অন্যান্য বীরেরাও তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছেন ; কিন্তু ইঁহাদের কেহই যুধিষ্ঠিরের কার্যের অর্থ বুঝিতে পারিতেছেন না। ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব বলিলেন, "দাদা! যুদ্ধ আরম্ভ হয়-হয়, এমন সময় আপনি আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়াছেন?"

যুধিষ্ঠির তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু কথা বলিলেন না। তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাদিগকে বলিলেন, "উনি যুদ্ধারম্ভের পূর্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিতে চলিয়াছেন, ইহাতে উঁহার জয়লাভ হইবে।"

এদিকে কৌরবপক্ষের লোকেরাও যুধিষ্ঠিরের ঐরূপ করিতে দেখিয়া নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বলিল, 'কাপুরুষ! ভয় পাইয়াছে!' কেহ বলিল 'তাই ভীষ্মের পায়ে ধরিতে চলিয়াছে!' কেহ বলিল, 'এমন সব ভাই থাকিতে এত ভয়, ছিঃ!"

যাহা হউক, যুধিষ্ঠির ততক্ষণে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "দাদামহাশয়! আপনার সহিত যুদ্ধ করিব, অনুমতি দিন আর আশীর্বাদ করুন।"

ভীষ্ম বলিলেন, "আশীর্বাদ করি ভাই, তোমার জয় হউক! তুমি না আসিলে হয়তো আমার রাগ থাকিত, কিন্তু তুমি আসাতে বড়ই সুখী হইলাম। বল, তোমার আর কি চাই। ভাই, মানুষ টাকার দাস। দুর্যোধনের টাকায় আমি আটকা পড়িয়াছি, কাজেই তোমার হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিব না। আর যাহা চাও, তাহাই দিব।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আপনাকে কি করিয়া পরাজয় করিব, দয়া করিয়া তাহা বলিয়া দিন।"

ভীষ্ম বলিলেন, "আমাকে পরাজয় করার সাধ্য কাহারো নাই, আর এখন আমার মরিবার সময়ও উপস্থিত হয় নাই। তুমি আবার আমার নিকট আসিও।"

তখন যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া দ্রোণের নিকট গেলেন। দ্রোণের সহিতও তাঁহার ঐরূপ কথাবার্তা হইল। তাঁহাকে পরাজয় করিবার উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে দ্রোণ বলিলেন, "আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না; আমাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা কর। সত্যবাদী লোকের মুখে নিতান্ত অপ্রিয় সংবাদ শুনিলেই, আমি অস্ত্র ছাড়িয়া দিব। এমনি সময় আমাকে মারিবার সুযোগ।"

সেখান হইতে যুধিষ্ঠির কৃপের নিকট গেলেন। সেখানেও ঐরূপ কথাবার্তা হইল। কৃপ বলিলেন, "আমি অমর, আমাকে মারা সম্ভব হইবে না। কিন্তু তথাপি নিশ্চয় তোমার জয় হইবে ; আমি সর্বদা তোমাকে আশীর্বাদ করিব।"

কৃপের নিকট হইতে যুধিষ্ঠির শল্যের নিকট গেলেন এবং যুদ্ধের সময় কর্ণের তেজ কমাইয়া দিবার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। শল্য বলিলেন, "আমি তাহা নিশ্চয় করিব। নির্ভয়ে যুদ্ধ কর, তোমার জয় অবশ্য হইবে।"

ইহার মধ্যে কৃষ্ণ কর্ণকে বলিলেন, "কর্ণ, ভীষ্ম থাকিতে তো তুমি আর এ পক্ষে

যুদ্ধ করিতেছ না, ততদিন আমাদের পক্ষে হইয়া যুদ্ধ কর না কেন?"

এ কথার উত্তরে কর্ণ বলিলেন, "আমি কিছুতেই দুর্যোধনের অনিষ্ট করিতে পারিব না।"

ফিরিয়া আসিবার সময় যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে কৌরবদিগকে বলিলেন, "এখানে যদি আমার বন্ধু কেহ থাকেন, তবে তিনি আসুন ; আমরা পরম আদরে তাঁহাকে আমাদের দলে লইব।"

এ কথায় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র যুযুৎসু আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার হইয়া যুদ্ধ করিব।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এস ভাই। তুমি আমাদের হইলে।"

তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যে কি ভয়ানক যুদ্ধ, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য আমার নাই। সে যুদ্ধে বৃষ্টির ধারার ন্যায় ক্রমাগত বাণ পড়িয়াছিল ; ঝড়ের সময় যেমন গাছের ফল পড়ে, সেইরূপ করিয়া লোকের মাথা কাটিয়া পড়িয়াছিল, কাটা মানুষের পাহাড় হইতে রক্তের নদী বহিয়া চলিয়াছিল। তখনকার ভয়ানক শব্দের কথা আর কি বলিব! তেমন শব্দ আর কখনো হয় নাই।

সে সময়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন, ভীম প্রভৃতি বড়-বড় যোদ্ধাদের বীরত্ব ও ক্ষমতা দেখিয়া, দেবতারা পর্যন্ত আশ্চর্য হইয়া যান। অনেকবারই তাঁহাদিগকে এ কথা মানিতে হইয়াছে যে, 'এমন অদ্ভুত কাজ আমরাও করিতে পারি কি না সন্দেহ।' ইঁহাদের এক-একজনে যখন রাগিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন শত যোদ্ধা মিলিয়াও তাঁহাকে আটকাইতে পারে নাই। হাজার হাজার লোক মারিয়া তবে তাঁহারা থামিয়াছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ বা অর্জুনের এক-এক বাণে, অথবা ভীমের এক-এক গদাঘাতে, এক-একটা হাতি তৎক্ষণাৎ মারা যাইতে ক্রমাগতই দেখা গিয়াছে।

পাণ্ডবদের পুত্রেরাই কি কম যুদ্ধ করিয়াছিলেন? অভিমন্যুর যুদ্ধ দেখিয়া ভীষ্ম প্রভৃতিরা বার বার বলিয়াছেন, "ঠিক যেন অর্জুন!" ভীষ্মের সহিত তাঁহার খুবই যুদ্ধ হয়। তখন ভীষ্ম অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কিছু করিতে পারেন নাই। অভিমন্যু তাঁহার সমুদয় বাণ কাটিয়া রথের ধ্বজ উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

আহা! উত্তরের কথা মনে করিয়া বাস্তবিকই দুঃখ হয়। বেচারা সেদিন ভালো করিয়া যুদ্ধ করিতে না করিতেই শল্যের হাতে মারা গেলেন। তিনি এক প্রকাণ্ড হাতিতে চড়িয়া শল্যকে আক্রমণ করেন। হাতি শল্যের রথের ঘোড়াগুলিকে মারিয়া ফেলিল। কিন্তু শল্য তাহার পরেই উত্তরকে এমন ভয়ঙ্কর একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহা তাঁহার বর্ম ভেদ করিয়া, একেবারে তাঁহার দেহের ভিতর ঢুকিয়া গেল। সেই শক্তির ঘায়েই উত্তর হাতি হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

উত্তরের দাদা শ্বেত ইহাতে অসহ্য শোক পাইয়া রাগের সহিত কৌরবদিগকে আক্রমণ করেন। খানিক যুদ্ধের পর একটা ভয়ানক বাণের ঘায় তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলে, তাঁহার সারথি তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করে। কিন্তু অল্পক্ষণের ভিতরেই তিনি আবার আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এবার তিনি শল্যকে এমন তেজের সহিত আক্রমণ

করিলেন যে, ভীষ্ম প্রভৃতি বীরেরা আসিয়া সাহায্য না করিলে, শল্যের প্রাণরক্ষা করাই কঠিন হইত। ভীষ্মের দল আসাতে শল্যও বাঁচিয়া গেলেন, আর যুদ্ধও আবার অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। সেই যুদ্ধে ভীষ্ম কত লোককে যে মারিলেন, তাহার সংখ্যা নাই।

শ্বেতও সেই সময়ে অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। সৈন্যেরা তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, ভীষ্মের নিকট গিয়া আশ্রয় লয়। ভীষ্ম ছাড়া আর কেহই শ্বেতের সম্মুখে স্থির থাকিতে পারেন নাই। এমন-কি, ভীষ্মও এক-একবার শ্বেতের হাতে রীতিমত জব্দ হইতে লাগিলেন। একবার তো সকলে মনে করিল, বুঝি-বা শ্বেতের হাতে তাঁহার মৃত্যুই হয়।

তখন ভীষ্ম যারপরনাই রাগের সহিত শ্বেতকে অনেকগুলি বাণ মারিলেন ; শ্বেতও তাহার সব আটকাইয়া, ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন। ভীষ্ম অমনি আর-এক ধনুক লইয়া, শ্বেতের রথের ঘোড়া ধ্বজ আর সারথিকে মারিয়া ফেলাতে কাজেই তাঁহাকে রথ হইতে লাফাইয়া পড়িতে হইল। তখন তিনি ধনুক রাখিয়া ভীষ্মকে একটা ভয়ঙ্কর শক্তি ছুঁড়িয়া মারেন, কিন্তু তাহা ভীষ্মের বাণে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। শক্তি বৃথা হওয়ায়, শ্বেত গদা লইয়া যেই ভীষ্মের উপরে তাহা ছুঁড়িতে যাইবেন, অমনি ভীষ্ম তাহা এড়াইবার জন্য রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। সে গদা রথের উপরে পড়িলে আর রথ, ঘোড়া সারথি, কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

এদিকে দ্রোণ, কৃপ, শল্য প্রভৃতি যোদ্ধারা ভীষ্মের সাহায্যের জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ; ভীষ্মের নূতন রথ আসিয়াছে। শ্বেতের পক্ষেও সাত্যকি, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং কিছুকাল সকলে মিলিয়া আবার যুদ্ধ চলিল। এমন সময় ভীষ্ম কি যে এক সাংঘাতিক বাণ ছুঁড়িয়া বসিলেন, শ্বেতের তাহা বারণ করিবার কোনো ক্ষমতা হইল না। সে বাণ তাঁহার বর্ম ও শরীর ভেদ করিয়া মাটির ভিতর ঢুকিয়া গেল।

শ্বেতের মৃত্যুর পর সেদিন আর পাণ্ডবদের যুদ্ধে উৎসাহ রহিল না। এদিকে ভীষ্ম, শ্বেতকে মারিয়া, এতই তেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, মনে হইল, বুঝি এখনি তিনি সকলকে মারিয়া শেষ করেন। তখন সন্ধ্যাও হইয়াছিল, কাজেই যুধিষ্ঠির সেদিনের মতন যুদ্ধ শেষ করিয়া দিয়া দুঃখের সহিত শিবিরে ফিরিলেন।

সে রাত্রিতে যুধিষ্ঠিরের মনে বড়ই চিন্তা হইতে লাগিল। তিনি সকলকে বলিলেন, "এমনভাবে বন্ধুবান্ধবকে মরিতে দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। কাল হইতে তোমরা আরো ভালো করিয়া যুদ্ধ কর।"

যুধিষ্ঠিরের চিন্তা দেখিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার মন অনেকটা শান্ত হওয়ায়, পরদিনের যুদ্ধের পরামর্শ আরম্ভ হইল। তখন যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন, "এবারে 'ক্রৌঞ্চারুণ' ব্যূহ করিয়া সৈন্য সাজাইবে।"

পরদিন 'ক্রৌঞ্চারুণ' ব্যূহ করিয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্য সাজানো হইল। কৌরবেরাও তাহাদের সৈন্য দিয়া অন্যরূপ এক ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। সেদিনকার যুদ্ধ নিতান্তই ভয়ানক হইয়াছিল।

সেইদিন অর্জুনের যুদ্ধে কৌরবেরা বড়ই অস্থির হইয়া উঠে। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন ভীষ্মকে বলিলেন, "দাদামহাশয়! আপনারা থাকিতে কি অর্জুন সব সৈন্য মারিয়া শেষ করিবে? একটু ভালো করিয়া যুদ্ধ করুন।"

তখন অর্জুন আর ভীষ্মে এমনি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল যে, তেমন যুদ্ধ আর হয় নাই। সে যুদ্ধ দেখিয়া অন্য সকলের উৎসাহ বাড়িয়া যাওয়াতে, তাহারা পাগলের মতো হইয়া কাটাকাটি আরম্ভ করিল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রোণেও সেদিন কম যুদ্ধ হয় নাই। যুদ্ধ করিতে করিতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ঘোড়া আর ধনুক কাটা গেল। তখন তিনি ভাবিলেন যে, গদা লইয়া দ্রোণকে আক্রমণ করিবেন। কিন্তু রথ হইতে নামিবার পূর্বেই দ্রোণ সেই মহাগদা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন ঢাল তলোয়ার লইয়া দ্রোণকে মারিতে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার বাণের মুখে অগ্রসর হয়, কাহার সাধ্য? ধৃষ্টদ্যুম্ন ঢাল দিয়া বাণ কাটাইতে ব্যস্ত রহিলেন। তাঁহার আর যুদ্ধ করা হইল না।

এই সময় ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্য করিতে আসিয়া কি অদ্ভুত কাণ্ডই দেখাইলেন! কলিঙ্গ আর তাঁহার পুত্র শত্রুদেব কিছুকাল তাঁহার সহিত খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এমন-কি, তাঁহাদের ভয়ে তাঁহার সঙ্গের চেদি দেশীয় সৈন্যগুলি তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিতেও ত্রুটি করে নাই। শত্রুদেব ভীমের ঘোড়া অবধি মারিয়া ফেলেন। কিন্তু তাহার পরেই ভীম এমন গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহাতে শত্রুদেব আর তাঁহার সারথির শরীর চূর্ণ হইয়া গেল।

তারপর ভানুমানের সহিত ভীমের যুদ্ধ হয়। ভানুমান ছিলেন হাতির উপরে আর ভীম মাটির উপরে। ভীম খড়্গ হাতে একলাফে সেই হাতির উপরে উঠিয়া ভানুমান এবং হাতি উভয়কেই কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর ভীম, হাতি, ঘোড়া যাহা পান, তাহাই খড়্গ দিয়া খণ্ড খণ্ড করেন। লাথির চোটে কত মানুষ পুঁতিয়া গেল। হাঁটুর গুঁতায় কত যোদ্ধা ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। এ-সকল কাণ্ড দেখিয়া কে কোথায় পলাইবে, তাহার ঠিকানাই রহিল না।

তারপর ভীম কলিঙ্গ আর কেতুমানকে মারিয়া, দুইহাজার সাতশত কলিঙ্গ সেনা বধ করিলেন।

আর-একস্থানে দুর্যোধন অনেক যোদ্ধা লইয়া অভিমন্যুকে ঘিরিয়াছেন। অভিমন্যুর তাহাতে কিছুমাত্র ভয় হয় নাই। কিন্তু অর্জুন যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্রকে দুরাত্মারা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, তখন আর তিনি তাঁহার কাছে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। এদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বড়-বড় বীরেরা অর্জুনকে আটকাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। তখন অর্জুন এমনি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহাকে আটকান দূরে থাকুক, উহাদের নিজের প্রাণ বাঁচানোই ভার হইল। চারিদিকে খালি যোদ্ধাদের মাথা কাটিয়া পড়িতেছে, ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, ভীষ্ম তাড়াতাড়ি দ্রোণাচার্যকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ঐ দেখ, অর্জুন কি আরম্ভ করিয়াছে! আজ আর উহার সঙ্গে পারা যাইবে না। বেলাও শেষ হইয়াছে; শীঘ্র যুদ্ধ থামাইয়া দাও!"

কাজেই তখন যুদ্ধ শেষের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল ; কৌরব সৈন্যরাও বলিল, "আঃ বাঁচিলাম!"

পরদিন কৌরবেরা 'গরুড়' ও পাণ্ডবেরা 'অর্ধচন্দ্র' ব্যূহ করিয়া সৈন্য সাজাইলেন। সেদিন ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ভীম, ঘটোৎকচ ধৃষ্টদ্যুম্ন যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব প্রভৃতি সকলেই খুব যুদ্ধ করেন। যুধিষ্ঠির আর ধৃষ্টদ্যুম্ন এমনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, ভীষ্ম আর দ্রোণ দুজনে মিলিয়াও তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে পারেন নাই। কৌরব-সৈন্যেরা ভীষ্ম দ্রোণের কথা না শুনিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে পলাইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া দুর্যোধন ভীষ্মকে বলিলেন, "সৈন্য সব মারা যাইতেছে, আর আপনারা চুপ করিয়া আছেন! ইহাতে বোধ হয়, পাণ্ডবদের উপকার করাই আপনাদের উদ্দেশ্য। এমন জানিলে আমি কখনোই যুদ্ধ করিতে আসিতাম না।"

এ কথায় ভীষ্ম বলিলেন, "পাণ্ডবেরা যে কত বড় বীর, তাহা তোমাকে বার বার বলিয়াছি। আমি বুড়া মানুষ, তথাপি আমার যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতেছি, দেখ।"

এই বলিয়া ভীষ্ম ক্রোধভরে এমনি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, কাহার সাধ্য তাঁহার সামনে দাঁড়ায়! চারিদিকে কেবল 'হায় হায়!' 'রক্ষা কর!' 'বাবা গো!' এইরূপ শব্দ। পাণ্ডবপক্ষের এক-এক যোদ্ধার নাম করিয়া তিনি বলেন, "এই তোমাকে কাটিলাম!" আর অমনি তাহার মাথা কাটিয়া পড়ে! সেই বুড়া মানুষ তখন এমনি বেগের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন যে, তাঁহার বাণই কেবল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, 'অর্জুন! এই তো সময়! তুমি বলিয়াছিলে ভীষ্ম, দ্রোণ, সকলকে মারিবে ; এখন তোমার কথা রাখ।"

অর্জুন বলিলেন, "শীঘ্র ভীষ্মের নিকট রথ লইয়া চলুন।"

কিন্তু অর্জুন অনেক যুদ্ধ করিয়াও ভীষ্মকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। বুড়া বাণে বাণে কৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, যুদ্ধ করিবেন না। কিন্তু ভীষ্মের কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, চুপ করিয়া থাকিলে-বা তিনি এখনই পাণ্ডবদিগের সকলকে মারিয়া শেষ করেন। কাজেই তিনি রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, "আজই আমি কৌরবদিগের সকলকে মারিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিব।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার সেই সুদর্শন চক্র নামক আশ্চর্য অস্ত্র হাতে ভীষ্মকে মারিবার জন্য ছুটিয়া চলিলেন। ভীষ্মের তাহাতে কিছুমাত্র ভয় বা দুঃখের চিহ্ন দেখা গেল না। তিনি কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, তোমার হাতে মরিলে তো আমি অমনি স্বর্গে যাইব। এখনই আমাকে কাট।"

এমন সময় অর্জুন, নিতান্ত লজ্জিত ও কাতরভাবে আসিয়া কৃষ্ণের পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "আপনি শান্ত হউন, আমি আর যুদ্ধে অবহেলা করিব না।"

এ কথায় কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া, আবার আসিয়া ঘোড়ার রাশ হাতে লইলেন। ইহার

পর সন্ধ্যা পর্যন্ত অর্জুন যে কি ভীষণ যুদ্ধ করিলেন, তাহা আর কি বলিব। তাঁহার গাণ্ডীব হইতে অদ্ভুত ইন্দ্র-অস্ত্র এবং আগুনের মতন উজ্জ্বল আরো অসংখ্য বাণ উল্কা ধারার ন্যায় অবিরাম ছুটিয়া গিয়া কৌরবদিগকে ধানের মতো কাটিতে লাগিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, ভূরিশ্রবা বাহ্লীক প্রভৃতি সকলে হারিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া কৌরব-সৈন্যেরা সেই যে রণস্থল হইতে চ্যাঁচাইয়া ছুট দিল, আর শিবিরের ভিতরে না গিয়া থামিল না।

পরদিন আবার মহারণ আরম্ভ হইল। প্রথমে ভীষ্ম, অর্জুন আর অভিমন্যু প্রভৃতি ঘোর যুদ্ধ করেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন কিছুকাল সাংযমনির পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া, গদাঘাতে তাঁহার মাথা গুঁড়া করিয়া দেন।

কিন্তু সেদিনকার যুদ্ধে বাস্তবিক ভয়ানক কাণ্ড যদি কেহ করিয়া থাকেন, তবে সে ভীম! ভীম গদা হাতে হাতি, ঘোড়া, রথী, পদাতি সকলকে পিষিতে আরম্ভ করিলে দুর্যোধন তাঁহাকে মারিবার জন্য অনেকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দেন। সে-সকল সৈন্য মারা গেলে, কিছুকাল ভীষ্ম আর অলম্বুষের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ চলে। তারপর দুর্যোধনের সহিত ভীমের দেখা হয়। দুর্যোধন একবার বাণাঘাতে ভীমকে অজ্ঞান করিয়া দেন। ভীম অবিলম্বে আবার উঠিয়া দুর্যোধনকে মারেন আট বাণ, আর শল্যকে পঁচিশ। শল্য বেগতিক দেখিয়া তখনই পলায়ন করিলেন।

তখন সেনানী, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, আলোপুর, দুর্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট এবং সম নামক দুর্যোধনের চৌদ্দ ভাই একসঙ্গে আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করেন। ভীমের তাহাতে সন্তোষ ভিন্ন অসন্তোষের কোনো কারণ ছিল না। তিনি তাঁহাদিগকে হাতের কাছে পাইয়া, মনের সুখে এক-একটি করিয়া সংহার করিতে লাগিলেন। প্রথমে সেনানী, তারপর জলসন্ধ, তারপর সুষেণ, তারপর উগ্র, বীরবাহু, ভীমরথ, সুলোচন—দেখিতে দেখিতে সাতটির প্রাণ গেল। ইহার পর আর বাকি সাতটির ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন ভিন্ন উপায় রহিল না।

এ-সকল কাণ্ড দেখিয়া ভীষ্ম কৌরবদিগকে কহিলেন, "ঐ দেখ, ভীম বোকাগুলিকে পাইয়া একেবারে শেষ করিল! তোমরা শীঘ্র যাও।"

সে কথায় ভগদত্ত ভীমকে আক্রমণ করিয়া, খানিক যুদ্ধের পর, একেবারে তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলেন। ভীম অজ্ঞান হওয়ামাত্রেই বিশাল বিশাল হাতির উপরে অগণ্য রাক্ষস লইয়া ঘোর বেগে ঘটোৎকচ আসিয়া উপস্থিত। তখন ভগদত্তকে বাঁচানোই কঠিন হইল। ততক্ষণে সন্ধ্যাও হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং ভীষ্ম তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করিয়া সেদিনকার মতন কৌরবদিগকে ঘটোৎকচের হাত হইতে রক্ষা করিলেন।

পরদিন প্রভাতে কৌরবেরা 'মকর' ব্যূহ ও পাণ্ডবেরা 'শোন' ব্যূহ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে ভীমার্জুন আর ভীষ্মের যুদ্ধ হইল, তারপর দ্রোণ আর সাত্যকির। সাত্যকি দ্রোণের হাতে একটু জব্দ হইয়া আসিলে ভীম দ্রোণকে অনেক বাণ মারিয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া দেন। ইহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ আর শল্য রোষভরে ভীমকে আক্রমণ করায়

অভিমন্যু দ্রৌপদীর পুত্রগণ সহ ভীমের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এমন সময় শিখণ্ডী ধনুর্বাণ হাতে ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ভীষ্ম তো আর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। শিখণ্ডী যতই বাণ মারেন, ভীষ্মের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। ততক্ষণে দ্রোণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, শিখণ্ডীকে পলায়ন করিতে হইল।

তারপর সকলে যুদ্ধে মাতিয়া রণস্থলে ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত করিলেন। বেলা যায়, তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই। সেদিন সাত্যকি দুর্যোধনের অনেক সৈন্য মারেন। দুর্যোধন দশহাজার সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাকে থামাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই দশহাজার সৈন্যও তাঁহার হাতে মারা গেল।

এই সময়ে ভূরিশ্রবা আসিয়া সাত্যকিকে ঘোরতর রূপে আক্রমণ করাতে তাঁহার সঙ্গের লোকেরা তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। সাত্যকির দশ পুত্র তাঁহার সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু ভূরিশ্রবার বজ্রসম বাণের আঘাতে, দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের দেহ চূর্ণ হইয়া গেল। তারপর বেলা আর অতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই, অর্জুন পঁচিশ হাজার মহারথী মারিয়া শেষ করিলেন। এইরূপে সেদিনকার যুদ্ধ শেষ হইল।

পরদিন পাণ্ডবদের 'মকর' ব্যূহ এবং কৌরবদের 'ক্রৌঞ্চ' ব্যূহ করিয়া সৈন্য সাজানো হইল। সেদিনকার যুদ্ধে ভীম এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের যে বীরত্ব দেখা গিয়াছিল, তাহার তুলনা দুর্লভ। ভীমকে দেখিতে পাইয়াই দুঃশাসন তাঁহার আর বারোটি ভাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "এস ভাইসকল। আজ ইহাকে মারিব!'

তখন হাজার হাজার রথী লইয়া তেরো বীর ভীমকে আক্রমণ করিলেন। ভীমের তাহা গ্রাহ্যই হইল না ; তিনি ভাবিলেন 'আগে রথীগুলিকে শেষ করিয়া লই!' তারপর তিনি গদা হাতে রথ হইতে নামিয়া, একদিক হইতে কৌরব-সৈন্য মারিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ করিতে করিতে সেখানে আসিয়া ভীমের শূন্য রথখানি দেখিয়া ব্যস্তভাবে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হায়! হায়! শূন্য রথ কেন? ভীম কোথায়?"

সারথি বলিল, "তিনি কৌরব মারিবার জন্য গদা হাতে নামিয়া গিয়াছেন।

ভীম যে পথে গিয়াছেন, গদার ঘায় ক্রমাগত হাতি মারিয়া গিয়াছেন। সেই হাতিগুলি দেখিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইল না। ভীম তখন ছোট সৈন্য শেষ করিয়া রাজা মারিতে ব্যস্ত। অতঃপর তাঁহারা দুজনে, মিলিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে দুর্যোধনের কতকগুলি ভাই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন সম্মোহন অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে অজ্ঞান করিয়া ফেলাতে বেচারারা যুদ্ধ করিতে পাইল না!

ইহার পর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া পাণ্ডবদিগকে বড়ই অস্থির করিয়া তোলেন। পাণ্ডবগণ কিছুতেই তখন তাঁহাকে বারণ করিতে পারেন নাই। তারপর ভীষ্ম আর অর্জুনে কিছুকাল ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এইরূপে সমস্ত দিনই নানা স্থানে তুমুল

যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কোনো ঘটনা সেদিন ঘটে নাই।

সেদিনকার যুদ্ধ শেষ হইলে, যুধিষ্ঠির ভীম আর ধৃষ্টদ্যুম্নকে আদর করিয়া মনের সুখে শিবিরে গেলেন।

পরদিন কৌরবদিগের হইল 'মণ্ডপ' ব্যূহ আর পাণ্ডবদের 'বজ্র' ব্যূহ। সেদিন প্রথম বেলায় বিরাটের পুত্র শঙ্খ দ্রোণের হাতে মারা যান।

সাত্যকি আর অলম্বুষে সেদিন খুব যুদ্ধ হইয়াছিল। অলম্বুষ রাক্ষস, ঘোর মায়াবী। তাই সে আগে মায়া দ্বারা সাত্যকিকে ভুলাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু সাত্যকি অর্জুনের ছাত্র, তাঁহার নিকট ইন্দ্র-অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন ; সেই-ইন্দ্র-অস্ত্র দিয়া তিনি রাক্ষসের সকল মায়া উড়াইয়া দিলেন। তখন সে পলাইতে পারিলে বাঁচে।

অর্জুনের পুত্র ইরাবান, বিন্দ ও অনুবিন্দের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করেন। ঘটোৎকচ ভগদত্তকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগদত্ত অসাধারণ যোদ্ধা। তাহার যুদ্ধ কেহ সহিতে পারেন না। ঘটোৎকচ কিছুকাল তাহার সহিত খুব তেজের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

শল্য সেদিন নকুল ও সহদেবকে আক্রমণ করিতে গিয়া, শেষে একটু জব্দ হন। মেঘ যেমন সূর্যকে ঢাকে, সহদেব তেমনি করিয়া বাণের দ্বারা শল্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলেন। শল্য সহদেবের মামা ; কাজেই তাঁহার বাণে আচ্ছন্ন হইয়াও তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। খানিক বেশ জোরের সহিতই যুদ্ধ চলিয়াছিল। তারপর সহদেবের এক বাণ খাইয়া শল্য আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সারথি দেখিল, মদ্ররাজ অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং সে রথ লইয়া প্রস্থান করিল।

বেলা দুই প্রহরের সময় শ্রুতায়ু যুধিষ্ঠিরের বাণ খাইয়া পলায়ন করেন। ভীষ্ম, দ্রোণ আর অর্জুনও সেদিন বহু সৈন্য বধ করেন। তারপর ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সেদিনকার যুদ্ধও থামিল।

পরদিন প্রভাতে কৌরবেরা সাগরের মতো ভয়ানক এক ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। তাহা দেখিয়া যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন, "তুমি 'শৃঙ্গাটক' ব্যূহ রচনা কর।"

সেদিন সকালবেলায় ভীষ্ম অসীম তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে এক ভীম ছাড়া আর এমন কেহই ছিল না যে তাঁহাকে আটকায়। ভীম ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন ; আর দুর্যোধন ভ্রাতাগণ সহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভীমের প্রথম কাজই হইল, ভীষ্মের সারথিটিকে সংহার করা। সারথি নাই, ঘোড়া কে থামাইবে? তারা রথ লইয়া রণস্থলময় ছুটাছুটি করিতেছে। সেই ফাঁকে ভীমও দুর্যোধনের ভাই সুনাভের মাথাটি কাটিয়া বসিয়া আছেন। সুনাভের মৃত্যুতে আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিত ও বিশালাক্ষ নামক দুর্যোধনের আর সাত ভাই ক্ষেপিয়া ভীমকে মারিতে লাগিল। ভীমও তাহাদিগকে সম্মুখে পাইয়া আর সংহার করিতে বিলম্ব করিলেন না।

তাহা দেখিয়া দুর্যোধন কাঁদিতে কাঁদিতে ভীষ্মকে বলিলেন, "দাদামহাশয়, ভীম তো ভাইগুলিকে মারিয়া ফেলিল। আপনার যুদ্ধে উৎসাহ নাই!"

ভীষ্ম বলিলেন, "আগে তো শুন নাই! ভীম কি তোমাদিগকে পাইলে ছাড়িবে? আমি আর দ্রোণ যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতেছি, করিবও।"

অর্জুনের পুত্র ইরাবান সেদিন অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। শকুনি আর তাঁহার ছয় ভাই মিলিয়া ইরাবানকে আক্রমণ করেন। সাতজনে মিলিয়া চারিদিক হইতে মারে, কাজেই ইরাবান প্রথমে তাহাদিগকে কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার শরীর অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। তখন ইরাবান অসিচর্ম (খড়্গ ও ঢাল) হাতে রথ হইতে নামিলেন। শত্রুরা এই সুযোগে তাঁহাকে মারিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তাহারা আর কোনো অনিষ্ট করিবার পূর্বে শকুনি ছাড়া তাহাদের আর সকলে ইরাবানের খড়্গে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

ভাইদিগের মৃত্যুতে শকুনি পলায়ন করিলে, দুর্যোধন ইরাবানকে মারিবার নিমিত্ত আর্যশৃঙ্গ নামক এক ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে পাঠাইয়া দিলেন। দুরাত্মা যুদ্ধ করিতে আসিয়াই মায়াবলে দুই হাজার অশ্বারোহী রাক্ষস আনিয়া ফেলিল! রাক্ষসের দল মারামারি করিতেছে, সেই অবসরে মায়াবী আর্যশৃঙ্গ আকাশে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইরাবানও মায়া জানিতেন, কাজেই আকাশে উঠিয়াও রাক্ষস তাঁহার কিছু করিতে পারিল না, তিনি খড়্গ দিয়া দুষ্টকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

ইরাবান নাগের দেশের লোক। নাগেরা যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া দলে দলে তাঁহার সাহায্য করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাক্ষসও তখন গরুড় হইয়া সেই সকল সাপ গিলিতে আরম্ভ করিল।

হায়! ইহাতে কি সর্বনাশ হইল! এই ব্যাপার দেখিয়া ইরাবান এমন আশ্চর্য হইয়া গেলেন যে, যুদ্ধের কথা আর তাঁহার একেবারে মনে নাই! সেই সুযোগে দুষ্ট রাক্ষস তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। অর্জুন অন্যদিকে ভয়ানক যুদ্ধে ব্যস্ত, ইরাবানের মৃত্যুর কথা তিনি তখন জানিতে পারিলেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীম, দ্রুপদ প্রভৃতিও তখন প্রত্যেকে হাজার হাজার করিয়া সৈন্য মারিতেছেন। সে সময়ে অবস্থা কি ভীষণ! যোদ্ধাদিগের কি বিষম রাগ, যেন সকলকে ভূতে পাইয়াছে। ঘটোৎকচ, ভীম, দ্রোণ, ভগদত্ত ইঁহারা সকলেই অতি অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইলেন। সেদিন বিকালবেলায় অর্ধেক যুদ্ধ ঘটোৎকচ একেলাই করিয়াছিল। তখন তাহার ভয় বা ক্লান্তি কিছুই দেখা যায় নাই।

ভীমকে মারিবার জন্য দুর্যোধনের ভ্রাতারা দ্রোণকে সহায় করিয়া খুবই তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু ভীম যখন দ্রোণের সাক্ষাতেই তাঁহাদের এক-একটি করিয়া ক্রমাগত ব্যূঢ়োরস্ক, কুণ্ডলী, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বৈরাট, বিশালাক্ষ্য, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনকধ্বজ এই নয়টিকে বধ করিলেন, তখন অবশিষ্টেরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ যমের মতো ভাবিয়া আর পলাইবার পথ পান না।

ইঁহারা পলাইয়া গেলে, ভীম অন্যান্য যোদ্ধাগণকে মারিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত, কৃপ ইঁহাদের সাধ্য হইল না যে তাঁহাকে বারণ করেন।

রাত্রি হইল, তথাপি যুদ্ধের শেষ নাই। ঘোর অন্ধকার হইলে তবে সেদিন সকলে শিবিরে গেলেন।

রাত্রিতে দুর্যোধন কর্ণ আর শকুনিকে বলিলেন, "পাণ্ডবদিগকে কেহই মারিতে পারিতেছে না, ইহার কারণ কি? আমার মনে বড়ই ভয় হইয়াছে।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "ভীষ্ম কেবল বড়াই করেন ; আসলে তাঁহার ক্ষমতা নাই। উঁহাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে বলেন, দেখিবেন, আমি দুদিনের মধ্যে পাণ্ডবদিগকে মারিয়া শেষ করিব।"

দুর্যোধন তখনই ভীষ্মের শিবিরে গিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক বলিলেন, "দাদামহাশয়! পাণ্ডবদিগকে মারিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন? আপনার যদি তাহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা না থাকে, তবে নাহয় একবার কর্ণকে বলিয়া দেখুন না। তিনি তাহাদিগকে বধ করিবেন।"

এমন অপমানের কথায় ভীষ্মের মনে নিতান্তই ক্লেশ হইবে, তাহা আশ্চর্য কি? তিনি খানিক চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন ; তারপর বলিলেন, "আমি প্রাণপণে তোমার উপকার করিতেছি, তথাপি তুমি কেন আমাকে এমন কঠিন কথা বলিতেছ? যে পাণ্ডবেরা খাণ্ডবদাহ করিল, নিবাত কবচগণকে মারিল, তোমাকে গন্ধর্বের হাত হইতে বাঁচাইল, বিরাটনগরে তোমাদিগকে হারাইয়া গোরু ছাড়াইয়া নিল, আর তোমাদের পোশাক লইয়া উত্তরাকে পুতুল খেলিতে দিল, তাহারা যে অসাধারণ বীর, ইহা কি বুঝিতে পার না? যাহা হউক, কাল আমি এমন যুদ্ধ করিব যে লোকে চিরদিন সেই যুদ্ধের কথা বলিবে।"

পরদিন যুদ্ধ বড়ই ভয়ানক হইল। সকালবেলায় দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আর অভিমন্যুকে মারিতে আসিয়া রাক্ষস অলম্বুষ খুব জব্দ হয়। তারপর দ্রোণ, অর্জুন, সাত্যকি, অশ্বত্থামা প্রভৃতি অনেকক্ষণ যুদ্ধ করেন। মধ্যাহ্নকাল হইতে যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। অর্জুন তখন এমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, কৌরব-সৈন্যেরা পলাইবারও অবসর পায় নাই।

কিন্তু শেষ বেলায় একেলা ভীষ্ম পাণ্ডবদিগকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিলেন। কাহারো এমন ক্ষমতা হইল না যে তাঁহাকে আটকায়। ভীষ্মের ধনুষ্টঙ্কারে অন্য-সকল শব্দকে ডুবাইয়া দিল। তাঁহার বাণ যাহার গায়ে লাগিল, তাহাকে ভেদ না করিয়া ছাড়িল না। পাণ্ডব-সৈন্যেরা অস্ত্র ফেলিয়া এলোচুলে চ্যাঁচাইয়া পলাইতে লাগিল ; কাহার সাধ্য তাহাদিগকে ফিরায়। কৃষ্ণ ক্রমাগত অর্জুনকে বলিতেছেন, "অর্জুন, কি দেখিতেছ? ভীষ্মকে মার!"

অর্জুন বলিলেন, "রাজ্যের জন্য যদি এমন কাজই করিতে হয়, তবে আর বনে গিয়া ক্লেশ পাইলাম কেন? আচ্ছা চলুন, আপনার কথাই রাখিতেছি।"

কিন্তু অর্জুন কিছুতেই ভীষ্মকে বারণ করিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ চাবুক হাতে নিজেই ভীষ্মকে মারিতে চলিলেন। ইহাতে অর্জুন লজ্জিত হইয়া আরো উৎসাহের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ভীষ্মের তেজ কমা দূরে থাকুক, বোধ হইল যেন আরো বাড়িয়া গিয়াছে। আগুন লাগিলে উলুবনের যেমন দশা হয়, ভীষ্মের হাতে পড়িয়া পাণ্ডব-সৈন্যদেরও প্রায় তেমনি হইল।

যতক্ষণ আলো ছিল, ততক্ষণ ভীষ্ম এইরূপ করিয়া যুদ্ধ করেন। তারপর অন্ধকার আসিয়া সৈন্যদিগকে বাঁচাইয়া দিল।

সেরাত্রে পাণ্ডবেরা ভীষ্মের নিকট গিয়া, তাঁহাকে প্রণামপূর্বক কাতরভাবে বলিলেন, "দাদামহাশয়! আমরা তো কিছুতেই আপনার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। আমাদের রাজ্য পাওয়ার কি উপায় হইবে? আর এত লোক যে মরিতেছে, তাহাই-বা কিরূপে বারণ হইবে? আপনাকে বধ করিবার উপায় বলিয়া দিন।"

ভীষ্ম বলিলেন, "আমার হাতে অস্ত্র থাকিলে দেবতারাও আমাকে পরাজয় করিতে পারে না। আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলে আমাকে মারা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং এক উপায় বলিয়া দিই। শিখণ্ডীকে দেখিলে আমি অস্ত্র ত্যাগ করি, অর্জুন এই শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া আমার গায় বাণ মারুক। এই আমার বধের উপায়। আমি অনুমতি দিতেছি, তোমরা মনের সুখে আমায় প্রহার কর। আমার এই কথামত কাজ করিলে, নিশ্চয় তোমাদের জয়লাভ হইবে।"

এইরূপ কথাবার্তার পর পাণ্ডবেরা সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। শিবিরে আসিয়া অর্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন, 'ছেলেবেলায় খেলা করিতে করিতে, ধূলাসুদ্ধ দাদামহাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার গায়ে ধূলা মাখাইয়া দিতাম। কোলে উঠিয়া ডাকিতাম, 'বাবা!' তিনি বলিতে, 'আমি তোমার বাবা নই, তোমার বাবার বাবা!' সেই দাদামহাশয়কে কি করিয়া মারিব? আমি তাহা পারিব না। মরি সেও ভালো।"

যাহা হউক, কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের মনের এই দুঃখ শীঘ্রই দূর হইয়া গেল। ভীষ্মকে না মারিলে জয় নাই ; সুতরাং যে উপায়েই হউক তাঁহাকে মারিতে হইবে।

রাত্রি প্রভাত হইলে পাণ্ডবেরা রণবাদ্য বাজাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আজ শিখণ্ডী সকলের আগে, অপর যোদ্ধারা তাঁহার পশ্চাতে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র, ভীষ্ম পূর্বদিনের ন্যায় একধার হইতে পাণ্ডব-সৈন্য শেষ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী তাঁহাকে বারণ করিবার জন্য ক্রমাগত বাণ মারিতেছেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। শিখণ্ডীর বাণ খাইয়া তিনি হাসেন আর বলেন, "তোমরা যাহা খুশি কর, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।"

শিখণ্ডী তাহার উত্তরে বলিলেন, "তুমি যুদ্ধ কর আর না কর, আমার হাতে আজ তোমার রক্ষা নাই।"

এইরূপে শিখণ্ডী ভীষ্মকে বাণ মারিতেছেন, আর ভীষ্ম তাঁহার দিকে না তাকাইয়া ক্রমাগত পাণ্ডবদিগের সৈন্য মারিতেছেন ; পাণ্ডবেরা তাঁহাকে কোনোমতেই বারণ করিতে পারিতেছেন না। তাহা দেখিয়া অর্জুন মহারোষে কৌরব-সৈন্য মারিতে আরম্ভ করিলেন।

দুর্যোধনের নিজের এমন ক্ষমতা নাই যে তিনি অর্জুনকে আটকান, কাজেই তিনি ভীষ্মকে বলিলেন, 'দাদামহাশয়! অর্জুন তো সব মারিয়া শেষ করিল। আপনি ভালো করিয়া যুদ্ধ করুন!"

তাহা শুনিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, রোজ

দশহাজার সৈন্য মারিব। তাহার মতে আমি রোজ দশহাজার সৈন্য মারিয়াছি। আজ যুদ্ধে প্রাণ দিয়া, তুমি যে এতদিন আমাকে অন্ন দিয়াছ, সেই ঋণ শোধ করিব।"

এই বলিয়া তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এদিকে শিখণ্ডীর বাণের বিরাম নাই। অর্জুন ক্রমাগত তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলিতেছেন, "ভয় নাই! দাদামহাশয়কে আক্রমণ কর! আমি বাণ মারিয়া তাঁহাকে বধ করিব।"

অর্জুনকে বারণ করিবার জন্য দুঃশাসন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু খানিক যুদ্ধের পরেই অর্জুনের বাণ সহিতে না পারিয়া ভীষ্মের রথে গিয়া তাঁহাকে আশ্রয় নিতে হইয়াছে।

এদিকে ভগদত্ত, কৃপ, শল্য কৃতবর্মা, বিন্দ, অনুবিন্দ, জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ, দুর্মর্ষণ, ইঁহারা সকলে মিলিয়া ভীমকে আক্রমণ করিয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের হাজার হাজার বাণ সহ্য করিয়া ভীম তাঁহাদের সকলকে বাণে বাণে অস্থির করিয়া দিয়াছেন।

এমন সময় অর্জুন আসিয়া ভীমের সহিত মিলিলেন, তখন কৌরবদেরও ভীষ্ম, দুর্যোধন, বৃহদ্বল প্রভৃতি সকলে সেখানে আসিলে, যুদ্ধ বড়ই ভীষণ হইয়া উঠিল। এই গোলমালের ভিতরে শিখণ্ডী তাহার নিজের কাজ ভুলেন নাই। সুযোগ পাইলেই তিনি ভীষ্মের গায়ে বাণ মারিতেছেন।

যুধিষ্ঠির এই সময়ে ভীষ্মের খুব কাছে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "যুধিষ্ঠির! অনেক প্রাণী বধ করিয়াছি, আমার আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। আমাকে যদি সুখী করিতে চাহ, তবে শীঘ্র অর্জুনকে লইয়া আমাকে বধ কর।"

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র আইস। আজ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে।" ইহার পর হইতে শিখণ্ডীকে সম্মুখে করিয়া পাণ্ডবগণ ভীষ্মের বধের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৌরবেরাও সকলে মিলিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিবার কোনোরূপ আয়োজনই করিতে বাকি রাখিলেন না। তখন যে কিরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার আর নাই।

আর ভীষ্মের কথা কি বলিব? 'আজ মরিতে হইবে', এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। যেমন করিয়া মরিলে ক্ষত্রিয় স্বর্গে যায়, সেইরূপ করিয়া মরিতে হইবে। রণস্থলে ধর্মযুদ্ধে শত্রু সংহার করিতে করিতে প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা, ক্ষত্রিয়ের আর গৌরবের কথা হইতে পারে না। ভীষ্মের ন্যায় মহাবীর আর মহাপুরুষ আজ সেই গৌরবের সুযোগ পাইয়া আর তাহা ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। তাই তিনি আজ মরিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। ঐ দেখ, পাণ্ডবদের দলের সোমক নামক সৈন্যগণ দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাণে শেষ হইয়া গেল। ঐ শুন, মেঘগর্জনের ন্যায় তাঁহার ধনুকের শব্দ অবিরাম শুনা যাইতেছে। কৃষ্ণ, অর্জুন আর শিখণ্ডী ব্যতীত কেহই সে ধনুকের সম্মুখে টিকিতে পারিতেছে না।

শিখণ্ডী ভীষ্মের বুকে দশ বাণ মারিলেন। ভীষ্ম তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। অর্জুন

ক্রমাগত তাঁহাকে বলিতেছেন, "মার! মার!" শিখণ্ডী উৎসাহ পাইয়া বাণে বাণে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সেই মহাপুরুষ সে-সকল বাণের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, একদিকে অর্জুনকে নিবারণ, আর-একদিকে পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করিতে ব্যস্ত।

এই সময়ে দুঃশাসন একা পাণ্ডবদিগের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতেছিলেন। তখন তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া কেহই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। অর্জুন ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে এড়াইয়া যাইতে পারিলেন না।

শিখণ্ডী ভীষ্মকে বাণ মারিতে এক মুহূর্তও অবহেলা করিতেছেন না। ভীষ্ম হাসিতে হাসিতে তাঁহার সকল বাণ অগ্রাহ্য করিয়া, ক্রমাগত পাণ্ডব-সৈন্য বধ করিতেছেন। দুর্যোধন প্রভৃতি সকলে প্রাণপণে ভীষ্মের সাহায্যের জন্য ব্যস্ত ; কিন্তু অর্জুনের তেজে তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইতেছে। অর্জুনের গাণ্ডীব হইতে ভীষণ বাণ-বৃষ্টির আর বিরাম নাই, কৌরব-সৈন্যদের আর বুঝি কিছু অবশিষ্ট থাকিল না। কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ, বিংশতি সকলেই পলাইয়া গেলেন। মৃতদেহে রণস্থল ছাইয়া গেল।

কিন্তু ভীষ্ম একাই যে অদ্ভুত কাজ করিতেছিলেন, অন্যেরা পলাইয়া যাওয়াতে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না।

অর্জুনের কাছে পাণ্ডবপক্ষের যে-সকল রাজা ছিলেন, ভীষ্ম তাঁহাদের সকলকেই মারিয়া শেষ করেন। দশহাজার গজারোহী, সাতজন মহারথ, চৌদ্দহাজার পদাতি, একহাজার হাতি, দশহাজার ঘোড়া, তাহা ছাড়া বিরাটের ভাই শতানীক প্রভৃতি হাজার হাজার যোদ্ধা সেদিন তাঁহার হাতে মারা যান।

এমন সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "অর্জুন, তুমি শীঘ্র ভীষ্মকে বারণ কর। উঁহাকে মারিতে পারিলেই জয় হইবে।"

অমনি অর্জুন বাণে বাণে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভীষ্মও সে-সকল বাণ খণ্ড খণ্ড করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। তারপর ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, সাত্যকি, ঘটোৎকচ প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষের সকলে তাঁহার বাণে অস্থির হইয়া উঠিলে, অর্জুন তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন।

শিখণ্ডীর বিশ্রাম নাই, আবার অর্জুন তাঁহার সাহায্য করিতেছেন। সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ প্রভৃতি সকলে মিলিয়াও তাঁহাকে বাণ মারিতে ত্রুটি করিতেছেন না। তথাপি ভীষ্ম কিছুমাত্র কাতর নহেন। তাহার যুদ্ধ তেমনি চলিয়াছে।

এমন সময় অর্জুন ভীষ্মের ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া দ্রোণ, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত মিলিয়া অর্জুনকে আক্রমণ করিতে যাওয়ায়, সাত্যকি, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, ঘটোৎকচ আর অভিমন্যু অর্জুনের সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিলেন।

এদিকে শিখণ্ডী বাণে বাণে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। ভীষ্ম ধনুক হাতে লইলেই অর্জুন তাহা কাটিয়া ফেলিতেছেন। তাহাতে ভীষ্ম এক শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে, তাহাও তিনি কাটিতে বাকি রাখেন নাই।

তখন ভীষ্ম মনে মনে বলিলেন, 'কৃষ্ণ না থাকিলে এখনো আমি এক বাণেই পাণ্ডবদিগকে মারিতে পারি। কিন্তু আমি পাণ্ডবদিগকে মারিব না, শিখণ্ডীর সহিতও যুদ্ধ করিব না। এই আমার মরিবার সুযোগ।'

ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অপর বসুগণ আকাশ হইতে বলিলেন, "তাহাই ঠিক, ভীষ্ম! আর যুদ্ধে কাজ নাই।"

এক কথায় স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেবতারা ভীষ্মের উপর পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর এই সময় হইতে ভীষ্ম অর্জুনের সহিত যুদ্ধের চেষ্টা ছাড়িয়া দিলেন। এতক্ষণ শিখণ্ডী তাঁহাকে যে-সকল বাণ মারিতেছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রাহ্য হয় নাই। অতঃপর অর্জুন গাণ্ডীব লইয়া তাঁহার গায়ে ভয়ঙ্কর বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম তখনো অন্যান্য যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু অর্জুনের বাণে জর্জরিত হইয়াও তিনি তাঁহাকে আর আঘাত করিলেন না। অর্জুন অবসর পাইয়া ক্রমাগত তাঁহার ধনুক কাটিয়া তাঁহার উপর বাণ মারিতে লাগিলেন।

এই সময় দুঃশাসন ভীষ্মের কাছে ছিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন, "দুঃশাসন! এ-সকল শিখণ্ডীর বাণ নয়, এগুলি নিশ্চয় অর্জুনের। দেখ আমার বর্ম ভেদ করিয়া বাণগুলি শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে।"

এই বলিয়া তিনি অর্জুনের প্রতি একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে, অর্জুন তিন বাণে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তারপর ভীষ্ম ঢাল আর খড়্গ হাতে লইয়া মনে করিলেন, 'হয় মরিব, নাহয় সকলকে মারিব।' কিন্তু তিনি খড়্গ চর্ম হাতে রথ হইতে নামিবার পূর্বেই তাহাও অর্জুন কাটিয়া শত খণ্ড করিলেন।

এদিকে কৌরবেরা ভীষ্মকে রক্ষার জন্য কত চেষ্টাই করিতেছেন, কিন্তু পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগকে কিছুই করিবার অবসর দিতেছেন না। অর্জুনের বাণে ভীষ্মের শরীর এরূপ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে যে, আর দু আঙ্গুল স্থানও অবশিষ্ট নাই। এইরূপে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে, ভীষ্ম রথ হইতে পড়িয়া গেলেন। পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। 'হায় হায়!' শব্দে যোদ্ধাগণ কাঁদিতে লাগিল। শরীরে এত বাণ বিঁধিয়াছিল যে, রথ হইতে পড়িয়াও ভীষ্ম শূন্যেই রহিয়া গেলেন ; তাঁহার শরীর মাটি ছুঁইতে পাইল না। লোকে মৃত্যুর সময় কোমল বিছানায় শয়ন করে ; কিন্তু ভীষ্মের হইল 'শর-শয্যা', অর্থাৎ বাণের বিছানা।

সেই মহাবীর শর-শয্যায় শুইয়া স্বর্গের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তখন আকাশ হইতে দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহাবীর! হে মহাপুরুষ! সূর্য এখনো আকাশের দক্ষিণভাগে রহিয়াছেন। মহাপুরুষের মৃত্যুর ইহা সময় নহে। তুমি এমন সময়ে প্রাণত্যাগ করিবে?"

ভীষ্ম বলিলেন, "আমি তো প্রাণত্যাগ করি নাই!"

মানস সরোবরবাসী হংসগণ আকাশে উড়িয়া যাইতেছিল। তাহারা বলিল, "এখনো সূর্যদেব আকাশের দক্ষিণভাগেই রহিয়াছেন ; মহাত্মা ভীষ্ম কি এমন সময়ে প্রাণত্যাগ করিবেন?"

ভীষ্মদেব সেই হংসগণকে দেখিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। উহারা তাঁহারই মাতা গঙ্গাদেবীর প্রেরিত হংসরূপী মহর্ষিগণ।

তাই তিনি বলিলেন, "হে হংসগণ! পিতার বরে আমি মৃত্যুকে বশ করিয়াছি। সত্য কহিতেছি, সূর্যদেব আকাশের উত্তরভাগে না গমন করিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব না।"

ভীষ্ম রথ হইতে পড়িবামাত্র যুদ্ধ থামিয়া গেল। পাণ্ডবদের দলে মহাশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। ভীম আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দ্রোণ এ-সংবাদ শুনিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া রথ হইতে পড়িয়া গেলেন। তারপর যোদ্ধাগণ কবচ পরিত্যাগ করিয়া হেঁটমুখে জোড়হাতে, সেই মহাবীরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন ভীষ্ম বলিলেন, "হে মহারথিগণ! তোমাদের মঙ্গল তো? তোমাদিগকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। দেখ, আমার মাথা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বালিশ দাও।"

রাজামহাশয়েরা তৎক্ষণাৎ রাশি রাশি কোমল রেশমী বালিশ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তাহা দেখিয়া ভীষ্ম হাসিয়া বলিলেন, "এ বালিশ তো এ বিছানার উপযুক্ত নয়। বৎস অর্জুন, উপযুক্ত বালিশ দাও।"

অর্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দাদামহাশয়! কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তুমি ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান আর ক্ষত্রিয়ের ধর্মে শিক্ষিত। মাথা ঝুলিতেছে, উপযুক্ত বালিশ দাও।"

তখন অর্জুন, ভীষ্মের পদধূলি লইয়া তিন বাণে তাঁহার মাথা উঁচু করিয়া দিলেন। তাহাতে ভীষ্ম পরম সন্তোষের সহিত অর্জুনকে আশীর্বাদ করিয়া সকলকে বলিলেন, "এই দেখ, অর্জুন আমার উপযুক্ত বালিশ দিয়াছেন।"

তারপর ভীষ্ম আবার বলিলেন, 'যতদিন না সূর্যদেব আকাশের উত্তরভাগে যাইবেন, ততদিন আমি এইভাবেই থাকিব ; সূর্যদেব আকাশের উত্তরভাগে আসিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। আমার চারিদিকে পরিখা করিয়া (অর্থাৎ খাল কাটিয়া) দাও। আর তোমরা শত্রুতা ছাড়িয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হও।"

তারপর দুর্যোধন ভালো-ভালো চিকিৎসকও ঔষধ লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ভীষ্ম বলিলেন, "উহা দিয়া আমার কি হইবে? এখন আমার চিকিৎসার সময় নহে, আমাকে পোড়াইবার সময়।"

সুতরাং চিকিৎসকেরা তাহাদের ঔষধ লইয়া ফিরিয়া গেল। তারপর রাত্রি হইলে সে স্থানে প্রহরী রাখিয়া সকলে শিবিরে গমন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, পুনরায় সকলে ভীষ্মের নিকট আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ক্রমে স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ সকলে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত সেখানে আসিতে লাগিল। কন্যাগণ তাঁহার উপরে ফুলের মালা, চন্দনচূর্ণ ও খই ছড়াইতে লাগিল। গায়ক, নর্তক ও বাদ্যকরগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজারা বিনীতভাবে তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলেন। তখন সেখানকার শোভা হইল যেন স্বর্গের শোভা।

এমন সময় ভীষ্ম বলিলেন, 'জল দাও।"

অমনি সকলে ব্যস্ত হইয়া নানারূপ মিষ্টান্ন এবং সুশীতল জল আনিয়া উপস্থিত

করিল। তাহা দেখিয়া ভীষ্ম কহিলেন, "এ পৃথিবী হইতে আমি বিদায় লইয়াছি; সুতরাং এখানকার মানুষেরা যে জল খায়, আমি আর তাহা খাইব না। অর্জুন কোথায়?"

অর্জুন জোড়হাতে বলিলেন, "কি করিতে হইবে, দাদামহাশয়?"

ভীষ্ম বলিলেন, "দাদা! বিছানা দিয়াছ, বালিশ দিয়াছ, এখন তাহার উপযুক্ত জল দাও!"

অর্জুন ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অমনি গাণ্ডীবে পর্জন্যাস্ত্র যোজনা করিলেন। সে অস্ত্র ভীষ্মের দক্ষিণপার্শ্বের ভূমিতে নিক্ষেপ করামাত্রই, তথা হইতে অতি পবিত্র নির্মল জলের উৎস উঠিতে লাগিল। আহা, কি সুগন্ধ! কি মধুর শীতল জল! সে জল পান করিয়া ভীষ্মের প্রাণ জুড়াইল। তিনি অর্জুনকে বার বার আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার সমান ধনুর্দ্ধর এ জগতে আর নাই। দুর্যোধন আমাদের কথা শুনিল না; সুতরাং সে নিশ্চয় মারা যাইবে।"

দুর্যোধন কাছেই ছিলেন, আর ভীষ্মের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিতও হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভীষ্ম বলিলেন, "দুর্যোধন! অর্জুন যাহা করিল, দেখিলে তো? এমন কাজ আর কেহই করিতে পারে না। এই পৃথিবীতে অর্জুন আর কৃষ্ণ ভিন্ন আগ্নেয় বরুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, পারমেষ্ঠ, প্রাজাপাত্য, ধাত্র, ত্বাষ্ট্র, সাবিত্র ও বৈবস্বত অস্ত্রসকলের কথা কেহ জানেন না। তুমি এইবেলা পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর, আমার মৃত্যুতেই এই যুদ্ধের শেষ হউক। আমি সত্য কহিতেছি, আমার কথা না শুনিলে নষ্ট হইবে।"

এই কথা বলিয়া ভীষ্ম চুপ করিলেন; সকলে শিবিরে চলিয়া গেলেন। এমন সময় কর্ণ সেখানে আসিয়া ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে প্রতিদিন আপনার দৃষ্টিপথে পড়িয়া আপনাকে ক্লেশ দিত, আমি সেই রাধেয় (রাধার পুত্র)।"

ভীষ্ম কষ্টে চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে অপর লোক নাই, কেবল প্রহরীরা আছে। তখন প্রহরীদিগকে সরাইয়া দিয়া এক হাতে কর্ণকে আলিঙ্গনপূর্বক তিনি বলিলেন, "কর্ণ! তুমি আসিয়া ভালো করিয়াছ। আমি নারদ আর ব্যাসের মুখে শুনিয়াছি, তুমি রাধার পুত্র নহ, তুমি কুন্তীর পুত্র। তুমি দুষ্টের দলে জুটিয়া পাণ্ডবদিগের নিন্দা করিতে, তাই আমি তোমাকে কঠিন কথা কহিতাম; কিন্তু আমি কখনো তোমার মন্দ ভাবি নাই। তোমার মতন ধার্মিক, দাতা, আর বীর এ পৃথিবীতে নাই, এ কথা আমি জানি। এখন তুমি তোমার ভাইদিগের সহিত মিলিয়া থাক; আমার মৃত্যুতেই এই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাউক।"

কিন্তু এ কথায় কর্ণের মন ফিরিল না। তিনি বলিলেন, "পাণ্ডবদের সহিত আমার শত্রুতা কিছুতেই দূর হইবার নহে। আপনি অনুমতি করুন, আমি যুদ্ধ করিব। আর, আপনার নিকট যদি কোনো অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করুন।"

ভীষ্ম বলিলেন, "যদি যুদ্ধ করিবেই, তবে রোষহীন মনে পুণ্য কামনায় যুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম পালনপূর্বক স্বর্গে চলিয়া যাও।"

# দ্রোণপর্ব

ঘ্নের পতন হইলে কর্ণ আসিয়া কৌরবদিগের পক্ষে যোগ দিলেন। কর্ণকে পাইয়া তাঁহাদের উৎসাহের সীমা রহিল না। অনেকে বলিল "ভীষ্ম ইচ্ছা করিয়া পাণ্ডবদিগকে মারেন নাই, কিন্তু কর্ণ উঁহাদিগকে নিশ্চয় বধ করিবেন।"

দুর্যোধন বলিলেন, "কর্ণ, একজন সেনাপতি স্থির কর।" কর্ণ বলিলেন, "দ্রোণ থাকিতে আর কাহাকে সেনাপতি করিবেন? দ্রোণই সর্বাপেক্ষা একাজের উপযুক্ত।"

একথায় দুর্যোধন দ্রোণকে বলিলেন, "গুরুদেব! এখন আপনি সেনাপতি হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।" দ্রোণ বলিলেন, "আচ্ছা, আমি সেনাপতি হইয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব। কিন্তু আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিতে পারিব না। সে আমাকে মারিবার জন্যই জন্মিয়াছে।"

দ্রোণকে সেনাপতি করিয়া কৌরবগণ বলিতে লাগিল, "এবারে পাণ্ডবদের পরাজয় নিশ্চয়!" দ্রোণ দুর্যোধনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, আমি তোমার জন্য কি করিব?"

দুর্যোধন বলিলেন, "আপনি যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত ধরিয়া দিন।"

দ্রোণ ইহাতে আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "যুধিষ্ঠির ধন্য ; তাঁহার শত্রু কোথাও নাই! তুমিও তাঁহাকে মারিতে না চাহিয়া, কেবল ধরিয়া আনিতে চাহিতেছ।"

ভালো লোকে ভালোভাবেই কথা নেয়। দ্রোণ মনে করিলেন যে, দুর্যোধন বুঝি যুধিষ্ঠিরকে ভালোবাসিয়াই তাঁহাকে মারিতে চাহেন নাই। কিন্তু দুর্যোধনের পেটে যে বাঁকা বুদ্ধি, তাহা তাঁহার কথাতেই ধরা পড়িল। তিনি বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরকে মারিলে কি অর্জুন আমাদিগকে রাখিবে? তাহার চেয়ে তাঁহাকে জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পারিলে, আবার পাশা খেলিয়া বনে পাঠাইতে পারিব।"

এ কথায় দ্রোণ বলিলেন, "অর্জুন থাকিতে যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনার শক্তি দেবতাদেরও নাই। অর্জুনকে যদি সরাইতে পারো, তবে যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চয় আজ ধরিয়া আনিব।"

চরের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন, "তুমি আজ আমার নিকট থাকিয়া যুদ্ধ কর। আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।"

অর্জুন বলিলেন, "আমি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার কোনো ভয় নাই। দেবতার

সাহায্য পাইলেও কৌরবেরা আপনাকে ধরিয়া নিতে পারিবে না।"

তারপর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং প্রথম হইতেই দ্রোণের তেজে পাণ্ডবেরা নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। সৈন্য যে কত মরিল, তাহার সীমা সংখ্যা নাই! ইহাতে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বীরগণ দ্রোণকে আক্রমণ করায়, যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরতর হইয়া উঠিল।

অভিমন্যুকে আক্রমণ করিতে গিয়া হার্দিক্য বড়ই জব্দ হইলেন। প্রথমে ধনুর্বাণ লইয়া তিনি মন্দ যুদ্ধ করেন নাই ; এমন কি, তিনি অভিমন্যুর ধনুক অবধি কাটিয়া ফেলেন। তখন অভিমন্যু খড়্গ চর্ম হাতে তাহার রথে উঠিয়া এক হাতে তাঁহার কেশাকর্ষণ, এক লাথিতে সারথিকে সংহার, এবং খড়্গাঘাতে রথের ধ্বজাটি নাশ করিলেন। তারপর হার্দিক্যের চুল ধরিয়া তাহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

হার্দিক্যের পরে জয়দ্রথ আসিয়াও কম নাকাল হন নাই। তারপর শল্য আসিতেই অভিমন্যুর হাতে তাঁহার সারথিটি মারা গেল। তাহাতে শল্য ক্রোধভরে গদাহাতে অভিমন্যুকে মারিতে আসিলে, অভিমন্যুও বজ্র হেন মহাগদা উঠাইয়া বলিলেন, "আইস!" এমন সময় ভীম আসিয়া তাঁহাকে থামাইয়া শল্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

সে অতি আশ্চর্য যুদ্ধ হইয়াছিল। গদায় গদায় ঠোকাঠুকিতে এমনি আগুনের ফিন্‌কি ছুটিয়াছিল যে কামারের দোকানেও তেমন হয় না। শেষে দুজনের গদার বাড়িতে দুজনেই ঠিকরাইয়া পড়িলেন। ভীম তখনই আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু শল্যের জ্ঞান না থাকায় তাঁহার আর উঠা হইল না।

তারপর ভীম, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতির ঘোর যুদ্ধ চলিল। এই সময়ে কৌরব সেনাগণ ক্ষত-বিক্ষত শরীরে পলায়ন করিতেছিল, দ্রোণ তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই!' বলিয়াই তিনি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। সে সময়ে শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, নকুল, সহদেব প্রভৃতির কেহই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিলেন না।

ইঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিবামাত্র, বিরাট, দ্রুপদ, কৈকেয়গণ, সাত্যকি, শিবি, ব্যাঘ্রদত্ত, সিংহসেন প্রভৃতি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পথ আটকাইলেন। কিন্তু তাঁহাদের বাণে দ্রোণের কি হইবে? তিনি দেখিতে দেখিতে ব্যাঘ্রদত্ত আর সিংহসেনের মাথা কাটিয়া একেবারে যুধিষ্ঠিরের রথের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডব-সৈন্যেরা তখন "মহারাজকে মারিল!" বলিয়া চ্যাঁচাইতে লাগিল, আর কৌরব-সৈন্যেরা "এই ধরিয়া আনিল!" বলিয়া আকাশ ফাটাইল।

এমন সময় অর্জুন শত্রুসৈন্য কাটিতে কাটিতে আসিয়া সেখানে দেখা দিলেন। তারপর আর কি কেহ ধনুক ধরিতে পাইল? সকলে ভয়েই অস্থির, যুদ্ধ করিবে কে? অর্জুনের ভীষণ বাণবৃষ্টিতে চারিদিক আঁধার হইয়া গেল। তখন আর এতটুকুও বুঝিবার সাধ্য রহিল না যে, 'এই পৃথিবী, ঐ আকাশ'।

আর তখন সন্ধ্যাও হইতেছিল। কাজেই দ্রোণ তখনি যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন। সেদিন

আর তাঁহার যুধিষ্ঠিরকে ধরা হইল না।

দ্রোণের পক্ষে ইহা লজ্জার কথা বটে ; আর অর্জুন থাকিতে এ লজ্জা দূর হওয়াও দুর্ঘট। সুতরাং যুক্তি হইল যে, পরদিন কৌশলে অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে সরাইয়া, আর-একবার চেষ্টা করিতে হইবে। দ্রোণ বলিলেন, "অর্জুনকে কেহ যুদ্ধের ছলে দূরে লইয়া যাউক। তখন সে ব্যক্তিকে পরাজয় না করিয়া অর্জুন কখনোই ফিরিবে না। সেই অবসরে আমি যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনিব।"

এ কথায় সুশর্মা, সত্যরথ, সত্যধর্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু, সত্যকর্মা প্রভৃতি বীরগণ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সমেত; তখনই অগ্নির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন; "কাল আমরা অর্জুনকে না মারিয়া যুদ্ধ হইতে ফিরিব না। যদি ফিরি, তাহা হইলে যত মহাপাপ আছে, সকলের শাস্তি যেন আমরা পাই!"

এমন প্রতিজ্ঞা যে করে, তাহাকে বলে "সংশপ্তক"। পরদিন যুদ্ধের সময় এই সংশপ্তকগণ অর্জুনকে ডাকিয়া বলিল, "আইস অর্জুন! যুদ্ধ করি!"

তাহা শুনিয়া অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "দাদা! আমাকে যখন ডাকিতেছে, তখন তো আমি না গিয়া পারি না।" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "দ্রোণ আমাকে ধরিয়া নিতে আসিবেন, তাহার কি হইবে?" অর্জুন বলিলেন, "আপনার কাছে সত্যজিৎকে রাখিয়া যাইতেছি। ইনি জীবিত থাকিতে আপনার কোনো ভয় নাই। সত্যজিৎ মরিলে আপনারা কেহ রণস্থলে থাকিবেন না।"

সেদিন সংশপ্তকেরা মিলিয়া কি অর্জুনকে কম ব্যস্ত করিয়াছিল। দলে দলে তাহারা আসিয়া প্রাণের মায়া ছাড়িয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এক-এক দলকে শেষ করিয়া অর্জুন যেই যুধিষ্ঠিরের নিকটে ফিরিতে যান, অমনি আর একদল আসিয়া বলে, "কোথায় যাও? এই যে আমরা আছি!"

আর তাহারা যুদ্ধও এমনি ভয়ানক করিয়াছিল যে কি বলিব! ইহার মধ্যে আবার নারায়ণীসেনারা আসিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তখন অর্জুন রোষভরে 'ত্বাষ্ট্র' অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। সে অতি অদ্ভুত অস্ত্র। উহা ছুঁড়িবামাত্র শত্রুদিগের মাথায় গোল লাগিয়া গেল! তখন তাহারা নিজ নিজ সঙ্গীকেই দেখিয়া বলে, "এই অর্জুন! কাট উহাকে!" এইরূপে তিলেকের মধ্যে তাহারা নিজে নিজে কাটাকাটি করিয়া মরিল।

তথাপি সে যুদ্ধের শেষ নাই। দেখিতে দেখিতে ললিথ, মালব, মাবেল্লক প্রভৃতি যোদ্ধাগণ বাণে বাণে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জুন! তুমি বাঁচিয়া আছ? আমি তো তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। অমনি অর্জুন বায়ব্যাস্ত্র মারিয়া শত্রুগণের বাণ তো উড়াইয়া দিলেনই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঘূর্ণী বাতাস বহিয়া হাতি ঘোড়া সংশপ্তক অবধি সকলকেই শুকনো পাতার মতো উড়াইয়া নিল!

এদিকে দ্রোণাচার্য্য তাঁহার কাজ ভুলেন নাই। তিনি যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে গিয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। পাণ্ডব-সৈন্যগণ তাঁহাকে কিছুতেই আটকাইতে পারিতেছে না। দ্রোণের হাতে পাণ্ডবপক্ষের বৃক্ষ মরিয়াছেন, সত্যজিৎ মরিয়াছেন, দৃঢ়সেন, ক্ষেম,

বসুদান ইঁহারাও মরিয়াছেন। যুধিষ্ঠির দেখিলেন, বড়ই বিপদ। দ্রোণ সকলকে পরাজিত করিয়া এখন তাঁহারই দিকে ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তিনি অবিলম্বে ঘোড়া হাঁকাইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে দুর্যোধন অনেক হাতি লইয়া ভীমকে আক্রমণ করেন। ভীম ক্ষণকালের মধ্যেই সে-সকল হাতি মারিয়া ফেলাতে, অঙ্গদেশের ম্লেচ্ছরাজা হাতি চড়িয়া দুর্যোধনকে সাহায্য করিতে আসেন। ইনি মরিলে আসেন ভগদত্ত।

ভগদত্ত ইন্দ্রের বন্ধু এবং ভয়ানক যোদ্ধা ছিলেন, আর তদপেক্ষাও অতি ভয়ানক একটা হাতিতে চড়িয়া আসিয়াছিলেন। ভীম এক হাতি মারিয়াছেন, কিন্তু এ হাতিকে মারা দূরে থাকুক, বরং হাতিই তাঁহাকে শুঁড়ে জড়াইয়া, পায়ের নীচে ফেলিবার জোগাড় করিয়াছিল। অনেক কষ্টে শুঁড় ছাড়াইয়া ভীম হাতির পায়ের তলায় গিয়া লুকাইয়াছিলেন, তাই রক্ষা। আর সকলে তো মনে করিয়াছিল, তাঁহাকে বুঝি মারিয়াই ফেলিয়াছে।

এদিকে ভীমকে বাঁচাইবার জন্য যুধিষ্ঠির, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অন্যান্য লোকের সহিত ভগদত্তের যুদ্ধ হইতে লাগিল। দশার্ণের রাজা ভগদত্তের হাতে মারা গেলেন। ভগদত্তের হাতি সাত্যকির রথখানিকে শুঁড় জড়াইয়া ছুঁড়িয়া মারিলে সাত্যকি ও তাঁহার সারথি তাহা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিলেন। তারপর হাতিটি রাজামহাশয়দিগকে লইয়া লুফালুফি করিতে লাগিল।

তখন না জানি কিরূপ কাণ্ড হইয়াছিল, আর সকলে কিরূপ চিৎকার করিয়াছিল। সে চিৎকার অর্জুনের কানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ঐ বুঝি ভগদত্ত তাঁহার হাতি লইয়া সকলকে শেষ করিলেন। শীঘ্র ওখানে চলুন।"

কিন্তু এদিকে আবার চৌদ্দহাজার সংশপ্তক আসিয়া উপস্থিত! অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্রে তাহাদিগকে মারিয়া ফিরিতে চলিয়াছেন, এমন সময় আবার সুশর্মা ছয় ভাই সমেত আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যাহা হউক, সুশর্মার ছয় ভাইকে মারিয়া এবং তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া চলিয়া আসিতে অর্জুনের অধিক সময় লাগিল না।

এদিকে ভগদত্ত তাঁহার হাতি লইয়া পাণ্ডব-সৈন্য শেষ করিতে ব্যস্ত, এমন সময় অর্জুন কৌরবসেনা মারিতে মারিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর দুজনে কি ভীষণ যুদ্ধই হইল! ভগদত্ত হাতির উপরে, অর্জুন রথের উপরে। অর্জুনের রথ তো আর যুদ্ধ করিতে জানে না, কিন্তু ভগদত্তের হাতিটি এক-একবার ক্ষেপিয়া রথ গুঁড়া করিয়া দিতে আসে, কৃষ্ণ তখন অনেক কৌশলে পাশ কাটিয়া তাহাকে এড়ান।

এমন সময় অর্জুন ভগদত্তের ধনুক ও তূণ কাটিয়া, তাঁহার গায়ে সত্তরটি বাণ বিঁধাইয়া দিলেন। তখন ভগদত্তও রাগে অস্থির হইয়া 'বৈষ্ণব অঙ্কুশ' নামক অস্ত্র অর্জুনের বুকের দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। ইহা অতি ভয়ানক অস্ত্র। বিষ্ণু ইহা নরকাসুরকে দেন, নরকাসুর ভগদত্তকে দেয়। এ অস্ত্রে ঘা খাইলে ইন্দ্রেরও প্রাণ বাহির হইয়া যায়। একমাত্র বিষ্ণু ইহা সহ্য করিতে পারেন।

তাই সে অস্ত্রকে অর্জুনের দিকে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণ (যিনি নিজেই বিষ্ণু) নিজের বুক পাতিয়া দিলেন। তাঁহার বুকে পড়িয়া তাহা একটি সুন্দর মালা হইয়া গেল।

ইহাতে অর্জুন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যুদ্ধে যোগ দিবেন না। এখন সে প্রতিজ্ঞা কিজন্য ভাঙিলেন? আমি অস্ত্র বারণ করিতে পারিতাম না?"

কৃষ্ণ তাঁহাকে সে অস্ত্রের কথা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভগদত্তের হাতে আর তাহা নাই। এখন তুমি উহাকে মার।"

ইহার অল্পক্ষণ পরেই অর্জুন রাগে ভগদত্তের হাতিকে মারিয়া, অর্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তকে বধ করিলেন।

তারপর অচল ও বৃষক নামক শকুনির দুই ভাই অর্জুনের হাতে মারা গেলে, শকুনির সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

শকুনি নানারূপ মায়া জানিতেন। প্রথমে তিনি কৌশল করিলেন যে, তাহাতে নানারূপ উৎকট অস্ত্র কোথা হইতে আসিয়া, কৃষ্ণ আর অর্জুনের গায়ে পড়িতে লাগিল। আর ভয়ঙ্কর জন্তু এবং রাক্ষসগণ তাহাদিগকে মারিতে আসিল। কিন্তু অর্জুনের বাণের সম্মুখে এ-সকল অস্ত্র বা জন্তু এক মুহূর্তও টিকিতে পারিল না।

তখন শকুনি হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন।

অর্জুন জ্যোতিষ্ক অস্ত্রে সে অন্ধকার দূর করিলে সেই ধূর্ত কোথা হইতে জলের বন্যা আনিয়া সকলকে ভাসাইয়া দিবার আয়োজন করিলেন। অর্জুনের আদিত্যাস্ত্রে জল সহজেই দূর হইল। তারপর আর শকুনির মায়ায় কুলাইল না; তিনি অর্জুনের বাণ খাইয়া পলায়ন করিলেন।

এইরূপে অর্জুন ক্রমে কৌরব-সৈন্যদিগকে নিতান্ত অস্থির করিয়া তোলায় তাহারা আর রণস্থলে টিকিয়া থাকিতে পারিল না। পাণ্ডব-সৈন্যগণ ইহাতে উৎসাহ পাইয়া দ্রোণকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিল। তখন যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বড়ই সাংঘাতিক। একদিকে দ্রোণ মহারোষে হাজার-হাজার সৈন্য মারিতেছেন, অপরদিকে অশ্বত্থামা নীলকে সংহার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার একদল সংশপ্তক আসিয়া অর্জুনকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাস্তবিক তখন পাণ্ডব-সৈন্যদের একটু বিপদই হইয়াছিল। কিন্তু এমন সময় ভীম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, আবার তাহাদের উৎসাহ দেখা দিল। ততক্ষণে অর্জুনও সংশপ্তকদিগকে মারিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন তাঁহার বাণে কৌরবদের কি দুর্গতিই হইল! তাহারা চ্যাঁচায় আর শুধু বলে 'কর্ণ! কর্ণ!'

সে ডাক শুনিয়া কর্ণ তখনই তিনটি ভাই সমেত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাই তিনটি তো আসিয়াই অর্জুনের হাতে মারা গেল; নিজে কর্ণও বুকে হাতে সাত্যকির বাণ খাইয়া কম শিক্ষা পাইলেন না। দ্রোণ, দুর্যোধন আর জয়দ্রথ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে না ছাড়াইলে বিপদ হইত।

তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত দুইপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ থামাইয়া সকলে শিবিরে আসিলেন।

সেদিনও যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে না পারায়, দুর্যোধনের নিকট লজ্জা পাইয়া দ্রোণ

প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পরদিন 'চক্র' ব্যূহ নামক অতি ভয়ঙ্কর ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া তিনি পাণ্ডবপক্ষের একজন মহারথীকে বধ করিবেন।

সেদিন প্রভাত হইবামাত্রই সংশপ্তকেরা আসিয়া অর্জুনকে ডাকিয়া লইয়া গেল। এই অবসরে দ্রোণ সেই সাংঘাতিক 'চক্র' ব্যূহ রচনা করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবেরা তখন এমনই বিপদে পড়িলেন যে কি বলিব! অর্জুন অনুপস্থিত, এখন শুধু অভিমন্যু ছাড়া আর কেহই সে ব্যূহে প্রবেশ করিতে জানে না। সুতরাং দ্রোণ সুবিধা পাইয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলিলেন।

যুধিষ্ঠির আর উপায় না দেখিয়া অভিমন্যুকেই বলিলেন, "বাবা! আমরা তো এ ব্যূহে প্রবেশ করিবার কোনো উপায় জানি না। এখন অর্জুন আসিয়া যাহাতে আমাদের নিন্দা না করেন, তাহা কর।"

অভিমন্যু বলিলেন, "আমি এ ব্যূহে প্রবেশ করিতে ভয় পাই। কিন্তু আপনি যখন বলিতেছেন, তখন অবশ্য যাইব।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির আর ভীম বলিলেন, "তুমি কেবল পথটুকু করিয়া দাও, তারপর তোমার পিছু পিছু আমরা ঢুকিয়া বাকি যাহা করিবার সব করিব।"

এ কথায় অভিমন্যু তাঁহার সারথি সুমিত্রকে চক্রব্যূহের দিকে রথ চালাইতে বলিলে, সুমিত্র বিনয় করিয়া বলিল, "কুমার, বড়ই কঠিন এবং ভয়ঙ্কর কাজে হাত দিতেছেন; একবার ভাবিয়া দেখুন।"

অভিমন্যু বলিলেন, "তুমি চল। নিজে ইন্দ্র দেবতাদিগকে লইয়া আসিলেও আজ আমি যুদ্ধ করিব।"

সুতরাং সারথি আর বিলম্ব না করিয়া রথ চালাইয়া দিল। আর অমনি, হরিণের ছানা পাইলে বাঘ যেমন করিয়া আসে, সেইরূপ করিয়া কৌরব-যোদ্ধাগণ বালক অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বয়সে বালক হইলে কি হয়? সেই আঠারো বৎসরের ছেলে দ্রোণের সামনেই ব্যূহ ভেদ করিয়া বড়-বড় কৌরবদিগকে একধার হইতে বাণের ঘায়ে অচল করিতে লাগিলেন। কত লোক মরিল, কত পলাইয়া গেল, তাহার কি সংখ্যা আছে? অশ্মকেশর মরিলেন, কর্ণ অজ্ঞান হইলেন, শল্য অজ্ঞান হইলেন, শল্যের ভাই মারা গেলেন, ছোট-খাট যোদ্ধার তো কথাই নাই।

অভিমন্যুর বীরত্ব দেখিয়া দ্রোণ কৃপকে বলিলেন, "ইহার মতো যোদ্ধা বোধহয় আর কোথাও নাই। এ ইচ্ছা করিলে আমাদের সকলকে মারিয়া শেষ করিতে পারে।"

এ কথা কিন্তু দুর্যোধনের সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন, "অর্জুনের পুত্র বলিয়া দ্রোণ ইচ্ছা করিয়া ইহাকে মারিতেছেন না। তাই এই মূর্খের এত স্পর্ধা হইয়াছে। চল, আমরা সকলে মিলিয়া ইহাকে বধ করি।"

দুঃশাসন বলিলেন, "ইহাকে মারিলে অর্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে আপনিই মরিয়া যাইবে। অর্জুন মরিলে পাণ্ডবেরাও মরিবে। সুতরাং আমি এখনই ইহাকে মারিয়া আপনার সকল আপদ দূর করিয়া দিতেছি।"

দুঃশাসন এইরূপ গর্ব করিয়া অভিমন্যুকে মারিতে গেলেন, আর তাহার খানিকক্ষণ

পরেই দেখা গেল যে তিনি চিৎ হইয়া রথে পড়িয়া খাবি খাইতেছেন, আর সারথি সেই রথ হাঁকাইয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিতেছে!

কর্ণ দুবার আসিয়া দুবারই নাকালের একশেষ হইলেন ; তাঁহার এক ভাই তো মরিয়াই গেল।

কিন্তু হায়! যাঁহারা এত উৎসাহ দিয়া অভিমন্যুকে ব্যূহের ভিতরে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই তাঁহার সঙ্গে ব্যূহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। একা জয়দ্রথ যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের সকলকে ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। তিন বাণে সাত্যকি, আট বাণে ভীম, ষাট বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন, দশ বাণে বিরাট, পাঁচ বাণে দ্রুপদ, দশ বাণে শিখণ্ডী, সত্তর বাণে যুধিষ্ঠির, এইরূপে সকলকেই তাঁহার নিকট পরাজিত হইতে হইল। দ্বৈত বনে ভীমের হাতে মার খাইয়া জয়দ্রথ শিবের তপস্যা করেন। তখন শিব তাঁহাকে বর দেন যে 'তুমি অর্জুন ভিন্ন আর চারি পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজয় করিবে' ; সেই বরের জোরে আজ জয়দ্রথের এত পরাক্রম।

এদিকে অভিমন্যু বৃষসেনকে পরাজয়পূর্বক বসাতীকে মারিয়াছেন। তারপর কৌরবপক্ষের অনেকে মিলিয়া আক্রমণ করিলে, তাঁহাদিগকেও কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন ; শল্যের পুত্র রুক্মরথকে মারিয়া গান্ধর্ব-অস্ত্রে অনেক যোদ্ধাকে অজ্ঞান করিয়া, তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন।

বাস্তবিক কেহই তাঁহার নিকট হইতে অক্ষত শরীরে ফিরিতে পায় নাই। দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও হার্দিক্য এই ছয়জনে এক সঙ্গে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গিয়া ছয়জনই পরাজিত হইলেন। তারপর ক্রাথের পুত্র আসিয়া মারা গেল। তারপর আবার সেই দ্রোণ প্রভৃতি ছয়জনের পরাজয়। তারপর বৃক্ষারক এবং বৃহদ্বলের মৃত্যু। আর কত বলিব? ক্রমাগত যোদ্ধারা আসে, আর অভিমন্যুর অস্ত্রে মারা যায়। কৌরবেরা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, আজ ইঁহার হাতে আর তাঁহাদের রক্ষা নাই।

তখন শকুনি বলিলেন, "চল সকলে মিলিয়া উহাকে মারি, নচেৎ ও আমাদের সকলকেই বধ করিবে।"

কর্ণ তখন দ্রোণকে বলিলেন, "শীঘ্র ইহাকে মারিবার উপায় করুন। নচেৎ আর রক্ষা নাই!"

এ কথায় দ্রোণ বলিলেন, "উহার কবচ ভেদ করা অসম্ভব। কিন্তু চেষ্টা করিলে, উহার ধনুক কাটিয়া, সারথি প্রভৃতি মারিয়া উহার যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিতে পার। উহার হাতে ধনুক থাকিতে দেবতাগণেরও উহাকে পরাজয় করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং আগে উহার ধনুক কাট ; তারপর যুদ্ধ করিও।"

এ কথায় কর্ণ হঠাৎ বাণ মারিয়া, অভিমন্যুর ধনুকটি কাটিলেন, ভোজ তাঁহার ঘোড়াগুলিকে মারিলেন, কৃপ সারথিকে বধ করিলেন ; এইরূপে তাঁহাকে সঙ্কটে ফেলিয়া, নিষ্ঠুর ছয় মহারথ এককালে সেই বীর বালককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধনুক নাই, রথ নাই। অভিমন্যু খড়্গ চর্ম লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাহাও দ্রোণ

আর কর্ণের ছলনায় দেখিতে দেখিতে কাটা গেল। চক্র নিলেন, তাহাও চারিদিক হইতে সকলে বাণ মারিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

তখন অভিমন্যু গদা হাতে অশ্বত্থামার দিকে ছুটিয়া চলিলে, অশ্বত্থামা তিন লাফে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। এদিকে চারিদিক হইতে বাণ বিঁধিয়া অভিমন্যুর দেহ সজারুর দেহের মতো হইয়া গিয়াছে।

এইসময়েও অভিমন্যু গদাঘাতে সত্তরটি সঙ্গীসমেত কালিকেয় এবং অপর সতেরজন রথী ও দশটি হাতিকে মারিয়া দুঃশাসনের পুত্রের রথ ও ঘোড়া চূর্ণ করেন। তখন দুঃশাসনের পুত্রও গদা লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। দুইজনেই দুজনের গদার বাড়িতে ঠিকরাইয়া পড়েন। তখন দুঃশাসনের পুত্র আগে উঠিয়া অভিমন্যুর মাথায় সাংঘাতিক গদার আঘাত করে। এইরূপে অন্যায় যুদ্ধে সে বালক মহাবীরকে সকলে মিলিয়া নির্দয়ভাবে হত্যা করিল।

কৌরবগণ তাঁহাদের পাপকর্ম শেষ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আর পাণ্ডবদের কথা কি বলিব? তাঁহাদের দুঃখ লিখিয়া জানানো সম্ভব নহে। অভিমন্যুর মৃত্যুতে সৈন্যেরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিতেছিল ; যুধিষ্ঠির অনেক কষ্টে তাহাদিগকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। তারপর সকলে যুধিষ্ঠিরকে ঘিরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কাহারো মুখে কথা বাহির হইল না।

এদিকে অর্জুন সংশপ্তকদিগকে মারিয়া ফিরিবার সময় কৃষ্ণকে বলিলেন, "আজ কেন আমার মন এত অস্থির হইতেছে? আমার শরীরও যেন অবশ হইয়া পড়িতেছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কোনো অমঙ্গল হয় নাই তো?"

শিবিরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা দেখিলেন, চারিদিকে অন্ধকার, লোকজনের সাড়াশব্দ নাই। অন্যদিন বাদ্য আর কোলাহলে শিবির পরিপূর্ণ থাকে, আজ তাহার কিছুই নাই। বিশেষত, অভিমন্যু প্রত্যহ, শিবিরে আসিবামাত্র, ভাইদিগকে লইয়া হাসিমুখে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন ; আজ সেই অভিমন্যুই-বা কোথায়?

এ-সকল কথা আর বাড়াইয়া বলিয়া ফল কি? অভিমন্যুর মৃত্যুর সংবাদে অর্জুনের কিরূপ কষ্ট হইল, তাহা তোমরা কল্পনা করিয়া লও। অভিমন্যুর মতো পুত্র মরিলে যেমন দুঃখ হইতে পারে, তাহা তাঁহার অবশ্যই হইল। আর সেই দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "কল্য আমি জয়দ্রথকে বধ করিব। যদি কল্য সেই পাপাত্মা জীবিত থাকিতে সূর্য অস্ত হয়, তবে আমি এইখানে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করিব।"

এই সংবাদ তখনই চরেরা দুর্যোধনের শিবিরে লইয়া গেল। তাহা শুনিয়া জয়দ্রথ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলকে বলিলেন, "রাজামহাশয়গণ! আপনাদের মঙ্গল হউক! আপনাদের অনুমতি পাইলেই আমি এই বেলা পলায়ন করি!"

কিন্তু দুর্যোধন তাহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, "আমরা এতগুলি লোক থাকিতে তোমার ভয় কি? আমরা তোমাকে রক্ষা করিব।"

দুর্যোধনের কথায় ভরসা না পাইয়া, জয়দ্রথ দ্রোণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্রোণও তাঁহাকে খুব সাহস দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই! আমি এমন ব্যূহ প্রস্তুত করিব যে, অর্জুন তাহা পারই হইতে পারিবে না। আর যদিই-বা অর্জুন তোমাকে মারে, তাহা হইলেও তো তোমার স্বর্গলাভ হইবে! সুতরাং ভয় কি?"

এ-সকল কথা আবার পাণ্ডবদিগের চরেরা তাঁহাদের কাছে গিয়া বলিলে কৃষ্ণ অর্জুনের জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন।

পরদিন দ্রোণ যে ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন, তাহা বড়ই অদ্ভুত। এই ব্যূহ চব্বিশ ক্রোশ লম্বা আর পিছনের দিকে দশ ক্রোশ চওড়া। ইহার সম্মুখ ভাগ শকটের ন্যায়, পশ্চাদ্‌ভাগ চক্র বা পদ্মের ন্যায়। ইহার ভিতরে আবার লুকাইয়া 'সূচী' নামক একটি ব্যূহ হইল। কৃতবর্মা, কাম্বোজ, জলসন্ধ, দুর্যোধন প্রভৃতি বীরেরা, জয়দ্রথকে তাঁহাদের পশ্চাতে রাখিয়া এই 'সূচী' ব্যূহে লুকাইয়া রহিলেন। নিজে দ্রোণ বড় ব্যূহের মুখে এবং ভোজ তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া সকলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেদিন অর্জুন কি ভীষণ রণই করিলেন। কৌরব-সৈন্যের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাহারা পলাইবে কি, যেদিকে চাহে, সেইদিকেই দেখে অর্জুন! দুঃশাসন অনেক হাতি লইয়া অর্জুনকে আটকাইতে আসিলেন, মুহূর্তের মধ্যে সে-সকল হাতি অর্জুনের বাণে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তাঁহার এক একটা বাণে দুই তিনটা করিয়া মানুষ কাটা যাইতে লাগিল।

এমন সময়, দুর্যোধনের তাড়ায় দ্রোণ অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। কিছুকাল দুইজনে এমনি যুদ্ধ চলিল যে, তাহার আর তুলনা নাই। কিন্তু অর্জুনের আজ অন্য কাজ রহিয়াছে, দ্রোণের কাছে এত সময় নষ্ট করিলে তাঁহার চলিবে কেন? কাজেই তিনি হঠাৎ তাঁহার পাশ দিয়া রথ চালাইয়া দিলেন। তাহাতে দ্রোণ বলিলেন, "সে কি অর্জুন! তুমি না শত্রুকে জয় না করিয়া ছাড় না?" অর্জুন বলিলেন, "আপনি তো আমার শত্রু নহেন, আপনি আমার গুরু! আমি আপনার পুত্রের সমান শিষ্য। আর আপনাকে কে যুদ্ধে হারাইতে পারে?"

কিন্তু বুড়া কি সহজে ছাড়িবার লোক? তিনি অর্জুনের পশ্চাতে তাড়া করিলেন। তখন কাজেই অল্প-স্বল্প করিয়া তাঁহাকে বারণ করা আবশ্যক হইল। এরপর ভোজকে পার হইতে হইবে। কিন্তু কৃতবর্মা ইহার মধ্যে পথ আটকাইয়া বসিয়াছেন। যাহা হউক, ইঁহাকে অজ্ঞান করিতে অর্জুনের অধিক সময় লাগিল না।

কৃতবর্মা অজ্ঞান হইলে, আসিলেন শ্রুতায়ুধ। ইঁহার বরুণদত্ত একটা ভয়ঙ্কর গদা আছে। সে গদা কেহই ফিরাইতে পারে না। কিন্তু উহার একটি দোষ আছে এই যে, যুদ্ধে লিপ্ত নহে, এমন লোককে মারিলে, উহা উল্টিয়া তাহার প্রভুরই মাথায় পড়ে। শ্রুতায়ুধ অর্জুনকে মারিতে গিয়া, সেই গদা কৃষ্ণের উপর ঝাড়িয়া বসিয়াছেন! কাজেই, বুঝিতেই পার, অর্জুনের আর শ্রুতায়ুধকে মারিবার জন্য পরিশ্রম করিতে হইল না।

শ্রুতায়ুধের পর সুদক্ষিণ ; তারপর শ্রুতায়ু ও অচ্যুত ; তারপর উঁহাদিগের পুত্র নিয়তায়ু, দীর্ঘায়ু ; তারপর সহস্র সহস্র অঙ্গদেশীয় গজারোহী সৈন্য ; তারপর বিকটাকার অসংখ্য যবন, পারদ ও শক ; তারপর আর-একজন শ্রুতায়ু—এইরূপ করিয়া কত যোদ্ধা

মরিল। দুর্যোধন তো দ্রোণের উপর চটিয়াই অস্থির! তিনি বলিলেন, "আপনি আমাদের খান, আবার আমাদেরই অনিষ্ট করেন। আপনি যে মধু মাখানো ক্ষুরের মতো, তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক, শীঘ্র জয়দ্রথকে বাঁচাইবার উপায় করুন।"

দ্রোণ বলিলেন, "আমি কি করিব? আমি বুড়া হইয়া এখন আর ছুটাছুটি করিতে পারি না। অর্জুন একটু ফাঁক পাইলেই রথ হাঁকাইয়া চলিয়া যায়। কৃষ্ণ এমনি তাড়াতাড়ি রথ চালান যে, অর্জুনের বাণ তাহার এক ক্রোশ পিছনে পড়ে। বজ্র হাতে ইন্দ্র আসিলেও আমি তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু অর্জুনকে পরাজয় করিতে কিছুতেই পারিব না। তুমিই নাহয় অনেক লোক লইয়া, একবার তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া দেখ না। আমি তোমার গায়ে এক আশ্চর্য কবচ বাঁধিয়া দিতেছি; ইহাকে কোনো অস্ত্রই ভেদ করিতে পারিবে না।"

এই বলিয়া দ্রোণাচার্য্য, জল ছুঁইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, দুর্যোধনের গায়ে সেই অদ্ভুত উজ্জ্বল কবচ বাঁধিয়া দিলে, দুর্যোধন মহোৎসাহে অর্জুনকে মারিতে চলিলেন।

এই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা, অনেক সৈন্য লইয়া দ্রোণকে ভয়ঙ্কর তেজের সহিত আক্রমণ করাতে তাঁহার সৈন্যসকল তিন দলে ভাগ হইয়া গেল। দ্রোণ অনেক চেষ্টা করিয়াও আর তাহাদিগকে একত্র করিতে পারিলেন না। তখন কি ঘোর যুদ্ধই হইয়াছিল! অশ্বত্থামা, কর্ণ, সৌমদত্তি প্রভৃতি কয়েকজন বড়-বড় বীরের হাতে, সকল সৈন্যের পশ্চাতে জয়দ্রথকে রাখিয়া, আর প্রায় সকলেই যুদ্ধে লাগিয়া গিয়াছিলেন। কত যে লোক মরিয়াছিল, তাহার গণনা নাই। দ্রোণাচার্যের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সময়ে খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাত্যকি আসিয়া সাহায্য না করিলে, বুড়ার হাতে তাঁহার বড়ই দুর্দশা হইত। সাত্যকি দেখিলেন যে, দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়্গ, চর্ম, ধ্বজ, ছত্র, ঘোড়া, সারথি সমুদায় শেষ করিয়া এক সাংঘাতিক বাণ চড়াইয়া বসিয়াছেন। সেই বাণ ছুঁড়িবামাত্র সাত্যকি চৌদ্দ বাণে তাহা কাটিয়া ফেলাতেই ধৃষ্টদ্যুম্ন সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন।

ইহার পর হইতে সাত্যকির সহিত দ্রোণের ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। কিন্তু জয়-পরাজয় কাহারো হইল না। শেষে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, বিরাট প্রভৃতি আসিয়া সাত্যকির সহিত যোগ দিল, বহুতর কৌরব যোদ্ধাও আসিয়া দ্রোণের সহায় হইলেন।

এদিকে বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল; অর্জুন এতক্ষণ কি করিতেছেন? এখনো জয়দ্রথকে পাইতে তাঁহার অনেক বিলম্ব আছে; কিন্তু তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। তিনি ক্রমাগত বাণাঘাতে কৌরব-সৈন্য কাটিয়া দিতেছেন, আর সেই পথে কৃষ্ণ রথ চালাইতেছেন। অর্জুনের বাণ তাঁহার ধনুক হইতে ছুটিয়া শত্রুর বুকে পড়িতে যে সময় লাগে, তাহার মধ্যে রথ যাইতেছে এক ক্রোশ! সুতরাং ঘোড়াগুলির যে খুবই পরিশ্রম হইবে, তাহা আশ্চর্য কি? কৃষ্ণ দেখিলেন যে, এগুলিকে একটু বিশ্রাম না করাইলে আর কিছুতেই চলিতেছে না।

অর্জুনের কি আশ্চর্য ক্ষমতাই ছিল। তিনি ঘোড়ার বিশ্রামের জন্য, রথ হইতে নামিয়া সেই মাঠের মধ্যেই বাণের দ্বারা একটা ঘর গাঁথিয়া ফেলিলেন। সেখানে জল ছিল না,

তাই একটি সুন্দর সরোবরও করিলেন। সে সরোবরে সুমধুর, সুবিমল জল তো ছিলই, তাহার উপর আবার তাহাতে হাঁসও চরিতেছিল, পদ্মফুলও ফুটিয়াছিল।

শত্রুরা অবশ্য অর্জুনের রথ থামিলে এবং অর্জুনকে নামিতে দেখিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু অর্জুনের বাণের কাছে তাহারা কি আর করিবে? কৃষ্ণ সেই বাণের ঘরের ভিতরে ঘোড়াগুলির সাজ খুলিয়া, তাহাদিগকে দলিয়া মলিয়া, জল খাওয়াইয়া, আবার তাজা করিয়া লইলেন। ইহার পর হইতে রথ আবার বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল। জয়দ্রথ যাইবেন কোথায়? ঐ তাঁহাকে দেখা যাইতেছে।

এমন সময় দুর্যোধন জয়দ্রথকে বাঁচাইবার জন্য অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। এবারে তাঁহার আর সাহসের সীমা নাই ; তাঁহার গায়ে দ্রোণের বাঁধা সেই কবচ রহিয়াছে। বাস্তবিকই সে কবচের এমনি আশ্চর্য গুণ যে, অর্জুনের বাছা বাছা বাণগুলি ইহা হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। ইহাতে কৃষ্ণ আর অর্জুন প্রথমে খুবই আশ্চর্য হইয়া গেলেন। যাহা হউক, ব্যাপারখানা যে কি, তাহা বুঝিতে অর্জুনের বিলম্ব হইল না। তখন তিনি বলিলেন, "ঐ কবচসুদ্ধই উহাকে হারাইব।"

কিন্তু কি মুশকিল! অর্জুন মন্ত্র পড়িয়া সাংঘাতিক অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করেন, আর অশ্বত্থামা অন্য দিক হইতে বাণ মারিয়া, তাহা মধ্য পথেই কাটিয়া ফেলেন ; দুর্যোধনও সেই অবসরে অর্জুন এবং কৃষ্ণকে ক্ষতবিক্ষত করেন। যাহা হউক, ইহার ঔষধ শীঘ্রই পড়িল। দুর্যোধনের সমস্ত শরীর কবচে ঢাকা, কিন্তু হাত দুখানি খালি। সেই দুখানি হাতেই অর্জুন বাণ মারিতে লাগিলেন। আর দুর্যোধন যাইবেন কোথায়? হাতে বাণ লাগাতে তাঁহার যুদ্ধ করাই অসম্ভব হইয়া উঠিল। সকলে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা না করিলে, তখনি মহারাজের প্রাণটিও যাইত।

তারপর জয়দ্রথকে ধরিবার জন্য অর্জুন অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলে কৌরবদের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। অর্জুনের গাণ্ডীবের টঙ্কার ও কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ভীষণ শব্দে কত লোক যে অজ্ঞান হইয়া গেল, তাহার সংখ্যা নাই। তখন ভূরিশ্রবা, শাল্ব, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, এই আটজনে মিলিয়া অর্জুনকে শরজালে আচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহাদের সকল বাণ কাটিয়া সমুচিত প্রতিফল দিতে অর্জুনের কোনো ক্লেশ হইল না।

এদিকে দ্রোণের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বিষম যুদ্ধ চলিতেছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাহারো জয়-পরাজয় বুঝা গেল না। বাণ, শক্তি, গদা দুজনে কতই ছুঁড়িলেন ; দুজনেরই সমান তেজ। কিন্তু ইহার পরেই দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের ঘোড়া আর ধনুক কাটিয়া তিনটি ভয়ঙ্কর বাণ মারিলে তাঁহার এমনি বিপদ হইল যে, তখন রথ ছাড়িয়া অস্ত্র ফেলিয়া হাত তুলিয়া দাঁড়ানো ভিন্ন আর উপায় নাই। দ্রোণ দেখিলেন যে, এই তাঁহার সুযোগ। অমনি তিনি সিংহের ন্যায় যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে ছুটিলেন। 'হায় হায়! মহারাজ ধরা পড়িলেন!' বলিয়া চারিদিকে চিৎকার উঠিল। ভাগ্যে সহদেবের রথ কাছে পাইয়া যুধিষ্ঠির তাহাতে উঠিতে পারিলেন, আর সহদেবের ঘোড়াগুলি দ্রোণের ঘোড়ার চেয়ে অনেক ভালো ছিল, নহিলে সেদিন সর্বনাশই হইত।

এদিকে রাক্ষস অলম্বুষ, খানিক পাণ্ডবদিগকে খুবই জ্বালাতন করিয়া ভীমের তাড়ায় পলায়ন করে। তারপর সে অন্যত্র গিয়া আবার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করাতে, ঘটোৎকচের হাতে আছাড় খাইয়া চূর্ণ হয়। তারপর অনেকক্ষণ দ্রোণের সহিত পাণ্ডবদিগের তুমুল সংগ্রাম চলে।

এমন সময় দূর হইতে কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। গাণ্ডীবের শব্দ এত দূর পৌঁছায় নাই, কাজেই তাহা কেহ শুনিতে পাইল না। এদিকে কৌরবেরাও সিংহনাদ করিতেছে। কাজেই যুধিষ্ঠির ভাবিলেন, বুঝি অর্জুনের কোনো বিপদ ঘটিল। তাই তিনি সাত্যকিতে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি শীঘ্র অর্জুনের কাছে যাও।"

সাত্যকি বলিলেন, "অর্জুন আমাকে আজ আপনার পাশ ছাড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, আমি কি করিয়া যাই? আপনি অর্জুনের জন্য চিন্তা করিবেন না। আপনাকে রক্ষা করাই আমাদের প্রথম কাজ।"

কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে অর্জুনের জন্য বড়ই ব্যস্ত দেখিয়া শেষে সাত্যকিকে যাইতে হইল। যুধিষ্ঠির ভীমকেও তাঁহার সঙ্গে পাঠাইতেছিলেন ; কিন্তু সাত্যকি তাহাকে বলিলেন, "আমার মতে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করাই তোমার কর্তব্য।" কাজেই ভীম রহিয়া গেলেন।

সাত্যকি কৌরবদিগের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় দ্রোণ আসিয়া তাহাকে আটকাইলেন। দ্রোণ বলিলেন, "অর্জুন আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কাপুরুষের মতো পাশ কাটিয়া পলায়ন করিল। তুমি যুদ্ধ না করিলে আজ তোমাকে বধ করিব।" বুদ্ধিমান সাত্যকি অমনি বলিলেন, "গুরু যাহা করেন, শিষ্যও তাহাই করে। আমি অর্জুনের কাছে চলিলাম।"

সেদিন সাত্যকির বিক্রম কৌরবেরা ভালো করিয়াই জানিতে পারিল। দ্রোণের নিকট হইতে ভোজের নিকট ; ভোজের সারথিকে কাটিয়া, কৃতবর্মাকে ঠেঙ্গাইয়া, জলসন্ধ ও মহামাত্রকে মারিয়া আবার দক্ষিণের দিকে, এইভাবে সাত্যকি চলিয়াছেন ; এমন সময় আবার দ্রোণ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে দুর্মর্ষণ, দুঃসহ, বিকর্ণ, দুর্মুখ, দুঃশাসন, চিত্রসেন, দুর্যোধন প্রভৃতিও আসিয়া একসঙ্গে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে পরাজয় করে কাহার সাধ্য? দুর্যোধন পলায়ন করিলেন, কৃতবর্মা অজ্ঞান হইলেন। তারপর যুদ্ধ চলিল, কেবল দ্রোণ আর সাত্যকিতে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর দ্রোণকে হার মানিতে হইল। তারপর সুদর্শন মরিল, কাম্বোজ, শক ও যবন-সৈন্যগণ পরাস্ত হইল, দুর্যোধন আবার আসিয়া যথেষ্ট সাজা পাইলেন। বিকটাকার পার্বতীয় সৈন্যগণ, বিশাল পাথর হাতে যুদ্ধ করিতে আসিয়া, তাহারাও সাত্যকির বাণে খণ্ড খণ্ড হইল। তখন কৌরবেরা কে কোথায় পলায়ন করিবেন, তাহাই ভাবিয়া অস্থির।

এমন সময় দ্রোণ দুঃশাসনকে সম্মুখে পাইয়া বলিলেন, "কি দুঃশাসন! এখন তোমার বীরত্ব কোথায় গেল? সকলে সাত্যকির ভয়ে পলাইতেছে, অর্জুনের হাতে পড়িলে কি করিবে? এই মুখেই কি পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিতে গিয়াছিলে?"

এই বলিয়া দ্রোণ পাণ্ডবদিগের সহিত আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলে বীরকেতু, সুধন্বা, চিত্রকেতু, চিত্রবর্মা ও চিত্ররথ নামক পাঞ্চাল রাজের পুত্রগণ দেখিতে দেখিতে তাঁহার

হাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন মনের দুঃখে রাগের ভরে দ্রোণকে আক্রমণ করাতে কিছুকাল দুজনে যুদ্ধ চলিল। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সম্মুখে টিকিতে পারিলেন না।

এদিকে সাত্যকি ক্রমে দুঃশাসন, ত্রিগর্ত প্রভৃতিকে পরাজয় করিয়া অর্জুনের দিকে চলিয়াছেন, আর দ্রোণ পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধার পর যোদ্ধাকে মারিয়া প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছেন। বৃহৎক্ষেত্র, ধৃষ্টকেতু, চেদিরাজের পুত্র, জরাসন্ধের পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র, ক্ষত্রবর্মা প্রভৃতি কত লোকের দ্রোণের হাতে প্রাণ গেল! সেই পঁচাশি বৎসরের বুড়া রণস্থলে এমনি ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, যেন তিনি ষোল বৎসরের বালক।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এই সময়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা হইল যে, 'আমি অর্জুনের সন্ধানে সাত্যকিকে পাঠাইলাম, কিন্তু সাত্যকির সাহায্যের জন্য তো কাহাকেও পাঠাই নাই।'

অমনি তিনি ভীমকে সেই কার্যে পাঠাইয়া দিলেন। ভীম খানিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতে দ্রোণ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "অর্জুনকে ছাড়িয়াছি, কিন্তু তোমাকে ছাড়িব না।" ভীম বলিলেন, "ঠাকুর! অর্জুনকে আপনি দয়া করিয়া ছাড়িয়াছেন বলিয়া তো আমার মনে হয় না। সে হয়তো ভদ্রতা করিয়া আপনার মান রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি তো ভালোমানুষ অর্জুন নহি, আমি ভীম! যুদ্ধ করিতে আসিলে গুরু বলিয়া মানিব না।" বলিতেই বলিতেই ভীম এক বিশাল গদা ঘুরাইয়া দ্রোণকে ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন। বুড়া তখন 'বাপ্!' বলিয়া রথ হইতে এক লাফ! ততক্ষণে ভীম তাঁহার রথ ঘোড়া সারথি প্রভৃতি একবারে পুঁতিয়া ফেলিয়াছেন।

ইহাতে দুর্যোধনের ভ্রাতাগণ ভীমকে আক্রমণ করিলে, তিনি তাহাদের সাতজনকে বধ করিলেন। যাহাদিগকে তিনি সম্মুখে পাইলেন, তাহাদের অল্প লোকই বাঁচিয়া রহিল। এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, দ্রোণাচার্য পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধাদিগকে নিতান্ত অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। অমনি আর কথাবার্তা নাই ; ভীম চক্ষু বুজিয়া দ্রোণের সেই বাণবৃষ্টির ভিতরেই তাঁহার রথের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তারপর সেই রথখানিসুদ্ধ—হেঁইয়োঃ হোঃ!—মার্ বুড়াকে ছুঁড়িয়া! কিন্তু বুড়ার হাড় কি অসম্ভব মজবুত! রথ গুঁড়া হইল, কিন্তু বুড়া মরিলেন না।

তারপর আর খানিক দূরে গিয়াই ভীম সাত্যকিকে দেখিতে পাইলেন। আরো খানিক দূরে গিয়া দেখিলেন, ঐ অর্জুন যুদ্ধ করিতেছেন! ওঃ! তখন যে ভীমের সিংহনাদ। সেই সিংহনাদ শুনিয়া কৃষ্ণ আর অর্জুনও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এই-সকল সিংহনাদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কানে পৌঁছাইলে তাঁহার যে খুবই আনন্দ হইল, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এ-সকল সিংহনাদ কর্ণের সহ্য না হওয়ায়, তিনি আসিয়া ভীমের সহিত মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু খানিক পরেই ভীমের বাণে তাঁহার ধনুক, ঘোড়া আর সারথি কাটা যাওয়াতে তাঁহাকে গিয়া বৃষসেনের রথে আশ্রয় লইতে হইল।

কিন্তু কর্ণ ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি আবার আসিয়া ভীমকে বলিলেন, "কি হে

পাণ্ডুপুত্র। তুমিও আবার যুদ্ধ করিতে জান নাকি! বড় যে পলাইতেছ?"

সুতরাং আবার তাঁহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবারেও কর্ণ অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া শেষে দেখিলেন যে, আবার তাঁহার ধনুক ঘোড়া সারথি সব কাটা গিয়াছে! তারপর ভীমের অস্ত্র বুকে বিঁধিয়া তাঁহার প্রাণ যায়-যায়! সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি অন্য রথে উঠিয়া পলায়ন করিলেন।

তথাপি কর্ণের লজ্জা নাই, তিনি আবার আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করিলেন। এবারে ধনুক সারথি আর ঘোড়া কাটা গিয়া তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হইতেছে দেখিয়া, দুর্যোধন তাড়াতাড়ি দুর্জয়কে সাহায্য করিতে পাঠাইলেন। কিন্তু সে বেচারা ভালো করিয়া সাহায্য করিবার পূর্বেই মরিয়া গেল।

যাহা হউক, এবারে কর্ণকে আর পলাইতে হইল না ; তাঁহার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সমেত এক নূতন রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। দুঃখের বিষয় এই যে, ভীম সে রথেরও ঘোড়া আর সারথি সংহার করাতে, তাহাতে চড়িয়া কর্ণের যুদ্ধ করা হইল খুব কমই। এমন সময় দুর্মুখ কর্ণের সাহায্য করিতে আসিলেন। সাহায্য যাহা করিলেন, তাহা একটু নতুন রকমের বটে, আর তিনি ইচ্ছা করিয়া যে সেরূপ করিয়াছিলেন, তাহাও অবশ্য কখনোই নহে, কিন্তু তাহাতেই কর্ণের প্রাণ রক্ষা হইল। দুর্মুখ আসিয়াই তো অমনি ভীমের হাতে প্রাণত্যাগপূর্বক, নিজের রথখানি খালি করিয়া দিলেন। সে রথের ঘোড়াগুলি ছিল বড়ই চমৎকার! সুতরাং কিঞ্চিৎ পরেই যখন ভীমের হাতে কর্ণেরও দুর্দশার একশেষ হইল, তখন ঐ ঘোড়াগুলির সাহায্যে তিনি সহজেই রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন।

তারপর ভীম দুর্যোধনের আর পাঁচটি ভাইকে বধ করিলে, কর্ণ আবার যুদ্ধ করিতে আসেন আর দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাতে জব্দও হন। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন তাঁহা সাতটি ভাইকে পাঠাইবামাত্র, তাহারাও ভীমের হাতে মারা যায়। তারপর আবার কর্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এবারেও ভীমের হাতে কর্ণের দুর্দশা দেখিয়া দুর্যোধন তাঁহার আর সাতটি ভাইকে বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র গিয়া উহাকে বাঁচাও!" হায়! কে কাহাকে বাঁচায়? সাতভাই ভালো করিয়া যুদ্ধ করিতে না করিতেই মরিয়া গেল। তারপর কর্ণের মাথায় কি যে গোল লাগিল, তিনি পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া কৌরবদিগকে মারিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু ইহার পর হইতেই যেন কর্ণের তেজ আবার ফিরিয়া আসিল। তখন দেখা গেল যে, অনেকক্ষণ দুজনে সমানভাবে যুদ্ধ চলার পর, কর্ণ ক্রমেই ভীমকে কাবু করিয়া আনিতেছেন। ক্রমে ভীমের তূণ, ধনুর গুণ, ঘোড়ার রাশ, সবই কাটা গেল। সারথিটি বাণ খাইয়া অন্য রথে আশ্রয় লইল। ধ্বজ, পতাকা, কিছুই আস্ত রহিল না। ভীম একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলেন, তাহাও কাটা গেল। শেষে রহিল খড়্গ ও চর্ম। কর্ণ চর্মখানি কাটিয়া ফেলিলেন। খড়্গটি ভীম ছুঁড়িয়া মারিলে, তাহাতে কর্ণের ধনুক কাটিয়া গেল। কর্ণ তখন আর এক ধনুক লইয়া, ভীমের উপরে বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন!

তখন ভীম কর্ণকে মারিবার জন্য লাফাইয়া তাঁহার উপর পড়িতে গেলেন। কিন্তু কর্ণ হঠাৎ গুঁড়ি মারিয়া রথের তলার সঙ্গে মিশিয়া পড়ায়, তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন

না। তারপর ভীমের হাত খালি দেখিয়া, কর্ণ তাঁহাকে তাড়া করাতে তিনি এমনি বিপদে পড়িলেন যে, বিপদ যাহাকে বলে! কতকগুলি মরা হাতি সেখানে পড়িয়াছিল ; ভীম আর উপায় না দেখিয়া তাহারই পিছনে গিয়া লুকাইলেন। কিন্তু হাতি খণ্ড খণ্ড করিতে কর্ণের মতো বীরের আর কতক্ষণ লাগে? তাহাতে ভীম রথের চাকা, হাতির মাথা প্রভৃতি কর্ণকে ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের বাণের কাছে তাহাতেই বা কি ফল হইবে?

তখন ভীম বজ্রমুষ্ঠি উঠাইয়া এক কীলে কর্ণকে বধ করিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু এই মনে করিয়া ক্ষান্ত হইলেন, 'আমি কর্ণকে মারিলে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইবে।' কর্ণও ইচ্ছা করিলে তখন ভীমকে মারিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারও মনে হইল যে, কুন্তীর নিকটে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ইহাদিগকে মারিবেন না। তাই তিনি ভীমকে ধনুক দিয়া একটা খোঁচামাত্র মারিলেন। ভীমও তৎক্ষণাৎ সেই ধনুক কাড়িয়া লইয়া, সাঁই শব্দে এক ঘা লাগাইতে ছাড়িলেন না।

তখন কর্ণ রাগে চোখ লাল করিয়া বলিলেন, "মূর্খ! পেটুক! কাপুরুষ! তুই কেন আবার যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস? তুই তো যুদ্ধের 'য'ও জানিস না! যা! পেট ভরিয়া খা গিয়া। আমার মতো লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা তোর কাজ নহে।"

তাহাতে ভীম বলিলেন, "ছোট লোক! এতবার আমার সঙ্গে হারিয়াছিস, তবুও আবার বড়াই করিস। হারজিৎ তো ইন্দ্রেরও হয়। আয় না, একবার মল্ল যুদ্ধ করি ; দেখি তোকে কীচক বধ করিতে পারি কিনা।"

ভীমের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে কর্ণের সাহস হইল না। কিন্তু তিনি এই ঘটনা লইয়া অর্জুনের সামনেই খুব বড়াই করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অর্জুনের কয়েকটি বাণ আসিয়া গায়ে পড়িলে আর তাঁহার বড়াই রহিল না। তখন তাঁহার হঠাৎ মনে হইল যে, বড়াই করার চেয়ে পলায়ন করাতে বেশি কাজ দেয়।

এই সময়ে সাত্যকি অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া অর্জুনের মনে সুখ হইল না। তিনি সাত্যকিকে যুধিষ্ঠিরের কাছে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া আসাতে না জানি মহারাজের কি বিপদই হইয়াছে। বিশেষত এতক্ষণ যুদ্ধ করিয়া সাত্যকির অস্ত্র প্রায় শেষ হইয়া যাওয়ায়, এখন তাঁহারও খুবই বিপদ। এদিকে ভূরিশ্রবা রাশি রাশি অস্ত্র সমেত সুন্দর রথে চড়িয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার সম্বল সাত্যকির মোটেই নাই। কাজেই অর্জুনের রাগ হইবার কথা। এখন সাত্যকিকেই বা তিনি কি করিয়া ফেলিয়া যান, আর, যে সামান্য বেলাটুকু অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে জয়দ্রথকে মারিতে হইবে, তাহারই-বা কি করেন?

সাত্যকি একে অতিশয় ক্লান্ত, তাহাতে আবার অস্ত্রহীন, কাজেই ভূরিশ্রবা তাঁহাকে যেন নিতান্তই বাগে পাইলেন। তথাপি সাত্যকির যতক্ষণ কিছুমাত্র অস্ত্র অবশিষ্ট ছিল, ততক্ষণে তিনি কম যুদ্ধ করেন নাই। ভূরিশ্রবা যেমন তাঁহার ধনুক আর ঘোড়া কাটিলেন, তিনিও তেমন ভূরিশ্রবার ধনুক আর ঘোড়া কাটিতে ছাড়িলেন না। তারপর রথ ছাড়িয়া

দুজনের খড়গযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু ক্লান্ত শরীরে আর কত করা যায়? সাত্যকি খড়গযুদ্ধ করিয়াই কাবু হইয়া পড়িলেন।

এমন সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "ঐ দেখ! সাত্যকিকে দুর্বল পাইয়া ভূরিশ্রবা তাহাকে বধ করিতেছে। ইহা অতি অন্যায়। সাত্যকি তোমার শিষ্য, আর তোমার জন্যই আসিয়া বিপদে পড়িল। উহাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য।"

এদিকে ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে খড়্গঘাতে ফেলিয়া দিয়া, তাঁহার চুলে ধরিয়া, বুকে লাথি মারিয়া তাঁহার মাথা কাটিতে উদ্যত ; সাত্যকি প্রাণপণে মাথা নাড়িয়া তাহার আঘাত এড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় অর্জুনের বাণ উল্কার মতো আসিয়া ভূরিশ্রবার ডানহাত কাটিয়া ফেলিল। তখন ভূরিশ্রবা অর্জুনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "অর্জুন, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, তুমি কেন আমার হাত কাটিলে?"

অর্জুন বলিলেন, "আমার শিষ্য, আত্মীয় ও বন্ধুকে আমার সম্মুখে বধ করিতে দেখিয়াও নীরব থাকিলে মহাপাপ হইত, তাই কাটিলাম।"

তখন ভূরিশ্রবা অনাহারে প্রাণত্যাগের জন্য নিজ হাতে শরশয্যা প্রস্তুত করিয়া ইষ্ট দেবতার ধ্যানে বসিলে কৌরবেরা চারিদিক হইতে অর্জুনের নিন্দা আরম্ভ করিল।

তাহাতে অর্জুন আবার ভূরিশ্রবাকে বলিলেন, "হে ভূরিশ্রবা! আমার পক্ষের লোককে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা আমার কর্তব্য কাজ, তাহাই আমি করিয়াছি! কিন্তু বল দেখি, তোমরা যে বালক অভিমন্যুকে মারিয়াছিলে, তাহা তোমাদের কিরূপ কাজ হইয়াছিল?"

ভূরিশ্রবা নতশিরে অর্জুনের কথা মানিয়া লইলেন, আর বাঁ হাতে নিজের কাটা ডান হাতখানি অর্জুনের সামনে ধরিয়া এ কথাও জানাইলেন যে, ও হাত কাটিয়া ফেলা উচিতই হইয়াছে।

এমন সময় সাত্যকি অসহ্য রাগের ভরে খড়্গ লইয়া ভূরিশ্রবার দিকে ছুটিয়া চলিলেন। সকলে চিৎকার করিয়া উঠিল, "আহা! আহা! কর কি" কিন্তু সাত্যকি কাহারো নিষেধ না শুনিয়া ভূরিশ্রবার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

আর বিলম্ব করা চলে না ; জয়দ্রথ বধের সময় যায়। তাই অর্জুন শীঘ্র সে কাজ শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। দুর্যোধন, কর্ণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা আর দুঃশাসন ইঁহারাও তখন জয়দ্রথকে পশ্চাতে রাখিয়া মহাতেজে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন।

অর্জুন তাঁহাদের প্রত্যেকের বাণ দুই তিন খণ্ড করিয়া কাটিতেছেন, তাঁহারাও বারবার অর্জুনকে বাণে আচ্ছন্ন করিতেছেন। জয়দ্রথও তখন চুপ করিয়া নাই। কিন্তু অর্জুনকে বারণ করে কাহার সাধ্য? তিনি ক্রমে সকলকে হারাইয়া চৌষট্টি বাণে জয়দ্রথকে অস্থির করিলেন।

কিন্তু তখনো ছয় মহাবীরের মাঝখানে জয়দ্রথ লুকাইয়া রহিলেন। ইঁহাদিগকে পরাজয় না করিয়া তাঁহাকে মারা অসম্ভব। এদিকে সূর্য অস্ত যাইতে আর অল্পই বাকি। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "আমি মায়াবলে সূর্যকে ঢাকিতেছি, তাহা হইলে জয়দ্রথ

ভাবিবে, সূর্য অস্ত গেল, এখন তোমাকে মরিতে হইবে। সুতরাং তখন আর সে লুকাইবার চেষ্টা করিবে না। সেই অবসরে কিন্তু তাহাকে বধ করা চাই!"

এই বলিয়া কৃষ্ণ মায়াবলে সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলিলে, অর্জুনের মৃত্যুকাল উপস্থিত মনে করিয়া কৌরবদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। তখন জয়দ্রথ গলা উঁচু করিয়া দেখিতে লাগিলেন, সূর্য যথার্থই অস্ত গিয়াছে কিনা।

অমনি কৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জুন, এই বেলা! ঐ দেখ জয়দ্রথ নিশ্চিন্তে গলা উঁচু করিয়া সূর্য দেখিতেছে। এই বেলা উহার মাথা কাটিয়া ফেল।"

কিন্তু জয়দ্রথের মাথা কাটা সহজ কাজ নহে। উহার জন্মকালে দেবতারা বলিয়াছিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো মহাবীর ইহার মাথা কাটিবেন।" তখন উঁহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্র বলেন, "যে ব্যক্তি আমার পুত্রের মাথা ভূমিতে ফেলিবে, তাহার মাথাও তখনই শতখণ্ড হইবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধক্ষত্র বনে গিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। এখনো তিনি সমন্তপঞ্চক নামক তীর্থে তপস্যা করিতেছেন। এ-সকল কথা মনে করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "সাবধান অর্জুন! ইহার মাথাটা তোমার হাতে মাটিতে পড়িলে কিন্তু সর্বনাশ। মাথাটাকে সেই সমন্তপঞ্চক তীর্থে বুড়া বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে নিয়া ফেলিতে হইবে।"

তখন অর্জুন এক বাণেই জয়দ্রথের মাথা কাটিয়া, তাহা মাটিতে পড়িবার পূর্বেই তিনি আর কয়েক বাণে সেটাকে উড়াইয়া সেই সমন্তপঞ্চক তীর্থে জয়দ্রথের পিতার কোলে নিয়া ফেলিলেন। সেখান হইতে উহা মাটিতে পড়িবামাত্র বৃদ্ধক্ষত্রের মাথা কাটিয়া শতখণ্ড হইয়া গেল।

তারপর কৃষ্ণ অন্ধকার দূর করিয়া দিলে দেখা গেল যে, তখনো সূর্য একেবারে ডুবিয়া যায় নাই।

জয়দ্রথের মৃত্যুতে কৃপ আর অশ্বত্থামা রাগিয়া অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অর্জুনের বাণ তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না।

সেদিন সন্ধ্যার পরেও আর কেহ শিবিরে যায় নাই। সমস্ত রাত্রি মশাল জ্বালিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। সে রাত্রিতে দ্রোণ, সাত্যকি, অশ্বত্থামা, ভীম, ঘটোৎকচ প্রভৃতি অতি অদ্ভুত বীরত্ব দেখান, আর অর্জুনের হাতে অসংখ্য লোক মরে। সে সময়ে তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল যে, কর্ণের সহিত যুদ্ধ করেন ; কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলে তাহা হয় নাই।

কর্ণ ঘোরতর যুদ্ধের পর সাত্যকির হাতে পরাজিত হইলেন। তারপর, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা প্রভৃতি অনেকেই সাত্যকিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পরাজয় করিতে কাহারো শক্তি হইল না।

এদিকে দুর্যোধন যুদ্ধে কিছু করিতে না পারিয়া শেষে দ্রোণকে গালি দিতে আরম্ভ করায় দ্রোণ নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, "দুর্যোধন! কেন বৃথা আমাকে কষ্ট দিতেছ? আমি তো সর্বদাই বলিতেছি যে, অর্জুনকে জয় করা অসম্ভব। পাপ তো কম কর নাই। এখন সে পাপের ফল ভোগ কর।" এই বলিয়া তিনি বাণে বাণে পাণ্ডবদিগকে অস্থির করিয়া তুলিলেন।

দুর্যোধনও কম তেজ দেখান নাই! হাজার হাজার লোক তাঁহার হাতে প্রাণত্যাগ

করে। তারপর যুধিষ্ঠির আসিয়া ধনুক কাটিয়া দশ বাণেই তাঁহাকে কাতর করিয়া দেন। যুধিষ্ঠির আবার বাণ মারিলে আর দুর্যোধন যুদ্ধ করিতে পারেন নাই।

দ্রোণ আর ভীমের কথা কি বলিব? দ্রোণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কেকয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ ও শিবিকে বিনাশ করিলেন। আর ভীম কীল মারিয়া কলিঙ্গরাজের পুত্র ধ্রুব, আর লাথির চোটে দুর্মদ এবং দুষ্কর্ণকে সংহার করিলেন।

ঘটোৎকচ আর অশ্বত্থামার সে সময়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বড়ই অদ্ভুত। রাত্রিতে রাক্ষসদের বল বাড়ে, আর রাক্ষসেরা নানারকম মায়াও জানে, তাহার উপর আবার ঘটোৎকচ অসাধারণ বীর। সুতরাং অশ্বত্থামা যে নিতান্ত সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এমন সংকটেও তিনি কিছু মাত্র কাতর হন নাই। ঘটোৎকচের সকল মায়া তিনি তিনবার চূর্ণ করিয়া দিলেন।

ঐ সময়ে ঘটোৎকচের পুত্র অঞ্জনপর্বা অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা গেলে, ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার উপরে ঘোরতর বাণবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। সে-সকল বাণ অশ্বত্থামা কাটিয়া ফেলিলে সে এমনি অদ্ভুত এক পাহাড় আনিয়া উপস্থিত করিল যে, কি বলিব! সে পাহাড়ের ঝরণা সকল হইতে ক্রমাগত শেল, শূল, মুষল মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্র অশ্বত্থামার উপর পড়িতে লাগিল।

পাহাড় অশ্বত্থামার বাণে চূর্ণ হইলে, ঘটোৎকচ মেঘের রূপ ধরিয়া ক্রমাগত অশ্বত্থামার উপরে প্রস্তরবৃষ্টি আরম্ভ করিল। কিন্তু অশ্বত্থামার 'বায়ব্য' অস্ত্রে সে-সকল পাথরসুদ্ধ মেঘ কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার ঠিক নাই।

তখনি আবার কোথা হইতে বিকটাকার রাক্ষসগণ অশ্বত্থামাকে গিলিতে আসিল। কিন্তু অশ্বত্থামা তাহাতেও কাতর হইলেন না। রাক্ষসেরা দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাণে খণ্ড হইয়া গেল।

ইহা দেখিয়া ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে একটা বজ্র ছুঁড়িয়া মারে। অশ্বত্থামা সেই বজ্র লুফিয়া লইয়া উল্টিয়া ঘটোৎকচকেই আবার তাহা ছুঁড়িয়া মারিলে তাহাতে ঘটোৎকচের ঘোড়া, সারথি আর ধ্বজ কাটিয়া গেল। এই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচকে সাহায্য করিতেছিলেন, তথাপি অশ্বত্থামার বাণে সে এতই কাতর হইয়া পড়িল যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহার মৃত্যু হইল ভাবিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলাইয়া গেলেন।

এদিকে সোমদত্ত ও বাহ্লীকের সহিত ভীম আর সাত্যকির যুদ্ধ চলিয়াছে। সোমদত্তকে ভীম পরিঘের আঘাতে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলে তাঁহার পিতা বাহ্লীক ভীমকে আক্রমণ করেন। বাহ্লীকের শক্তির ঘায়ে ভীম অচেতন হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুহূর্ত পরেই আবার উঠিয়া তিনি এমন এক গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহাতে বাহ্লীকের মাথা চূর্ণ হইয়া গেল।

তারপর ভীম নাগদত্ত, দৃঢ়রথ, বীরবাহু প্রভৃতি দুর্যোধনের নয়টি ভাইকে মারিয়া কর্ণের ভ্রাতা ভূকরথ, শকুনির ভাই শতচন্দ্র ও ধৃতরাষ্ট্রের আর সাতটি শ্যালককে সংহার করিলেন।

আর-একস্থানে যুধিষ্ঠিরকে অনেক লোক মারিতে দেখিয়া, দ্রোণ আসিয়া তাঁহাকে

আক্রমণ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠির তাঁহার বায়ব্য, বারুণ, যাম্য, আগ্নেয়, ত্বাষ্ট্র, সাবিত্রী প্রভৃতি সকল অস্ত্র কাটিয়া শেষ করিলেন। দ্রোণের ঐন্দ্র ও প্রাজাপত্য-অস্ত্র যুধিষ্ঠিরের মাহেন্দ্র-অস্ত্রে কাটা গেল। তখন দ্রোণ রোষভরে ব্রহ্মাস্ত্র হাতে করিলে, যোদ্ধাদের আতঙ্কের সীমাই রহিল না। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহাতে কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া, নিজের ব্রহ্মাস্ত্রে দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র বারণ করিলেন। কাজেই দ্রোণের আর যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করা হইল না।

এই সময় কর্ণ পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বড়ই অস্থির করিয়া তোলেন। তাহারা তাঁহার বাণের জ্বালায় হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন করিতে থাকে। তখন অর্জুন না থাকিলে কি হইত, কে জানে? অর্জুন আসিয়া কর্ণের ধনুক, ঘোড়া আর সারথি কাটিয়া তাঁহাকে বাণে বাণে সজারুর প্রায় করিয়া দেন। কৃপের রথ সেখানে ছিল তাই রক্ষা, নহিলে সে যাত্রা কর্ণের প্রায় বাঁচাই ভার হইত।

ইহার পর ভীষণ যুদ্ধে সাত্যকির হাতে সোমদত্তের মৃত্যু হয়। যুধিষ্ঠিরও তখন দ্রোণের সহিত খুব যুদ্ধ করিতেছিলেন ; এমন-কি, মুহূর্তের জন্য তাঁহাকে অজ্ঞান করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে বারণ করিয়া বলিলেন, "উনি সর্বদা আপনাকে ধরিয়া আনিবার চেষ্টায় আছেন, উঁহার সহিত আপনার যুদ্ধ না করাই ভালো।"

ইহার কিছু পরে কৃতবর্মার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া যুধিষ্ঠির অজ্ঞান হইয়া যান ; অন্যেরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচায়।

তারপর আবার অশ্বত্থামা এবং ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এবারেও জয় অশ্বত্থামারই হইল। দুর্যোধন এই সময়ে ভীমকে আক্রমণ করিয়া ক্রমাগত পাঁচবার তাঁহার ধনুক কাটিলেন। তাহাতে ভীম ধনুক ছাড়িয়া শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে তাহাও দুর্যোধন কাটিতে ছাড়িলেন না। তখন ভীম দুর্যোধনের রথের উপর এমনি বিশাল এক গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহাতে রথ, ঘোড়া, সারথি সব চুরমার হইয়া গেল। দুর্যোধন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নন্দকের রথে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু ভীমের মনে হইল বুঝি রথ আর ঘোড়ার সহিত তিনিও চূর্ণ হইয়াছেন।

এই সময়ে সহদেবের সহিত কর্ণের যুদ্ধ হয় ; আর সহদেব দেখিতে দেখিতে তাহাতে হারিয়া যান। তখন কর্ণ ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে বধ করিতে পারিতেন, কিন্তু কুন্তীর কথা ভাবিয়া ক্ষান্ত রহিলেন।

শকুনি কিন্তু নকুলের হাতে খুবই সাজা পাইলেন। শিখণ্ডীরও কৃপের হাতে প্রায় সেইরূপ দশা হইল। তারপর দ্রোণ আর ধৃষ্টদ্যুম্নে, কর্ণ আর সাত্যকিতে, এইরূপ করিয়া কত যে যুদ্ধ হইল, তাহার শেষ নাই। এদিকে, এ-সকল যুদ্ধের ভিতরেই, অর্জুনের গাণ্ডীবের ভয়ঙ্কর শব্দ ক্রমাগত দূর হইতে শোনা যাইতেছিল। তিনি যে তখন কত লোক মারিতেছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহাকে আটকাইতে আসিয়া শকুনি আর তাঁহার পুত্র উলুক বড়ই লজ্জা পাইলেন।

ইহাতে দুর্যোধনের নিকট বকুনি খাইয়া দ্রোণ আর কর্ণ মহারোষে সৈন্য মারিতে

আরম্ভ করিলেন। তখন বেচারারা দ্রোণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। যতক্ষণ না অর্জুন আসিয়া দ্রোণ আর কর্ণকে আক্রমণ করিলেন, ততক্ষণ আর তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে সাহসই পায় নাই। খানিক পরে আবার কর্ণ এমনি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন যে, সৈন্যদের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের ভাবনা হইল, 'এখন যুদ্ধ করি, না পলায়ন করি।'

অর্জুন আর সহ্য করিতে না পারিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, "শীঘ্র কর্ণের নিকট চলুন। আজ হয় আমি উহাকে বধ করিব, নাহয় ঐ আমাকে বধ করিবে।"

কিন্তু কৃষ্ণ তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, "তোমাকে মারিবার জন্য কর্ণ ইন্দ্রের সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি রাখিয়া দিয়াছে, অতএব এখন তোমার তাহার কাছে যাওয়া উচিত নহে। ঘটোৎকচকে পাঠাও।"

তখন অর্জুনের কথায় ঘটোৎকচ গিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এদিকে সেই জটাসুরের পুত্র অলম্বল নামক রাক্ষস আসিয়া দুর্যোধনকে বলিল, 'হেই মোহার্‌রাজ্জ! মোকে বোল্‌না, মুহি পাণ্ডোধের্‌র্‌কে মারকে খাই। ই লোক মোর বাপ্পুকে মারিলেক্‌!"

দুর্যোধনের ইহাতে কোনো আপত্তি হওয়ার কথা ছিল না। সুতরাং তখন অলম্বল আর ঘটোৎকচে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই রাক্ষস মিলিয়া কি অদ্ভুত যুদ্ধই করিয়াছিল! অস্ত্র দিয়া, নখ দিয়া, দাঁত দিয়া, কীল, লাথি, চড়, মারিয়া সাদাসিধা যুদ্ধ তো প্রথমে তাহারা করিলই, শেষে আরম্ভ হইল মায়াযুদ্ধ। এক জন যেইমাত্র আগুন হইল, অমনি আর-একজন হইল জল! তখন এ হইল তক্ষক, অমনি ও হইল গরুড়! এ হইল মেঘ, ও হইল ঝড়; মেঘ হইল পর্বত, ঝড় হইল বজ্র। পর্বত হইল হাতি, বজ্র হইল বাঘ! হাতি গেল সূর্য হইয়া বাঘকে পোড়াইতে, অমনি বাঘ আসিল রাহু হইয়া সূর্যকে গিলিতে।

এইরূপ অসম্ভব অদ্ভুত যুদ্ধের পর ঘটোৎকচ অলম্বলের মাথা কাটিয়া তারপর কর্ণকে আক্রমণ করিল। দুইজনেই বীর, কাহারো তেজ কম নহে। কত বাণ ঘটোৎকচ কর্ণকে মারিল, কত বাণ কর্ণ ঘটোৎকচকে মারিলেন।

দুজনের কাঁসার কবচ ছিঁড়িয়া গেল। দুজনের শরীরই রক্তে লাল হইল। শেষে কর্ণ ঘটোৎকচের ঘোড়া মারিয়া আর রথ ভাঙ্গিয়া দিলে সে মায়াদ্বারা এমনি বিকট চেহারা করিল যে কি বলিব! কর্ণ বাণ মারেন, আর সে হাঁ করিয়া তাহা গিলে। দেখিতে দেখিতে সে বুড়া আঙ্গুলটির মতন ছোট হইয়া যায়, আবার তখনি বিশাল পর্বতের বেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে তাহার একশতটা মাথা হইয়া গেল। তারপর হঠাৎ আর সে নাই, সে পাতালে ঢুকিয়া গিয়াছে। আবার মুহূর্তের ভিতরেই, সে পাহাড় সাজিয়া শূন্যমার্গে আকাশে আসিয়া উপস্থিত। সেই পাহাড় হইতে কত শেল, কত শূল, কত গদা যে কর্ণের মাথায় পড়িল, তাহার অন্তই নাই। তারপর আবার অসংখ্য বিকট রাক্ষস কোথা হইতে আনিয়া উপস্থিত করিল! এইরূপে কত মায়া যে সে দেখাইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, কিন্তু কর্ণ কিছুতেই কাতর হইলেন না।

ইহার মধ্যে অলায়ুধ নামক একটা ভয়ঙ্কর রাক্ষস আসিয়া ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিল। তখন ভীম ঘটোৎকচের সাহায্য করিতে আসিলে, অলায়ুধের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হইল। অলায়ুধ সেই বকের ভাই, কাজেই ভীমের উপর তাহার রাগ। আর সে রাগের উপযুক্ত বলও তাহার ছিল। সুতরাং সে ভীমকে সহজে ছাড়িল না। এই সময়ে ঘটোৎকচ কর্ণকে ছাড়িয়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ না করিলে, হয়তো সে ভীমকে পরাজয়ই করিত।

ঘটোৎকচ অনেক কষ্টে অলায়ুধকে বধ করিয়া, আবার কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল। খানিক যুদ্ধের পর সে কর্ণের ঘোড়া আর সারথিকে মারিয়া হঠাৎ আর সেখানে নাই। তারপর আবার আসিয়া সে কি ভয়ঙ্কর মায়াযুদ্ধই যে আরম্ভ করিল, তাহা কি বলিব! তখন অগ্নিবর্ণ মেঘসকল আকাশ হইতে ক্রমাগত বজ্র, উল্কা, বাণ, শক্তি, প্রাস, মুষল, পরশু, খড়্গ, পট্টিশ, তোমর, পরিঘ, গদা, শূল, শতঘ্নী, পাথর প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিল। কর্ণের আর তখন এমন শক্তি হইল না যে, তাহা বারণ করেন। ইহার উপরে আবার শত শত রাক্ষস আসিয়া, কৌরবদিগকে সংহার করিতে লাগিল। কর্ণ তথাপি যথাসাধ্য বাণবৃষ্টি করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছুই হইল না। এদিকে ঘটোৎকচ শতঘ্নী মারিয়া তাঁহার ঘোড়া কয়টিকে বধ করিয়াছে।

এমন সময় কৌরবেরা সকলে মিলিয়া কর্ণকে কহিলেন, "আর কি দেখিতেছ? শীঘ্র ইন্দ্রের সেই এক পুরুষঘাতিনী শক্তি দিয়া এ রাক্ষসকে বধ কর।"

কর্ণ দেখিলেন যে, রাক্ষসের হাতে প্রাণ যায়-যায় ; কাজেই তিনি নিরুপায় হইয়া, সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি হাতে লইলেন।

সে শক্তি দেখিবামাত্র ঘটোৎকচ নিজের দেহকে বিশাল পর্বতের ন্যায় বড় করিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল। জীবজন্তুরা চিৎকার করিয়া উঠিল, ঝড় বহিল, বজ্রপাত আরম্ভ হইল ; আর সেই মহাশক্তি কর্ণের হাত হইতে ছুটিয়া গিয়া ঘটোৎকচের বুক ভেদ করত ঊর্ধ্বমুখে প্রস্থান করিল।

ঘটোৎকচ পড়িবার সময়, এক অক্ষৌহিণী কৌরব-সৈন্য তাহার সেই বিশাল শরীরের চাপে মারা গেল। তাহার মৃত্যুতে পাণ্ডবদের কিরূপ দুঃখ হইল, বুঝিতেই পার। কিন্তু কৃষ্ণ ইহার মধ্যে সিংহনাদপূর্বক অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া, সেই রথের উপরেই নাচিতে লাগিলেন।

ইহাতে অর্জুন ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন দুঃখের সময় কিজন্য আপনি এত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন?"

কৃষ্ণ বলিলেন, "আনন্দ করিতেছি এইজন্য যে, কর্ণ সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর মারাতে, তোমার বিপদ কাটিয়া গেল। ঘটোৎকচকে না মারিলে ঐ শক্তি দিয়া সে তোমাকে বধ করিত। এখন উহা তাহার হাত হইতে চলিয়া গেল, এরপর তুমি অনায়াসেই তাহাকে মারিতে পারিবে।"

কিন্তু ঘটোৎকচের গুণের কথা মনে করিয়া কেহই স্থির থাকিতে পারিল না। জন্মাবধি সে এক মুহূর্তও নিজের সুখের দিকে না চাহিয়া, পাণ্ডবদিগের কত সেবা করিয়াছে,

যুধিষ্ঠির সে-সকলের কথা বলিতে বলিতে রাগে এবং দুঃখে অস্থির হইয়া কর্ণকে বধ করিতে চলিলেন। ভীম তো তখন হইতে কৌরবদিগকে এক ধার হইতে মারিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এ পর্যন্ত ক্ষান্ত হন নাই।

এমন সময় অর্জুন সকলকে বলিলেন, "রাত্রি অনেক হইয়াছে, আর তোমরাও অন্ধকারে যুদ্ধ করিয়া নিতান্তই ক্লান্ত হইয়াছ। সুতরাং এই বেলা একটু বিশ্রাম করিয়া লও, চন্দ্র উঠিলে আবার যুদ্ধ করা যাইবে।" অর্জুনের কথায় সকলে সন্তুষ্ট হইয়া, যিনি যেমনভাবে ছিলেন, সেইভাবেই, কেহ ঘোড়ায়, কেহ রথে, কেহ হাতিতে, কেহ সেই রণস্থলের কাদার উপরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। অস্ত্র-শস্ত্র যোদ্ধাদিগের হাতেই রহিল।

শেষ রাত্রিতে চাঁদ উঠিলে, আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভোরবেলায় দ্রুপদ এবং তিনটি পৌত্র সহ বিরাট, দ্রোণের হাতে মারা গেলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন শোকে অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আজ যদি আমি দ্রোণকে বধ না করি, তবে যেন আমার স্বর্গলাভ না হয়।"

এই বলিয়া তিনি ভীমের সহিত দ্রোণ-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। তখনকার যুদ্ধ কি ঘোরতরই হইয়াছিল! দুর্যোধন ও দুঃশাসন নকুল ও সহদেবের সহিত, কর্ণ ভীমের সহিত, দ্রোণ অর্জুনের সহিত, এমনই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, সকলে তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

দ্রোণ আর অর্জুনের যুদ্ধ কি আশ্চর্য ; তাঁহাদের হাতেরই-বা কি অদ্ভুত ক্ষমতা, রথেরই-বা কি বিচিত্র গতি, আর অস্ত্রেরই-বা কি চমৎকার গুণ। কত বড়-বড় অস্ত্র যে দ্রোণ অর্জুনকে মারিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। অর্জুন তাহা সকলই কাটিয়া ফেলিলেন। যতই তিনি সে-সব অস্ত্র কাটেন, দ্রোণ ততই আহ্লাদিত হইয়া ভাবেন যে, 'আমি যত পরিশ্রম করিয়া উহাকে শিখাইয়াছিলাম, তাহা সার্থক হইয়াছে।'

সেদিন অনেকের সহিত অনেকের যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু দ্রোণ যেমন তেজের সহিত পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরা তেমন করিয়া কৌরব-সৈন্য মারিতে পারেন নাই। দ্রোণের পরাক্রম দেখিয়া তাঁহাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

এমন সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "অর্জুন! দ্রোণের হাতে অস্ত্র থাকিতে দেবতারাও উঁহাকে মারিতে পারেন না। অতএব যাহাতে উনি অস্ত্র ছাড়েন, তাহার উপায় করিতে হইবে। কেহ গিয়া উঁহার কাছে বলুক যে, 'অশ্বত্থামা মরিয়া গিয়াছে'; তাহা হইলে উনি অস্ত্র ছাড়িয়া দিবেন।"

অর্জুন এমন কাজ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কিন্তু অন্য যোদ্ধারা ইহাতে মত দিলেন, এবং অনেক কষ্টে যুধিষ্ঠিরেরও মত করানো হইল।

তখন ভীম কী করিলেন শুন। পাণ্ডবপক্ষের ইন্দ্রবর্মার একটা হাতি ছিল, তাহার নাম 'অশ্বত্থামা'! ভীম গদাঘাতে সেই হাতিটাকে মারিয়া, লজ্জিতভাবে দ্রোণের নিকট আসিয়া চিৎকারপূর্বক বলিতে লাগিলেন, "অশ্বত্থামা মরিয়া গিয়াছে! অশ্বত্থামা মরিয়া গিয়াছে!"

এ কথায় দ্রোণ প্রথমে বড়ই কাতর হইলেন ; কিন্তু তারপর মনে করিলেন যে

'অশ্বত্থামা অমর, সে কি করিয়া মরিয়া যাইবে?' তারপর খানিক যুদ্ধ করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যুধিষ্ঠির! অশ্বত্থামা মরিয়াছে, এ কথা কি সত্য?"

দ্রোণ জানেন যে, যুধিষ্ঠির কখনোই মিথ্যা কথা কহেন না, কাজেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু হায়! কৃষ্ণ যে ইহার মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে কি শিখাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনি জানেন না। কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছেন, "মহারাজ! আপনি এই মিথ্যা কথাটুকু না বলিলে, আমরা সকলে আজ দ্রোণের হাতে মারা যাইব। সুতরাং এইটুকু মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

ইহার উপর আবার ভীম সেই অশ্বত্থামা নামক হাতিটাকে মারিয়া 'অশ্বত্থামা মরিয়াছে' এ কথা বলার সুবিধাও করিয়া দিয়াছেন। কাজেই যুধিষ্ঠিরের আর তাহা বলিতে তত আপত্তি নাই। তবে কথা এই যে, দ্রোণ তো আর হাতির কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, তিনি তাঁহার পুত্রের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সুতরাং কেবল 'অশ্বত্থামা মরিয়াছে', এ কথা তাঁহাকে বলিলে মিথ্যা কথাই বলা হয় বৈকি!

যাহা হউক, যুধিষ্ঠিরের চেষ্টা, যাহাতে দুই দিকই রক্ষা হয়। জয়ও লাভ করিতে হইবে, মিথ্যাও বলা হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি দ্রোণকে বলিলেন, "অশ্বত্থামা মরিয়াছে...হাতি।"

'অশ্বত্থামা মরিয়াছে' এই কথাগুলি বলিলেন জোরে, দ্রোণ তাহাই শুনিতে পাইলেন! 'হাতি' কথাটি বলিলেন অতি মৃদু স্বরে ; দ্রোণ তাহা শুনিতে পাইলেন না।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রথ কখনো মাটি ছুঁইত না, সর্বদাই চারি আঙ্গুল উচ্চে থাকিত। কিন্তু তিনি মিথ্যা কথা বলার পর হইতে, তাহা মাটিতে নামিয়া পড়িল।

যুধিষ্ঠিরের মুখে অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথা শুনিয়া, দ্রোণ নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, তিনি আর আগের মতো যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি অনেকক্ষণ যুঝিয়াছিলেন এবং সহজে কেহ তাঁহার কিছু করিতে পারেন নাই।

এমন সময় ভীম আবার আসিয়া বলিলেন, "কিসের জন্য অত যুদ্ধ করিতেছেন? অশ্বত্থামা তো মরিয়া গিয়াছে!"

তখন দ্রোণ অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "হে মহাবীর কর্ণ! হে কৃপাচার্য! হে দুর্যোধন! আমি বারম্বার বলিতেছি, তোমরা ভালো করিয়া যুদ্ধ কর। তোমাদের মঙ্গল হউক ; আমি অস্ত্রত্যাগ করিলাম।" এই বলিয়া তিনি ভগবানের চিন্তায় মন দিলেন।

এমন সময় দেখা গেল যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন অসি হস্তে দ্রোণকে কাটিতে চলিয়াছেন। রণভূমিসুদ্ধ লোক তাহাতে শিহরিয়া উঠিল। সকলে চিৎকার করিয়া বলিল, "হায় হায়! এমন কাজ করিও না।" অর্জুন রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে বারণ করিতে ছুটিলেন। কিন্তু হায়! কিছুতেই কিছু হইল না; অর্জুন তাঁহাকে ধরিবার পূর্বেই তিনি তাঁহার নিষ্ঠুর নীচ কাজ শেষ করিয়া ফেলিলেন।

দ্রোণের মৃত্যুতে কৌরবেরা ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্যোধন পলাইলেন, কর্ণ পলাইলেন, শল্য পলাইলেন, কৃপ কাঁদিতে কাঁদিতে রণস্থল ছাড়িয়া

চলিলেন। সকলেই ভাবিলেন যে, আজ বুঝি কৌরব-সৈন্য নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

অশ্বত্থামা অন্যদিকে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন ; তিনি এ বিপদের কিছুই জানিতে পারেন নাই। সকলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কিজন্য এমন করিয়া পলাইতেছ?"

ইহার উত্তরে যখন তাঁহাকে দ্রোণের মৃত্যু-সংবাদ শোনানো হইল, তখন তিনি অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "আজ নিশ্চয় আমি পাণ্ডবপক্ষের সকলকে বিনাশ করিব।"

অশ্বত্থামার নিকট নারায়ণ-অস্ত্র নামক একখানি অতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছিল। সে অস্ত্র ছুঁড়িলে, কাহারো সাধ্য হয় না যে তাহাকে আটকায়। অমরই হউক আর দেবতাই হউক, সে অস্ত্র গায়ে পড়িলে, তাহাকে মরিতেই হইবে। স্বয়ং নারায়ণ এই অস্ত্র দ্রোণকে দেন, দ্রোণের নিকট হইতে তাহা অশ্বত্থামা পান। সেই অস্ত্র এখন তিনি ধনুকে জুড়িলেন।

নারায়ণ-অস্ত্র ছুঁড়িবামাত্র ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং ভূমিকম্প আরম্ভ হইল, সূর্য মলিন হইয়া গেল, চারিদিকে অন্ধকার ঘিরিয়া ফেলিল, সাগর উথলিয়া উঠিল, নদীসকলের স্রোত ফিরিয়া গেল। সেই সাংঘাতিক অস্ত্রের ভিতর হইতে আগুনের মতো অসংখ্য অস্ত্র বাহির হইয়া জ্বলিতে জ্বলিতে ঘোর গর্জনে পাণ্ডবদিগকে তাড়া করিল। তখন আর কেহই মনে করিল না যে, তাঁহাদের রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় আছে।

কিন্তু উপায় ছিল ; তাহা কৃষ্ণ জানিতেন। তিনি সকলকে বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র অস্ত্র ফেলিয়া নামিয়া দাঁড়াও, তাহা হইলে এই অস্ত্রে কিছুই করিতে পারিবে না। অমনি সকলে অস্ত্রত্যাগ করিয়া, হাতি, ঘোড়া, রথ, যিনি যাহার উপর ছিলেন, তাহা হইতে নামিয়া পড়িলেন। কিন্তু ভীম রোখা লোক, তিনি বলিলেন, "অস্ত্র ছাড়িব কেন? এই গদা দিয়া আমি নারায়ণ-অস্ত্রকে পিষিয়া দিব।" বিষম বিপদ আর কি! ভীম কিছুতেই অস্ত্র ছাড়িবেন না। নারায়ণ-অস্ত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিতে গেলেন ; আর নারায়ণ-অস্ত্রের ভীষণ অগ্নিও তৎক্ষণাৎ আসিয়া, রথসুদ্ধ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন কৃষ্ণ আর অর্জুন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া, তাঁহাকে রথ হইতে টানিয়া নামান, আর তাঁহার অস্ত্র কাড়িয়া ফেলিয়া দেন, নচেৎ না জানি সেদিন কি হইত!

এইরূপে ভীম বাঁচিয়া গেলেন বটে, কিন্তু জোর করিয়া নামাইবার আর অস্ত্র কাড়িয়া লইবার দরুন, তাঁহার ভয়ানক রাগ হওয়াতে, তিনি সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

নারায়ণ-অস্ত্র বৃথা হওয়ায়, অশ্বত্থামা ক্রোধভরে অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ভীম ইঁহাদের কেহই তাঁহার সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে পারিলেন না। তারপর অর্জুন তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি মন্ত্র পড়িয়া আগ্নেয়-অস্ত্র নামক এক মহা-অস্ত্র তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করা মাত্র অতি ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত হইল, যেন সৃষ্টি থাকে কি যায়! এরূপ অস্ত্র আর কেহ কখনো দেখে নাই। অশ্বত্থামা মনে করিয়াছিলেন যে, এ অস্ত্রে পাণ্ডবেরা নিশ্চয় মরিবে। কিন্তু অর্জুন তাহার পরক্ষণেই ব্রহ্মাস্ত্র মারিয়া সে অস্ত্রকে দূর করিয়া দিলেন। তখন অশ্বত্থামা নিতান্ত নিরাশভাবে, "দূর হোক্! সব মিথ্যা!" এই বলিতে বলিতে রণস্থল ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন।

# কর্ণপর্ব

চদিন ঘোরতর যুদ্ধের পর দ্রোণ প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পর কাহাকে সেনাপতি করা যায়, এ বিষয়ে পরামর্শ আরম্ভ হইলে অশ্বত্থামা বলিলেন, "মহাবীর কর্ণ অসাধারণ যোদ্ধা, অতএব তাঁহাকেই আমরা সেনাপতি করিয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করিব।"

তখন দুর্যোধন বলিলেন, "হে কর্ণ! তোমার মতো যোদ্ধা তো আর কেহই নহে, সুতরাং তুমিই এখন আমাদের সেনাপতি হও।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, 'মহারাজ! আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব। এখন আমি তোমার সেনাপতি হইতেছি, সুতরাং মনে কর যেন পাণ্ডবেরা হারিয়া গিয়াছে।"

তখনই ধুমধামের সহিত কর্ণকে সেনাপতি করা হইল। তারপর রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র দেখা গেল যে, 'সাজ! সাজ!' বলিয়া সকলে যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত। কর্ণকে সেনাপতি করিয়া আবার কৌরবদিগের সাহস ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাদের এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভীষ্ম আর দ্রোণ স্নেহ করিয়া পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এবার কর্ণের হাতে আর তাঁহাদের রক্ষা নাই। সুতরাং সেদিন যুদ্ধ আরম্ভের সময় সকলেরই খুব উৎসাহ দেখা গেল।

আজ বিশাল হাতিতে চড়িয়া ভীম যুদ্ধে নামিয়াছেন। যাঁহার সহিত প্রথমে তাঁহার যুদ্ধ হইল, তাঁহার নাম ক্ষেমমূর্তি ; তিনিও হাতির উপরে এবং অসাধারণ বীরও বটেন, প্রথমে যুদ্ধ অনেকটা সমানে সমানেই চলিল ; এমন-কি, ক্ষেমমূর্তিই আগে নারাচের ঘায়ে ভীমের হাতিকে মারিয়া ফেলিলেন। ভীম সেই হাতি পড়িবার পূর্বেই তাহা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ক্ষেমমূর্তির হাতিকে এমনি লাথি মারিলেন যে, হাতি চেপ্টা হইয়া মাটির ভিতর ঢুকিয়া গেল। তখন ক্ষেমমূর্তি মাটিতে নামিয়া রোষভরে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ামাত্র ভীম গদাঘাতে তাঁহার প্রাণ বাহির করিয়া দিলেন।

তারপর অশ্বত্থামার সহিত ভীমের অনেকক্ষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ করিতে করিতে, শেষে দুজনেই অজ্ঞান হইয়া যাওয়ায় সারথিরা তাঁহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করে।

এদিকে অর্জুনকে অবশিষ্ট সংশপ্তকদিগের সহিত ঘোর যুদ্ধে রত দেখিয়া অশ্বত্থামা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন এবং বেশ একটু জব্দও হইলেন। তখন অর্জুন আবার সংশপ্তকদিগকে আক্রমণ করামাত্র আবার অশ্বত্থামা আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু এবারে

হাতে বুকে ও মাথায় বাণের খোঁচা খাইয়া অশ্বত্থামা একটু বিশেষরূপে সাজা পাইলেন। তাঁহার ঘোড়াগুলিরও কম দুর্দশা হইল না। ইহার উপর আবার তাহাদের রাশ কাটিয়া যাওয়াতে, তাহারা অশ্বত্থামাকে লইয়া সেখান হইতে যে ছুট দিল, আর রণক্ষেত্রের বাহিরে না গিয়া থামিল না। অশ্বত্থামাও ভাবিলেন, 'ভালোই হইয়াছে।'

তারপর আর একজন অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন, তাঁহার নাম দণ্ডধার। তিনি মরিলে আসিলেন তাঁহার ভাই দণ্ড। দণ্ড মরিলে আবার সংশপ্তকেরা আসিল।

অপরদিকে কর্ণও পাণ্ড্যকে বধ করিয়া বিস্তর পাণ্ডব-সৈন্য মারিয়াছেন। তারপর নকুলকে আক্রমণ করাতে দুজনে যুদ্ধ চলিয়াছে। দুজনেই দুজনের বাণে আচ্ছন্ন, মেঘের ছায়ার ন্যায় বাণের ছায়ায় রণস্থল ঢাকিয়া গিয়াছে। এমন সময় কর্ণের বাণে নকুলের ধনুক কাটা গেল, তারপর দেখিতে দেখিতে তাঁহার সারথি, ঘোড়া, রথ, অস্ত্র সকলই গেল, আর তাহার যুঝিবার ক্ষমতা রহিল না। তখন তিনি পলায়নের আয়োজন করামাত্র কর্ণ আসিয়া তাঁহার গলায় ধনুকের ফাঁস লাগাইয়া দেওয়াতে, বেচারার সে পথও বন্ধ হইয়া গেল। কর্ণ ইচ্ছা করিলেই তখন নকুলকে বধ করিতে পারিতেন, কিন্তু কুন্তীর কথা মনে করিয়া, কেবল এই বলিয়াই ছাড়িয়া দিলেন, "যাও, ঘরে যাও! আর বড়-বড় কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিও না!"

ইহার পর আর কর্ণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া সৈন্যদের দুর্গতির একশেষ হইয়া উঠিল।

এদিকে কৃপের হাতে পড়িয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রায় সেই দশা। অনেকে ভাবিল, তিনি বুঝি-বা মারাই যান। সারথি তাঁহাকে বলিল, "বড়ই তো বিপদ দেখিতেছি, রথ ফিরাইব নাকি?" ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন, "আমি ঘামিয়া কাঁপিয়া আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। চল, এই বামুনকে ছাড়িয়া শীঘ্র ভীম বা অর্জুনের কাছে যাই।" সারথি তাহাই করিল।

দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ অতি অদ্ভুত হইয়াছিল। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ধনুক কাটিলেন, যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ অন্য ধনুক লইয়া দুর্যোধনের ধনুক কাটিয়া তাহার উত্তর দিলেন। যুধিষ্ঠিরের তিন বাণ দুর্যোধনের বুকে আসিয়া পড়িল, দুর্যোধন তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, উল্টিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাঁচ বাণ আর একটা শক্তি মারিলেন। সেই শক্তি কাটা গেল, দুর্যোধন মারিলেন একটা ভল্ল। তাহার উত্তরে যুধিষ্ঠিরের এক বাণ আসিয়া তাঁহার গায়ে বিষম বিঁধিয়া গেল। তখন দুর্যোধন বিশাল গদা হাতে যুধিষ্ঠিরকে মারিতে গিয়া তাঁহার শক্তির ভীষণ ঘায়ে রথের উপরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় ভীম আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বারণ করিয়া বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি দুর্যোধনকে মারিব, সুতরাং আপনার এখন উহাকে মারা উচিত নহে।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে ছাড়িয়া দিলেন। তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত বড়ই ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। এই সময়ে সর্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব দেখান কর্ণ আর অর্জুন। দুজনেই অসংখ্য সৈন্য বিনাশ করেন। বিশেষত কর্ণের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইলে, অর্জুন এমনি অসাধারণ যুদ্ধ করেন যে, কৌরবেরা তাহা দেখিয়া, ভয়ে চক্ষু বুজিয়া, আর্তনাদ করিতে থাকেন। তাঁহাদের ভাগ্যবলে এই সময়ে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন

তাঁহারা যুদ্ধ শেষ করিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কর্ণ সর্বদাই বড়-বড় কথা কহেন। সেদিন নাকালের একশেষ হইয়াও তিনি বলিলেন, "অর্জুন আজ হঠাৎ অস্ত্র-বৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছে, কিন্তু কাল আমি তাহাকে জব্দ করিব।"

রাত্রি প্রভাত হইলে কর্ণ দুর্যোধনকে বলিলেন, "আজ হয় আমি অর্জুনকে মারিব, নাহয় সে আমাকে মারিবে। কিন্তু আমার একজন ভালো সারথি চাই। আমার বিজয় নামক বিশ্বকর্মা-কৃত যে আশ্চর্য ধনুক আছে, তাহা অর্জুনের গাণ্ডীবের চেয়ে কম নহে। এখন কৃষ্ণের মতো একটি সারথি পাইলেই, আমি পাণ্ডবদিগকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারি।"

তারপর তিনি বলিলেন, "শল্য যদি আমার সারথি হন, তবে নিশ্চয় অর্জুনকে বধ করিব। মহাবীর শল্য কৃষ্ণ অপেক্ষাও ভালো সারথি, আর আমি তো অর্জুনের চেয়ে বড় যোদ্ধা আছিই, সুতরাং শল্য আমার সারথি হইলে, দেবাসুরগণও আমার হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারিবেন না।"

তখন দুর্যোধন শল্যকে বলিলেন, "মামা! আপনাকে কর্ণের সারথি হইতে হইতেছে।"

এ কথায় শল্য রাগে চোখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "কি! এত বড় কথা! আমাকে বল সূতপুত্রের (সারথির ছেলে) সারথি হইতে! আমি কি তাহার চেয়ে কম যে আমি তাহার সারথি হইতে যাইব? চলিলাম আমি এখান হইতে!'

ইহাতে দুর্যোধন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "রাম রাম! আপনি কেন তাহার চেয়ে কম হইতে যাইবেন? কৃষ্ণ কি অর্জুনের চেয়ে কম? আমি তো মনে করি যে অর্জুনের চেয়ে বড়, আর আপনি কৃষ্ণের চেয়েও বড়!"

এ কথায় শল্য বলিলেন, "তুমি যে আমাকে কৃষ্ণের চেয়ে বড় বলিলে, ইহাতে আমি বড়ই তুষ্ট হইলাম। আচ্ছা তবে আমি কর্ণের সারথি হইব, কিন্তু আমার একটা নিয়ম থাকিল। আমার যাহা খুশি, তাহাই আমি কর্ণকে বলিব।"

কর্ণ তাহাতেই রাজি হইয়া রথে উঠিলেন। আর উঠিয়াই শল্যকে বলিলেন, "রথ চালাও! আমি এখনি অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব আর যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিব।"

ইহাতে শল্য বলিলেন, "সূতপুত্র! ইন্দ্রও যাঁহাদিগকে ভয় করেন, তুমি কোন্ সাহসে তাঁহাদিগকে অবহেলা করিতেছ? যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আর তোমার মুখে এমন কথা শোনা যাইবে না।"

কর্ণ বলিলেন, "আজ যদি যম, বরুণ, কুবের আর ইন্দ্রও বন্ধু বান্ধব লইয়া অর্জুনকে রক্ষা করিতে আসেন, তথাপি আমি তাঁহাদিগকে সুদ্ধ অর্জুনকে পরাজয় করিব।"

শল্য বলিলেন, "তোমার ক্ষমতা খুব আছে বটে, কিন্তু কথা কও তাহার চেয়ে অনেক বেশি! তুমি কখনোই অর্জুনের সমান নহ। পলায়ন না করিলে, আজ তাহার হাতে তোমার প্রাণ যাইবে।"

কর্ণ বলিলেন, "যখন অর্জুন আমাকে পরাজয় করিবে, তখন আসিয়া তাহার বড়াই

করিও।"

তখন শল্য, "বেশ কথা! তাহাই হইবে।" বলিয়া রথ চালাইয়া দিলেন।

কর্ণ পাণ্ডব-সৈন্য দেখিলেই বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে অর্জুনকে দেখাইয়া দিবে, তাহাকে গাড়ি ভরিয়া রত্ন দিব, ছয় হাতির রথ দিব, একশত গ্রাম দিব আর কৃষ্ণ আর অর্জুনকে মারিয়া তাহাদের সকল ধন দিব।"

এ কথায় শল্য হাসিয়া বলিলেন, "তোমার অত হাতি-টাতি কিছুই দিতে হইবে না, অর্জুনকে অমনিই দেখিতে পাইবে।"

এতক্ষণে কর্ণের রাগ হইল। তিনি বলিলেন, "তুমি নিতান্ত মূর্খ, যুদ্ধের কিছুই জান না। তুমি চুপ কর ; তোমার মতো একশোজনে আসিয়া বকিলেও আমি ভয় পাইব না।"

শল্য বলিলেন, "তাই তো! তোমার দেখিতেছি মাথা খারাপ হইয়াছে! চিকিৎসার দরকার!"

এইরূপে ক্রমাগত উপহাস করিয়া, শল্য কর্ণের মন ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কর্ণের তেজ কমাইয়া দিবার জন্য পাণ্ডবদিগের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই প্রতিজ্ঞা পালন করা। যুদ্ধের সময়ও একটু সুযোগ পাইলেই, "ঐ দেখ অর্জুন কেমন বীর, তুমি ইহার সঙ্গে পারিবে না।" এইরূপ নানাকথা বলিয়া তিনি বেচারাকে ব্যস্ত করিয়া তোলেন।

তথাপি কর্ণ যেরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহা অতি অদ্ভুত। অর্জুন যত কৌরব-সৈন্য মারিলেন, কর্ণ তাহা অপেক্ষা কম পাণ্ডব-সৈন্য মারিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সাত্যকি, ভীম, সহদেব, শিখণ্ডী, যুধিষ্ঠির ইহারা সকলে তাঁহার নিকট হইতে হঠিয়া গেলেন।

যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের বাণে কর্ণ একবার অজ্ঞান হইয়া যান, কিন্তু শীঘ্রই আবার উঠিয়া আসিয়া যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বরক্ষক দুটিকে মারিয়া ফেলেন। তারপর ষাট বাণে তাঁহাকে কাতর করিয়া কর্ণ সিংহনাদ করিতেছেন, এমন সময় সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি অনেক যোদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিলেন।

তথাপি কর্ণ কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না। তাঁহার বাণে চারিদিক ছারখার হইয়া যাইতে লাগিল। যুধিষ্ঠিরের ধনুক আর বর্ম কাটিয়া, তিনি তাঁহাকে এমনি সঙ্কটে ফেলিলেন যে কি বলিব! যুধিষ্ঠির এক শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলেন, কর্ণের বাণে তাহাও দুই খণ্ড হইয়া গেল। তারপর যুধিষ্ঠির চারিটা তোমর মারিয়া কর্ণকে কাতর করিলেন বটে, কিন্তু কর্ণ তথাপি তাঁহার ধ্বজ, তূণ, রথাদি নাশপূর্বক তাঁহাকে বাণাঘাতে ব্যাকুল করিতে ছাড়িলেন না।

তখন যুধিষ্ঠির অন্য রথে চড়িয়া পলায়নের আয়োজন করিলে, কর্ণ অমনি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার কাঁধে হাত দিলেন।

এমন সময় শল্য বলিলেন, "কর কি, সূতপুত্র! উঁহাকে ধরিলেই উনি তোমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন।"

যাহা হউক, কুন্তীর কথা কর্ণের মনে ছিল ; তাই তিনি যুধিষ্ঠিরের আর কোনো অনিষ্ট করিলেন না, কেবল কিছু গালি দিয়াই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। যুধিষ্ঠিরকে হারিতে দেখিয়া, কৌরবেরা তাঁহার সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে লাগিল, আর ভীম সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণের হাতে তাহারা শাস্তিও পাইল ভালো মতেই। দুর্যোধন চিৎকারপূর্বক তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা পলায়ন করিও না, পলায়ন করিও না।" কিন্তু তাঁহার কথা কে শুনে।

ইহা দেখিয়া কর্ণ শল্যকে বলিলেন, "শীঘ্র ভীমের নিকট রথ লইয়া চল।" ভীম তখন কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সিংহনাদপূর্বক সেই দিকেই আসিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া শল্য কর্ণকে বলিলেন, "ঐ দেখ ভীম আসিতেছে। আজ সে তাহার বহুদিনের রাগ তোমার উপর ঝাড়িবে!"

তারপর ভীমের আর কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে ভীম কর্ণকে এমনি ভয়ঙ্কর বাণ ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহা পর্বতে লাগিলে পর্বতও ফাটিয়া যাইত। সে বাণ খাইয়া আর কর্ণকে যুদ্ধ করিতে হইল না। তিনি তখনি চিৎ হইয়া রথের ভিতরে পড়িয়া অজ্ঞান হওয়ায় শল্য তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন।

কর্ণের পরাভব দেখিয়া দুর্যোধন তাঁহার ভাইদিগকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। তারপর সে বেচারাদের যে দুর্দশা! যুদ্ধ ভালো করিয়া আরম্ভ হইতে না হইতেই তাহাদের ছয়জন মরিয়া গেল। আর সকলে তখন ভাবিল, বুঝি যম আসিয়াছে। কাজেই তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

তখন আবার কর্ণ আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করাতে, ভীম এক বিশিকের ঘায় তাঁহাকে অস্থির করিয়া দিলেন। কর্ণ তথাপি তাহাতে না চটিয়া ভীমের ধনুক আর রথ চূর্ণ করিলেন। তাহাতে ভীম মহারোষে গদা লইয়া এমনি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, কৌরবদিগের পলায়ন ভিন্ন কথা নাই।

এদিকে কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে সামনে পাইয়া, তাঁহাকে এমনি তাড়া করিয়াছেন যে, তিনি পলাইবার পথ পান না। তাহাতে ভীম ছুটিয়া আসিয়া আবার কর্ণকে আক্রমণ করিলেন। ততক্ষণে কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা প্রভৃতি বীরগণও সেখানে উপস্থিত হইলে অনেকক্ষণ সাংঘাতিক যুদ্ধ চলিল!

অর্জুন এই সময়ে সংশপ্তক, নারায়ণী-সৈন্য প্রভৃতির সহিত ঘোরতর যুদ্ধে ব্যস্ত। উহাদের মধ্যে সুশর্মা অর্জুনের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করেন, এমন-কি, একবার তাঁহাকে অজ্ঞান করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু অর্জুন ঐন্দ্রাস্ত্র মারিয়া তাঁহাদের সকলকেই জব্দ করিয়া দিলেন।

অশ্বত্থামা আর যুধিষ্ঠিরের অনেকক্ষণ খুব যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সাত্যকি মাঝে মাঝে যুধিষ্ঠিরের সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামার বাণে যুধিষ্ঠির ক্রমে এমনই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন যে, তখন আর তাঁহার সেখান হইতে প্রস্থান করা ভিন্ন উপায় রহিল না।

অশ্বত্থামা সেদিন অর্জুনের সঙ্গেও কম যুদ্ধ করেন নাই। এমন-কি, তাঁহার তেজে অর্জুনকে কাতর হইতে হয়। তখন কৃষ্ণ আশ্চর্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আজ কেমন তোমার তেজ কমিয়া গেল? গাণ্ডীব কি তোমার হাতে নাই? না কি হাতে লাগিয়াছে?"

যাহা হউক, এরূপভাবে অনেকক্ষণ যায় নাই। শেষে অশ্বত্থামাকে নিতান্তই নাকাল হইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতে হয়।

ইহার পরে অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক, রথ, ঘোড়া, সারথি প্রভৃতি মুহূর্তের মধ্যে চূর্ণ হইয়া গেল। তারপর তাঁহাকে খালি হাতে পাইয়া, অশ্বত্থামা বাণে বাণে তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহাকে বধ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ছুটিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিলে, কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "ঐ দেখ, ধৃষ্টদ্যুম্নের কি দুর্দশা!" তখন অর্জুন অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এই সময়ে কর্ণ প্রভৃতি বীরেরা, যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার চেষ্টায়, তাঁহাকে আক্রমণ করেন। কর্ণের বাণে নিতান্ত ক্লেশ পাইয়াও যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ এমনি তেজের সহিত যুদ্ধ করেন যে, তাহাতে কৌরবদলে হাহাকার উপস্থিত হয়। কিন্তু শেষকালে কর্ণের বাণ একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠাতে, তিনি সারথিকে বলিলেন, "শীঘ্র এখান হইতে রথ লইয়া চল।"

তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা "ধর! ধর!' বলিয়া তাঁহার পিছু পিছু তাড়া করিল। কিন্তু পাণ্ডব-সৈন্যেরা ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে এমনি শিক্ষা দিল যে, আর তাহারা বেয়াদবি করিতে সাহস পাইল না।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির, বাণাঘাতে নিতান্ত কাতর হইয়া, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে ধীরে ধীরে শিবিরে চলিয়াছেন, ইতিমধ্যে আবার কর্ণ আসিয়া তাঁহার গায়ে বাণ মারিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা তিনজনে মিলিয়াও কর্ণকে কিছুতেই বারণ করিতে পারিলেন না। কর্ণের বাণে যুধিষ্ঠিরের ঘোড়া আর পাগড়ি, নকুলের ঘোড়া, রাশ আর ধনুক, দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। সর্বনাশের আর অধিক বাকি নাই, এমন সময় শল্য কর্ণকে বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরকে লইয়া ব্যস্ত হইয়াছ, অর্জুনের সহিত কখন যুদ্ধ করিবে? উহাকে মারিয়া ফল কি? আগে অর্জুনকে মার। আর ঐ দেখ, দুর্যোধন ভীমের হাতে পড়িয়াছেন, ইহাদিগকে ছাড়িয়া আগে তাঁহাকে বাঁচাও!"

এ কথায় কর্ণ তাড়াতাড়ি দুর্যোধনকে সাহায্য করিতে গেলেন, যুধিষ্ঠিরও রক্ষা পাইলেন ; আঘাতের যাতনায় তিনি এতই কাতর হইয়াছিলেন যে, শিবিরে আসিয়াই তাঁহাকে শয়ন করিতে হইল।

এদিকে আবার অশ্বত্থামার আর অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এবারেও অশ্বত্থামার তেজের কোনো অভাব নাই ; কিন্তু তাঁহার সারথি হত আর ঘোড়া ক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি একটু বিপদে পড়িয়াছেন। ঘোড়াগুলি অর্জুনের বাণে অস্থির হইয়া, রথ রথী সকল সুদ্ধ রণস্থল হইতে ছুট দিল। তারপর পাণ্ডব-যোদ্ধাগণের তাড়া খাইয়া, কৌরবদিগের

সৈন্যগুলিও পলায়ন করিতে পারিলে বাঁচে।

তখন দুর্যোধন কর্ণকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, তুমি থাকিতেই সৈন্যগুলি পলায়ন করিতেছে! আর তাহারা তোমাকেই ডাকিতেছে।"

এ কথায় কর্ণ তাঁহার বিজয় নামক বিশ্বকর্মানির্মিত সেই আশ্চর্য পুরাতন ধনুকে ভার্গব-অস্ত্র জুড়িয়া নিক্ষেপ করিলে আর পাণ্ডব-সৈন্যদের দুর্দশার অবধি রহিল না। তখন তাঁহারা দাবানলভীত জন্তুর ন্যায় চ্যাঁচাইতে লাগিল। সেই চিৎকার শুনিয়া অর্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন, "ঐ দেখুন, ভার্গবাস্ত্রে সৈন্যগণের কি দুর্দশা হইতেছে। শীঘ্র কর্ণের নিকট রথ লইয়া চলুন।"

কিন্তু কৃষ্ণ ভাবিলেন যে, কর্ণ আরো খানিক যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইলে, অর্জুন সহজেই তাঁহাকে বধ করিতে পারিবেন ; কাজেই তিনি কর্ণের দিকে না গিয়া অর্জুনকে বলিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের বাণে বড়ই কাতর হইয়াছেন। আগে তাঁহাকে শান্ত করিয়া, তারপর কর্ণকে মারা যাইবে।"

তখন তাঁহারা তাড়াতাড়ি শিবিরের দিকে আসিতেছেন, এমন সময় অশ্বত্থামা আসিয়া মহারোষে অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। যাহা হউক, অশ্বত্থামাকে পরাজয় করিতে অনেক সময় লাগিল না। তারপর ভীমের হাতে কৌরবদিগের নিবারণের ভার দিয়া তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে গেলেন।

সেখানে অনেক কথাবার্তার পর তথা হইতে চলিয়া আসিবার সময় অর্জুন এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আজ হয় আমি কর্ণকে মারিব, না হয় কর্ণ আমাকে মারিবে।"

এদিকে ভীম সেই অবধি আর এক মুহূর্তের জন্যও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই। আজকার যুদ্ধে তাঁহার বড়ই আনন্দ বোধ হইতেছে। তিনি সারথি বিশোককে ডাকিয়া বলিলেন, 'বিশোক, আমার বড়ই উৎসাহ হইতেছে, এখন আর কোন্ রথটা স্বপক্ষের, কোন্টা বিপক্ষের তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। একটু সতর্ক থাকিও, যেন শত্রু বোধে মিত্রকে মারিয়া না বসি। আজ প্রাণ ভরিয়া শত্রু মারিব। দেখ তো, অস্ত্র-শস্ত্র কি পরিমাণ আছে।"

বিশোক বলিল, "এখনো দশহাজার শর, দশহাজার ক্ষুর, দশহাজার ভল্ল, দু'হাজার নারাচ, তিনহাজার প্রদর, আর অসংখ্য গদা, অসি, মুদ্গর, শক্তি আর তোমর রহিয়াছে। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধ করুন, অস্ত্র ফুরাইবার কোনো ভয় নাই।"

এই সময়ে অর্জুন কৌরব-সৈন্য ছারখার করিয়া, অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেই যুদ্ধের ঘোরতর শব্দ ভীমের নিকট আসিয়া পৌঁছিলে, তিনি যারপরনাই উৎসাহ পাইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে কৌরবদিগকে একেবারে পিষিয়া দিতে লাগিলেন! তখন আর কেহই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না।

অন্যদিকে কর্ণও পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে মারিয়া আর কিছু রাখেন নাই। তাহারা তখন ভয়ে এমনি হইয়াছে যে, আর যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের হাত উঠে না।

বাস্তবিক তখন দুই পক্ষের কত লোক যে মরিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করে কাহার সাধ্য? দুই পক্ষের প্রায় প্রত্যেক বড়-বড় বীরই সে সময় হাজার হাজার সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন।

ইহার মধ্যে একবার দুঃশাসন ভীমকে আক্রমণ করেন। ইহাতে প্রথমেই ভীমের বাণে তাঁহার ধনুক আর ধ্বজ কাটা যায়, নিজের কপালেও একটি বাণ বিঁধে, তারপর এক বাণ আসিয়া তাঁহার সারথির মাথা কাটিয়া ফেলে। তখন দুঃশাসন তাড়াতাড়ি অন্য ধনুক লইয়া ভীমকে বারোটি বাণ মারেন এবং নিজ হাতে ঘোড়ার রাশ ধরিয়া এক ভীষণ বাণে তাঁহাকে অজ্ঞান করিতেও ছাড়েন নাই। ইহার উপর আবার তিনি এক বাণে ভীমের ধনুক কাটিয়া তাঁহার সারথিকে নয়টি এবং তাঁহাকে বহুতর বাণ মারাতে, ভীম রাগের ভরে তাঁহাকে একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারেন।

দুঃশাসন আকর্ণ (কান অবধি, অর্থাৎ যথাসাধ্য) ধনুক টানিয়া দশ বাণে সেই জ্বলন্ত উল্কাবৎ শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি বাণে বাণে ভীমকে জর্জরিত করিতে থাকিলে ভীম তাহাতে বিষম ক্রোধভরে বলিলেন, "তুমি তো আমাকে খুবই মারিলে, এখন আমার এই গদাটিকে সামলাও দেখি!"

বলিতে বলিতে তিনি এক বিশাল গদা দুঃশাসনকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। দুঃশাসনও ভীমকে একটা শক্তি মারিলেন বটে, কিন্তু তাহা অর্ধপথে গদায় ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তারপর সেই দারুণ গদা, দুঃশাসনের রথ আর সারথিকে চূর্ণ করিয়া, তাঁহার মাথায় পড়িলে, তিনি তাহার আঘাতে দশ ধনু দূরে বিক্ষিপ্ত হইলেন।

এই অবস্থায় দুঃশাসনকে যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া ভীমের সেই পুরাতন প্রতিজ্ঞার কথা মনে হইল। এই দুরাত্মাই দ্রৌপদীকে সেই সভায় চুলে ধরিয়া আনিয়া অপমান করিয়াছিল। তখন ভীম বলিয়াছিলেন, 'আমি ইহার বুক চিরিয়া রক্ত খাইব।'

সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে হওয়া মাত্র ভীম কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ আমি পাপাত্মা দুঃশাসনকে বধ করিব, তোমাদের সাধ্য থাকে তো ইহাকে রক্ষা কর।" তারপর তিনি ঝড়ের ন্যায় আসিয়া দুঃশাসনকে পদতলে পেষণপূর্বক তাঁহার বুকে তলোয়ার বসাইয়া দিলেন। সেই তলোয়ারের ঘায়ে দুঃশাসনের গরম রক্ত সবেগে বাহির হওয়ামাত্র, ভীম মহানন্দে তাহা পান করিয়া বলিলেন, "আহা! কি মিষ্টি! দধি দুগ্ধ বা ঘৃত পানেও আমি এত সুখী হই না।"

ভীমকে দুঃশাসনের রক্ত খাইতে দেখিয়া, সৈন্যেরা "বাবা রে! রাক্ষস রে!" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল। এদিকে ভীম তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালনপূর্বক, দুঃশাসনের মাথা কাটিয়া দিলেন। "অতঃপর দুর্যোধন পশুকে মারিয়া পদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিতে হইবে।"

এই সময়ে দুর্যোধনের দশ ভাই, রোষভরে ভীমকে আক্রমণ করাতে ভীম দশ ভল্লে সেই দশজনকে সংহার করিলেন। এ-সকল কাণ্ড দেখিয়া, আর ভীমের তখনকার সিংহনাদ শুনিয়া, অন্যেরা তো পলায়ন করিতেই পারে। নিজে কর্ণই ভয়ে আড়ষ্ট, তাঁহার মুখে কথা সরে না! তখন শল্য তাঁহাকে বলিলেন, "এখন ওরূপ হইলে চলিবে না, তোমার কাজ কর।"

কিন্তু কর্ণের পুত্র বৃষসেন এই সময়ে খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণে নকুলের ধনুক, রথ, খড়্গ প্রভৃতি কাটা গিয়া অল্পক্ষণের ভিতরেই নিতান্ত সঙ্কট উপস্থিত হইল।

ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ প্রভৃতিও তাঁহার বাণে অক্ষত রহিলেন না। এইরূপে অর্জুনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াতে, অর্জুন কর্ণকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে মিলিয়া অভিমন্যুকে মারিয়াছিলে। আমি তোমাদের সম্মুখেই বৃষসেনকে মারিতেছি, ক্ষমতা থাকে তো রক্ষা কর।"

তারপর অর্জুন হাসিতে হাসিতে দশ বাণে বৃষসেনকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া, আর চারিটি ক্ষুরে তাঁহার ধনুক, দুটি হাত আর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। ইহাতে কর্ণের প্রাণে কিরূপ লাগিয়াছিল, বুঝিতেই পার। ইহার পরেও কি আর তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? কাজেই তখন অর্জুনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এ সময় অশ্বত্থামা দুর্যোধনের দুটি হাত ধরিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আর কেন? এখনো ক্ষান্ত হও! আর পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। যুদ্ধের মুখে ছাই! আমাদের সকলেই মরিয়া গিয়াছেন, কয়েকটি মাত্র বাঁচিয়া আছি। এখন যুদ্ধ হইতে তুমি ক্ষান্ত হও, নহিলে নিশ্চয় মারা যাইবে।" কিন্তু দুর্যোধন সেই উপকারী বন্ধুর কথায় কান দিলেন না। তিনি বলিলেন, "অর্জুন বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে ; কর্ণ এখনি তাহাকে বধ করিবেন।"

এদিকে কর্ণ আর অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। যোদ্ধারা সিংহনাদ করিয়া আর চাদর উড়াইয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন। এমন যুদ্ধ কি সচরাচর হয়? তাই আজ দেবতারা অবধি, আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তামাশা দেখিতে আসিয়াছেন।

বাণ, বাণ! কেবলই বাণের পর বাণ। অর্জুন মারেন, কর্ণ কাটেন ; কর্ণ মারেন, অর্জুন কাটেন। অর্জুনের এক বাণে পৃথিবী, আকাশ, সূর্য অবধি জ্বলিয়া উঠিল। যোদ্ধাদের কাপড়ে আগুন! বেচারারা বুঝি পলাইবার পূর্বেই মারা যায়। উহার নাম আগ্নেয়-অস্ত্র। উঃ! কি ঘোরতর হড়্-হড়্ ধক্-ধক্ শব্দ! গেল বুঝি সব!

ঐ দেখ, কর্ণ বরুণাস্ত্র ছুঁড়িয়াছেন। ঐ কালো কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল! কি ঘোর অন্ধকার! কি ভয়ানক বৃষ্টি! সৃষ্টি বুঝি তল হয়!

অমনি দেখ, কি বিষম ঝড় বহিল! মেঘ বৃষ্টি উড়াইয়া নিল ; সৃষ্টি বাঁচিল! অর্জুন বায়ব্য-অস্ত্র মারিয়াছেন, তাহাতেই এত ঝড়!

আর একটা অস্ত্র আরো ভীষণ। ইহা অর্জুন ইন্দ্রের নিকট পাইয়াছিলেন। অস্ত্রের অদ্ভুত গুণে গাণ্ডীব হইতে কত ক্ষুরপ্র, কত নালীক, কত অঞ্জলীক, কত নারাচ, কত অর্ধচন্দ্রই বাহির হইতেছে। এবারে বুঝি আর কর্ণের রক্ষা নাই।

কিন্তু কর্ণ মরিলেন না! তিনি ভার্গবাস্ত্রে অর্জুনের সকল অস্ত্র দূর করিলেন। আর লোকও মারিলেন কতই। কর্ণের কি অসীম তেজ! কৃষ্ণ আর অর্জুনকে তিনি কি ব্যস্তই করিলেন! তখন ভীম ক্রোধভরে বলিলেন, "ও কি, অর্জুন! মন দিয়া যুদ্ধ কর!"

কৃষ্ণও বলিলেন, "অর্জুন! তোমার উৎসাহ দেখিতেছি না কেন?"

তাহাতে অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র মারিলে কর্ণ তাহাও কাটিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু ইহার পর যে অর্জুন আর-একটা ব্রহ্মাস্ত্র মারিলেন, সে বড়ই ভয়ানক! কত যোদ্ধাই তাহাতে মরিল। কিন্তু তথাপি বাণক্ষেপে ত্রুটি নাই ; বৃষ্টিধারার মতো তাঁহার বাণ পড়িতেছে।

তখন অর্জুনের আঠারোটি বাণ ছুটিয়া চলিল। তাহার তিনটি বিঁধিল কর্ণের গায়ে, একটিতে কাটিল তাঁহার ধ্বজ, আর চারটি খাইলেন শল্য। বাকি দশটিতে রাজপুত্র সভাপতির মাথাটি কাটা গেল। বাণের আর অন্তই নাই ; হাতি, রথী, পদাতিক সবই বুঝি কাটিয়া শেষ হয়। এবারে কর্ণ কাবু হইবেন। কিন্তু হায়! অর্জুনের গুণ যে ছিঁড়িয়া গেল, এখন উপায়? কর্ণ সুযোগ পাইয়া কত বাণই মারিতেছেন। কৃষ্ণকে আট, অর্জুনকে আট, ভীমকেও অনেক, সৈন্যগুলিকে তো অসংখ্য। সর্বনাশ হইল বুঝি ; দেখ কৌরবদের কত আনন্দ!

যাহা হউক, ঐ অর্জুনের ধুনকে আবার গুণ চড়িল! আর কর্ণের বাণের সে তেজ নাই, এখন অর্জুনের বাণেই আকাশ অন্ধকার। ঐ কর্ণের গায়ে উনিশ বাণ পড়িল, শল্যের গায়ে দশটি বিঁধিল। কর্ণ রক্তে লাল হইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি তিনি অর্জুনকে তিন বাণ, আর কৃষ্ণকে পাঁচ বাণ মারিতে ছাড়েন নাই। ঐ পাঁচটি বাণ পাঁচটা মহাসর্প। কৃষ্ণকে বিঁধিয়া উহারা আবার কর্ণের নিকট ফিরিয়া যাইতে যাইতে, মধ্যপথে অর্জুনের ভল্লে খণ্ড খণ্ড হইল। অর্জুনের আর দশ বাণে কর্ণের কি দশা হইয়াছে, দেখ। অর্জুনের কি অতুল বিক্রম, কি ভীষণ বাণ-সৃষ্টি! আকাশ আঁধার হইল; কর্ণের রথ কাটিয়া গেল। তাঁহার সঙ্গের একটি রক্ষকও বাঁচিয়া নাই। অপর কৌরবেরা, অর্জুনের ভয়ে, তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিতেছে। কৌরবদের মধ্যে কেবল কর্ণই ভয় পান নাই ; তিনি অর্জুনের সামনেই বাণ-বৃষ্টি করিতেছেন।

এমন সময় কোথা হইতে ঐ সাপটা আসিয়া কর্ণের তূণের ভিতরে ঢুকিল। এ সেই অশ্বসেন, খাণ্ডবদাহের সময় যে অনেক কষ্টে পাতালে ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। সেই রাগে, সে আজ কর্ণের বাণের ভিতরে ঢুকিয়া অর্জুনকে বধ করিতে আসিয়াছে, কর্ণ ইহার কিছুই জানেন না। অশ্বসেন যে বাণের ভিতরে ঢুকিয়াছে, তাহারো চেহারা সাপের মতো। কর্ণ অর্জুনকে মারিবার জন্য এই বাণ বহুকাল যাবৎ কত রকম যত্নে চন্দন চূর্ণের ভিতরে রাখিয়াছেন।

এখন অর্জুনকে কিছুতেই আঁটিতে না পারিয়া কর্ণ সেই দারুণ বাণ ধনুকে জুড়িয়া বসিয়াছেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই, উল্কাবৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, আকাশে আগুন ধরিয়া গিয়াছে। এ বাণ লাগিলে আর অর্জুনের রক্ষা নাই, ইহাকে আটকাইবার ক্ষমতাও কিছুরই নাই। তাই বাণ ছুঁড়িবার সময় কর্ণ বলিলেন, "অর্জুন! এইবারে তুমি গেলে!" উঃ! কি ভয়ঙ্কর বাণ, সর্বনাশ হয় বুঝি!

এমন সময় কৃষ্ণ হঠাৎ পায়ে চাপিয়া অর্জুনের রথখানিকে মাটির ভিতর বসাইয়া দিলেন; ঘোড়াগুলি হাঁটু গাড়িয়া রহিল। আর কর্ণের বাণ অর্জুনের গায়ে পড়িতে পাইল না, তাঁহার সেই ইন্দ্রদত্ত আশ্চর্য মুকুটখানি গুঁড়া করিয়া দিল, অর্জুন বাঁচিয়া গিয়া সাদা পাগড়ি বাঁধিয়া লইলেন।

সাপের বাছা ঠকিয়া গিয়া বড়ই চটিল। সে কর্ণকে গিয়া বলিল, "কর্ণ, তুমি আমাকে না দেখিয়াই বাণ মারিয়াছিলে, তাই অর্জুনের মাথা কাটিতে পারি নাই। এবারে আমাকে দেখিয়া বাণ মার, নিশ্চয় উহাকে বধ করিব।"

কিন্তু কর্ণ বড় অহঙ্কারী লোক, তিনি অন্যের সাহায্য নিতে প্রস্তুত নহেন ; কাজেই দুষ্ট সাপ নিরাশ মনে ফিরিয়া চলিল। কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়া সে কোথায় যাইবে? তিনি অমনি অর্জুনকে তাহার কথা বলিয়া দিলেন, আর দেখিতে দেখিতে দুষ্ট সাপ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। ততক্ষণে কৃষ্ণও রথখানিকে তুলিয়া লইয়াছেন, আর কি ভয়ানক যুদ্ধই চলিয়াছে! কৃষ্ণকে বারোটি আর অর্জুনকে নব্বুইটি বাণ মারিয়া কর্ণের আনন্দের সীমা নাই। অর্জুন তাহা সহিবেন কেন? তিনি কর্ণকে তেমনি শিক্ষা দিলেন। ঐ কর্ণের মুকুট আর কুণ্ডল উড়িয়া গেল! ঐ তাঁহার বর্ম ছিন্নভিন্ন হইল! আহা! এখন না জানি ঐ দারুণ বাণগুলি তাঁহার গায়ে কিরূপ বিঁধিতেছে। রক্তে শরীর ভাসিয়া গেল। ঐ তাঁহার বুকে ভীষণ বাণ ফুটিল, আর তাঁহার জ্ঞান নাই। তখন আর অর্জুনের উদার হৃদয় তাঁহাকে বাণ মারিতে চাহিল না ; সেজন্য কৃষ্ণ তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন।

কর্ণের জ্ঞান হইল, আবার যুদ্ধ চলিল। কিন্তু এবার বুঝি আর তাঁহার রক্ষা নাই। ঐ তাঁহার রথের চাকা বসিয়া গেল! আহা! এই বিপদের সময় আবার বেচারা তাঁহার সেই পরশুরামের দেওয়া বড়-বড় অস্ত্রের কথা সব ভুলিয়া গিয়াছেন।

নিজেরই পাপের ফল! পরশুরামকে ফাঁকি দিয়া তিনি তাঁহার নিকট অস্ত্র শিখিতে গেলেন ; বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ।" পরশুরাম যথার্থই ব্রাহ্মণ বোধে তাঁহাকে অশেষরূপে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া বিধিমতে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলেন। তারপর একদিন দেখেন কি যে, এ ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়! কাজেই তখন তিনি শাপ দিলেন, 'মৃত্যুকালে তুই এ-সকল ভুলিয়া যাইবি।"

তারপর আর একবার দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণের বাছুর মারিয়া ফেলাতে সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে শাপ দেন, "যুদ্ধের কালে যখন তোর বড়ই আতঙ্ক হইবে, ঠিক সেই সময় তোর রথের চাকা বসিয়া যাইবে।"

সেই-সকল পুরাতন পাপের শাস্তি আজ আসিয়া একসঙ্গে উপস্থিত হইল। আহা! ঐ দেখ, তিনি হাত ছুঁড়িয়া আক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু বীরের তেজ না কি বিপদেও লোপ পায় না, তাই এখনো তিনি অর্জুনের সহিত ঘোর যুদ্ধে মত্ত! ইহার মধ্যেও কৃষ্ণের হাতে তিন, আর অর্জুনকে সাতবাণ মারিতে ছাড়েন নাই। তাহাতে অর্জুনের বাণ খাইয়া মন্ত্রপূর্বক ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িয়াছেন। তাহাতে অর্জুন ঐন্দ্রাস্ত্র মারিলে, তাহাও আটকাইয়াছেন। তারপর আবার অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি অশেষ বাণে জর্জরিত হইয়াও না জানি কিরূপে কর্ণ তাঁহার ধনুকের গুণ কাটিলেন। অর্জুন তৎক্ষণাৎ নূতন গুণ পরাইয়াও তাঁহাকে আঁটিতে না পারায় কৃষ্ণ তাঁহাকে আরো বড়-বড় অস্ত্র মারিতে বলিতেছেন।

হঠাৎ কর্ণের রথের চাকা আরো অনেক বসিয়া গেল! বেচারা তাহা উঠাইবার জন্য, প্রাণপণে কি টানাটানিই করিতেছেন! পৃথিবী তাহাতে চারি আঙ্গুল উঁচু হইয়া গেল, কিন্তু চাকা যে কিছুতেই উঠিতেছে না। এইবারে কর্ণের চোখে জল আসিল ; তিনি অর্জুনকে বলিলেন, "অর্জুন! তুমি বড়ই ধার্মিক, আর মহাশয় লোক ; একটু অপেক্ষা কর, আমার রথের চাকাটা তুলিয়া লই।"

তাহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, "সূতপুত্র! বড় ভাগ্য যে এখন তোমার ধর্মের কথা

মনে হইয়াছে! কিন্তু যখন ভীমকে বিষ খাওয়াইবার পরামর্শ দিয়াছিলে, দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়া অপমান করিয়াছিলে, ছলপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে পাশায় হারাইয়াছিলে, জতুগৃহে পাণ্ডবদিগকে পোড়াইতে গিয়াছিলে আর সকলে মিলিয়া বালক অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? এখন ধর্ম-ধর্ম করিয়া তালু ফাটাইলেও, আর তোমার রক্ষা নাই।"

এ কথার আর কি উত্তর দিবেন? তাই লজ্জায় কর্ণের মাথা হেঁট হইল। বিষম রোষে ব্রাহ্ম, আগ্নেয় বায়ব্যাদি অস্ত্র বর্ষণপূর্বক তিনি আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং অচিরে ভীষণ একটা অস্ত্রে অর্জুনকে অজ্ঞান করিয়া ব্যস্তভাবে রথ হইতে নামিলেন, যদি এই অবসরে তাহার চাকা আবার উঠানো যায়। কিন্তু হায়! চাকা কিছুতেই উঠিল না।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "এই বেলা কর্ণকে মার। উহাকে রথে উঠিতে দিও না।" সে কথায় অর্জুন অঞ্জলীক নামক ভীষণ অস্ত্র গাণ্ডীবে জুড়িবামাত্র ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল ; আর দেখিতে দেখিতে সেই মহাস্ত্র ঘোর গর্জনে প্রচণ্ড তেজে ছুটিয়া গিয়া কর্ণের মাথা কাটিয়া ফেলিল। তখন সকলে অবাক হইয়া দেখিলেন, কর্ণের দেহ হইতে অপরূপ দীপ্তি নির্গত হইয়া সূর্যের সহিত মিলাইয়া যাইতেছে।

আজ আর পাণ্ডবদের আনন্দের সীমা নাই? ভীম সিংহনাদপূর্বক নৃত্য করিতেছেন ; আর সকলে শঙ্খ বাজাইয়া জয় ঘোষণায় মত্ত। বেচারা কৌরবগণ, ভয়ে বিহ্বল হইয়া, পলায়নের পথও পাইতেছে না। এমন সময় সন্ধ্যা আসিয়া পড়িল। দুর্যোধন, 'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিরে চলিলেন।

আজ সঞ্জয়ের মুখে এই সংবাদ শুনিবামাত্রই, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভীষ্ম, দ্রোণের মৃত্যু-সংবাদেও তিনি এত ক্লেশ পান নাই।

# শল্যপর্ব

র্ণের মৃত্যুতেও দুর্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন না। তাঁহার পক্ষের বীরগণেরও বিলক্ষণ রণোৎসাহ দেখা গেল। সুতরাং সকলে শল্যকে সেনাপতি করিয়া, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

সে রাত্রে আর তাঁহারা শিবিরে থাকেন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রায় দুই যোজন দূরে, সরস্বতী নদীর তীরে, হিমালয়প্রস্থ নামক স্থানে, তাঁহারা রাত্রি কাটাইয়াছিলেন।

পরদিন নূতন সেনাপতি শল্য অসাধারণ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। আজ এই নিয়ম হইল যে, 'তাঁহাদের কেহই একাকী পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিতে যাইবেন না ; সকলে মিলিয়া সাবধানে পরস্পরকে সাহায্য করা হইবে।'

মোটামুটি এইভাবেই যুদ্ধ চলিল। কিছুকাল যুদ্ধের পরই, কর্ণের পুত্র চিত্রসেন, সত্যসেন এবং সুষেণ নকুলের হাতে, এবং শল্যর পুত্র সহদেবের হাতে মারা গেলেন।

তারপর ভীমের সহিত শল্যের ঘোর গদাযুদ্ধ হয়। যুদ্ধ করিতে করিতে, শেষে দুইজনেই দুজনের গদাঘাতে অজ্ঞান হওয়ায়, কৃপাচার্য শল্যকে লইয়া প্রস্থান করিলেন, আর ভীম উঠিয়া গদা হাতে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠিরের সহিত শল্যের বারবার যুদ্ধ হয়! তখন পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা সকলে মিলিয়াও শল্যের কিছুই করিতে পারেন নাই! অর্জুন এ সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না ; তিনি অন্যস্থানে অশ্বত্থামা প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরে, অর্জুনের সম্মুখেই, সৈন্যেরা ভীমের নিষেধ অমান্য করিয়া, পলায়ন করিতে লাগিল।

এই সময়ে শল্যের বাণে নিজে নিতান্ত অস্থির হইয়া এবং সৈন্যদিগকে রক্তাক্ত শরীরে পলায়ন করিতে দেখিয়া, যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা করিলেন, "হয় শল্যকে বধ করিব, নাহয় নিজে প্রাণ দিব।" তারপর ভীমকে সম্মুখে, অর্জুনকে পশ্চাতে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন আর সাত্যকিকে দুপাশে লইয়া তিনি শল্যের সহিত এমন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, তাহাতে কৌরবদের আর আতঙ্কের সীমা রহিল না।

ইহার মধ্যে একবার শল্যের বাণে কঠিন বেদনা পাইয়াও যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া দিলেন। কিন্তু শল্যের জ্ঞান হইতে অধিক সময় লাগিল না। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহার

কবচ ভেদ করিলে, তিনি উল্টিয়া যুধিষ্ঠির এবং ভীম দুইজনেরই কবচ ছিঁড়িয়া দিলেন।

এমন সময় শল্যের বাণে যুধিষ্ঠিরের ধনুক এবং কৃপের বাণে তাঁহার সারথির মাথা কাটা গেল। ঘোড়া চারটি শল্যের বাণে মরিতেও আর বেশি বিলম্ব হইল না।

ইহাতে ভীম বিষম রোষে শল্যের ধনুক, সারথি, ঘোড়া সকল চূর্ণ করিয়া দিলেন। শল্যের বর্মও মুহূর্তের পরেই কাটা যাওয়ায় তিনি অসি চর্ম হাতে, রথ হইতে নামিয়া, ক্রোধভরে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে গেলেন। এমন সময় ভীমের নয়টি বাণ, বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া শল্যের খড়্গের মুষ্টি কাটিয়া ফেলিল। তথাপি তিনি যুধিষ্ঠিরের দিকে সিংহের ন্যায় ছুটিয়া চলিলে যুধিষ্ঠির মণিমণ্ডিত অতি ভীষণ করালবদন স্বর্ণময় জ্বলন্ত শক্তি গ্রহণ করিলেন।

তারপর তিনি তাঁহার বিশাল দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া রোষভরে সেই শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে, শল্য তাহা লুফিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সাংঘাতিক অস্ত্র, দেখিতে দেখিতে তাঁহার বক্ষ ভেদপূর্বক, প্রবল বেগে ভূতলে প্রবেশ করিল।

শল্যের মৃত্যুতে তাঁহার সহোদর সক্রোধে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিয়া মস্তক হারাইতে অধিক বিলম্ব করিল না। শল্যের সঙ্গের মদ্রদেশীয় লোকেরাও, অনেক যুদ্ধের পর পাণ্ডবদের হাতে মারা গেল। ইহার পরে আর কৌরব-সৈন্যরা আর কিসের ভরসায় যুদ্ধ করিবে? তখন তাহারা সকলেই বুঝিল যে, আর পলায়ন ভিন্ন গতি নাই।

এ সময়ে দুর্যোধন, অনেক কষ্টে তাঁহার সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তখন ম্লেচ্ছরাজ শাল্ব এক ভয়ঙ্কর হাতিতে চড়িয়া, অতি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছিলেন। সৈন্যেরা তো সে হাতির ভয়ে চ্যাঁচাইয়া পলাইলই, ভীম, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্নের মতো বীরেরাও তাহার তাড়ায় কম ব্যস্ত হইলেন না। সে হতভাগা হাতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে এমনি তাড়া করিল যে, তিনি রথ ছাড়িয়াই দে চম্পট! বেচারা সারথি আর পলাইতে পারিল না। হাতি তাহাকে সুদ্ধ রথখানিকে আছড়াইয়া গুঁড়া করিল।

যাহা হউক, শেষে ধৃষ্টদ্যুম্নের গদায়ই হাতি মারা পড়ে। তারপরেই তীক্ষ্ণ ভল্লে সাত্যকি শাল্বের মাথা কাটেন।

তারপর দুই দলে ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। দুর্যোধন এ সময়ে খুবই বীরত্ব দেখাইলেন। শকুনিও কম যুদ্ধ করিলেন না। দশহাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং সহদেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কিন্তু সেই দশহাজারের মধ্যে চারিহাজার অশ্বারোহী দেখিতে দেখিতেই মারা যাওয়াতে, তাঁহার মনে হইল যে, এখন সবেগে প্রস্থান করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

যাহা হউক, শকুনি অবিলম্বেই আবার ফিরিয়া আসিলেন। তারপর পলকের মধ্যে তাঁহার অশ্বারোহীর সংখ্যা সাতশতে নামিয়া আসায় তিনি অমনি দুর্যোধনকে গিয়া বলিলেন, "আমি অশ্বারোহীগণকে পরাজয় করিয়াছি। এখন তুমি গিয়া রথীদিগকে পরাজয় কর।"

দুর্যোধনের নিরানব্বুই ভাইয়ের মধ্যে কেবল দুর্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি,

জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্বিসহ, অরিহা, দুর্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ আর শ্রুতর্বা এই বারোজন বাঁচিয়া ছিলেন। এই দিনের যুদ্ধে ভীমের হাতে তাঁহাদের মৃত্যু হইল। ইহার কিছুকাল পরেই সুশর্মা অর্জুনের বাণে, আর শকুনির পুত্র উলুক সহদেবের হাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পুত্রের মৃত্যু সহ্য করিতে না পারিয়া শকুনি তখন সহদেবকে আক্রমণ করেন, কিন্তু ভালোমতে যুদ্ধ আরম্ভ না করিতেই সহদেবের বাণে তাঁহার ধনুক কাটা যায়। তখন অসি গদা শক্তি প্রভৃতি যে অস্ত্রই তিনি হাতে করেন, সহদেব তাহাই কাটিয়া ফেলেন। কাজেই শকুনি আর এক মুহূর্তও সেখানে অপেক্ষা করিলেন না।

কিন্তু পলাইয়া তিনি যাইবেন কোথায়? সহদেব তাঁহার পিছু পিছু তাড়া করিয়া, বাণে বাণে তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। তখন শকুনি একটা প্রাস লইয়া সহদেবকে আক্রমণ করিতে গেলে, সহদেব তাঁহার দুখানি হাতসুদ্ধ সেই প্রাস কাটিয়া, সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহার মাথায় এক ভয়ানক ভল্ল ছুঁড়িয়া মারিলেন। সে ভল্ল তাঁহার মাথা কাটিয়া প্রাণ বাহির করিয়া দিল।

ইহার পর আর যুদ্ধের বড় বেশি বাকি রহিল না। দেখিতে দেখিতে কৌরবদিগের মধ্যে দুর্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা অবশিষ্ট রহিলেন। তাঁহাদের এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্যের সমস্তই মরিয়া শেষ হইল।

তখন রাজা দুর্যোধন, চারিদিক শূন্য দেখিয়া, প্রাণের ভয়ে পলায়নপূর্বক রণভূমির নিকটেই দ্বৈপায়ন নামক একটা হ্রদের জলে লুকাইতে চলিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল যে, বিদুর পূর্বেই বলিয়াছিলেন, এইরূপ হইবে।

ইতিমধ্যে বেচারা সঞ্জয়, সাত্যকি আর ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে পড়িয়া প্রায় মারাই গিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কাটিতে যাইবেন, ইত্যবসরে ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া বলিলেন, "ইহাকে ছাড়িয়া দাও।"

এই রূপে মুক্তি পাইয়া সঞ্জয় তথা হইতে নগরের দিকে চলিয়াছেন, এমন সময় রণস্থলের এক ক্রোশ দূরে, দুর্যোধনের সহিত তাঁহার দেখা হইল। দুই চক্ষু জলে পূর্ণ থাকায়, দুর্যোধন প্রথমে সঞ্জয়কে দেখিতে পান নাই। তারপর তাঁহার কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে চিনিয়া বলিলেন, "সঞ্জয়, বাবাকে বলিও, আমি হ্রদের নিকট লুকাইয়া, প্রাণ বাঁচাইয়াছি।" এই বলিয়া তিনি গদা হাতে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইয়া রহিলেন।

সঞ্জয় সেখান হইতে চলিয়া যাইবার কিঞ্চিৎ পরেই কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা তাঁহার নিকট দুর্যোধনের সংবাদ পাইয়া, সেই হ্রদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, জল হইতে উঠিয়া আইস, আমরা তিন জনে তোমাকে লইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। আজ উহারা নিশ্চয় পরাজিত হইবে।"

তাহা শুনিয়া দুর্যোধন বলিলেন, "বড় ভাগ্য যে, আপনাদিগকে জীবিত দেখিলাম! কিন্তু আমি অতিশয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি, আর পাণ্ডবদিগের অনেক সৈন্য এখনো বাঁচিয়া আছে। সুতরাং আজ আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না। আজিকার রাত্রিটি বিশ্রাম করি, কাল

আপনাদিগকে লইয়া যুদ্ধ করিব।"

তখন অশ্বত্থামা বলিলেন, "মহারাজ! তুমি উঠিয়া আইস! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, রাত্রি প্রভাত না হইতে তোমার শত্রুদিগকে বিনাশ করিব।"

এই সময়ে কয়েকজন ব্যাধ সেই হ্রদের ধারে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা তাহাদিগকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু তাহারা তাঁহাদের কথাবার্তা সকলই শুনিতে পাইল। সুতরাং দুর্যোধন যে সেই হ্রদের জলে লুকাইয়া রহিয়াছেন, এ কথা আর তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না। একটু আগেই তাহারা পাণ্ডবদিগকে তাঁহার অন্বেষণ করিতে দেখিয়াছিল, আর তাঁহারা তাহাদিগকে দুর্যোধনের কথা জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল। এমন সংবাদ তাঁহাদিগকে দিতে পারিলে, নিশ্চয়ই বিশেষ পুরস্কার মিলিবে, এই মনে করিয়া তাহারা অবিলম্বে ভীমের কাছে গিয়া, সকল কথা বলিয়া দিল।

পাণ্ডবদিগের তখনো দুহাজার রথী, সাতশত গজারোহী, পাঁচহাজার অশ্বারোহী আর দশহাজার পদাতি অবশিষ্ট ছিল। দুর্যোধন পলায়ন করা অবধি তাঁহারা তাঁহাকে খুঁজিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পান নাই। এমন সময় সেই ব্যাধেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে সেই সংবাদ দিল।

ব্যাধদিগকে রাশি রাশি ধন দিয়া তখনি সকলে দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে আসিলেন। কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা, দূর হইতেই তাঁহাদের কোলাহল শুনিতে পাইয়াই, হ্রদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তারপর পাণ্ডবেরা সেখানে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখন কি উপায়ে দুর্যোধনকে জলের ভিতর হইতে বাহির করা যায়।

দুর্যোধন বড়ই অহঙ্কারী লোক ছিলেন, কটু কথা তিনি কিছুতেই সহিতে পারিতেন না। গালি দিলে তিনি বাহির হইয়া আসিবেন, এই ভাবিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অতি কর্কশভাবে বলিলেন, "দুর্যোধন! তুমি সে সকলকে যমের হাতে দিয়া, নিজে প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে, এ কাজ ভালো হয় নাই ; আইস যুদ্ধ করি।"

এ কথার উত্তরে দুর্যোধন ভিতর হইতে বলিলেন, "আমি পলায়ন করি নাই, বিশ্রাম করিতেছি। তোমরাও এখন গিয়া বিশ্রাম কর, তারপর যুদ্ধ হইবে।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমাদের বিশ্রাম হইয়াছে, সুতরাং এখন আসিয়া হয় আমাদিগকে হারাইয়া রাজ্য ভোগ কর, নাহয় আমাদের হাতে মরিয়া স্বর্গে যাও!"

দুর্যোধন বলিলেন, "আমি এখনো তোমাদিগকে পরাজয় করিতে পারি। কিন্তু আমার সব মরিয়া গেল, আর কাহার জন্য রাজ্য লইতে চাহিব? সুতরাং তোমরাই এখন রাজ্য ভোগ কর, আমি মৃগচর্ম পরিয়া বনে যাইতেছি।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তোমার ও কান্নায় আর আমার মন ভুলিবার নয়। এখন তুমি আমাকে রাজ্য দিবার কে? তোমাকে বধ করিয়া আমরা রাজ্য কাড়িয়া লইব। আইস, যুদ্ধ করি!"

এরূপ কঠিন কথা দুর্যোধন আর তাঁহার জীবনে কখনো শোনেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "আমার বর্ম নাই, অস্ত্র

নাই, রথ নাই; তোমাদের সকলই আছে। তোমরা সকলে আমায় ঘিরিয়া মারিলে, আমি কি করিয়া যুদ্ধ করিব? এক-একজন করিয়া আইস, দেখা যাইবে।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তোমার যেমন খুশি, অস্ত্র দেখিয়া লও। বর্ম পর, চুল বাঁধ; আর যাহা খুশি কর। তারপর আমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যাহার সহিত ইচ্ছা, যুদ্ধ কর। সেই একজনকে পরাজয় করিতে পারিলেই সমুদয় রাজ্য তোমার হইবে।"

তখন দুর্যোধন বর্ম আর পাগড়ি পরিয়া, গদা হাতে লইয়া বলিলেন, "আমি এই গদা লইয়া যুদ্ধ করিব। তুমি বা ভীম বা অর্জুন বা নকুল বা সহদেব, যাহার খুশি আসিয়া আমার সহিত গদাযুদ্ধ কর। ন্যায় মতে গদাযুদ্ধ করিয়া, তোমাদের কেহ আমার সঙ্গে পারিবে না। সত্য কি মিথ্যা, এখনি দেখিতে পাইবে।"

এই সময়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "আপনি কোন সাহসে দুর্যোধনকে আপনাদের যাহার সহিত ইচ্ছা যুদ্ধ করিতে বলিলেন? দুরাত্মা যদি আপনাকে, অর্জুনকে, নকুলকে বা সহদেবকে আক্রমণ করিয়া বসিত, তাহা হইলে আপনাদের কিরূপ দশা হইত? ভীমও গদাযুদ্ধে দুর্যোধনকে আঁটিতে পারে কি না সন্দেহ। ভীমের বল আর তেজ বেশি, কিন্তু দুর্যোধনের শিক্ষা অধিক, আর শিক্ষাতেই হার-জিত। এখন বুঝিলাম যে, পাণ্ডবদের কপালে রাজ্য লাভ নাই, বিধাতা উহাদিগকে বনে থাকিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এমন সময় ভীম গদা হাতে লইয়া দুর্যোধনকে বলিলেন, "ওরে নরাধম! সকল দুরাত্মা মরিয়া এখন কেবল তুমিই অবশিষ্ট রহিয়াছ; আজ এই গদার প্রহারে তোমাকেও বধ করিয়া আমাদের সকল দুঃখের শোধ লইব!"

দুর্যোধন বলিলেন, 'আর বড়াই করিও না! এখনি তোমার যুদ্ধের সাধ মিটাইয়া দিব। ন্যায় মতে গদাযুদ্ধে ইন্দ্রও আমকে পরাজয় করিতে পারেন না। আইস দেখি, তোমার কত বিদ্যা!"

দুজনে প্রাণ ভরিয়া গালাগালি চলিতেছে, এমন সময় বলরাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীম ও দুর্যোধন দুইজনেই বলরামের ছাত্র, তিনিই ইঁহাদের গদা শিক্ষার গুরু। সুতরাং, যুদ্ধের সময় তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া দুজনেরই খুব উৎসাহ হইল।

কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র স্থান, সেখানে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয়। এইজন্য বলরাম বলিলেন যে, যুদ্ধ দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে না হইয়া কুরুক্ষেত্রে হওয়াই ভালো। তখন সকলে সেখান হইতে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া, যুদ্ধের জন্য একটি স্থান দেখিয়া লইলেন।

তারপর দুজনে, দুই মত্ত হস্তীর ন্যায় গর্জন করিতে করিতে, কি ঘোর যুদ্ধই আরম্ভ করিলেন। সকলে স্তব্ধভাবে চারিদিকে বসিয়া সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

সেকালের লোকেরা আগে খুব এক চোট বাক্য-যুদ্ধ অর্থাৎ গালাগালি না করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিত না। সুতরাং প্রথমে তাহাই কিছুকাল চলিল। তারপর ভীষণ ঠকাঠক শব্দে রণস্থল কাঁপাইয়া উভয়ে উভয়কে আঘাত করিতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের গদা হইতে ক্রমাগত আগুন বাহির হইতেছিল।

সে যুদ্ধের কি অদ্ভুত কৌশল! মণ্ডল, গতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র, যন্ত্র, পরিমোক্ষ, প্রহার, ব্যঞ্জন, পরিবারণ, অভিদ্রাবণ, আক্ষেপ, বিগ্রহ, পরাবর্তন, সংবতন, অবপ্লুত, উপপ্লুত, উপন্যস্ত প্রভৃতি অশেষ প্রকার কৌশল দেখাইয়া তাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এ-সকল কৌশলে দুর্যোধনেরই অধিক ক্ষমতা দেখা গেল। তিনি একবার ভীমের বুকে এমনি গদা প্রহার করিলেন যে, কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহার নড়িবার শক্তি রহিল না। যাহা হউক, ইহার পরেই ভীমও এক গদাঘাতে দুর্যোধনকে অজ্ঞান করিলেন।

খানিক পরে দুর্যোধন উঠিয়াই, ভীমের কপালে এমন গদার আঘাত করিলেন যে, সে স্থান হইতে দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। কিন্তু ভীমের দেহে এমনি অসাধারণ শক্তি ছিল যে, সেই সাংঘাতিক আঘাতেও তাঁহার কিছুই হইল না। তাহার পরেই দেখা গেল যে, দুর্যোধন ভীমের গদার চোটে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া যাইতেছেন। তখনি আবার দুর্যোধনের আঘাতে ভীমেরও সেই দশা হইল! তখন দুর্যোধন ঘোরনাদে পুনরায় গদাঘাত করত ভীমের কবচ ছিঁড়িয়া দিলেন। সে আঘাতের বেগ ভীম সহজে সামলাইতে পারিলেন না।

এতক্ষণে কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, ন্যায় যুদ্ধে ভীমের দুর্যোধনকে পরাজয় করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি অন্যায় যুদ্ধেই তাঁহাকে বধ করিতে পরামর্শ দিলেন। তখন অর্জুন ইঙ্গিত করামাত্র ভীম বুঝিতে পারিলেন যে, দুর্যোধনের উরু ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে সংহার করিতে হইবে। গদাযুদ্ধে নাভির নীচে আঘাত নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু ইহা ভিন্ন দুর্যোধনকে বধ করা যাইতেছে না। সুতরাং ভীম এইটুকু অন্যায় করিয়াই নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

আবার যুদ্ধ চলিল। তারপর উভয়েই ক্লান্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। তারপর আবার যুদ্ধ চলিল। এই সময়ে ভীম ইচ্ছা করিয়াই দুর্যোধনকে একটু আঘাতের সুযোগ দিলেন। তাহাতে দুর্যোধন প্রবল বেগে ভীমকে আক্রমণ করিতে আসিবামাত্র ভীম তাঁহাকে গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন; দুর্যোধন বিদ্যুতের মতো সেই গদা এড়াইয়া ভীমকে সাংঘাতিকভাবে আঘাত করিলেন। যাহা হউক, ভীম সেই ভয়ানক আঘাতও আশ্চর্যরূপে সহিয়া রহিলেন। তাঁহার শান্তভাব দেখিয়া দুর্যোধনের মনে হইল, বুঝি তাঁহার কি অভিসন্ধি আছে। সুতরাং তিনি তাঁহাকে আর আঘাত না করিয়াই ত্বরায় ফিরিয়া আসিলেন।

তারপর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, ভীম অসীম রোষে দুর্যোধনকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। দুর্যোধন তাঁহাকে এড়াইবার জন্য লাফ দিয়া শূন্যে উঠিবামাত্র ভীম দারুণ গদাঘাতে তাঁহার দুই উরু ভাঙ্গিয়া দিলেন। তখন ভগ্নপদে নিতান্ত অসহায়ভাবে দুর্যোধনকে ধরাশায়ী হইতে হইল। অমনি ভীম তাঁহার মাথায় পদাঘাতপূর্বক বলিলেন, "রে দুরাত্মা! সভার মধ্যে 'গোরু গোরু' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলি, আর দ্রৌপদীকে অপমান করিয়াছিলি, তাহার এই সাজা"। এইরূপে গালি দিতে দিতে ভীম দুর্যোধনের মাথায় আবার পদাঘাত করিলেন।

ভীমের এই ব্যবহারে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, "ভীম! সৎ

উপায়েই হউক, আর অসৎ উপায়েই হউক, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি রাখিয়াছ ; এখন ক্ষান্ত হও। ইহার মাথায় পদাঘাত করিয়া আর পাপ কেন বাড়াও ? ইহার অবস্থা দেখিলে এখন বড়ই দুঃখ হয়। এ আমাদের ভাই ; তুমি ধার্মিক হইয়া কেন উহাকে পদাঘাত করিতেছ?"

তারপর তিনি দুর্যোধনকে বলিলেন, "ভাই, তুমি দুঃখ করিও না। তোমার দোষেই যুদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি দেহত্যাগপূর্বক এখনি স্বর্গে যাইবে, আর আমরা এখানে সুহৃদ্‌গণের শোকে চিরকাল দারুণ দুঃখ ভোগ করিব।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন।

ভীমের কাজটি অতি অন্যায় হইয়াছিল ; উপস্থিত যোদ্ধারাও ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। বলরাম তো লাঙ্গল উঠাইয়া, তখনি ভীমকে বধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কৃষ্ণের অনেক চেষ্টায় তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাগ দূর হইল না। তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন, "তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন, ভীম যে নিতান্ত অন্যায় করিয়াছেন, এ বিশ্বাস আমার মন হইতে দূর করিতে পারিবে না।"

এই বলিয়া বলরাম সেখান হইতে চলিয়া গেলে, যোদ্ধারা সকলে মিলিয়া দুর্যোধনের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "হে ভীম! আজ তুমি দুষ্ট দুর্যোধনকে মারিয়া বড়ই ভালো কাজ করিলে ; আমাদের ইহাতে যারপরনাই আনন্দ হইয়াছে।"

তখন কৃষ্ণ সেই যোদ্ধাদিগকে বলিলেন, "যে শত্রু মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে বকিলে কি হইবে? এ দুষ্ট এখন শত্রুতা বা বন্ধুতা কিছুরই উপযুক্ত নহে। আমাদের ভাগ্যের জোরে এত দিনে পাপী মারা গেল। এখন চল, আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।"

এ কথায় দুর্যোধন, দুহাতে মাটিতে ভর দিয়া, মাথা তুলিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, "হে কংসের দাসের পুত্র! তোমার দুষ্ট বুদ্ধিতেই আমাদের বীরেরা মারা গেলেন। তোমার মতো পাপী, নির্দয় আর নির্লজ্জ কে আছে?"

তাহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি অনেক পাপ করিয়াছ, এখন তাহারই ফল ভোগ কর।"

তাহাতে দুর্যোধন বলিলেন, "রাজার যে সুখ, তাহা আমি ভালো মতোই ভোগ করিয়াছি। এখন আমি সবান্ধবে স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকে দুঃখে আধমরা হইয়া এই পৃথিবীতে পড়িয়া থাক।"

এ কথা বলিবামাত্র স্বর্গ হইতে দুর্যোধনের উপর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইলে পাণ্ডবেরা লজ্জিতভাবে শিবিরে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু সে রাত্রিতে তাঁহাদের সকলের শিবিরের ভিতরে থাকা হইল না। কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর সাত্যকি তাঁহার সহিত শিবির ছাড়িয়া নদীর ধারে আসিয়া নিদ্রার আয়োজন করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা, দুর্যোধনের উরুভঙ্গের সংবাদ পাইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্যোধনের তখনকার অবস্থা দেখিয়া, সেই

তিন বীরের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা তাঁহার কাছে বসিয়া অনেক কাঁদিলে, দুর্যোধন তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা আমার জন্য দুঃখ করিবেন না ; আমি নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিব। আপনারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু আমার ভাগ্যে জয়লাভ ছিল না, কি করিব ?"

এই কথা বলিয়া দুর্যোধন চুপ করিলে, অশ্বত্থামা দুঃখে ও রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, "আমাকে অনুমতি দাও, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ যেমন করিয়া হউক, শত্রুদিগকে মারিয়া শেষ করিব।"

এ কথায় দুর্যোধন তখনই অশ্বত্থামাকে সেনাপতি করিয়া দিলে, তাঁহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়াই তিন বীর সিংহনাদ করিতে করিতে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

# সৌপ্তিকপর্ব

র্যোধনের এখন নিতান্তই দুরবস্থা। নিজে তো মরিতেই চলিয়াছেন; তাঁহার পক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যেও তিনজনমাত্র জীবিত।

এই তিনটি লোকে কি করিতে পারে? তাঁহারা দুর্যোধনের দুর্দশা আর পাণ্ডবদের পরাক্রমের কথা চিন্তা করিতে করিতে রথে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু শত্রুসংহারের কোনো উপায় দেখিতেছেন না। তাঁহারা চুপিচুপি শিবিরের কাছে গেলেন, কিন্তু সেখানে পাণ্ডবদের সিংহনাদ শুনিয়া তাঁহাদের ভয় হইল। তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহারা একটা বনের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর নিজেরাও অতিশয় ক্লান্ত, ঘোড়াগুলিও আর চলিতে পারে না। এখন একটু বিশ্রাম না করিলেই নয়। তাই সেই বনের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ দেখিতে পাইয়া, তাঁহারা রথ হইতে নামিলেন। নিকটেই জলাশয় ছিল। ঘোড়াগুলিকে খুলিয়া দিয়া, তাঁহারা সেই জলাশয়ে মুখ হাত ধুইয়া, সন্ধ্যাপূজা সারিয়া বটগাছের নীচে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের ভিতরে কৃপ আর কৃতবর্মার ঘুম আসিল। কিন্তু দুঃখে আর চিন্তায় অশ্বত্থামার ঘুম হইল না। তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রাত্রি হইয়াছে; গাছের ডালে কাকেরা তাহাদের বাসায় সুখে নিদ্রা যাইতেছে। এমন সময় কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড পেচক আসিয়া, ঘুমের ভিতরে, অসহায় অবস্থায়, সেই কাকগুলিকে বধ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পেচক কাকগুলিকে মারিয়া শেষ করিল, একটিও অবশিষ্ট রহিল না।

এই ঘটনা দেখিয়া অশ্বত্থামার মনে হইল, 'তাই তো, আমিও তো এই উপায়ে শত্রুদিগকে বধ করিতে পারি।' ইহার পর আর অশ্বত্থামা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখনই কৃপকে ডাকিয়া বলিলেন, "মামা! এইরূপ করিয়া আমরাও শত্রুদিগকে বধ করিব।"

কৃপাচার্য প্রথমে কিছুতেই এমন কাজে মত দেন নাই, কিন্তু ভাগিনেয়ের পীড়াপীড়িতে শেষটা তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। তখন তিনজনে মিলিয়া সেই নিষ্ঠুর পাপকার্য সাধনের জন্য, পাণ্ডব-শিবিরের দিকে যাত্রা করিলেন।

পাণ্ডব-শিবিরের কাছে আসিয়া অশ্বত্থামা দেখিলেন যে, একজন অতিশয় উজ্জ্বল পুরুষ শিবিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। সেই উজ্জ্বল পুরুষ স্বয়ং মহাদেব। কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া, তাঁহাকে সেখান হইতে তাড়াইবার জন্য, বাণ মারিতে লাগিলেন।

অস্ত্রে মহাদেবের কি হইবে? অশ্বত্থামা বাণ, শক্তি, অসি, গদা যাহা কিছু মারিলেন, সমস্তই সেই উজ্জ্বল পুরুষ গিলিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা সকল ক্ষমতা শেষ করিয়া, তারপর আর কি করিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না।

এমন সময় তাঁহার মনে হইল, 'শিবের পূজা করি, তাহা হইলে আমার কাজ হইবে।'

এই মনে করিয়া তিনি শিবের স্তব করিতে করিতে, নিজ শরীর উপহার দিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য আগুন জ্বালিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিলেন। তখন শিব সন্তুষ্ট না হইয়া আর যান কোথায়? তিনি কেবল যে দরজা ছাড়িয়া দিলেন, তাহা নহে, তাঁহাকে একখানি ধারালো খড়্গও দিলেন এবং নিজে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বল বাড়াইতে ত্রুটি করিলেন না।

তারপর যাহা ঘটিল, বলিতে বড়ই ক্লেশ বোধ হয়। অশ্বত্থামা সেই খড়্গ হাতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন ; কৃপ আর কৃতবর্মাকে দরজায় রাখিয়া গেলেন, যেন কেহ পলাইয়া যাইতে না পারে।

শিবিরে প্রবেশ করিয়াই অশ্বত্থামা সকলের আগে ধৃষ্টদ্যুম্নের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে তাঁহার পিতাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে বধ করিয়াছিল, তাহার উপর রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। সেই রাগেই তিনি সকলের আগে ধৃষ্টদ্যুম্নকে মারিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

সুন্দর কোমল শয্যার উপরে ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় অশ্বত্থামার পদাঘাতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চমকিয়া উঠিয়া বসিবামাত্র, অশ্বত্থামা তাঁহাকে চুলে ধরিয়া মাটিতে আছড়াইতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়া, বুকে লাথি মারিতে আরম্ভ করিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন অনেক কষ্টে বলিলেন, "আমাকে অস্ত্রাঘাতে শীঘ্র সংহার কর।" কিন্তু অশ্বত্থামা তাহা না শুনিয়া পদাঘাতে তাঁহার প্রাণ শেষ করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের চীৎকারে সকলে জাগিয়া উঠিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই ভীষণ রাত্রে ঘুমের ঘোরে, বিষম ত্রাসে কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, কি হইয়াছে।

এদিকে অশ্বত্থামা অস্ত্র হাতে সাক্ষাৎ শমনের ন্যায় সকলকে সংহার করিতেছেন। যোদ্ধারা যুদ্ধ করিবে কি? একে রাত্রিকাল, তাহাতে নিদ্রাকালে হঠাৎ আক্রমণ। হতভাগ্যেরা ভালোমতে প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই, অশ্বত্থামা তাহাদিগকে আক্রমণপূর্বক বধ করিতে লাগিলেন।

সে নিষ্ঠুর নীচ ভীষণ কার্যের আর বর্ণনা করিয়া কি হইবে? শিবিরে যত লোক ছিল, স্ত্রীলোক ভিন্ন আর তাহাদের একজনও রক্ষা পাইল না। পাণ্ডবদিগের পুত্রকয়টিকে

অবধি অশ্বত্থামা নির্দয়ভাবে বিনাশ করিলেন। তিনি চুপি চুপি চোরের ন্যায় প্রবেশ করিবার সময় শিবির যেমন নিস্তব্ধ ছিল, দেখিতে দেখিতে আবার তাহা সেইরূপ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তখন তিনি দেখিলেন যে, তাহার কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, রাত্রিও শেষ হইয়াছে।

তারপর বাহিরে আসিয়া, অশ্বত্থামা কৃপ এবং কৃতবর্মাকে নিজ কীর্তি শুনাইলেন, আর জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া একটি প্রাণীকেও পলায়ন করিতে দেন নাই। তখন তিনজনে মনের আনন্দে করতালি দিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন। এমন কাজের সংবাদটা দুর্যোধনকে তখনই জানানো চাই ; সুতরাং তাঁহারা তাঁহার নিকট আসিতে আর তিলমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

হায় মহারাজ দুর্যোধন! এখন তিনি কি করিতেছেন? এখনো তিনি মৃত্যুর অপেক্ষায় রণস্থলে শয়ান। প্রাণ বাহির হইতে বিলম্ব নাই, জ্ঞান লোপ হইয়া আসিতেছে, মুখ দিয়া ক্রমাগত রক্ত বাহির হইতেছে! বৃক প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুগণ আসিয়া তাঁহার মাংসের লোভে তাঁহাকে ঘেরিয়াছে, তিনি দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে অতি কষ্টে তাহাদিগকে বারণ করিতেছেন।

তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সেই তিন বীর আর চোখের জল থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না। একাদশ অক্ষৌহিণীর যিনি অধিপতি ছিলেন, তাঁহার কিনা এই দশা! আর সেই বীরের মাংস খাইবার জন্য, বন্যজন্তুরা তাঁহাকে ঘেরিয়াছে! যাহা হউক, এ-সব কথা ভাবিয়া আর কি হইবে? এখন যে সংবাদ লইয়া তিনজন আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে শোনানো হউক। এই ভাবিয়া অশ্বত্থামা তাঁহাকে বলিলেন, 'হে কুরুরাজ! যদি জীবিত থাকেন, তবে এই আনন্দ সংবাদ শ্রবণ করুন। এখন পাণ্ডব-পক্ষে পাঁচ পাণ্ডব, কৃষ্ণ আর সাত্যকি, এই সাতজনমাত্র জীবিত। আজ রাত্রে আমি তাহাদের শিবিরে প্রবেশ করিয়া, আর সকলকে বধ করিয়াছি।"

এ কথায় দুর্যোধন চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "হে বীর! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, যাহা করিতে পারেন নাই, আজ তুমি তাহা করিলে। তোমাদের কথা শুনিয়া নিজকে ইন্দ্রের ন্যায় সুখী মনে করিতেছি। এখন তোমাদের মঙ্গল হউক। আবার স্বর্গে দেখা হইবে।" এই বলিয়া দুর্যোধন সেই তিনজনকে আলিঙ্গন করিলে, তাঁহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

ইহার কিঞ্চিৎ পরে সঞ্জয় কাঁদিতে কাঁদিতে এই সংবাদ লইয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। সেদিন আর তিনি অন্যদিনের মতো স্থিরভাবে তাঁহার কথা বলিতে পারিলেন না। ধৃতরাষ্ট্রের পুরীতে প্রবেশমাত্রই, তিনি দুহাত তুলিয়া "হা মহারাজ! হা মহারাজ!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার মুখে সেই দারুণ সংবাদ শুনিয়া সকলের, বিশেষত ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীর, যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনাতীত। সে সংবাদে কেহ অজ্ঞান, কেহবা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। অনেকে পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তারপর এমন কান্না আরম্ভ হইল যে, তাহা শুনিলে বুঝি পাথরও গলিয়া যায়।

এদিকে রাত্রির সেই ভীষণ ব্যাপারের সংবাদ পাইয়া পাণ্ডবগণের কিরূপ কষ্ট হইল, তাহা আর বলিয়া কি হইবে? নকুল তখনই দ্রৌপদীকে আনিতে পাঞ্চাল দেশে চলিয়া গেলেন। দ্রৌপদী আসিলে পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত এমনভাবে কাটিল যে, সে দুঃখের আর তুলনা নাই। দ্রৌপদী কাঁদিতে কাঁদিতে রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, "আজ যদি সেই পামরকে সংহার করা না হয়, তবে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।"

যুধিষ্ঠির তখন তাঁহাকে বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে শান্ত না হইয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি অশ্বত্থামার জন্মাবধি তাহার মাথায় একটা মণি আছে। ঐ দুরাত্মার প্রাণ বধপূর্বক সেই মণি আনিয়া দিতে পারিলে, আমি তাহা তোমাকে পরাইয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইতে পারি।"

তিনি ভীমকেও বলিলেন, "অশ্বত্থামাকে মারিয়া এই মণি আনিয়া দিতে হইবে।" এ কথা বলামাত্রই ভীম নকুলকে সারথি করিয়া অশ্বত্থামার খোঁজে বাহির হইলেন। অশ্বত্থামার রথের চাকার দাগ স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল, সুতরাং তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা তেমন কঠিন কাজ বলিয়াও বোধ হইল না।

কিন্তু ভীমকে অশ্বত্থামার খোঁজে যাইতে দেখিয়া কৃষ্ণের বড়ই চিন্তা হইল। তিনি জানিতেন যে, অশ্বত্থামাকে দ্রোণ ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র দিয়াছিলেন। উহা এমনই ভয়ংকর যে, তাহার বদলে অশ্বত্থামা কৃষ্ণের চক্র চাহিতেও লজ্জাবোধ করেন নাই। অশ্বত্থামা রাগের ভরে ভীমের উপরে এই অস্ত্র মারিয়া বসিলে, তাঁহার রক্ষা থাকিবে না। সুতরাং কৃষ্ণ তখনই, যুধিষ্ঠির আর অর্জুনকে লইয়া রথারোহণে ভীমের অনুগামী হইলেন। ভীমকে পাইতেও তাঁহাদের বিলম্ব হইল না। কিন্তু তিনি কি নিষেধ শুনিবার লোক? তিনি তাঁহাদের কথা না শুনিয়াই ছুটিয়া চলিলেন। তারপর গঙ্গার ধারে আসিয়া অশ্বত্থামাকে ব্যাসদেবের নিকট দেখিবামাত্র তিনি, "দাঁড়া, বামুন দাঁড়া!" বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গেলেন।

অশ্বত্থামা দেখিলেন বড়ই বিপদ। একা ভীম হইতেই রক্ষা নাই, তাহাতে আবার ভীমের পশ্চাতে কৃষ্ণ, অর্জুন আর যুধিষ্ঠিরকেও দেখা যাইতেছে। কাজেই তিনি তখন প্রাণভয়ে তাড়াতাড়ি "পাণ্ডব বংশ নষ্ট হউক!" বলিয়া সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র ছুঁড়িয়া বসিলেন। তখন সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "শীঘ্র তোমার দ্রোণদত্ত সেই মহাঅস্ত্র ছাড়।"

অর্জুন তৎক্ষণাৎ, "এই অস্ত্রে অশ্বত্থামার অস্ত্র বারণ হউক।" বলিয়া তাঁহার অস্ত্র ছাড়িলেন। অমনি সেই দুই অস্ত্রের তেজে এমন ভয়ংকর গর্জন, উল্কাবৃষ্টি আর বজ্রপাত আরম্ভ হইল যে, সকলে ভাবিল, বুঝি সৃষ্টি নষ্ট হয়।

তখন নারদ আর ব্যাসদেব, সৃষ্টি রক্ষার জন্য, সেই দুই অস্ত্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া অর্জুন এবং অশ্বত্থামাকে অস্ত্র থামাইতে বলিলেন। অর্জুন বলিলেন, "অশ্বত্থামার অস্ত্র বারণের জন্য আমি অস্ত্র ছুঁড়িয়াছিলাম। আমার অস্ত্র থামাইলেই উহার অস্ত্র আমাদিগকে ভস্ম করিবে। অতএব যাহাতে সকলে রক্ষা পাই, আপনারা তাহা করুন।"

এ কথা বলিয়াই অর্জুন তাঁহার অস্ত্র থামাইয়া দিলেন। অতিশয় সত্যবাদী সাধুপুরুষ

না হইলে সে অস্ত্র থামাইতে পারে না। মনের ভিতরে কিছুমাত্র মন্দভাব লইয়া উহা থামাইতে গেলে, উহাতে তৎক্ষণাৎ নিজেরই মাথা কাটা যায়। অর্জুন অসাধারণ সাধুপুরুষ ছিলেন, তাই তিনি ইচ্ছামাত্রই তাঁহার অস্ত্র থামাইয়া দিলেন।

কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁহার অস্ত্র থামাইতে না পারিয়া মুনিদিগকে বলিলেন, "আমি ভীমের ভয়ে অস্ত্র ছাড়িয়াছিলাম, এখন তো আর থামাইতে পারিতেছি না। বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি ; এ অস্ত্র নিশ্চয়ই পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবে।"

কিন্তু মুনিরা এরূপ অন্যায় কথায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "অর্জুন যখন তাঁহার অস্ত্র ফিরাইয়া লইয়াছেন, অশ্বত্থামারও পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করা নিতান্ত উচিত।"

বাস্তবিকই, কেবল পাণ্ডবদেরই ক্ষতি হইবে, অশ্বত্থামার কিছুই হইবে না, এমন হইলে অর্জুন তাঁহার অস্ত্র থামাইতে রাজি হইবেন কেন? অথচ এদিকে অশ্বত্থামার নিজের অস্ত্র থামাইবার শক্তি না থাকায় পাণ্ডবদিগের কিছু ক্ষতি না হইয়া যাইতেছে না। এ অবস্থায় অশ্বত্থামার অস্ত্রে অভিমন্যুর শিশু-পুত্রটি মারা যাইবে ; আর অশ্বত্থামা তাঁহার মাথার মণি পাণ্ডবদিগকে দিবেন।

এইরূপে পাণ্ডবেরা অশ্বত্থামার মাথার মণি আনিয়া দ্রৌপদীকে দিলে, সেই মণি যুধিষ্ঠিরের মাথায় পরাইয়া, এত দুঃখের ভিতরেও তিনি কিঞ্চিৎ সুখ পাইলেন।

আর অভিমন্যুর সেই পুত্রটির কি হইল? শিশুটি তখনো জন্মে নাই, সেই অবস্থায়ই সে মারা গেল। তাহার জন্মের পর মরা ছেলে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, কৃষ্ণ আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন। ছেলেটির নাম হইল পরীক্ষিৎ। যুধিষ্ঠিরের পরে এই পরীক্ষিৎ হস্তিনায় ষাট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল।

# স্ত্রীপর্ব

ঠারো দিনের পর কুরুক্ষেত্রের সেই ভীষণ যুদ্ধের শেষ হইল। আঠারো অক্ষৌহিণী লোক এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে। এখন সেই-সকল যোদ্ধার ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেবল শোক করিয়া তো আর চলিবে না, মৃত লোকদের শ্রাদ্ধাদির আয়োজন করা চাই।

একশত পুত্রের শোক কি সহজ কথা? সামলাইয়া উঠিতে ধৃতরাষ্ট্রের বড়ই কষ্ট হইল। ব্যাস, বিদুর প্রভৃতি অনেকে বুঝাইয়াও তাঁহাকে সহজে শান্ত করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, অনেক কষ্টে শেষে তিনি কতক স্থির হইলেন, আর পাণ্ডবদের উপরও তাঁহার রাগ অনেকটা কমিল। ব্যাস তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তোমার পুত্রেরা নিতান্তই দুরাচার ছিল। তাহাদের দোষেই এই সর্বনাশ হইয়াছে; পাণ্ডবদের ইহাতে কিছুমাত্র অপরাধ নাই।"

তারপর শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে, সঞ্জয় আর বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইয়া বলিলেন, "মহারাজ, এখন শ্রাদ্ধাদির সময় উপস্থিত। শোকের মোহে সে-সকল কার্যে অবহেলা করিবেন না।"

তখন ধৃতরাষ্ট্র পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করিলেন। কুলবধূগণ বিধবার বেশে পথে বাহির হইলে পৃথিবীসুদ্ধ লোক তাঁহাদের দুঃখে কাঁদিয়া আকুল হইল।

এদিকে পাণ্ডবেরাও, কৃষ্ণ, সাত্যকি আর দ্রৌপদী প্রভৃতিকে লইয়া কুরুক্ষেত্রের দিকে আসিতেছিলেন। কিছুদূর আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের দেখা হইবামাত্র কৌরব-নারীগণের দুঃখ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল, কেননা পাণ্ডবেরাই এই দুঃখের কারণ।

পাণ্ডবেরা একে একে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে যাইয়া নিজ নিজ নাম বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিরক্তভাবে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন ও তাঁহার সহিত দু-একটি কথা কহিয়াই, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভীম কোথায়"? তখন তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝা গিয়াছিল যে, ভীমকে পাইলে তিনি তাঁহাকে বধ না করিয়া ছাড়িবেন না। তাঁহার এরূপ অভিসন্ধির কথা কৃষ্ণ পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেও ভুলেন নাই। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র ভীমের কথা জিজ্ঞাসা করামাত্র, তিনি একটা

লোহার ভীম আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সেই লোহার মূর্তিটাকে আলিঙ্গন করিবার ছলে, ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে এমনি চাপিয়া দিলেন যে, তাহা একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল! ধৃতরাষ্ট্রের দেহে লক্ষ হাতির জোর ছিল, সুতরাং তিনি যে লোহার ভীম চূর্ণ করিবেন, তাহা আশ্চর্য নহে। আসল ভীমকে পাইলে না জানি তিনি তাঁহার কি দশা করিতেন।

যাহা হউক, লোহার ভীম চূর্ণ করা লক্ষ হাতির জোরের পক্ষেও সহজ কথা নহে; সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র সে কাজ শেষ করিয়াই রক্ত বমি করিতে করিতে পড়িয়া গেলেন। এদিকে ভীমের যথেষ্ট সাজা হইয়াছে মনে করিয়া, তাঁহার রাগ চলিয়া গেল, তখন আবার তিনি "হা-ভীম! হা-ভীম!" করিয়া কাঁদিতে ত্রুটি করিলেন না। তাহাতে কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! দুঃখ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। ওটা লোহার ভীম, যথার্থ ভীম নহে। ভীমকে বধ করিতে যাওয়া আপনার উচিত হয় নাই। দেখুন, যুদ্ধ বারণ করিতে অশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, তথাপি আপনার পুত্রেরা তাহাতে ক্ষান্ত হন নাই; তাহার ফলেই এখন তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সুতরাং ভীমকে তাহার জন্য দোষী করেন কেন?"

কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'কৃষ্ণ! তোমার কথাই সত্য! শোকে বুদ্ধিনাশ হওয়াতেই আমি ঐরূপ করিয়াছিলাম।" এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেবকে আলিঙ্গনপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা গান্ধারীর কথা ভাবিয়াই পাণ্ডবদের মনে অধিক ভয় হইয়াছিল। গান্ধারী সামান্য স্ত্রীলোক ছিলেন না। জীবনে তিনি কখনো একটি অধর্মের কাজ করেন নাই বা একটি অধর্মের কথা মুখে আনেন নাই। অন্ধ স্বামীর দুঃখে তিনি এতই দুঃখিত ছিলেন যে, বিবাহের পরেই তিনি নিজের চক্ষু মোটা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলেন। সে বাঁধন তাঁহার চিরদিন একভাবে ছিল। যুদ্ধের সময় যখন দুর্যোধনেরা জয়লাভের জন্য তাঁহার আশীর্বাদ চাহিতে আসিলেন, তখন গান্ধারী তাঁহাদের মা হইয়াও এ কথা মুখে আনিতে পারিলেন না যে, 'তোমাদের জয় হউক', তিনি বলিলেন, 'ধর্মের জয় হউক!'

সেই দেবতার ন্যায় তেজস্বিনী ধার্মিকা রমণীর ক্রোধের কথা ভাবিয়াই পাণ্ডবেরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। আর ক্রোধও তাঁহার খুবই হইয়াছিল। সেই ক্রোধে পাছে তিনি পাণ্ডবদিগকে শাপ দেন, এই ভয়ে ব্যাসদেব পূর্বেই তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন, "মা! তুমিই বলিয়াছিলে 'ধর্মের জয় হউক', সেই ধর্মের জয় হইয়াছে। তোমার যে অসাধারণ ক্ষমাগুণ, তাহাই ধর্ম ; আর এখন যে ক্রোধ করিতেছ, তাহা অধর্ম। মা! ধর্মের উপর যেন অধর্মের জয় না হয়।"

ইহার উত্তরে গান্ধারী বলিলেন, "ভগবান্! পাণ্ডবদিগের উপর আমার ক্রোধ নাই, তাহাদের বিনাশ আমি চাহি না। কিন্তু ভীম যে অন্যায়পূর্বক দুর্যোধনকে মারিয়াছে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

তাই ভীম গান্ধারীর নিকট উপস্থিত হইয়া, ভয়ে ভয়ে, বিনয়ের সহিত বলিলেন, "মা! আমার অপরাধ হইয়াছে! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! ভাবিয়া দেখুন, আপনার

পুত্রেরা আমাদিগের বড়ই অনিষ্ট করিয়াছিল।"

গান্ধারী বলিলেন, "বাছা! আমার একশত পুত্রের মধ্যে যাহার কিছু কম অপরাধ, এমন একটিকেও যদি জীবিত রাখিতে, তাহা হইলেও সে এই দুই অন্ধের নড়ি স্বরূপ হইতে পারিত। এখন আমাদের পুত্র নাই, কাজেই তুমি আমাদের পুত্রের মতন হইলে।"

তারপর যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট আসিয়া জোড়হাতে বলিলেন, "দেবি! আমিই আপনাদের দুঃখের মূল। আমি অতি নরাধম ; আমাকে শাপ দিন!"

গান্ধারী এ কথায় কোনো উত্তর না দিয়া, কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সেই সময়ে যুধিষ্ঠির গান্ধারীর পায়ে ধরিতে গেলে, গান্ধারী তাঁহার চোখের বাঁধনের ফাঁক দিয়া যুধিষ্ঠিরের আঙ্গুলের নখ দেখিতে পান। তদবধি যুধিষ্ঠিরের নখ মরিয়া গেল। তাহা দেখিয়া অর্জুন, সহদেব এবং নকুল ভয়ে আর তাঁহার নিকট আসিলেন না। তখন গান্ধারী তাঁহাদিগকে ডাকিয়া স্নেহের সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

তারপর পাণ্ডবেরা কুন্তীর নিকটে গেলেন। এত দুঃখ-কষ্টের পর তাহাদিগকে পাইয়া আর তাঁহাদিগকে অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত এবং দ্রৌপদীকে পুত্রশোকে আকুল দেখিয়া, না জানি কুন্তীর কতই কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে কষ্টের দিকে মন না দিয়া, তিনি দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

তারপর সকলে মিলিয়া সেখান হইতে রণস্থলে গেলেন। তখন নিজ নিজ আত্মীয়গণের মৃত শরীর দেখিয়া তাঁহাদের যে দারুণ দুঃখ হইল, তাহার কথা অধিক বলিয়া আর কি হইবে? সেই মৃতদেহগুলির সৎকারই হইল তখনকার প্রথম কাজ। বহুমূল্য কাষ্ঠ, ঘৃত চন্দনাদিতে অসংখ্য চিতা প্রস্তুত করিয়া, যত্নপূর্বক সে কাজ শেষ করা হইলে, সকলে স্নান ও জলাঞ্জলি (অর্থাৎ যাহারা মরিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশে অঞ্জলি ভরিয়া জল) দিবার জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন।

এই সময় কুন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে পাণ্ডবদিগকে বলিলেন, "বৎসগণ! কর্ণের জন্য জলাঞ্জলি দাও, সে তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভাই ছিল।"

হায়! চিরকাল কর্ণের সহিত সাংঘাতিক শত্রুতা করিয়া তাঁহাকে আহ্লাদপূর্বক নিধনের পর ইহা কি নিদারুণ সংবাদ! সে সংবাদ শুনিয়া পাণ্ডবদিগের ন্যায় বীরপুরুষেরাও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

তখন যুধিষ্ঠির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কুন্তীকে বলিলেন, "মা! তুমি আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা গোপন করিয়া কি অন্যায় কাজই করিয়াছ! আমরা তাহাকে বধ করিয়াছি, এ কথা ভাবিয়া এখন বুক ফাটিয়া যাইতেছে। হায়! এ কথা আগে বলিলে কি আর এ নিষ্ঠুর যুদ্ধ হইত?"

# শান্তিপর্ব

যবধি যুধিষ্ঠির এ কথা জানিতে পারিলেন যে, কর্ণ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভাই, সেই অবধি তাঁহার শোকে এবং না জানিয়া তাঁহাকে বধ করার জন্য দুঃখ আর অনুতাপে, তিনি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। যে রাজ্যের জন্য এমন ঘটনা ঘটে, তাহার প্রতি তাঁহার এতই ঘৃণা জন্মিয়া গেল যে, আর কিছুতেই সে রাজ্য ভোগ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। ভাইদিগকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমার রাজ্য করিতে ইচ্ছা নাই, রাজ্য ছাড়িয়া বনে গিয়া আমি তপস্যা করিব।"

এ কথায় সকলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে রাজ্যের জন্য এত ক্লেশ, এত রক্তপাত, সে রাজ্য হাতে পাইয়া কোন্ রাজা তাহা পালন এবং রক্ষার অবহেলা করিতে পারে? বনে যাওয়াই যদি কর্তব্য হয়, তবে এত কাণ্ডের কি প্রয়োজন ছিল? নাহয় এই রাজ্য দ্বারা দান-যজ্ঞাদি ধর্ম কাজই হউক-না, ইহা ছাড়িয়া দিলে কি প্রশংসার কাজ হইবে?

এইরূপে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী সকলে মিলিয়া যুধিষ্ঠিরকে কত বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই যুধিষ্ঠিরের মন শান্ত হইল না। তিনি সবিনয়ে ব্যাসকে বলিলেন, "ভগবান্! ধর্মের কথা আমাকে আরো ভালো করিয়া বলুন। কিরূপে একজন লোক রাজ্যও করিতে পারে, আর ধর্মও করিতে পারে, এ কথা না বুঝিতে পারিয়া আমার মনে বড়ই চিন্তা হইতেছে।"

তখন ব্যাস তাঁহাকে বলিলেন, "যদি ভালো করিয়া ধর্মের কথা শুনিতে তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মের নিকটে যাও, তিনি তোমার সংশয় দূর করিবেন। তিনি দেহত্যাগ না করিতে করিতে শীঘ্র তাঁহার নিকট যাও।"

কৃষ্ণও বলিলেন, "মহারাজ! অতিশয় শোক করা আপনার মতো লোকের উচিত নহে। মহর্ষি ব্যাস যাহা বলিলেন, আপনি তাহাই করুন!"

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতে সকলে নগরের বাহিরেই বাস করিতেছিলেন, এ পর্যন্ত তাঁহাদের হস্তিনায় প্রবেশ হয় নাই। ব্যাস এবং কৃষ্ণের উপদেশ এবং ভীষ্মের কথা শুনিবার আশায় মনে কতকটা শান্তি লাভ করাতে, এখন যুধিষ্ঠির হস্তিনায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

তখন শুভ্র, সুন্দর, সুসজ্জিত ষোড়শ বৃষযুক্ত শ্বেত রথে যুধিষ্ঠিরকে তুলিয়া, অর্জুন

তাহার উপরে নির্মল শ্বেত-ছত্র ধারণ করিলেন, নকুল, সহদেব শুভ্র চামর লইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন, ভীম বল্গা হস্তে সেই রথের সারথি হইলেন। কৃষ্ণ শ্বেত রথে চড়িয়া সঙ্গে চলিলেন ; ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলে, কেহ শিবিকায়, কেহ রথে, তাঁহাদের অনুগামী হইলেন।

নগরবাসিগণের তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা যত্নে রাজপথ, গৃহতোরণাদি সাজাইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। জনতার জয়গীতে, দুন্দুভিরব, শঙ্খনাদ আর দ্বিজগণের আশীর্বাদ মিলিয়া, সে সময়ে এমনি একটি সুখের ব্যাপার হইয়াছিল যে, তাহার আর তুলনাই নাই।

ইহার মধ্যে চার্বাক নামক একটা দুষ্ট রাক্ষস, ভিক্ষুকের বেশে আসিয়া বড়ই রসভঙ্গ করিয়া দিল। হতভাগা দুর্যোধনের বন্ধু, পাণ্ডবদিগের অনিষ্টের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ব্রাহ্মণেরা যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করিতেছেন, তাহাতে দুষ্ট আসিয়া বলে কি, "মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ জ্ঞাতি বধের জন্য আপনাকে দুষ্ট রাজা বলিয়া গালি দিতেছেন। আপনার জীবনে কোনো প্রয়োজন নাই, আপনার মৃত্যুই শ্রেয়।"

এ কথা শুনিয়া ক্রোধে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণগণের কথা সরিল না। ইহার মধ্যে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে দ্বিজগণ! আপনারা দয়া করিয়া আমাকে গালি দিবেন না ; আমি অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিব!"

তখন ব্রাহ্মণেরা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমরা আপনাকে গালি দেই নাই। আপনার মঙ্গল হউক! এই দুরাত্মা দুর্যোধনের বন্ধু, চার্বাক নামক রাক্ষস। দুর্যোধনের বন্ধু বলিয়াই দুষ্ট আপনাকে গালি দিয়াছে, আমরা কিছুই বলি নাই। আপনি কোনো ভয় করিবেন না।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বিষম রোষনয়নে চার্বাকের দিকে চাহিবামাত্র দুরাত্মার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

তারপর বিধিমতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক হইয়া গেলে, তিনি উপযুক্ত লোকদিগের হাতে রাজ্যের কাজ বাঁটিয়া দিলেন। ভীম হইলেন যুবরাজ, বিদুর হইলেন মন্ত্রী, সঞ্জয় আয়-ব্যয় পরীক্ষক, নকুল সৈন্য-পরিদর্শক, অর্জুন শত্রু ও দুষ্ট শাসক, সহদেব দেব-রক্ষক, ধৌম্য দেবসেবা সম্পাদক। সকলের প্রতিই আদেশ রহিল যে, 'ধৃতরাষ্ট্র যখন যেরূপ আজ্ঞা দেন, তাঁহারই মতে চলিতে হইবে।'

এইরূপে রাজকার্যের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া, যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সেই শরশয্যার দিন হইতে ভীষ্ম সেইভাবেই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া, সূর্যের উত্তরায়ণের (অর্থাৎ আকাশের উত্তর ভাগে যাওয়ার) অপেক্ষা করিতেছেন। উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলেই সেই মহাপুরুষের দেহত্যাগের সময় হইবে। তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, কৃপ, সঞ্জয় প্রভৃতি রথে চড়িয়া যাত্রা করিলেন।

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, সেই মহাবীরের মৃত্যুশয্যার চারিদিকে মুনি-ঋষিগণ ঘিরিয়া বসায়, সে স্থানের এক অপূর্ব শোভা হইয়াছে। দূর হইতে তাহা দেখিয়াই, সকলে রথ হইতে নামিয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন।

তখন কৃষ্ণ ভীষ্মের নিকটে গিয়া, বিনয়ের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "হে কুরুপিতামহ! আপনার তুল্য মহৎ লোক এই পৃথিবীতে কেহই নাই ; ধর্মের সকল তত্ত্বই আপনার জ্ঞাত। রাজা যুধিষ্ঠির শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছেন ; এ সময়ে আপনি দয়া করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলে, তাঁহার শান্তিলাভ হইতে পারে।"

যুধিষ্ঠির লজ্জায় ভীষ্মের নিকটে গিয়া কথা বলিতে সাহস পান নাই। কিন্তু ভীষ্মের মনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি কিছুমাত্র বিরাগ ছিল না। যুধিষ্ঠিরের লজ্জার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "যুধিষ্ঠির তো যুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্মই পালন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার লজ্জিত হইবার কোনো কারণ নাই।"

তখন যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট আসিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে, ভীষ্ম তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্বক বলিলেন, "তোমার কোনো ভয় নাই ; মন খুলিয়া আমাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা কর।"

এই সময় কৃষ্ণ ভীষ্মের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা এবং দুর্বলতা দূর করিয়া দিলেন।

তারপর বহুদিন পর্যন্ত, যুধিষ্ঠির প্রত্যহ সেই মহাপুরুষের নিকট আসিয়া, যে-সকল অমূল্য উপদেশ পাইয়াছিলেন, তোমরা বড় হইয়া তাহার কথা পড়িবে। এমন উপদেশ যে-সে দিতে পারে না। তাই যুধিষ্ঠির উপদেশ লইতে আসিলে নারদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এই মহাত্মা ধর্মের সকল সংবাদ জানেন, ইনি বাঁচিয়া থাকিতে তাহা শুনিয়া লও।"

# অনুশাসনপর্ব

শেষ উপদেশ দ্বারা যুধিষ্ঠিরের মনের সকল সংশয় দূর করিয়া ভীষ্মদেব চুপ করিলে, চারিদিকের লোকেরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছবির ন্যায় স্থির এবং নিঃশব্দ হইয়া রহিল। তারপর যুধিষ্ঠির তাঁহার পায়ের ধূলা ও আশীর্বাদ লইয়া হস্তিনায় ফিরিলেন। বিদায়কালে ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন, "সূর্যদেবের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে আমার নিকট আসিও।"

তারপর কিছুদিন গেলে, যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ আসিয়াছে। ইহাই সূর্যের উত্তরায়ণের সময়, এই সময়েই ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ করিবার কথা। সুতরাং তিনি অবিলম্বে পুরোহিত, পুরজন প্রভৃতি সকলকে সঙ্গে লইয়া, রত্ন, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, পট্টবস্ত্র, চন্দনাদি সহ কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ, বিদুর, সাত্যকি প্রভৃতিও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন।

ভীষ্মদেবের শরশয্যার চারিধারে ব্যাস, নারদ প্রভৃতি মুনিরা ও নানা দেশের রাজাগণ বসিয়া আছেন, এমন সময় যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "তোমরা আসাতে আমি বড় সুখী হইলাম। এই শরশয্যায় আমার আটান্ন দিন কাটিয়াছে ; এখন মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ উপস্থিত।"

তারপর তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "ধর্মের কথা তোমার অজানা নাই ; সুতরাং আর শোক করিও না। এখন তুমি পাণ্ডবদিগকে প্রতিপালন কর।"

কৃষ্ণকে তিনি বলিলেন, "আমার দেহত্যাগের সময় উপস্থিত। অতঃপর আমার যেন স্বর্গলাভ হয়।"

সকলের প্রতি তাঁহার শেষ কথা এই হইল, 'তোমরা অনুমতি কর, আমি দেহত্যাগ করি। তোমাদের বুদ্ধি যেন কদাপি সত্যকে পরিত্যাগ না করে ; সত্যের তুল্য আর বল নাই।"

তারপর সেই মহাপুরুষ মৌনাবলম্বনপূর্বক দেহত্যাগে উদ্যত হইলে শর সকল একে একে তাঁহার শরীর হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার দেহে একটি শরের দাগ পর্যন্ত রহিল না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার উজ্জ্বল আত্মা, তাঁহার মস্তক হইতে উঠিয়া স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করিবামাত্র, দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি এবং দুন্দুভি বাদ্য আরম্ভ করিলেন।

এমন মহাত্মার জন্য কি আর শোক করিতে হয়? বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল,

সহদেব প্রভৃতিরা তাঁহাকে মহামূল্য পট্টবস্ত্র ও উষ্ণীষ পরাইয়া, তাঁহার উপরে উৎকৃষ্ট ছত্র ধারণপূর্বক, চামর দোলাইতে লাগিলেন। নারীগণ তালবৃন্ত হস্তে চারিদিকে দাঁড়াইয়া ব্যজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে সুমধুর সামগান আরম্ভ হইয়াছে, চন্দন কাষ্ঠের চিতাও প্রস্তুত। সেই চিতার আগুনে ভীষ্মের দেহ শেষ করিয়া এবং তাহার উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিয়া সকলে তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

# আশ্বমেধিকপর্ব

জ্য লাভের পর যুধিষ্ঠিরের প্রথম কীর্তি হইল অশ্বমেধ যজ্ঞ। যুধিষ্ঠিরের শোক কিছুতেই একেবারে দূর না হওয়ায়, সকলে তাঁহাকে এই মহাযজ্ঞে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহা অতি বৃহৎ এবং কঠিন ব্যাপার; অল্প ধন লইয়া কিছুতেই ইহাতে হাত দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং যুধিষ্ঠির এ যজ্ঞ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াও, ইহা আরম্ভ করিতে ভয় পাইলেন।

ধনরত্ন যাহা কিছু ছিল, যুদ্ধে প্রায় তাহার সমস্তই ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখন অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযুক্ত ধন কোথায় পাওয়া যাইবে? যুধিষ্ঠিরের এইরূপ চিন্তা দেখিয়া ব্যাস তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস, তুমি চিন্তা করিও না ; ধন সহজেই পাওয়া যাইবে। পূর্বে মহারাজ মরুত্ত হিমালয় পর্বতে যজ্ঞ করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে এত অধিক সুবর্ণ দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা বহিতে না পারিয়া সেইখানেই ফেলিয়া আসেন। সেই সুবর্ণ এখনো তথায় রহিয়াছে ; তাহা আনিলে অনায়াসে তোমার যজ্ঞ হইতে পারে।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির হর্ষভরে অমাত্যগণের সহিত সেই ধন আনয়নের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতি সকলেই বলিলেন, "ব্যাসদেবের পরামর্শ অতি উত্তম।" সুতরাং অবিলম্বে মরুত্তের যজ্ঞের সোনা আনিবার জন্য হিমালয় যাত্রার আয়োজন হইল। সেখানে গিয়া উহা খুঁজিয়া বাহির করিতেও বিশেষ ক্লেশ হইল না।

সেকালের লোকে এত ধন কোথায় পাইত? আর না জানি তাহারা কিরূপ মহাশয় লোক ছিল যে, এত ধন দান করিত! মরুত্ত রাজার যজ্ঞের সেই সোনা আনিতে ষাটলক্ষ উট, এককোটি বিশলক্ষ ঘোড়া, দুইলক্ষ হাতি, একলক্ষ রথ, একলক্ষ গাড়ি লাগিয়াছিল। আর মানুষ আর গাধা যে কত লাগিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। এতগুলিতেও কি সে ধন সহজে আনিতে পারিয়াছিল? তাহারা সেই সোনার ভারে বাঁকা হইয়া, দিনে দুই ক্রোশের অধিক পথ চলিতে পারে নাই।

এত ধন যে যজ্ঞে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা যে কত বড় যজ্ঞ বুঝিয়া লও। একটি প্রশস্ত ভূমি খাঁটি সোনায় মুড়িয়া, তাহার উপর যজ্ঞের গৃহাদি প্রস্তুত হইল। জমিটি যেমন, ঘর-বাড়িও অবশ্য তাহার উপযুক্তই হইয়াছিল। এদিকে অর্জুন, ইহার অনেক পূর্বেই গাণ্ডীব হাতে, একটি সুন্দর ঘোড়ার পশ্চাতে পৃথিবীর সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে

আরম্ভ করিয়াছেন। এক বৎসর দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া ঘোড়া ফিরিয়া আসিবে। ইহার মধ্যে কাহাকেও সে ঘোড়া আটকাইতে দেওয়া হইবে না। আর, অর্জুন যাহার রক্ষক, তাহাকে কেহ আটকাইয়া রাখিবার আশঙ্কাও নাই।

অর্জুনের যাত্রাকালে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, "যাঁহারা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের পুত্র-পৌত্রদিগকে বধ করিও না।" অর্জুন যথাসাধ্য এই আজ্ঞা পালনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেজন্য তাঁহাকে বিস্তর ক্লেশও পাইতে হইল। কুরুক্ষেত্রে কত রাজাই পাণ্ডবদিগের হাতে মারা গিয়াছে, তাহাদের দেশে গেলেই, তাহাদের পুত্র-পৌত্র আর দেশের লোকেরা ক্ষেপিয়া অর্জুনকে মারিতে আইসে। তিনি তাহাদিগকে অধিক বাণ মারেন না, পাছে বেচারারা মারা যায়। কিন্তু তাহাতে তাহারা মনে করে, বুঝি তিনি ভালোরূপ যুদ্ধই করিতে পারেন না ; কাজেই তাহারা মহোৎসাহে তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করে। সুতরাং তখন তিনি তাহাদের দু-চারজনকে মারিতে বাধ্য হন। তারপর তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া তাঁহার নিকট হাতজোড় করিতে থাকে।

ত্রিগর্ত দেশে সুশর্মার পুত্র ধৃতবর্মার সহিত এইরূপ হইল। প্রাগ্‌জ্যোতিষে ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের সহিত এইরূপ হইল। সিন্ধুদেশে জয়দ্রথের আত্মীয়গণও এইরূপ আরম্ভ করিল। শেষে তাহাদের অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় তিনি তাহাদের মাথা কাটিতে আরম্ভ করিলে আর তাহাদের দুর্দশার সীমা নাই।

এমন সময় জয়দ্রথের স্ত্রী দুঃশলা, তাঁহার শিশু পৌত্রটিকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অর্জুনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুঃশলা ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা, সুতরাং অর্জুনের ভগিনী। তাঁহাকে দেখিবামাত্র অর্জুন গাণ্ডীব রাখিয়া দিয়া বলিলেন, 'ভগিনী! তোমার কি কাজ করিব, বল।"

ইহার উত্তরে দুঃশলা যাহা বলিলেন, তাহাতে অর্জুনের মনে বড়ই ক্লেশ হইল। জয়দ্রথের সঙ্গে দুঃশলার বিবাহ হইয়াছিল। জয়দ্রথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুরথ, পিতার শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। ইহার উপরে যখন তিনি শুনিলেন যে, অর্জুন যজ্ঞের ঘোড়া সমেত আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, তখনি তাঁহার মৃত্যু হইল। এখন দুঃখিনী বিধবা দুঃশলা, পতি-পুত্রের শোকে অস্থির হইয়া, পৌত্রটিকে অর্জুনের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, যদি তাহাকে দেখিয়া অর্জুনের দয়া হয়।

ছেলেটি যখন মাথা হেঁট করিয়া কাতরভাবে অর্জুনকে প্রণাম করিল, তখন আর তিনি চক্ষের জল না রাখিতে পারিয়া বলিলেন, 'ক্ষত্রিয়ের ধর্মকে ধিক্! এই ধর্ম পালন করিতে গিয়াই বন্ধু-বান্ধবদিগকে বধ করিয়াছি!"

এই বলিয়া তিনি দুঃশলাকে সাদর মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া তথা হইতে বিদায় হইলেন।

মণিপুরের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। এখন সেই চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন মণিপুরের রাজা। ঘোড়া মণিপুরে উপস্থিত হইলে বভ্রুবাহন তাঁহার পিতার আগমন সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই পাত্রমিত্র সমেত, অতি বিনীতভাবে অর্জুনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু অর্জুন ইহাতে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বভ্রুবাহনকে বলিলেন, "আমি আসিলাম যুদ্ধ করিতে, আর তুমি করজোড়ে আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলে! ইহা কখনোই ক্ষত্রিয়ের কাজ নহে, ইহা কাপুরুষের কাজ। তোমাকে ধিক্। তোমার জীবনে প্রয়োজন কি?"

এ কথায় বভ্রুবাহন নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। এমন সময় সেই যে উলুপী নাম্নী নাগকন্যার সহিত অর্জুনের বিবাহ হইয়াছিল, তিনি আসিয়া বভ্রুবাহনকে বলিলেন, "বাছা, আমি তোমার বিমাতা উলুপী। তোমার পিতা যখন যুদ্ধের বেশে আসিয়াছেন, তখন ইঁহার সহিত যুদ্ধ করাই তোমার উচিত। তাহাতে ইনি সন্তুষ্ট হইবেন।" তখন বভ্রুবাহন বিপুল যুদ্ধের আয়োজন করিয়া, সৈন্যগণকে আদেশ দিবামাত্রই তাহারা ঘোড়া আটকাইয়া ফেলিল। তাহাতে অর্জুন অতিশয় তুষ্ট হইয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, ক্ষণেকের ভিতরেই বভ্রুবাহনের বাণে তাঁহাকে অজ্ঞান হইতে হইল।

জ্ঞান হইলে অর্জুন বভ্রুবাহনকে বলিলেন, "বাঃ! এই তো চাই! আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম! আচ্ছা, এখন আমি মারি, স্থির হইয়া সামলাও তো!"

তারপর অর্জুন অসংখ্য নারাচ ছুঁড়িয়া মারিলে, বভ্রুবাহন তাহার সমস্তই কাটিলেন! কিন্তু তাহার পরে ভয়ানক বাণগুলি ফিরাইতে না পারায়, তাঁহার রথের ধ্বজ আর ঘোড়া কাটা গেল। তখন তিনি রথ হইতে নামিয়া এমনি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, তাহা দেখিয়া অর্জুনের আর আনন্দের সীমা রহিল না। এমন সময় বভ্রুবাহন কি যে একটা বাণ মারিলেন, তাহাতে নিমেষ মধ্যে অর্জুনকে একেবারে মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিল। বভ্রুবাহনও তাহা দেখিয়া দুঃখে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

এই বিষম বিপদের সময়, চিত্রাঙ্গদা কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে আসিয়া উলুপীকে দেখিয়াই বলিলেন, "উলুপী! তোমার দোষেই এই বিপদ উপস্থিত হইল।" বভ্রুবাহনও সেই সময়ে জ্ঞানলাভ করিয়া, উলুপীকে তিরস্কারপূর্বক বলিলেন, "পিতাকে মারিয়াছি, সুতরাং আমিও এখনি প্রাণত্যাগ করিব। তাহা হইলে হয়তো তুমি সন্তুষ্ট হইবে।"

উলুপী যথাসাধ্য ইহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া, তখনি নাগলোক হইতে সঞ্জীবনী মণি আনাইলেন। সে মণির কি আশ্চর্য গুণ! উহা অর্জুনের বুকে স্থাপনমাত্রই তিনি চক্ষু মার্জনাপূর্বক উঠিয়া বসিলেন, যেন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল।

তারপর অবশ্য খুব সুখের অবস্থাই হইল। আর তখন এ কথাও জানা গেল যে, উলুপী অতি মহৎ অভিপ্রায়েই এই ব্যাপাব ঘটাইয়াছিলেন। শিখণ্ডীর সহায়তায় ভীষ্মকে বধ করায়, অর্জুনের যথেষ্ট অপরাধ হইয়াছিল। সেই অপরাধে বসুগণ এবং গঙ্গাদেবী তাঁহাকে শাপ দিতে প্রস্তুত হন। উলুপী সে সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পিতা সেই দেবতাদিগকে অর্জুনের প্রতি প্রসন্ন হওয়ার জন্য বিস্তর মিনতি করায়, তাঁহারা বলেন, "বভ্রুবাহন অর্জুনকে বধ করিলে, তবে তাঁহার শাপ কাটিবে।" এইজন্যই উলুপী বভ্রুবাহনকে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ দেন। তিনি জানিতেন যে, অর্জুনকে বাঁচাইবার ঔষধ তাঁহার ঘরে আছে। এ-সকল কথা জানিতে পারিয়া সকলেই

যে উলুপীর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তখন বভ্রুবাহন, চিত্রাঙ্গদা আর উলুপীকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণপূর্বক, অর্জুন পুনরায় তথা হইতে যাত্রা করিলেন।

মগধে জরাসন্ধের নাতি মেঘসন্ধিও অন্যান্য অনেক মূর্খের ন্যায় মনে করিয়াছিলেন যে অর্জুন অপেক্ষা তিনি নিজে অধিক যোদ্ধা। অর্জুন, যুধিষ্ঠিরের কথা মনে করিয়া যতই তাঁহাকে বাঁচাইয়া বাণ মারিতে যান, ততই তাঁহার আরো সাহস বাড়িয়া যায়। শেষে অবোধের যে দশা সচরাচর হয়, তাঁহারও তাহাই হইল, তাঁহার আর অস্ত্র নাই। তখন অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ হইয়া বেশ যুদ্ধ করিয়াছ, এখন ঘরে যাও! আমি তোমাকে বধ করিব না।" তাহাতে মেঘসন্ধি করজোড়ে কহিলেন, "মহাশয়! আমি পরাজিত হইয়াছি। এখন অনুমতি করুন, কি করিব।" অর্জুন বলিলেন, "চৈত্র মাসের পূর্ণিমার দিন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ দেখিতে যাইবে।" এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

গান্ধার দেশে শকুনির পুত্রও প্রথমে ভারি তেজ দেখাইয়াছিলেন। অর্জুন কৃপাপূর্বক, তাঁহার মাথা না কাটিয়া, পাগড়িটি উড়াইয়া দিলে, তাঁহার চৈতন্য হইল।

এইরূপে এক বৎসরকাল ঘোড়াটিকে দেশে দেশে ভ্রমণ করাইয়া তাহাকে হস্তিনায় ফিরাইয়া আনিলে, সেই ঘোড়ার মাংস দিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। সেরূপ যজ্ঞ আর তাহার পরে কখনো হয় নাই। এমন কোন আত্মীয়-স্বজন, এমন কোনো রাজারাজড়া, এমন কোনো মুনি-ঋষি বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না, যিনি সেই যজ্ঞে না আসিয়াছিলেন।

আর ভোজনের বিষয় কি বলিব? অন্নের পর্বত, ঘৃত-দধির নদী, আর মিঠাই-মোণ্ডা কি পরিমাণ, তাহা বলিতে পারি না। হাজার হাজার লোক মণি কুণ্ডল, আর সুবর্ণ মাল্যে সুসজ্জিত হইয়া সেই-সকল সুমধুর খাদ্য পরিবেশন করিয়াছিল। এক-একলক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন শেষ হইলে এক-একবার দুন্দুভি বাজিত। এইরূপে যজ্ঞের কয়েকদিনের মধ্যে কত শত বার যে দুন্দুভি বাজিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই।

এইরূপ সমারোহে সেই মহাযজ্ঞ শেষ হইল। এই যজ্ঞে একটি অদ্ভুত ঘটনা হয়। যজ্ঞ শেষে সকলেই যুধিষ্ঠিরের অতিশয় সুখ্যাতি করিতেছেন, এমন সময় একটি আশ্চর্য নেউল আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। উহার চক্ষু দুটি নীল! মাথা আর শরীরের এক পাশ সোনার। নেউল আসিয়া ঠিক মানুষের মতো বলিতে লাগিল, "হে রাজামহাশয়গণ! উঞ্ছবৃত্তি নামক ব্রাহ্মণ যে ছাতু দান করিয়াছিলেন, সে কাজ আপনাদের যজ্ঞের চেয়ে অনেক বড়!"

এ কথায় সকলে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এমন কি দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ যে, এই যজ্ঞকে তাহা অপেক্ষা কম মনে করিলে?"

তাহাতে নেউল বলিল, "আপনারা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন। উঞ্ছবৃত্তি নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী, এক পুত্র ও পুত্রবধূ ছিল। ক্ষেত্রের শস্য কাটিয়া নিলে যাহা পড়িয়া থাকে, উঞ্ছবৃত্তি এবং তাঁহার পরিবার সেই শস্যমাত্র আহার করিতেন; এইরূপে তাঁহাদের দিন যাইত।

"তারপর দেশে দুর্ভিক্ষ আসিল, ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট হইল, ব্রাহ্মণের কষ্টও বৃদ্ধি পাইল। তখন কোনোদিন অতি কষ্টে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ আহার জুটিত, কোনোদিন একেবারেই জুটিত না।

"এই সময়ে একবার সারাদিন ঘুরিয়া, শেষ বেলায় ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ যব পাইলেন। তাহাতে তাঁহার পরিবারের লোকেরা আহ্লাদিত হইয়া, সেই যবের ছাতু প্রস্তুত করিল। তারপর সকলে স্নান, আহ্নিক অন্তে সেই ছাতু আহারের আয়োজন করিলেন।

"এমন সময় সেখানে এক অতিথি ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ সেই অতিথিকে আদরের সহিত তাঁহার নিজের ছাতুর ভাগ আহার করিতে দিলেন, কিন্তু অতিথির তাহাতে তৃপ্তি হইল না।

"তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহার নিজের ভাগ অতিথিকে দিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার তৃপ্তি হইল না।

"দেখিয়া ব্রাহ্মণের পুত্র তাঁহার নিজের ভাগ অতিথিকে দিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার তৃপ্তি হইল না।

"তখন ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ তাঁহার নিজের ভাগ আনিয়া অতিথিকে দিলেন।

"ইহাতে সেই অতিথি পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'হে ধার্মিক! ঐ দেখ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে; দেবতারা তোমার স্তব করিতেছেন। এখন তুমি পরম সুখে স্বপরিবারে স্বর্গে চলিয়া যাও।'

"সেই অতিথি ছিলেন, স্বয়ং ধর্ম। তাঁহার কথায় ব্রাহ্মণ স্ত্রী, পুত্র, এবং পুত্রবধূ সহ তখনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তারপর আমি গর্ত হইতে উঠিয়া, সেই অতিথির পাতের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। তাহাতেই এই দেখুন! আমার অর্ধেক শরীর স্বর্ণময় হইয়া গিয়াছে।

"সেই অবধি আমি, আমার অবশিষ্ট শরীরটুকু স্বর্ণময় করিবার আশায় যজ্ঞস্থান দেখিলেই তাহাতে গড়াগড়ি দিয়া থাকি। আজ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের কথা শুনিয়া, অনেক আশায় এখানে আসিয়া গড়াগড়ি দিলাম; কিন্তু আমার শরীর সোনার হইল না! তাই বলিতেছি যে, সেই গরিব ব্রাহ্মণ যে অতিথিকে ছাতু খাওয়াইয়াছিল, তাহা ইহার চেয়ে বড় কাজ।"

এই বলিয়া সেই নেউল তথা হইতে প্রস্থান করিল।

# আশ্রমবাসিকপর্ব

জা হইয়া যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর সহিত এমন মিষ্ট ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। দুর্যোধনের কথা মনে করিয়া এখন যুধিষ্ঠিরের উপরে তাঁহাদের রাগ হওয়া দূরে থাকুক, বরং যুধিষ্ঠিরের গুণের কথা ভাবিয়া দুর্যোধনকেই অতিশয় দুষ্ট লোক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যুধিষ্ঠির ইঁহাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতিও সেইরূপই ব্যবহার করিতেন। বাস্তবিক ইঁহাদের নিকট ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী যেমন ভক্তি ও ভালোবাসা পাইতে লাগিলেন, নিজ পুত্রগণের নিকটও তাহা পান নাই।

পনেরো বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে পূর্বে যে যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তাঁহার দুঃখের কথা ভাবিয়া ক্রমে আর সকলেই তাহা ভুলিয়া গেলেন ; কিন্তু ভীম তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। এজন্য অন্য সকলের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রকে সম্মান এবং ভালোবাসা দানে তিনি অক্ষম হইলেন।

ভীমের এই ভাব ক্রমেই রাড়িতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে, তিনি গোপনে ধৃতরাষ্ট্রের অসম্মান করিতেও ত্রুটি করেন না। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্রের কিরূপ কষ্টের কারণ হইল, তাহা বুঝিতেই পার।

এই সময়ে ভীম একদিন যুধিষ্ঠির অর্জুন প্রভৃতির অসাক্ষাতে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে শুনাইয়া নিজ বন্ধুগণের নিকট বলিতেছিলেন, "আমি আমার এই চন্দন মাখা দুখানি হাত দিয়াই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে বধ করিয়াছি।"

এ কথা শুনিয়া গান্ধারী চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া, তখনি নিজের বন্ধুদিগকে ডাকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হে বন্ধুগণ! আমিই যে এই কুরুবংশের নাশের মূল, তাহা তোমরা জান। সকলে যখন আমাকে হিতবাক্য বলিয়াছিল, তখন আমি তাহা শুনি নাই। এতদিনে সেই পাপের দণ্ড গ্রহণ করিতেছি। এখন আমি আর গান্ধারী প্রতিদিন মৃগচর্ম পরিধান, মাদুরে শয়ন এবং দিনান্তে যৎকিঞ্চিৎ ভোজনপূর্বক ভগবানের নাম লইয়া দিন কাটাই। এ কথা জানিলে যুধিষ্ঠিরের অতিশয় ক্লেশ হইবে বলিয়া, কাহারো নিকট ইহা প্রকাশ করি নাই।"

তারপর তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "বাবা যুধিষ্ঠির, তোমার মঙ্গল হউক। তোমার

যত্নে এতদিন পরম সুখে কাল কাটাইলাম, এখন আমাদিগের পরকালের পথ দেখিবার সময় উপস্থিত। সুতরাং অনুমতি দাও, আমি আর গান্ধারী বনে গিয়া তপস্যা করি।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "জ্যাঠামহাশয়। আমার তুল্য নরাধম আর কেহ নাই। আপনি অনাহারে ভূমি-শয্যায় এত কষ্টে কাল কাটাইতেছেন, আর আমি আপনার সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। আপনি যদি কষ্ট পান, তবে আমার সুখের কি প্রয়োজন? দুর্যোধন আপনার যেরূপ পুত্র ছিল, আমাদিগকেও সেইরূপ মনে করিবেন। আপনি বনে গেলে, এই রাজ্য লইয়া আমি কিছুমাত্র সুখ পাইব না। আপনি আমাদিগের দিকে চাহিয়া মনকে শান্ত করুন; আমরা আপনার সেবা করিয়া কৃতার্থ হই।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "বাবা! বৃদ্ধকালে বনে গিয়া তপস্যা করাই আমাদের কুলের ধর্ম। সুতরাং আমার তাহা করিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, তুমি ইহাতে আমাকে নিষেধ করিও না।"

অনাহারে ধৃতরাষ্ট্রের শরীর এতই দুর্বল হইয়াছিল যে, তিনি এইটুকু বলিতে বলিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহাতে যুধিষ্ঠিরের অতিশয় দুঃখ হইল বটে, কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা, বিস্তর মিনতি করিয়াও ধৃতরাষ্ট্রের মত ফিরাইতে পারিলেন না। ইহার উপরে আবার ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্রের কথায় সম্মত হইতে বলিলে, কাজেই শেষে তাঁহাকে তাহাই করিতে হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্র বিনয়বচনে প্রজাদিগের নিকট বিদায় লইয়া, মৃত পুত্র এবং আত্মীয়গণের কল্যাণার্থ অনেক ধন দান-পূর্বক বনগমনে উদ্যত হইলেন।

কার্তিক মাসের পূর্ণিমার দিন, বল্কল এবং মৃগচর্ম পরিধানপূর্বক, ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী, বিদুর এবং সঞ্জয়কে লইয়া গৃহের বাহির হইলে, স্ত্রী পুরুষ সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। কুন্তী এবং গান্ধারীর কাঁধে ভর দিয়া ধৃতরাষ্ট্র আগে আগে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা প্রভৃতি সকলেই চলিলেন। সকলেরই চোখে জল, কাহারো মন স্থির রাখিবার শক্তি নাই।

নগরের বাহিরে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকলকে বলিলেন, "এখন তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও।" এ কথায় আর অন্য সকলেই নিরস্ত হইল, কিন্তু বিদুর, সঞ্জয়, এবং কুন্তী আর ঘরে ফিরিলেন না।

কুন্তীকে বনে যাইতে দেখিয়া পাণ্ডবদিগের যে কি দুঃখ হইল, আমার কি সাধ্য যে তাহা লিখিয়া জানাই। তাঁহারা অতি কাতরস্বরে সাশ্রুনয়নে কত মিনতি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। তখন অগত্যা তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সকলকে হস্তিনায় আসিতে হইল।

এদিকে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর আর সঞ্জয় অনেক পথ চলিয়া গঙ্গাতীরে এবং তথা হইতে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অনেক তপস্বীর আশ্রম ছিল। সেই-সকল আশ্রমের নিকটে থাকিয়া তাহারা বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণপূর্বক কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। এইরূপে কিছু দিন গেল।

সেই সময়ে ব্যাসদেব, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রভৃতির মনে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত, অতি আশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যত বীর মারা গিয়াছিলেন, সকলে ব্যাসের ডাকে পরলোক হইতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে তখন সেই আশ্রমে কি আনন্দের ব্যাপার যে হইয়াছিল, তাহা কি বলিব! ব্যাসের বরে সে সময়ের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের চক্ষুও ভালো হইয়া গেল। সুতরাং তিনিও পুত্রগণকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলেন।

এক মাস কাল ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে থাকিয়া, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরা হস্তিনায় ফিরিয়া আসেন। তারপর দুই বৎসর চলিয়া গেলে, একদিন দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম দেখিয়া আসিয়াছেন, এ কথা জানিতে পারিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবন্! যদি জ্যাঠামহাশয়, জ্যেঠিমা, মা এবং সঞ্জয়ের কোনো সংবাদ পাইয়া থাকেন, তবে দয়া করিয়া তাহা বলুন।"

নারদ বলিলেন, "তোমরা তপোবন হইতে চলিয়া আসিলে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী আর সঞ্জয় অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। সে সময়ে ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী জল ভিন্ন আর কিছুই খাইতেন না, কুন্তী মাসে একবার আহার করিতেন, সঞ্জয় পাঁচ দিনে একবার আহার করিতেন।

একদিন ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী কুন্তীর সঙ্গে বনের দিকে যাত্রা করেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিবার সময় ভীষণ দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। অনাহারে নিতান্ত দুর্বল থাকায় সে আগুন হইতে কোনোমতেই তাঁহাদের পলায়নের শক্তি হইল না! তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিলেন, 'সঞ্জয়! তুমি শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর। আমরা এই অগ্নিতেই দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইব।'

"এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী পূর্বমুখে ভগবানের ধ্যান আরম্ভ করিলে, দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের দেহ ভস্ম হইয়া গেল।

"সঞ্জয় অনেক কষ্টে সেই অগ্নি হইতে রক্ষা পাইয়া, তাপসগণের নিকট এই সংবাদ প্রদানকালে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। তপস্বীদিগকে এই সংবাদ দিয়া সঞ্জয় হিমাচলে চলিয়া গিয়াছেন। তারপর আমি তোমাদিগকে এই সংবাদ দিবার জন্য এখানে আসিয়াছি. আসিবার সময়ে আমি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর কুন্তীর শরীর দেখিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা ইচ্ছাপূর্বকই অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করায় তাঁহাদের স্বর্গলাভ হইবে। অতএব তাঁহাদের জন্য তোমাদের শোক করা উচিত নহে।"

হায়, কি কষ্টের কথা! যুধিষ্ঠির এই দারুণ সংবাদে মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, হস্তিনায় হাহাকার উঠিল। পাণ্ডবদিগের মনে হইল যে, 'গুরুজনেরা যখন এইরূপে পুড়িয়া মরিলেন, তখন আমাদের রাজ্য, ধর্ম, বীরত্ব সকলই বৃথা।'

নারদ উপদেশ দ্বারা তাঁহাদিগকে শান্ত করিলে, সকলে গঙ্গাতীরে গিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর কুন্তীর তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি শেষ করিলেন।

বনবাসে ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী আর গান্ধারীর তিন বৎসর কাটিয়াছিল।

# মৌসলপর্ব

রপর আঠারো বৎসর চলিয়া গেল। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের ছত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইলে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন যে, শীঘ্রই কোনো বিপদ হইবে।

যে বিপদ হইল, তাহা পাণ্ডবদের নহে, যাদবদের (অর্থাৎ কৃষ্ণ যে বংশে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের)। এইরূপ একটা বিপদ যে হইবে, তাহা কৃষ্ণ আগেই জানিতেন। কিন্তু-এমনি হওয়া আবশ্যক বুঝিয়া তিনি তাহাতে ব্যস্ত হন নাই।

বিপদের কারণ অতি সামান্য। যদুকুলের কয়েকটি বালক একটা লৌহ-মুসলের কথা লইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদকে উপহাস করে। ইহাতে তাঁহারা বিষম ক্রোধভরে এই দারুণ শাপ দেন, "এই মুসলের দ্বারাই কৃষ্ণ আর বলরাম ভিন্ন তোমাদের বংশের সকলে নষ্ট হইবে!"

কৃষ্ণ জানিতেন যে এইরূপ হইবে, এবং হওয়া আবশ্যক, সুতরাং তিনি আর এই বিপদ নিবারণের কোনো চেষ্টা করিলেন না। মুসলটিকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইল। যাদবদিগের মধ্যে অনেকে মদ খাইত। পাছে এই-সকল লোক মাতাল হইয়া কোনো একটা কিছু বিপদ ঘটায়, এজন্য তখন হইতেই মদ্যপানও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আশা ছিল, ইহাতে লোকের চরিত্র ভালো হইবে। কিন্তু ফল হইল ঠিক ইহার বিপরীত।

এই সময়ে একদিন যাদবেরা সকলে প্রভাস তীর্থে যায়। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, সেখানে গিয়া খুব আমোদ-প্রমোদ করিবে, সুতরাং তাহার আয়োজন সঙ্গে লইতে ভুলিল না। দুঃখের বিষয় এই যে, এত নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা সেই আয়োজনের সঙ্গে মদও লইল, সেই মদে যে কি সর্বনাশ হইল, তাহার কথা শুন।

প্রভাস তীর্থে গিয়া বলরাম, সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি সকলে কৃষ্ণের সম্মুখে সুরাপান করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাঁহারা মাতাল হইয়া ঝগড়া আরম্ভ করিবেন, তাহা বিচিত্র কি? তখন সাত্যকি কৃতবর্মাকে বলিলেন, "তুই বড় নির্দয় লোক! ঘুমের ভিতরে লোককে মারিতে গিয়াছিলি!"

ইহাতে কৃতবর্মা চটিয়া বলিলেন, "তুই তো ভূরিশ্রবার মাথা কাটিয়াছিলি। তোর মতো নির্দয় কে আছে?"

এইরূপে কথায় কথায় বিবাদ আরম্ভ হইয়া, শেষে তাহা বড়ই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। সাত্যকি কৃতবর্মার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন, তাহাতে কৃতবর্মার পক্ষের লোকেরা তাঁহাদের নিজ নিজ থালা হাতেই সাত্যকিকে আক্রমণ করিলেন। তখন কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন আসিয়া সাত্যকির সাহায্য করিতে লাগিলেন।

তারপর ক্রমে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, কৃতবর্মার লোকেরা কৃষ্ণের সম্মুখেই সাত্যকি এবং প্রদ্যুম্নকে বধ করিল। তাহাতে কৃষ্ণ নিকটস্থ শরবন হইতে এক মুষ্টি শর তুলিয়া লইবামাত্র তাহা একটা মুদ্গর হইয়া গেল! সেই মুদ্গর দিয়া তিনি কৃতবর্মার পক্ষের লোকদিগকে বিনাশ করিলেন!

মুনির শাপের কি বিষম তেজ! সে সময়ে কেহ একটিমাত্র শর তুলিয়া লইলেও তাহা বজ্রের মতন হইয়া যাইতে লাগিল। সেই শরের ঘায়ে কৃষ্ণের সাক্ষাতেই তাঁহার পুত্র, ভাই, নাতি প্রভৃতির মৃত্যু হইলে, তিনি ক্রোধভরে সেখানকার প্রায় সকলকে মারিয়া শেষ করিলেন।

তারপর কৃষ্ণ, বজ্র এবং দারুক বলরামকে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন যে, তিনি এক বৃক্ষের তলায় বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। তখন কৃষ্ণ, অর্জুনের নিকট সংবাদ দিবার জন্য দারুককে হস্তিনায় পাঠাইয়া বজ্রকে বলিলেন, বজ্র, তুমি শীঘ্র গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা কর।"

কিন্তু বজ্র অধিক দূর না যাইতে, এক ব্যাধের মুদ্গর আসিয়া তাঁহার উপরে পড়ায় তাঁহার মৃত্যু হইল। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ বলরামকে সেইখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, নিজেই স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে গেলেন।

নিজের পিতা বসুদেবের হাতে এই কার্যের ভার দিয়া কৃষ্ণ আবার বলরামের নিকট আসিয়া দেখেন যে, তাহার মুখ দিয়া সহস্র ফণাযুক্ত ভয়ঙ্কর এক সাপ নির্গত হইতেছে। উহার শরীর শ্বেতবর্ণ এবং মুখসকল লাল। বাহির হইয়াই সেই সাপ সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিলে, সমুদ্র, বরুণ এবং প্রধান প্রধান নাগগণ তাহার পূজা করিতে করিতে তাহাকে লইয়া গেলেন। বলরামের অসার নির্জীব দেহ সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

কৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে, বলরাম ঐ সর্পরূপেই নিজের দেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন। ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, বন মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে, তিনি এক স্থানে শয়ন করিয়াছেন, এমন সময় জরা নামক এক ব্যাধ, মৃগ মনে করিয়া, তাঁহার প্রতি এক বাণ মারিল। সেই বাণ তাঁহার পদতলে বিঁধিয়া গেল। ব্যাধ জানে, হরিণই পড়িয়াছে; কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া বুঝিতে পারিল, সে কি সর্বনাশ করিয়াছে! অমনি সে কৃষ্ণের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু কৃষ্ণ তাহার উপর কিছুমাত্র রাগ না করিয়া, তাহাকে সান্ত্বনাপূর্বক স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এদিকে দারুকের নিকট সংবাদ পাইয়া অর্জুন দ্বারকায় আসিয়া দেখিলেন যে, দ্বারকাপুরী শ্মশান হইয়া গিয়াছে। বসুদেব তখনো জীবিত ছিলেন, কিন্তু পরদিন তিনিও মারা গেলেন।

তখন আর দুঃখ করিবার সময় ছিল না। বসুদেবের এবং প্রভাস তীর্থে নিহত

যাদবগণের সৎকারের অন্য লোক উপস্থিত না থাকায়, অর্জুনকেই সর্বাগ্রে সে-সকল কাজের চেষ্টা দেখিতে হইল। তারপর কৃষ্ণের পৌত্র বজ্র এবং দ্বারকার স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া তিনি ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করিলেন। সেই সময়ে একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। অর্জুন সকলকে লইয়া দ্বারকানগরের যে স্থানই ছাড়িয়া যান, অমনি সমুদ্র আসিয়া তাহা গ্রাস করিতে লাগিল।

তারপর কি নিদারুণ ব্যাপার হইল, শুন। অর্জুন দ্বারকার স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করিলে পথমধ্যে একদল দস্যু আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। অর্জুন দস্যুনাশার্থ গাণ্ডীব তুলিতে গিয়া দেখেন, দেহে বল কিছুমাত্রও নাই, গুণটুকু পরানোই প্রায় অসাধ্য হইয়াছে। বহু কষ্টে যদি গুণ পরানো হইল, উৎকৃষ্ট অস্ত্রগুলির কথা কিছুতেই মনে পড়িল না। হা বিধাতঃ! এমন যে অক্ষয় তূণ, এই বিপদের সময় তাহাও শূন্য হইয়া গেল।

কাজেই দস্যুরা স্ত্রীলোকদিগের অনেককে ধরিয়া লইয়া গেল, অর্জুন তাহাদিগকে কিছুতেই বারণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ভগ্নহৃদয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া, তথায় বজ্রকে রাজা করিলেন।

এই-সকল ঘটনার কথা ভাবিয়া অর্জুনের মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া, ব্যাসদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাস তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, অর্জুন? আজ কেন তোমাকে এরূপ চিন্তিত এবং বিষণ্ণ দেখিতেছি?"

এ কথার উত্তরে অর্জুন তাঁহাকে কৃষ্ণ, বলরাম এবং অন্যান্য যাদবগণের মৃত্যুর সংবাদ দিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণের শোকে আমার জীবনধারণ করাই ভার বোধ হইতেছে, আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। তারপর দ্বারকার নারীগণকে আনয়নকালে একদল দস্যু আমাদিগকে আক্রমণ করে। ঐ সময়ে আমার গাণ্ডীবে গুণ চড়ানো অতীব ক্লেশকর হইল; অক্ষয় তূণ শূন্য হইয়া গেল ; দিব্য অস্ত্রসকল কিছুতেই স্মরণে আসিল না। এই-সকল ঘটনার কথা ভাবিয়া আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি। ভগবন্! এখন আমার কি কর্তব্য, তাহা বলুন।"

অর্জুনের কথা শুনিয়া ব্যাস বলিলেন, "এই পৃথিবীতে তোমাদের কার্য শেষ হইয়াছে। আমার মতে এখন তোমাদের এ-স্থান পরিত্যাগ করাই উচিত! তোমার কাজ শেষ হওয়াতেই দিব্য অস্ত্রসকল তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, তাই তুমি তাহাদিগকে স্মরণ করিতে পার নাই। এখন তোমাদের স্বর্গারোহণের কাল উপস্থিত ; সুতরাং তাহারই চেষ্টা দেখ।"

# মহাপ্রস্থানিকপর্ব

যদু বংশের বিনাশ ও কৃষ্ণের দেহত্যাগের কথা শুনিয়া আর যুধিষ্ঠির পৃথিবীতে থাকিতে চাহিলেন না। সুতরাং তিনি এখন মহাপ্রস্থানই (অর্থাৎ প্রাণত্যাগের উদ্দেশ্যে হিমালয়ে প্রস্থান) কর্তব্য বুঝিয়া অর্জুনকে বলিলেন, "ভাই! আমি ভাবিয়াছি, শীঘ্রই দেহত্যাগ করিব। এখন তোমরা কি করিবে, স্থির কর।"

অর্জুন বলিলেন, "আমিও তাহাই স্থির করিয়াছি।"

এ কথা শুনিয়া ভীম, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদী বলিলেন, "আমরাও তাহাই করিব।"

এইরূপে সকলের পরামর্শ স্থির হইলে, পরীক্ষিৎকে হস্তিনার রাজা করিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানে উদ্যত হইলেন। প্রজাগণ কাতরস্বরে তাঁহদিগকে বারণ করিল ; কিন্তু তাঁহারা আর মর্তবাসে সম্মত হইলেন না।

এইরূপ সময়ের করণীয় অনুষ্ঠানাদি শেষ হইলে, পাণ্ডবগণ এবং দ্রৌপদী মহামূল্য বস্ত্রাভরণ পরিত্যাগপূর্বক বল্কল পরিয়া হস্তিনা নগরকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চিরকালের জন্য তথা হইতে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে একটি কুকুরও তাঁহাদের অনুগামী হইল। এ সময়ে পশ্চাৎ হইতে ডাকিতে নাই। নগরবাসীরা নীরবে, নতশিরে বহু দূর অবধি তাঁহাদের সঙ্গে চলিল, কিন্তু কেহ তাঁহাদিগকে ফিরিতে বলিল না।

ক্রমে সকলেই ঘরে ফিরিল, কিন্তু সেই কুকুরটি ফিরিল না।

পাণ্ডবেরা তথা হইতে ক্রমাগত পূর্বদিকে চলিতে চলিতে অসংখ্য গিরি-নদী পার হইয়া, শেষে লোহিত সাগরের[১] তীরে উপস্থিত হইলেন। এ পর্যন্ত গাণ্ডীব এবং অক্ষয় তূণ অর্জুনের সঙ্গেই ছিল। সেই সময়ে এক পর্বতাকার পুরুষ পাণ্ডবদিগের পথরোধ করত বলিলেন, "হে পাণ্ডবগণ! আমি অগ্নি! কৃষ্ণ তাঁহার চক্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে অর্জুনও গাণ্ডীব পরিত্যাগ করুন। উহাতে আর তাঁহার কোনো প্রয়োজন নাই; উহা বরুণকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।"

এ কথায় অর্জুন গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ জলে নিক্ষেপ করায় অগ্নি চলিয়া গেলে, পাণ্ডবগণ দক্ষিণ মুখে চলিয়া শেষে লবণ সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে সমুদ্রের তীর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম ও তারপর ক্রমাগত পশ্চিমদিকে বহুদূরে চলিয়া

আবার সমুদ্রতীর প্রাপ্ত হইলে, জলের উপরে দ্বারকার মঠাদির চূড়াসকল দেখা গেল।

তারপর তাঁহারা ক্রমাগত উত্তরদিকে চলিয়া, অবশেষে হিমালয়ে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সহসা দ্রৌপদীর অঙ্গ অবশ হইয়া গেল। তিনি আর চলিতে না পারিয়া সেই স্থানেই পড়িয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! দ্রৌপদী তো কখনো কোনো অপরাধ করেন নাই, তবে কেন ইঁহার পতন হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "দ্রৌপদী আমাদের অপেক্ষা অর্জুনকে অধিক ভালোবাসিতেন, সেই পাপেই তাঁহার পতন হইয়াছে।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রস্থানের যাত্রীকে ফিরিয়া তাকাইতে নাই, সুতরাং তিনি দ্রৌপদীর পানে চাহিয়া দেখিলেন না।

কিছুকাল পরে সহদেবও অবশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! সহদেব অতি সুশীল ছিল এবং সর্বদাই আমাদের সেবা করিত। সে কি অপরাধে পতিত হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "সর্বাপেক্ষা বিদ্বান বলিয়া সহদেবের অহঙ্কার ছিল। তাহাতেই উহার পতন হইয়াছে।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির একমনে ভগবানকে ভাবিয়া চলিতে লাগিলেন। সহদেবের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না।

তারপর দ্রৌপদী ও সহদেবের শোকে অবশ হইয়া নকুল পড়িয়া গেলে ভীম পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! নকুল পরম ধার্মিক ছিল ; সে কিজন্য পতিত হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "নকুল ভাবিত, তাঁহার মতো সুন্দর লোক পৃথিবীতে নাই। তাহাতে তাহার পতন হইয়াছে। চল! উহাদের দিকে আর ফিরিয়া তাকাইবার প্রয়োজন নাই।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির, আর ফিরিয়া না চাহিয়া, একমনে পথ চলিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে দ্রৌপদী, সহদেব এবং নকুলের জন্য শোক করিতে করিতে অর্জুনও পড়িয়া গেলেন। তাহাতে ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! মহাত্মা অর্জুন হাস্যচ্ছলে কদাচ মিথ্যা কথা বলে নাই; তাহার কেন পতন হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "অর্জুন অহঙ্কারপূর্বক বলিয়াছিল যে, সে একদিনেই সকল শত্রু সংহার করিবে। কিন্তু তাহা করিতে পারে নাই, সে অন্য বীরগণকে তুচ্ছ করিত। এইজন্যেই আজ তাহাকে পড়িতে হইল।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির স্থিরচিত্তে ভীম আর সেই কুকুরকে লইয়া চলিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে ভীমেরও শরীর অবশ হইয়া গেল। তিনি ভূপতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার অতি প্রিয়পাত্র,

আমার কি অপরাধ হইয়াছিল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তুমি অন্যকে না দিয়া নিজে অপরিমিত আহার করিতে, আর তোমার তুল্য বলবান কেহ নাই বলিয়া অহঙ্কার করিতে। ইহাই তোমার অপরাধ!"

এই বলিয়া ভীমের দিকেও আর না চাহিয়া, যুধিষ্ঠির স্থিরচিত্তে পথ চলিতে লাগিলেন। সেই কুকুর তখনো তাহার সঙ্গে ছিল। অনন্তর যুধিষ্ঠির আর অল্প দূর গমন করিলেই ইন্দ্র উজ্জ্বল রথারোহণে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই রথে উঠ, তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছি।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার দ্রৌপদী এবং প্রিয় ভাইসকল পথে পড়িয়া আছে। তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমার স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা নাই।"

তাহা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "উঁহারা তো তোমার পূর্বেই স্বর্গে গিয়াছেন, উঁহাদের জন্য কেন দুঃখ করিতেছ? তুমি তোমার এই শরীর সমেতই স্বর্গে গিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে।"

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "দেবরাজ! এই কুকুর আমাকে ভালোবাসিয়া এতদূর আমার সঙ্গে আসিয়াছে, ইহাকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া স্বর্গে যাইব? সুতরাং দয়া করিয়া ইহাকেও আমার সঙ্গে আসিতে দিন!"

ইন্দ্র বলিলেন, "আজ তুমি স্বর্গে গিয়া দেবোচিত সুখ লাভ করিবে। আজ কেন একটা কুকুরের জন্য চিন্তিত হইতেছ? ওটা থাকুক ; তুমি আইস।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "স্বর্গের সুখ লাভ করিতে হইলে যদি আমার পরম ভক্ত এই কুকুরটিকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে সে সুখে আমার প্রয়োজন নাই।"

ইন্দ্র বলিলেন, "যে কুকুরের সঙ্গে বাস করে, সে স্বর্গে যাইতে পারে না। সুতরাং শীঘ্র ওটাকে পরিত্যাগ কর!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ও আমাকে ভালোবাসে, সুতরাং আমি নিজের সুখের জন্য উহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তুমি দ্রৌপদীকে আর তোমার ভাইদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে, আর একটা কুকুরকে ছাড়িতে পারিবে না?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমি তো উহাদিগকে পরিত্যাগ করি নাই, উহাদের মৃত্যু হইয়াছে। জীবিত থাকিতে আমি কখনো উহাদিগকে ছাড়িয়া যাই নাই। মৃত্যুর পর আর উহাদিগকে ছাড়া না ছাড়া আমার হাতে ছিল না, কাজেই কি করিব?"

তখন সেই কুকুর, হঠাৎ তাহার পশুবেশ পরিত্যাগপূর্বক, সাক্ষাৎ ধর্মরূপে পরম স্নেহভরে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই কুকুরের বেশে তোমার সঙ্গে আসিয়াছিলাম। তুমি যে তোমার ভক্ত কুকুরটির জন্য স্বর্গও ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়াছ, ইহাতে বেশ বুঝিলাম, তোমার মতো ধার্মিক আর স্বর্গেও নাই। তুমি এই দেহেই স্বর্গে যাইতে পাইবে।"

তখন সকল দেবতারা মিলিয়া, দিব্য রথে করিয়া মহানন্দে যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, নারদ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,

"যুধিষ্ঠির ভিন্ন আর কেহই সশরীরে স্বর্গে আসিতে পারেন নাই! ইনিই সকল ধার্মিকের শ্রেষ্ঠ!"

নারদের কথা শেষ হইলে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার ভাইয়েরা যেখানে গিয়াছে, সে স্থান ভালোই হউক আর মন্দই হউক, আমিও সেইখানে যাইব। তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে চাহি না।"

তাহা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "মহারাজ! তুমি নিজ পুণ্যবলে এখানে আসিয়াছ; এইখানেই থাক। উঁহারা তোমার সমান পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। উঁহারা কেমন করিয়া আসিবেন?"

যুধিষ্ঠির তথাপি বলিলেন, "দ্রৌপদী আর আমার ভাইসকল যেখানে, আমি সেইখানেই যাইতে চাহি। উহাদিগকে ছাড়িয়া এখানে থাকিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না!"

# স্বর্গারোহণপর্ব

ধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়া দেখিলেন যে, দুর্যোধন সেখানে পরম সুখে বসিয়া আছেন, কিন্তু ভীমার্জুন প্রভৃতি কেহই তথায় নাই। ইহাতে তিনি নিতান্ত আশ্চর্য এবং দুঃখিত হইলে নারদ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "দুর্যোধন ধর্মযুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন, আর তিনি ঘোর বিপদেও ভীত হন নাই। এই পুণ্যেই তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে!"

তখন যুধিষ্ঠির দেবতাদিগকে বলিলেন, "হে দেবতাগণ, আমি তো এখানে কর্ণকে দেখিতে পাইতেছি না। যে সকল রাজা আমার জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন, তাঁহারাই-বা এখন কোথায়? তাঁহারা কি স্বর্গে আসিতে পান নাই? তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমি এ-স্থানে কিরূপে থাকিব? কর্ণের জন্য আমার প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইতেছে, আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ইঁহাদিগকে দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। আমি সত্য কহিতেছি, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমি এখানে থাকিতে পারিব না। উঁহারা যেখানে নাই, সেখানে থাকিয়া আমার কি সুখ? উঁহারা যেখানে আছেন, সেই স্থানই আমার স্বর্গ!"

এ কথায় দেবগণ বলিলেন, "বৎস! তোমার যদি উহাদিগের নিকট যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে শীঘ্র সেখানে যাও। ইন্দ্র আমাদিগকে তোমার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে বলিয়াছেন, সুতরাং আমরা তাহা করিব!"

এই বলিয়া তাঁহারা একজন দেবদূতকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি শীঘ্র ইঁহাকে নিয়া ইঁহার আত্মীয়গণের সহিত দেখা করাও।"

দেবদূত তখনি যুধিষ্ঠিরকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সে বড়ই ভীষণ পথ ; পাপীরা উহাতে চলাফেরা করে। মশা, মাছি, কীট, ভল্লুকাদিতে এবং অস্থি, রক্ত-মাংসের কর্দম ও পূতিগন্ধে সেই ঘোর অন্ধকার পথ পরিপূর্ণ। চারদিকে ভীষণ অগ্নি। লৌহচঞ্চু কাক ও গৃধিনীগণ দলে দলে তথায় উড়িয়া বেড়াইতেছে। পর্বতাকার সূচমুখ ভূতগণ তথায় ছুটাছুটি করিতেছে ; তাহাদের কোনোটা রক্তমাখা, কোনোটার হাত-পা কাটা, কোনোটার নাড়ি-ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেখানকার নদীর জল আগুনের মতো গরম ; গাছের পাতা ক্ষুরের মতো ধারাল। চারিদিকে লোহার কলসীতে ফুটন্ত তেলের মধ্যে ভাজা হইতে হইতে পাপীরা চীৎকার করিতেছে।

কি ভয়ংকর স্থান! যুধিষ্ঠির তাহা দেখিয়া দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এ

পথে আর কতদূর যাইতে হইবে?"

দেবদূত বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কষ্ট হইলে দেবতারা আপনাকে ফিরাইয়া নিতে বলিয়াছেন। সুতরাং যদি বলেন, এখান হইতে ফিরি।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির সেখান হইতে ফিরিলেন, আর অমনি চারিদিক হইতে অতি কাতরস্বরে কাহারা বলিতে লাগিল, " হে মহারাজ! দয়া করিয়া আর-একমুহূর্ত অপেক্ষা করুন! আপনার আগমনে সুন্দর বাতাস বহিয়া আমাদিগকে অনেক শীতল করিয়াছে। অনেকদিন পরে আপনাকে দেখিয়া আমাদের বড় সুখ হইতেছে। আপনি দয়া করিয়া আর-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন।"

চারিদিক হইতে এইরূপ কাতর বাক্য শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের বড়ই দয়া হইল ; কিন্তু উহা কাহার শব্দ, কোথা হইতে আসিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন তিনি বলিলেন, "ওহে দুঃখী লোকসকল! তোমরা কে? আর কিজন্য তোমরা কষ্ট পাইতেছ?"

যুধিষ্ঠির এই কথা কহিবামাত্র চারিদিক হইতে একসঙ্গে, "আমি কর্ণ!" "আমি ভীম!" "আমি অর্জুন!" "আমি নকুল!" "আমি সহদেব!" "আমি দ্রৌপদী!" "আমরা আপনার পুত্রগণ!"—এইরূপ সকলে পরিচয় দিতে লাগিলেন। তখন যুধিষ্ঠির ভাবিলেন, 'হায়! কি কষ্ট! আমার পুণ্যবান প্রিয়তমেরা এমন কি পাপ করিয়াছে যে, তাহাদিগকে এ স্থানে আসিতে হইল? আর দুষ্ট দুর্যোধনই-বা এমন কি পুণ্য করিয়াছে যে, সে সবান্ধবে স্বর্গে বসিয়া সুখ ভোগ করিতে পাইল? এ অতি অবিচার।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির দেবদূতকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি যাঁহাদের দূত, তাঁহাদিগকে বলুন যে, আমি এই স্থানেই থাকিলাম। আর আমি সেখানে যাইব না। আমার ভাইয়েরা আমাকে পাইয়া সুখী হইয়াছে।"

দেবদূত এ-সকল কথা ইন্দ্রকে জানাইলে, দেবতারা সকলে সেই ভয়ঙ্কর স্থানে যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেখিতে দেখিতে সেখানকার সকল অন্ধকার, দুর্গন্ধ এবং ভয় দূর হইয়া সে স্থান স্বর্গের ন্যায় সুন্দর হইয়া গেল।

তারপর ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "মহারাজ! দেবতারা তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আর তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না। তোমার পুণ্যের বলে সর্বাপেক্ষা উচ্চ ফল লাভ হইয়াছে। নরক দেখিতে হইল বলিয়া তুমি বিরক্ত হইও না। সকল রাজাকেই একবার নরক দেখিতে হয়। পাপ-পুণ্য সকলেরই থাকে। যাহার পাপ অধিক, সে আগে অল্পকাল স্বর্গে থাকিয়া, পরে নরক ভোগ করে। যাহার পুণ্য অধিক, সে আগে নরকে থাকিয়া শেষে স্বর্গ ভোগ করে। এইজন্যই তোমাকে আগে নরক দেখাইয়াছি। তুমি যে অশ্বত্থামার বধের কথা বলিয়া দ্রোণকে ফাঁকি দিয়াছিলে, সেই পাপে তোমাকে নরক দেখিতে হইল। এইরূপ অল্প-অল্প পাপ ভীমার্জুন, দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলেরই ছিল, তাই সকলকেই কিছু কিছু কষ্ট পাইতে হইয়াছে। কিন্তু এখন আর তাহাদের কোনো কষ্ট নাই, তাহারা সকলেই স্বর্গে গিয়াছে। তোমার পক্ষের রাজাদেরও সকলেরই স্বর্গলাভ হইয়াছে। এখন তুমি শোক পরিত্যাগপূর্বক আমার সঙ্গে আইস, সকলকেই

দেখিয়া সুখী হইবে। ঐ দেখ, দেবনদী মন্দাকিনী বহিয়া যাইতেছে। উঁহার জলে স্নান করিলে আর তোমার শোক, তাপ, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতি কিছুই থাকিবে না।"

সকলের শেষে ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "বৎস! আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। বারবার তোমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, তোমার তুল্য ধার্মিক আর নাই। তুমি যে তোমার ভাইদিগকে ছাড়িয়া স্বর্গ ভোগ করিতে চাহ নাই, ইহাতেও তোমার মহত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এখন তুমি আমার সঙ্গে ঐ মন্দাকিনীর পবিত্র জলে স্নান কর।"

মন্দাকিনীর জলে স্নান করামাত্র যুধিষ্ঠিরের মানুষ দেহ দূর হইয়া দেবতুল্য অপরূপ উজ্জ্বল মূর্তি দেখা দিল। তখন তিনি ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, কুন্তী, মাদ্রী, পাণ্ডু, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি আত্মীয়গণ এবং কৃষ্ণের সহিত মিলিয়া স্বর্গের অতুল আনন্দে মগ্ন হইলেন।

সমাপ্ত

শিক্ষাবর্ষ-২০২৫

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক
প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য